প্রিয়তমাসু ...

এই উপন্যাসটি আমাদের বিয়ের বহু বছর পরে লেখা। বিয়ের সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ আমাকে লেখক হতে দেয়নি। রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র দু-তিন বছর পরে এই উপন্যাস রচনার উপক্রম।

উপন্যাসটি একজন প্রকাশকের কাছে তিন বছর পড়ে থাকার পরে ফিরে এল। তারপর কয়েক বছর পড়ে রইল বাড়িতে। তখন হঠাৎ মনে হল 'ডগর'* তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার কথা। করলাম। কিন্তু ডগর-এ সবটা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারা গেল না। তাই পরবর্তী সংকল্প অনুযায়ী পুস্তক আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হল।

'হিড়মাটি' ও 'ভঙ্গাহাড়'-র তৃতীয় পর্যায় 'ঘরডিহ' (ভিটে)। এর বিষয়বস্তুর সময়সীমা উনিশ শ একষট্টি সাল পর্যন্ত। উনিশ শ বেয়াল্লিশ থেকে শুরু করে যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে লক্ষ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে শাসনের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে ১৯৬১ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে যে-সব আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে পঙ্গু হাতে লেখার ক্ষমতা না থাকাতে সে-সব কথা লেখার উদ্যমও এখন হারিয়ে গেছে।

এই উপন্যাস লেখার কল্পনা বহুদিন থেকে ছিল। রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরে এটি রূপ নিল, ... তুমি এ উপন্যাস লেখার সময় যে প্রেরণা দিয়েছিলে তারই উপহার স্বরূপ এই রচনাটিকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু বিকল্পের আবিষ্কার করতে পারলাম না।

একাধিক ছাপাখানায় এটি মুদ্রিত হয়েছে। নিজের উদ্যমে কাগজ কিনেও ছাপবার খরচ যোগানো সম্ভব হয়নি। এ কথা তোমার জানা। ভারতবর্ষের বিশেষত ওড়িশা রাজ্যের একজন ভূতপূর্ব মন্ত্রীর এ উক্তি তুমি ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ বিশ্বাস করবে না। না করুক। কিছু আসে যায় না। ইতিহাস থেকে অনেক কথা লোপ পেয়ে যায়। যাবে। কিন্তু বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে পরম্পরাকে ধরে চলবে তার পৃষ্ঠভূমিকে মজবুত না করলে একটা জাতি, জাতি হয়ে থাকতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানের কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনকালের কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনীয় নয়। গান্ধিজী বলেছিলেন স্বাধীনতার উত্তরকালে গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দল নিজ নিজ মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কংগ্রেস নাম ধরে গণতন্ত্রে কোনো রাজনৈতিক দল গঠিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাদের কংগ্রেস নেতারা তাঁর মতকে খাতির করেননি। এখন তো কংগ্রেসের শতবার্ষিকী পালিত হতে চলেছে, রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস শীর্ষক ছদ্মনামে। বর্তমানের কংগ্রেস যে আর জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয় একথা কংগ্রেসওয়ালারা ভুলে গেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ, রাজনীতিবিশারদ ঐতিহাসিকগণ একথা ভুলে যাওয়াতে এটুকু বিশ্বাস হচ্ছে যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইতিহাসও মিথ্যার প্রবাচক বা প্রবক্তা হয়ে থেকে যাবে।

এখন তো আরও বিশ বছরের অধিককাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখনকার উপন্যাস

এই সময়ের জীবনকে আশ্রয় করে লিখিত হওয়া উচিত। এখন জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা নেই বললেই চলে। রাজনীতি বর্তমান অর্থের দাস। স্বাধীনতা এ দেশকে যাঁরা এনে দিয়েছিলেন তাঁদেরই কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে বর্তমান রাজনীতিতে। আধুনিক বা অধুনাতন জীবনে বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলির প্রাদুর্ভাব মানুষের জীবন থেকে চিরাচরিত মূল্যবোধকে লোপ করে দিয়েছে। পৃথিবীতে অন্যত্র এরকম বিপর্যয় ঘটেছে কিনা বলতে পারি না কিন্তু এ দেশের সভ্যতার মূল ভিত্তি যা কিনা পরতন্ত্রকালেও জাতীয় জীবনকে বহু উর্ধে রাখতে পেরেছিল, তা যেন লোপ পেতে শুরু করেছে এমন মনে হয়।

আমার অন্যান্য উৎসর্গপত্র থেকে এ পত্রের স্বর স্বতন্ত্র। তার কারণ বার্ধক্য। বর্তমানকে দেখে ভবিষ্যতে পা দেওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছি।

এটুকুমাত্র আমার বলার কথা নিজের সম্বন্ধে। তুমি ছাড়া আমার এই মর্মন্তুদ যন্ত্রণা আর কেউ বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই এই লেখাটি তোমার হাতে দিলাম।

তোমার

২৬/১/৮৪ 'তুমি'

আজ আর সে সপ্তাঘর* নেই। সে দুয়ার নেই। সাঁঝের সলতে আর জ্বলে না সেখানে। সে গোলাম বাড়ির বউ কোথায় মরে পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে। সব গেছে। কর্পূর গেছে, কাপড়ও গেছে। তবুও যেন কত কি পড়ে আছে এলোমেলো, এখানে সেখানে, চারিদিকে। তাকে কুড়োচ্চে কে! তাকে কুড়োবে কে! কার ধৈর্য আছে? তাকে কেউ চিনছেও না, বুঝছেও না।

দুনিয়াটা এগিয়েছে। তার নাম সংসার। সে শুধু বেড়েই চলেছে। টানলে আরো বাড়বে। ফুরোবে না। কত কি বদলে গেছে। পুরোনো নতুন হয়ে গেছে।

একটা ঘুম, এক ঘুমে যেন রাত পুইয়েছে। কুম্ভকর্ণের ঘুমের মতো। জেগে উঠতে উঠতে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। আমগাছে আমড়া ফলার মতো। কেমন আলাদা আলাদা লাগছে। শুকরা ড্যাবডাবে চোখে তাকালো। দৃষ্টি টান টান। এটা সেই গাঁ নাকি? চোখ মলে আবার তাকালো চারধারে। হ্যাঁ, সেই গাঁ। তার ছেলেবেলার ডালকপাটি খেলা বটগাছের ঝুরিগুলো তেমনি নেমে এসে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে শেকড় ধরার মতো লাগছে। এ কি সেই গাঁ! শুকরার গাঁ? রতনীর গাঁ? বাইন্যার গাঁ?

ধনী মাস্টারের গাঁ? দুঃখী দাসের গাঁ? ভাগু মহান্তি, নিধিয়ার মায়ের গাঁ? এ কি সেই গাঁ।

দু-দুটো দশক, যুগ বল তো দু দুটো যুগ। কুড়ি বাইশ বছর জলের মতো বয়ে গেল কোথায়। কালকের মতো লাগছে। কত কি ছিল এ গাঁয়ে। কত কারা ছিল এ গাঁয়ে। কে কোথায় মরে ঝরে গেছে। খালি যেন গত দিনগুলো স্বপ্ন হয়ে তার ঘুম জড়ানো কাজল কালো ছায়া ফেলেছে গাছপালা, ঘরদোর, খেত-খামার চারদিকে। সে ছায়াটা যেন ভাসা বাদলের ছায়ার মতো উড়ে যাবে অমনি। আবার রোদ আসবে, ফরসা হবে। নতুন নতুন লাগছে। কত বছর বাদে গাঁয়ে ফিরেছে শুকরা।

শুকরা কলকাতা থেকে এসেছে। দুপ দাপ গোটা গাঁয়ের ছেলেপিলে যত দৌড়ে এলো। দেখতে চায় শুকরা বলে কেমনতর সে জীবটা।

শুকরা এসেছে। বসে আছে ভাগু মহান্তির দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে। জামা প্যান্ট পরা শুকরা।

ঝাঁকালো করঞ্জ গাছটার লটপটে ডাল একটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল আচমকা। এই পথে উড়ে যাওয়া শাঁকচুন্নি একটা বসেছিল সেই ডালটায় বুঝি। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল। 'ওই উড়ে গেল' বলে কেউ শোর তুলল। দৌড়োল সবাই পেতনির পিছনে খালি মিছিমিছি। শুকরা তেমনি তাকিয়ে থাকে। শাঁকচুন্নি কিম্বা ছেলেগুলো কাউকে দেখা যায় না।

মহান্তিমশায় বাড়িতে ছিলেন না। কখন আসবেন কে জানে। ভিতর বাড়ি থেকে খবর এল। রতনীকে রেখেছে রাউতের পো। শুকরা সেখানে না গিয়ে এখানে বসে আছে কেন?

* গাঁয়ের বারোয়ারি ভাগবত পাঠঘর

খবর পেল মণিয়া। ধনী মাস্টারের সম্পর্কের ভাই। ধেয়ে এল 'শুকুরদা, শুকুরদা' ডাকতে ডাকতে। সত্যি যেন বেশ চেনাজানা অতি আপনার।

পড়ল এসে পায়ের তলায়। সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ।

"তুই কে?" শুধোল শুকুরা।

"আমি মণিয়া গো। চিনতে পারছ না আমাকে? ধনীদাদাকে মনে আছে?"

"ধনীদাদা? ধনী মাস্টারমশাই? কি হল? ধনী মাস্টারমশাই কোথায়?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মণিয়া। ওর মনে পড়ে না ধনীদাদাকে। সে শুধু শুনেছে ওর মায়ের কাছে। ওর মা মানে ধনীয়ার পিসি। ধনীয়ার ভিটেতে ওরা এসে রয়েছে। শুনেছে শুকুরা আর ধনীয়ার মধ্যে ভারি ভাব।

"কি রে? চুপ করে রইলি যে? তুই — তুমি ধনী মাস্টারের কে হও?"

"ভাই— পিসতুতো ভাই।"

"আর ধনী মাস্টারমশাই?"

মুখে কথা নেই মণির।

"ধনী মাষ্টারমশাই নেই?" উঠে দাঁড়িয়েছিল শুকুরা মণিকে দেখে। বসে পড়ল ধপ করে।

"আর বাইয়া? বলতে পার বাইয়া কোথায়? রাউত বাড়িতে? চেন তুমি বাইয়াকে? বায়া গো— আমার ছেলে।"

মণি চুপ।

"দেখনি, দেখনি? বায়াকে দেখনি?"

মাথা নাড়ল মণিয়া।

পাঁজরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গাঢ় একটা নিঃশ্বাস। ওর তাপে সব রক্ত যেন বাষ্প হয়ে উড়ে গেল শূন্যে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল গা-টা। মাথা ঘুরিয়ে দিল। পড়ে যাবে না তো! চোখের সামনে সব ঝাপসা দেখাল।

আকাশে মেঘ, দু-ফোঁটা ছিটিয়ে দিল, তারপরে ঝর ঝর ঝরে পড়ল। বৃষ্টি নয়, জল। চোখের জল।

'বাইয়া নেই'! 'বাইয়া নেই!' মাঠঘাট, ঘরদোর, গাছপালা সব যেন একসঙ্গে হঠাৎ হাহাকার করে উঠল।

"বাইয়া নেই? আর রতনী? মানে বায়ার মা— আমার স্ত্রী, ওহ্, সে বুঝি রাউত বাড়িতে, তাই না? বুঝেছি, এবার সব বুঝেছি। গাঁয়ে আর সকলে আছে? ভাগু মহান্তি, নীলমণি রাউত, দোলগোবিন্দ নায়েক সবাই আছে তো? কেউ মরেনি? সবাই বেঁচে আছে? একা শুধু বায়া? আর ধনী মাস্টার?"

মণির মুখে কথা নেই, এ যেন অন্য এক শুকুরা। যে শুকুরার কথা তার মা বলে, যে কলকাতা গেছে রোজগার করতে, এ তো সে শুকুরা নয়। মণি ভাবতে থাকে।

শুকুরার মুখ লাল হয়ে গেছে। কান দুটো যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। নাকের গর্ত দুটো ফুলে উঠেছে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ার জন্যে।

আর রইল কী? আর আছে কী? ঘর গেছে। গেরস্থালিও গেছে। ঘরের ঘরণী গেছে। ঘরের দীপ নিবে গেছে। আর রইল কী? চারধারে আঁধার। মিসমিসে অন্ধকার দেখছিল শুকুরা।

মোটরের শব্দ এল। হর্ন বেজে উঠল জিপগাড়ির, ঘোড়া চিহিঁহিঁ করার মতো একটা রুক্ষ আওয়াজ। চমকে উঠল শুকুরা। গাঁয়ের মধ্যে জিপের আনাগোনাও হয়!

পটনায়ক নেমে এলেন জিপ থেকে। ভাগু মহান্তি ওরফে ভাগু পট্টনায়ক। গাড়ি থেকে নেমে সোজা চললেন বাড়ির ভিতরে। এখনো শক্তপোক্ত আছেন কর্তা, শুকুরা চেয়ে আছে, চেয়ে রয়েছে মণিয়া। ভাগু মহান্তির নজরে কেউ পড়েনি, দুজনের একজনও।

''নমস্কার ভাগুবাবু!'' ওদিকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল জিপের ভিতর থেকে, একজন বাবু। বাবু নয় সাহেব— বাবুসাহাব।

হেসে ফেললেন মহান্তিমশায়। কি সুন্দর হাসি। একঝুড়ি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। গরুর হাড়ের মতো সাদা দাঁত। নতুন দাঁত যেন সাজিয়েছে বুড়োবয়সে, ষাট বছরের পুরোনো মাড়ির ওপর।

ষাট কেন, তার চেয়ে বেশি হবে। দেখেছিল শুকুরা কলকাতা যাওয়ার আগের দিন। এক কুড়ি দুই কি চার বছর আগে। সেদিন সে যেমন দেখে গিয়েছিল আজও তেমনি টাটকা দেখাচ্ছে কর্তামশায়ের গতরটা, শুধু ঐ চুলগুলো যা পাক ধরে এসেছে খানিকটা কানের গোড়ায়। বেজায় কান-ভাঙানো কথা শুনে শুনে বুঝি! পাতলা করে ছাঁটলেও জলে চাঁদের আলো পড়ার মতো সেগুলো চিকচিক করছে। টাক পড়ে এসেছে কপালের ওপরটায়, ভাটায় জোয়ারের জল সরে সরে যাওয়ার মতো।

''কর্তামশাই!'' ডেকে উঠল শুকুরা।

''এঁহ্ কত্তামশাই!'' দাঁতে দাঁত চিবিয়ে খেঁকিয়ে উঠে বললেন ভাগু মহান্তি শুকুরাকে না দেখেই। ''কর্তামশাই, কর্তামশাই! হাগতে মুততে দেবে না এ লোকগুলো। দিনরাত খালি কর্তামশাই, কর্তামশাই! কর্তামশাই কি তোমার বারমেসে মাইনদার? সময় নেই অসময় নেই— খালি বাবু বাবু!''

''আমি শুকুরা, কর্তামশাই।'' হেঁকে উঠল শুকুরা, মহান্তিমশায়ের কথায় কান না দিয়ে। সে স্বর বড় গম্ভীর। সচল টাকা বাজানোর মতো। ওই আওয়াজে যেন ঘরের দরজা-জানালা বেজে উঠল।

''কে?'' কর্তা ফিরে তাকালেন এবার। ''তুই কে?'' থেমে গেলেন। বললেন— ''ভাল তো সব বাবা? কোথায় যে গেলি আর পাত্তা নেই। যা হোক তুই ফিরেছিস তাহলে। ভগবান তোর মঙ্গল করুন। বেশ, থাক এখন, আমি আসছি ভিতর থেকে।'' বলে ভিতরে ঢুকলেন। যেতে যেতে আরো কটা কথা ছুঁড়ে দিলেন— ''ঘরের জোয়ান বউটাকে একলা ছেড়ে কি করে তোর মন টিকল রে এতদিন? ধন্যি তোর কাঁচা বয়েস!'' চলে গেলেন বাড়ির ভিতরে।

সেই যে গেলেন আর ফেরার নাম নেই। শুকুরা মণিয়া দুজনে তাকিয়ে আছে।

"চল শুকুরাদা, কতক্ষণ এমন বসে থাকবে?"

"ভাগু মহান্তি কি আর দেখা দেবে না?"

"আমি জানি শুকুরাদা, সব শুনেছি। সে তোমায় দেখে বাড়ির মধ্যে লুকিয়েছে। আর ধরা দেবে না।"

"মণি, ভাগু মহান্তি আমার ঘর উজাড় করেছে। আমি তাকে সহজে ছাড়ছি না।" দাঁত কড়মড় করল শুকুরা।

মণি হাসল। শুকুরা আর ভাগু মহান্তি। কোথায় শুকুরা আর কোথায় ভাগু মহান্তি। কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে! এ আবার তাকে সহজে ছাড়বে না! কি করবে তার? সে হল ভাগু মহান্তি। ভাগু মহান্তি ওরফে ভাগু পট্টনায়ক। গর্ভবতী গাই পথ ছেড়ে দেয় ভাগুবাবুর নাম শুনলে, মহান্তি থেকে পট্টনায়ক, পট্টনায়ক থেকে বাবু। পটনায়েকবাবু, হতে হতে সরপঞ্চবাবু। বি.ডি.ও., এস.ডি.ও. থেকে কলেকটার কমিশনার পর্যন্ত সবার মুখে সরপঞ্চবাবু। সামান্য লোক নয়। একজন মুখ্যমন্ত্রী। পঞ্চায়েতের মুখ্যমন্ত্রী। দেড় কোটি ওড়িয়ার মধ্যে এরকম পাঁচ হাজার মুখ্যমন্ত্রী। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী সেদিন ঘোষণা করে বলেছিলেন— আমি একা নই। তোমরাও সব এক একজন মুখ্যমন্ত্রী। এই সরপঞ্চদের বললেন সেদিন। কম মানুষ নন এই ভাইগি সরপঞ্চ, তাঁর সঙ্গে শুকুরা বাদ সাধবে বটে!

"আয় শুকুরাদা, উঠে আয়। চল যাই।" মণিয়া ডাকল শুকুরাকে।

"কোথায়? কোথায় যাব? আমার কি জায়গা আছে যাবার?"

"কেন, আমাদের বাড়ি?" মণিয়া বলল।

"তোমাদের বাড়িতে চিরদিন থাকব?" শুকুরা এড়াতে চাইল।

"তুমি কি ভেবেচ ভাগু মহান্তি তোমার ভিটেখানা ফিরিয়ে দেবে? ভিটে থাকলে ত!"

"ভিটে যাবে কোথায়? তার কি ডানা আছে যে উড়ে যাবে?"

"ডানা নেই ত পরের হাতে গেল কি করে? ভাগু মহান্তি কি আর তাকে না বেচে রেখেছে এতদিন?"

"তুই কি বলছিস মণিয়া?" শুকুরা অবাক।

"আমি যা বলছি ঠিক তাই," মণিয়া খুলে বলল। "ভাগু মহান্তি তোমার ঘর, ভিটা সব নিলাম করিয়ে বেনামীতে নিলাম ধরে দখল নিয়ে আবার তাকে বেচে দিয়েচে।"

শুকুরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মণিয়ার দিকে, বাতাসে ভরে গেল ফুসফুস দুটো, বুকটা ফুলে উঠল। ফোঁস করে এক নিঃশ্বাস ছাড়ল।

"বুকটাকে পাথর করে দে শুকুরাদা!" মণিয়া বোঝাল শুকুরাকে — "দেশ কিনা স্বাধীন হয়েছে? রাম রাজ্য! রাম রাজ্য!! তুমি এমন অধৈর্য হলে চলবে? গাঁয়ে নতুন এসেছ বলে চমকাচ্ছ। আস্তে আস্তে সব গা-সওয়া হয়ে যাবে শুকুরাদা, স্থির হও, ধৈর্য ধর!"

"আমি সব বুঝেছি রে মণি। বুঝতে আর বাকি নেই কিছু। সেদিন থেকেই আমি ভাগু

মহান্তিকে জানি। তা কি করব, নাচার। সব অদৃষ্ট। আপন কর্মের ফল ভুগতেই হবে।"

উঠে দাঁড়াল শুকুরা, ভাণ্ড মহান্তির বারান্দা থেকে নেমে সে ও মণিয়া দুজনে হাঁটতে থাকল। শুকুরা জানে না সে কোথায় যাচ্ছে; মণিয়া যেখানে নিয়ে যাবে। তবে মণিয়ার বাড়িতে নয়। কারো চালার নীচে মাথা গোঁজার চেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকা ভাল। নিজের বাহুর ওপর ভরসা তার যায়নি এখনও। এই হাতে তুলে, এই পিঠে বয়ে মণ মণ ওজনের সুতোর গাঁটরি গুদাম থেকে নিয়ে সে ছুঁড়ে দিয়েছে পাঁচ-দশ হাত দূরে বোঝাই গাড়ির ওপরে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কে? এই গাঁয়ের ফেরেববাজ পরধন লুটেরা বসে-খাওয়া ভাণ্ড মহান্তি? হাসি পেল শুকুরার।

"এটা নিধিয়া-মা'র ভিটে না, মণি?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা. "নিধি কি বেঁচে আছে?"

কুড়ি বছর। দু-দুটো দশক কালকের মতো লাগছে শুকুরার। নিধির মা কি সেই দিনকার লোক! আর কি থাকার কথা। মণি বলল ওর ইতিহাস। শুকুরা মাথা ঠেকাল সেখানে।

মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে গেছে নিধির মা, ধনী মাস্টার। আরো কতজন, কারো নাম মনে পড়ে না। অনেককে দেখেনি চোখে। "তোর মনে আছে?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

মাথা নেড়ে 'না' বলল মণিয়া।

"মনে করে কখনো কেউ?"

'না' বলে উত্তর দেয় মণিয়া।

"ভারত ছাড়ো আন্দোলন? নয়ই আগস্ট?" আবার শুধোল শুকুরা।

"আগস্ট পনের?"

"না রে না— আগস্ট নয়। যেদিন ভারত ছাড়ো প্রস্তাব পাস হল বোম্বাইয়ে।"

"কিছু না।"

"আগস্ট পনেরোয় কি সব হয়?"

"রাজধানীতে আলো জ্বলে। লাটসাহেব টী-পার্টি দেন। মাষ্টাররা প্রাইজ পায়, গাঁয়ে কিছু হয় না।"

দাঁড়িয়ে পড়ল শুকুরা। তাকাল মণিয়ার দিকে। এ যুগের যুবক মণিয়া। স্বাধীনতা কি জানে না। পরাধীনতা কি জানে না। কেউ জানে না, কেউ বোঝে না। যে ব্রিটিশের আমল দেখেছে, যে দেখেনি, সবাই সমান। স্বাধীনতা পরাধীনতার মধ্যে ফারাক কেউ বোঝে না। স্বাধীনতার জন্যে যারা প্রাণবলি দিল তাদের চিনবে কেন, জানবে কেন, মনে করবে কিসের জন্যে?

ধনী মাস্টার, নিধির মা-দের পিণ্ড দেবার কেউ নেই। কাউকে রেখে যায়নি তারা, ছেলে নাতিদের মানুষ করে যায়নি যে পিণ্ডদান করবে গয়া-শ্রাদ্ধে ভোজ্য তুলে দেবে। তারা এই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে নাতিদের জন্যে মরেনি তো, আসলে নিজের বংশ লোপ করে গেছে। কুলে বাতি দেবার কেউ নেই। তাদের জন্য তিলতর্পণ করা তো দূরের কথা, তাদের কথা মনেও পড়ে না কারো। অথচ তাদেরই রক্তমাংস খেয়ে মৌজ করে সবাই।

এই যত বড় বড় সব লোক, গোরাদের বদলে যারা এদেশের গদি চেপে বসেছে — হরেক মানুষ, হাকিম ডেপুটি, কলেকটার, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী লাট সকলে। সকলেই এই শহীদদের রক্তমাংস খেয়ে, হাড়গোড় চিবিয়ে হজম করে ফেলেছে। কড়মড় করে উঠল শুকুরার দাঁত।

আর বালুঙ্গা দাদা? হঠাৎ মনে পড়ল শুকুরার।

বালুঙ্গা বেঁচে আছে। বুড়ো হয়ে গেছে। ছেলে-নাতি মিলিয়ে এক পণ কি কাহন। ছেলেরা সব কাজের হয়ে গেছে। বুড়ো দাওয়ায় বসে চাটাই বোনে। মাদুর বোনে। সুতলি কাটে। লাটাই গুটোয়। কঞ্চি বেঁধে দেয় দুই খুঁটিতে, ঢেলা ঝুলিয়ে দেয় এধার ওধার, কেয়া, খড়, শণ, হোগলা যখন যা পাওয়া যায় এনে ফেলে দেয় কঞ্চির ওপর। ওলটপালট করে যায় ঢেলাগুলো এক এক করে এধার থেকে সেধারে— সেধার থেকে এধারে। নিজের পরমায়ু নিজেই গুনে যায় যেন, যে মাদুরটা বসায় সেটাই যেন ওর শেষ মাদুর, সেটা শেষ করলে যেন তার কাজ ফুরোবে, হাঁপিয়ে ওঠে। বোনা শেষ হয়, কাজ কিন্তু শেষ হয় না। আর একটা মাদুর ধরে। কাশ-কুশ ফুরোলে কেওড়া বা শণের মাদুর শুরু করে। বালুঙ্গা বেঁচে আছে এখনো।

বালুঙ্গার বাড়ির দিকে সে এগোল। মণিয়া চলেছে সঙ্গে। সেটাই ওর বাড়ি যাওয়ার পথ।

বালুঙ্গা বেঁচে আছে। বসে আছে বারান্দায়। গাঁয়ের মাথায় ন্যাড়া বটগাছটার মতো টাকপড়া মাথাটা তুলে সে বসে আছে। নাকে নিকেলের চশমা। চালশে চশমা। বাপের আমলের। কোন কাবুলীর কাছ থেকে কিনেছিল। ডাঁটা ভেঙে গেছে। ডাঁটার জায়গায় সুতো লাগানো। কানের ওপর পাক দিয়ে আঁটে, কাজ থেকে ফাঁক পেলে সেটা খোলা হয়। মাঝে কারো দিকে কখনো তাকানোর দরকার হলে সেই পরকলার উপরের ফাঁক দিয়ে তাকায়।

বুড়ো হয়ে গেছে বালুঙ্গা। চামড়া ঢলঢলে। মাড়ির সব দাঁত পড়ে গেছে। ফাটা হাঁড়ি পেটার মতো গলার স্বর ফেটে বেরোয়। তবুও উঁচু গলায় কথা বলে, পাঁজি-পুঁথি ব্যাখ্যান করে এখনও।

ধন অর্জ্জনে ধর্ম করি
ধর্মে প্রাপত নরহরি॥

উত্তর দেয় বালুঙ্গা। ছেলে ভাইপোরা তো পুষছে, তুই কেন এত খাটিস? কি দরকার? কেউ যদি কখনো জিজ্ঞেস করে তো বালুঙ্গা উত্তর দেয়। জবাবে বলে, ছেলের ধনে সে ধর্ম করবে? সে কি ধর্ম? ছিঃ। ছি-ছি করে ছেলেদের রোজগারকে।

দুনিয়া তাকে দেখে হাসে। সারা দুনিয়াটাই। সেদিকে খেয়াল নেই তার। মাদুর বোনে, সুতলি কাটে। শ্মশানের দিকে পথ চেয়ে বসে থাকে। ডাক পড়লে হাজির। পরওয়ানা, শমন জারি সব সারা হয়ে গেছে শমনের, খালি ওয়ারেন্ট বাকি। নিজেই বলে বালুঙ্গা। শুধু বেঁচে আছি বাঁচার জন্যে। জীবনটা না যেতে চায়, না থাকতে চায়।

"জুহার বালুঙ্গাদা, জুহার। আমি শুকুরা।" শুকুরা গিয়ে উঠল বালুঙ্গার বাড়ির সদরে।

তোরঙ্গটা বড় ভারি। আর বওয়া যাচ্ছে না। বালুঙ্গার বারান্দায় রেখে দিয়ে বসে পড়ল শুকুরা। মেঝেতে মাদুর বা চাটাই কিছু নেই। পাতা হয়নি। সাফসুতরোও কেউ করেনি সকাল থেকে ঝাঁটপাট দিয়ে। বেবাক ময়লা জায়গাতেই বসে পড়ল। বসে মাথা নীচে নুইয়ে প্রণাম করল।

বালুঙ্গা চেয়ে দেখল। শুকুরা? কোন্ শুকুরা? রতনীর ভাতার শুকুরা? কলকাতা গিয়েছিল না? এক মুহূর্তে বছরের পর বছরের পর্ব যেন ফর্দ ফর্দ করে কেউ উলটিয়ে গেল ওর চোখের সামনে। এ কি সেই শুকুরা? প্যান্ট পরেছে, শার্ট গায়ে। ছাতা লাঠি কই? তেল হলুদ কই? কাপড় জড়ানো বোতল কই? এ আবার কেমন শুকুরা গো? তবে তাজা চিকন গোলগাল এক শুকুরা বটে। বেশ দেখাচ্ছে তো। ভাল হয়েছে এসেছে, চুলগুলো কটা কটা দেখাচ্ছে, বয়েসের ঘা পড়েছে মাথায়, যাবে কোথায়?

"অ্যাঁ— শুকুরা?"— তাকাল চশমার ফাঁকে, "আরে, তুই বেঁচে আছিস? জগন্নাথ তোর মঙ্গল করুন। বুড়োটি হ। এমনি কলকাতার নেশা লেগে গেল রে তোর? কথায় বলে 'পুরস্তমে' (পুরীতে) জাতি নাই, কলকাতায় রাতি নাই, মা-বাপ বাদ দিয়ে যা চাইবে যখন চাইবে সব পাবে। পড়ে গেলি কি রে সেখানে কারো পাল্লায়? কাঁউরী কামাক্ষী ত সেখান থেকে কাছেই।"

"না বালুঙ্গাদা, বেঘোরে পড়ে গেলাম। সে ঢের কথা। বেঁচে এলাম বল, তোমাদের কল্যাণে, কপালে ছিল তোমাদের সব দেখতে পেলাম, প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরব বলে কোনো ভরসা ছিল না।" বলল শুকুরা।

"তা হোক, যা হবার হয়েছে, সে-সব কথা পরে। তুই সোজা গাড়ি থেকে নেমেছিস মনে হচ্ছে। খেয়েছিস কিছু? মুখখানা ত শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। যা যা, আগে হাত-পা ধুয়ে আয়। তারপরে ভাবা যাবে তুই থাকবি কোথায়। ভাগু মহান্তি ত তোর ভিটের জমিতে তিল বুনে দিয়েছে। রতনী গিয়েছে রাউতদের বাড়িতে। এখনো আছে না সেখানে?"

জিজ্ঞেস করল মণিয়াকে। মণিয়া সায় দিল— "হ্যাঁ, সেখানেই আছে।"

"ধান ভানত ওই রাউতের বাড়িতে। আর কিই বা সে করত! তুই ত টাকা-পয়সা পাঠালি না। থাকতে থাকতে রয়ে গেল সেখানে। এখন ত আর ঢেঁকি পড়ে না। ফাই-ফরমাস খাটে বোধহয়। ঢেঁকি থাকলে তবে ত কুটবে। এখন কি ঢেঁকির পাট আছে কারো বাড়িতে? এখন ত ভম্ ভম্ ভড়্ ভড়্ হলার মহাদেব বর দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ধান থেকে চাল। নারদের বাহন বিদেয় হয়ে গেছেন স্বর্গে... হো হো..."— হাসল বালুঙ্গা।

"সপ্তাঘরে থাকা যায় না ক'দিন..."

আরো জোরে হেসে উঠল বালুঙ্গা। সে হাসির ঢেউ একটার পর একটা যেন ভেঙে পড়তে থাকে শুকুরার ওপর। কলকাতা-ফেরত শুকুরার জামাকাপড়ের ওপর। লম্বা জুলফি আর সেফটি রেজারে ছাঁই-কাটা সরু সরু তরওয়াল মার্কা গোঁফের ওপরে।

"সেখানে ত আমাদের যুবক সংঘের আপিস। লাইব্রেরি। ক্লাব। সরকারি গ্রান্ট আসে।" বলল মণিয়া।

"সপ্তা হচ্চে কোথায় তবে?" জানতে চাইল শুকুরা।

"সপ্তা, সপ্তা? ভাগবত গদী? ভাগবত গোসাঁই!"

"হো হো হো"— হাসি আর থামে না বালুঙ্গার। বালুঙ্গা আজ ফুলে উঠছে যেন। অনেকদিন বাদে সে পেয়েছে একটা নতুন মানুষ, যার সামনে সে তার মনের কথা বলবে, যে ধৈর্য ধরে শুনে যাবে সে যা বলবে। অনেকদিন পরে একটা লোক পেয়েছে, ওর চেলা হওয়ার মতো একজনকে। "সপ্তার কথা কোথাও বলিসনি রে শুকুরা; হ্যাঁ, বলে রাখছি। লোকে হাসবে। কত রকম ঠাট্টা করবে। তোকে নাকাল করে ছাড়বে। সুরাজ্য এসেছে, সুরাজ্য। বুঝলি? তোদের ওদিকে কি আসেনি? সারা জম্বুদীপ ছেয়ে গেছে। কলকাতা ত এই আমাদের জম্বুদীপের মধ্যে, না আর কোনখানে? তোমরা যাকে ভারত বলে বলছ গো, কলকাতা ত তারই ভিতরে। সেখানেও ত এসে থাকবে। সেখানকার সুরাজ্য এইরকম না আলাদা? সেখানে ঠাকুর ব্রাহ্মণ আছে না উঠে গেছে?"

শুকুরা কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। বালুঙ্গাদাদাটার মাথা একটু গোলমাল হয়েছে নাকি; তার যেন কেমন কেমন লাগে। কথাটা ঘুরিয়ে সে জিজ্ঞেস করে "দুখিয়া দাঠাকুরের খবর কি?"

"কোন দুখিয়া? স্বরাজী দুখিয়া? জেলখাটা দুখিয়া? অগনি দাশের ছেলে? আছে, আছে। যাবে কোথায়? বীজ বুনলে দায়, দান দিলে পায়। যাবে কোথা সুদে-আসলে সব না মিটিয়ে? চোখে দেখতে থাকবে, কানে শুনতে থাকবে। পা উঠবে না, হাত নড়বে না। তবু কতকিছু দেখবে সে আরো, কতকিছু দেখতে পেয়েছে। ভেট হবে তোর সঙ্গে। ব্যস্ত কেন? সবাই আছে। তুই থাকিস কি না আগে দেখ্‌, তোকে চেনাতে লাগ্‌। তারপরে আর যাকে চিনবার চিনিস। যারা গেছে গেছে; যারা আছে তাদের এমনি খোলাচোখে চিনতে পারবি নাকি রে শুকুরা? নতুন যুগ। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। মানুষ বদলে গেছে। সব নতুন। আগের দিনকাল বাঘে খেয়ে গেছে।" বলে শ্বাসটা লম্বা করে টেনে নিয়ে ছেড়ে দেয় হঠাৎ।

"দুখিয়া কি মন্ত্রী হয়েচে বালুঙ্গাদা?"

"হো হো হো"— হেসে ফেলল বালুঙ্গা, "অগনি দাশের ছেলে দুঃখী আবার মন্ত্রী? হো হো! মানুষ বদলে গেছে। যুগ বদলে গেছে, তবে দুঃখী বদলাল না। হো হো।"

আবার নিজের মধ্যে ফিরে এল বালুঙ্গা। হ্যাঁ, বালুঙ্গা। মদন পট্টনায়কের পুরোনো চাকর। পুঁথি-শাস্তর পড়া বালুঙ্গা। বুড়ো হয়েছে। ষাট পেরিয়ে গেছে। তেমনি বসে থাকে। শিরদাঁড়ার হাড়টা সোজা হয়ে চাঙ্গা হয়ে খাড়া আছে এখনো। নুয়ে পড়েনি দুনিয়ার দাপটে। ভেঙে পড়েনি বয়সের ধাক্কায়। মাথায় সরু গোছায় কয়েকগাছি চুল জীবনের জয় পতাকা উড়িয়ে চলেছে। এখনো লোকটার মনের জোর ভাঙেনি। পরের বাড়িতে সারাজীবন গোলামী করেও সার কথা, হক কথা বলতে পিছোয় না। সময় ঢলে, বিবেক টলে না।

কত বকছে বকে যাক। মণিয়া চেয়ে থাকে। এরকম বকা ওর অভ্যেস। আগু-পিছু কিছু নেই। শেষে কিছু এসে না পড়ে মণিয়ার ওপর। মণিয়ার ভয় হয়।

কিন্তু ফিরে এল বালুঙ্গা আপনি আপনার ভিতরে। হুঁশ হল, বললে, "ওরে অ শুকুরা, তুই তো সেই কখন এয়েছিস। কিছু ত খাসনি এখনো। কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবি? কে রেঁধে দেবে? ঘরদোর কি আর আছে? যা সেই ভাগু মহান্তির দোরগোড়ায়, ধরনা দিয়ে বসবি। সর্বনেশে ঘর পালানো আঁটকুড়ো বেটা!"

চুপ করল বালুঙ্গা। দাঁতে দাঁতকপাটি লেগেছে যেন মুখের ভিতরে। সবাই চুপ, মণি শুকুরা দুজনেই।

বালুঙ্গা আবার মুখ খুলল— "কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ওরে অ মণি, তুই শুকুরাকে একটু দেখিয়ে দে। বাতলে দে। নতুন এসেছে, ওর সব অচেনা ঠেকবে। কুড়ি-বাইশ বছর বাদে গাঁয়ে ফিরেছে। ঠেকারই কথা। ওই যে ওদিকের কোণে পুকুর। সেখানে মুখ-হাত ধুয়ে আয়। কোট পেন্টলুন খুলে ফেল। গামছাখানা পরে নে। গামছা-টামছা নেই বুঝি? তা সে-সব ত এখন স্বপ্ন। এখন ত লুঙ্গি টোয়াল না কি যেন বলে রে মণি? তোরও ত থাকবে। আর কি সব এনেছিস কলকাতা থেকে? এই তোরঙ্গ একটা? যাক্ গে, যা এনেছিস রেখে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। পান্তা জল একটু মুখে দিবি ত বালুঙ্গাদার বাড়িতে? আমার আর কি আছে, কি দোব? ওই সালসা। গরিবগুরবোদের সালসা ওই পান্তাভাত।" হো হো হেসে ফেলল বালুঙ্গা নিজের কথায়। বলল, "না রে না, ভয় পেলি নাকি পান্তার নাম শুনে? ভয় নেই, আমি জানি তুই কলকেতিয়া, তোর যা দরকার সে-সব পাবি এই বালুঙ্গার বাড়িতে। সেকাল একাল সবের মিলন এখানে, বালুঙ্গার আখড়ায়।"

"তা চায়ের ব্যবস্থা কি রেখেছ?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা হাসি হাসি মুখে।

"সে কথা আর বলতে? আমি কি রাখব রে? সে ত নিজেই ঢুকেছে। একা কি আমারই বাড়িতে? ঘরে ঘরে দেখগে যা। কার চালাতে চা-পানি বিরাজ করছে না। গাঁয়ে তিন-চারটে চায়ের দোকান। একটাও ছিল না তোর যাবার সময়, সেই গুঁড়রি সা'র চাল ডালের দোকানটি ছাড়া। এখন চা-বিস্কুট, বড়া পেঁয়াজি সব পাওয়া যায়।"

"কবে থেকে এসব দোকান খুলল?"

"কবে থেকে?" মনে করতে চাইল বালুঙ্গা। হঠাৎ বলল, "কবে থেকে কিরে? সে ত যাদুর কাঠি কেউ বুলিয়ে দেওয়ার মতো খুলে গেল দোকানগুলো, একের পর এক চোখের সামনে। ওই যে যুদ্ধ হল না— খুব বড় মস্ত বড় যুদ্ধ? ভারতযুদ্ধ নয় রে, বিশ্বযুদ্ধ— তার পরেই ত ঠাকরুণ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে ঠাকরুণ ত দুধ ছানা বা পানা টানা নেন না কিম্বা ধূপ ধুনো টানেন না। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। লাল রঙের জল না হলে তিনি সন্তুষ্ট হন না। পানার জায়গায় চা আর ধুনোর বদলে বিড়ি সিগরেট, এটুকু হলে মা ঠাকরুণ বর দেন, না-লাগাকে লাগিয়ে দেন, নির্বলকে বল দেন। হা হা হা..."

এক দমকা হেসে নিয়ে বালুঙ্গা ফট করে থেমে গিয়ে জোরে হাঁক পাড়ে — "ওরে বিশে!"

শুকুরার দিকে চেয়ে বলে, "সেই বিশে রে শুকুরা— তোর বন্ধু। বালুঙ্গার সবেধন

নীলমণি। বাঁদরটা এখন ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে গেছে। 'ওরে ও অপিস্তে, ওলো অ পাকী।'... বিশের একজোড়া। ওরে কোথায় গেলিরে সব? ওরে এসে দেখে যা রে দেখে যা। কেমন অপূর্ব মানুষ কলকাতা থেকে এসেছে— তোদের শুকুরা কাকা।... বিশেটা নেই, কোথাও গেছে কাজে। ওরে, চায়ের জল একটু চড়িয়ে দে রে পাকী! কি করছিস এতক্ষণ? কি আর করবি? ঠাক্‌মার সঙ্গে লেগেছিস নিশ্চয়ই সতীনের মত। এই শুকুরা, খুলে ফেল তোর ডেরেস।"

বালুঙ্গা বলে যায় এক নাগাড়ে। শুকুরা শুনতে থাকে, ওদিকে লুঙ্গি গলিয়ে প্যান্ট খুলতে খুলতে কাঁধে ফেলে কলকাতাই সরু চেকের ডোরাকাটা তাঁতের গামছা আর একটা লোমওয়ালা টারকিস তোয়ালে।

"বাহ্যে করতে যাবি?" জিজ্ঞেস করে বালুঙ্গা। "ঐ যে ওই কোণায় পুকুর, রাস্তার সেধারে। নিয়ে যা রে মণি, দেখিয়ে দে ওই পঞ্চায়েত পুকুর। বাহ্যে বসে হাত-পা ধুয়ে চলে আয় তাড়াতাড়ি। দেরি করিসনি। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু চায়ের সঙ্গে বিস্কুট নেই রে। তবে আমাদের দিশি বিস্কুট আলবাৎ মিলবে। ওলো ও পাকী, ওরে অপিস্তে! ... কেবল একজনকে যদি ডাকি ত অন্যজন চটে যাবে, ওর নামও কেন ধরলাম না বলে! শোন্, চায়ের সঙ্গে এক টুকরি মুড়ি আনিস রে অপিস্তে, পুরো এক চাঙারি।... যত খেতে পারিস। কলকাতায় মুড়ি পাওয়া যায়? এখানে রোজ টাটকা মুড়ি। একদিন অন্তর ভাজা হয়। কাল ভেজেছে। চিঁড়ে ত স্বপ্ন। গাঁয়ের মেয়েদের মাটির হাঁড়িতে মুড়িটা এখনো ভাজা হয়।"

শুকুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল বালুঙ্গাকে। যাবার জন্যে পা ফেলেছিল, সামনে মণিয়া। "কি বললে বালুঙ্গাদা, চিঁড়ে আর পাওয়া যায় না গাঁয়ে?" তার আশ্চর্য লাগল।

"যায় রে যায়। এত ব্যস্ত কিসের? একসঙ্গে চিঁড়ে মুড়ি পুরি মালপো সব খেতে চাস নাকি?"

"না, তুমি যে বললে চিঁড়ে স্বপ্ন, তাই জানতে চাইলাম।"

বালুঙ্গা বুঝিয়ে দেয়— "আরে, স্বপ্ন বলে যে বললাম, সত্যি সত্যি আমাদের গাঁয়ে চিঁড়ে আর হয় না। পদিয়া নিয়ারির পরিবার উঠে গেছে গাঁ থেকে। তাদের কুলে কেউ রইল না। খেতে না পেয়ে মরে গেল। কে দেখে, কে খবর নেয়? আমি মাসখানেক চালালাম। আমারই বা দম কত?" হাঁ করে শুনতে থাকে শুকুরা। বালুঙ্গা গেয়ে চলে পুঁথি পড়ার মতো— "সরকার বলল, এ গাঁয়ে অনাহারে মৃত্যু নাস্তি। পদিয়া মরল কলেরায়, সাউন্টা ম'ল জ্বরে। কেউ না খেয়ে মরেনি। না খেয়ে বেঁচে আছে সবাই, সরকারের মতন। আর বেঁচেছে রতনলাল মাড়োয়ারি। মেসিনে চিঁড়া কুটবে। চিঁড়া আসবে শহর থেকে গাঁয়ে। গাঁ থেকে আর শহরে যাবে না। চাকা ঘুরে গেল— হো হো হো! সব উলটো। যুগটাই উলটো। হো হো হো।"

শুকুরা মণি দুজনে হাসতে হাসতে চলে গেল পুকুরপাড়ে। এ ওর মুখের দিকে, ও এর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে। পথে সেই ঠুঁটো বটগাছটা, কোন কালের কোন যুগের। কোনো কাজে লাগে না। ভাল জ্বালানিও হয় না, পঞ্চায়েতকেও মেনে চলে না। ঝুরিগুলো

নেমে রয়েছে, শেকড় নেই। মূল নেই। শুধু ঝুরি। শূন্যে ঝুলছে, দুলছে।

কালের মল। ঠায় ঠায় জায়গায় জায়গায় ঝুলছে তেমনি। তার দিকে তাকাচ্ছে কে, চেয়ে দেখছে কে? খুঁজবে কে? সেখানে বিষ আছে না অমৃত আছে? ধৈর্য আছে কার? আগ্রহ জাগে কার? পিছনে তাকাবার সময় নেই কারো, এগিয়ে চলেছে দুনিয়াটা।

বালুঙ্গা কিন্তু চেয়ে আছে। গোটা গাঁয়ে সেই একটিমাত্র লোক। মনে মনে ভাবে সে কিন্তু আলাদা ধরনের। সবার থেকে আলাদা, চোখদুটো যেন তার পিছনদিকে। তবু সেও তো এগোচ্ছে! পিছনে তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে মনে মনে। চলেছে মরণের পানে যেন। সবাই দৌড়চ্ছে ওই মরণমুখো হয়ে। সে যুক্তি দেখায়। কে পিছনে কে সামনে? যে পিছনদিকে চেয়ে আছে সেও এগোচ্ছে, যে সামনের দিকে হাঁটছে সেও।

"আমরা সবাই এগিয়েছি।" বালুঙ্গা বলে, "একদিন না একদিন সভায় নিশ্চয়ই বলবো—"

এই একটি লোক গাঁয়ে। চিরদিন ওর আলাদা গোঠ। কাজলা গাইয়ের বাছুর বলে সবাই বলে। জোয়ান বয়সের যত ছোকরা কেউ বাদ যায় না। এই মণিয়াও হাসে। ঠাট্টা করে ঝরে যাওয়া বয়সকে, এমনি হাসে। বরাবর হেসে এসেছে বালুঙ্গার কথায়। তাই ঠাট্টা করে হাসে— গাঁয়ের যত ছোকরা। সকলেই তো মরবে একদিন। কে না জানে। সে কথা মনে করিয়ে কি লাভ? বলাবলি করে তারা।

অগনি দাশ বুড়ো মরে গেছে। সে বলত — "'অজরা-মরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ' মানে অজর অমর বলে মানুষ নিজেকে চেন। অর্থকে ধনকেও তেমনি চিন্তা করবে না। চাণক্য বলেছেন একথা, কোনো সাহেব বলেননি।" অগনি দাশ এমনি সব মনে করিয়ে দিত। আজ আর কেউ নেই সেরকম কথা বলার। তারপর বলত — "গৃহীত্বা ইব কেশেষু মৃত্যু না ধর্মমাকরেৎ"। লাগল ঝগড়া একদিন দুই পণ্ডিতের। এদিকে অগনি দাশ, সেদিকে বৈদ্য তিয়াড়ী। সংস্কৃত জানে সে, আবার ইংরেজি-পড়া ইস্কুল মাস্টার। বলল— "এর মানে হল, বিদ্যা অর্জনের সময়, ধন অর্জন করার বেলায় আমি মরে যাব, বুড়ো হয়ে যাব বলে ভাবলে মানুষের ধন অর্জন করতে বা বিদ্যা অর্জন ইচ্ছে হবে না। মরে যখন যাব কেন এত ঝামেলা! এরকম ভাবতে পারে মানুষ। তাই চাণক্য বললেন— নিজেকে অজর অমর বলে ভেবে নিয়ে লেখাপড়া কর, ধন সঞ্চয় কর। আর যম এসে টিকি ধরলে তখন গিয়ে ধর্ম করবে।" অগনি দাশ মানল না। বলল, "এর অর্থ তা নয়। মানুষ বিষয় বা ধন উপার্জন করার সময় তাড়াহুড়ো করবে না। কারণ একদিনে লেখাপড়া শেষ হয় না কিম্বা একদিনেই ধন অর্জন করে টাকার গদিতে বসা যায় না। বলে— 'ক্ষুদ্র কীট উই অল্প অল্প করি রচিল উইয়ের ঢিপি' না কি যেন। কাল মরে যাব, বুড়ো হয়ে যাব ভাবলে আর পড়তে পারতাম না বা উপার্জন করতে পারতাম না। এরকম ভেবে তড়িঘড়ি করে সেসব কাজ করা উচিত নয়। আর দিন কাটিয়ে দিলে বা বেলা গড়িয়ে গেলে ক্ষতি নেই। তবে ধর্ম করার সময় এক দণ্ড বা ঘড়ি এমনকি এক তিল দেরি করতে নেই। টালবাহানা করতে নেই। মনে করবে যেন যম এসে টিকি ধরে ফেলেছে। এক্ষুনি না করলে আর সুযোগ জুটবে না।"

এমনি ঝগড়া চলে দুই পণ্ডিতের। এমন সময় এসে হাজির মূর্খ ভূশণ্ডী বালুঙ্গা। দুজনেই তাকে মধ্যস্থ মানল। যে মানেটা বালুঙ্গার ভাল লাগবে সেটাই ঠিক বলে দুজনে মেনে নেবে। এই কথা স্থির হল। বালুঙ্গা বলল সে তো সংস্কৃত বোঝে না, সে কি বলবে? তখন দুজনে মিলে ওকে কার মানে কি কাঁচা ওড়িয়াতে বুঝিয়ে দিল। বালুঙ্গা বলল, "হে ভাই, আমার ত আর একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। যদি গোসা না কর ত বলি।"

দুই পণ্ডিতই এবার হাসাহাসি করল মূর্খের কথা শুনে। বৈদ্য তিয়াড়ী কি একটা বলল ইংরেজিতে। তার মানে পরে একজন ওড়িয়াতে বুঝিয়ে দিয়েছিল। যেখানে দেবতারা যেতে ভয় পায়, সেখানে বোকার অবাধ বিচরণ, না ভেবেচিন্তে ঢুকে পড়ে। তা বোকা হোক যাই হোক বালুঙ্গা টীকা বয়ান করার আগেই দুজনের রাগ কোথায় উবে গিয়েছিল। দুজনেই একটা মজা দেখার জন্য বসেছিল। বালুঙ্গা বলল, "শোন। অজরা মানে আমার মনে হচ্ছে যাকে নুন দিয়ে জরান হয়নি, মানে আলুনি,— অলাজুক, নিপট বেহায়া। অমরা অর্থাৎ কিনা অমাড়া— যে বাট কেউ মাড়ায় না অর্থাৎ যে পথে কেউ হাঁটে না। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। মানে যে নিলাজ, বেদুরস্ত সেরকম লোকই লেখাপড়া করে, ধন অর্জন করে। বেআক্কেল লোক তারা। ওহে বাপু, ম'লে কি ধন বিদ্যা সঙ্গে নিয়ে যাবি? তবে এত পড়াশুনা কিসের জন্যে? এত মেহনত কি জন্যে? আর যমের মতন ধর্ম করবে। মানে মৃত্যু যেমন ধর্মে বিচরণও তেমনি। জন্মের সঙ্গে যেমন মৃত্যু রয়েছে, কর্মের সঙ্গে তেমনি ধর্ম রয়েছে। ধন কেন কামাবে মানুষ? সেজন্যে বলেছে, 'ধন অর্জনে ধর্ম করি, ধর্মে প্রাপত নরহরি'। যে ধন দিয়ে, যে বিদ্যার জোরে নরহরি হেন ব্যক্তি লাভ করা যায় না, সে ধন সে বিদ্যা মানুষ কেন হাসিল করবে বল? বল ত ঠাকুর, ধন কি স্বর্গে নেবে?"

কিন্তু গাঁ সুদ্ধ সবাই বলছে— ধন, ধন, ধন! সবাই তাকিয়ে আছে ধনের দিকে। টাকা টাকা টাকা!! সবাই চায় রাতারাতি ধনী বড়লোক হতে। কোথা থেকে আসবে টাকা! কেমন করে আসবে ধন!! যেমন করেই হোক টাকা চাই। চুরি করে, ডাকাতি করে, বাটপাড়ি কালোবাজারী যে-কোনওভাবে পথে টাকা আনতে হবে। তাতে পাপ নেই, দোষ নেই! ধনটাই ধর্ম। ধর্ম বলে একটা কিছু আলাদা জিনিস নেই। ধর্মটা পদার্থ নয়, মানুষের নেশা। ধন অর্জন করলে সে নেশা কেটে যায়। পাপ-পুণ্যের ধারণা উবে যায়। চোখ বুজে ধন অর্জন করে যাও। 'চোখ নেই কান নেই, কারো গায়ে লাগলে দোষ নেই।' ধন অর্জন করলে কারো না কারো বাধবে। তাতে দোষ নেই।

খালি টাকা টাকা টাকা। টাকার খিদে। ভাতের খিদে তো একটুতেই মিটে যায়। একমুঠো চাল, আধমুঠো ডাল, দু গাছা শাক। ব্যস। কিন্তু এই টাকার খিদে যে মহীরাবণের খিদের মতো কখনও মেটবার নয়।

মানুষের ধন চাই। টাকা চাই। স্বাধীনতা মানে এই খিদে। ধনের খিদে। মানুষ ধনী হবে। দেশ ধনী হবে। মানুষের জন্ম তারই জন্যে। ধন অর্জনের জন্যে। টাকা কুড়োনোর জন্যে মানুষ বেঁচে থাকে। জাতি বেঁচে থাকে ধনে, মনে নয়। স্বাধীনতা শিখিয়েছে এই সব।

চারিদিকে হাঁকডাক পড়ে গেছে। মেতে উঠেছে সকলে। চেঁচাচ্ছে। শোর উঠেছে

দেশকে ধনী করতে হবে। জাতিকে ধনী করতে হবে। প্রায় হয়ে এসেছে। বিদেশী শাসন, গোরা লোকেরা আমাদের ওপরে চেপে বসেছিল। পালিয়ে গেল লেজ গুটিয়ে— বলছে কংগ্রেসওলারা। এখন দারিদ্র্য চেপে বসেছে। সেও পালাবে পা দুটো নিজের কাঁধে তুলে। বোসো, বোসো, আর দেরি নেই।

নেতারা বলছেন— এই যে ঝরল, ঝরল বলে। মুখটা শুধু হাঁ করে বসে থাক, ঘি মধু বৃষ্টি হবে।

সরকার বলছেন— এই যে হচ্ছে, হবে। সব হবে। যোজনা তৈরি হয়েছে। পরশমণি ছুঁলেই সব সোনা।

বালুঙ্গা বলে— দেশ বরং সোনা হোক কিন্তু মানুষ একটা সোনার তাল না হলেই হল।

একমাত্র বালুঙ্গা যোজনার নাম শুনলে হাসে। হেসে ওঠে।

রামবাবুর মুখেও ওই এক কথা। নেতারা যা বলে থাকে। তিনিও তো ওই নেতা। তাঁরও একটা কি পার্টি আছে। আর সব পার্টির মতো। এক একটি 'সুরসা'* এই পার্টিগুলো। হাঁ করে বসে আছে। রামবাবুরটা সরকারের বিরোধী পার্টি। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের বনে না। কথাগুলো কেমন বাঁকা বাঁকা। ওইরকম লাগে বালুঙ্গার। দেশটা ধনী হবে। তিনিও বলেন ওই কথা। কেমন করে হবে? দেশসুদ্ধ সবাই খাটলে তো ধনী হবে? ধন কি আকাশ থেকে পড়বে? রামবাবু বলেন— ধন এইখানে আছে। বড়লোকরা চেপে বসে আছে। তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে। এদিকে যে অগুনতি লোক। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ খালিপেটে ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে পড়ে আছে। পরের জন্য দরদ আছে রামবাবুর। তবে বসে খেলে তো নদীর বালিও ফুরোয়। বড়লোকদের সম্পত্তি এমন কত যে?

রসিক পট্টনায়ক বলেন— 'এই যে, আমার বাড়িটাকে দেখ'। বছর কয়টার মধ্যে দোতলা কোঠা তুলে ফেললেন। 'গাঁয়ে ক'জনের দোতলা আছে? জমিদার কি মহাজন কেউ তাদের চোদ্দপুরুষে তুলতে পারেনি। ধন কাকে বলে দেখ। ধন কেমন করে আসে শেখ।'

অগনি দাশ মশায় বলতেন, যখন বেঁচেছিলেন— বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী। তার অর্ধেক কৃষিকর্মে। সে-কথা শুনে হাসেন রসিক পটনায়েক। সব তাঁর মুঠোর মধ্যে। চাকা উলটে দিলে ভাগ্য উলটে যায়। নীচেরটা ওপরে, ওপরটা নীচে। উলটে দিলেই হল। তাঁর ছেলেই বা কম কিসে? ছেলে বিশ্বজিৎ পটনায়েক। আই.এ.এস.। বড় হাকিম। বড় অফিসার। খুব বড়। বলেন, সেই তো রাজা। রসিক পটনায়েকের ছেলে কেমনতর রাজা? এক একটা জেলার রাজা। তারপরে সারা ওড়িশার এক একটা দায় নিয়ে রাজা। কেউ রাস্তাঘাটের রাজা, কেউ নদীনালা কুয়ো-পুকুরের রাজা। কেউ ইস্কুল কলেজের রাজা, কেউ গা হাত পা, ব্যারাম আরাম, ডাক্তার কম্পাউন্ডারের রাজা। এমনি সব ভাগ ভাগ করে রাজা হল। বলেন, মন্ত্রীরা সব নামে, নামকাবাস্তে। কুছ কাম্‌কা নেহি। আজ এল তো কাল গেল। দুটো খোশামুদিতে কাজ সারা। ওঝার মন্ত্র শুনে চুপ। আসল শাসক এই রসিকের ছেলে বিশ্বজিৎ ও তার সঙ্গী-সাথীরা।

---

* লঙ্কায় যাবার পথে হনুমান যে নাগমাতার মুখে ঢুকেছিল

তাঁর বেয়াইও ছিলেন ওড়িশা সরকারের খুব বড় অফিসার। পেনসান নিয়েছেন বুঝি। ভাইপো ডাক্তার। বড় ডাক্তারি পড়তে গিয়েছেন বিলেতে। জামাই ইঞ্জিনিয়ার। দেদার পয়সা। তাঁর মেয়ে একবার বাপের বাড়ি এসেছিল সোনায় গা মুড়ে। পা বাদ দিয়ে বাকি সব জায়গায় খালি সোনায় সোনা। লক্ষ্মী তাঁরই ঘরে। লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছেন খাটের গোড়ায় যেন। খাটাচ্ছেন দাসী পরিবারী করে।

গোলামবাড়ির বউয়ের সদর দুয়ার থেকে ঘরের ভিতর পর্যন্ত লক্ষ্মীর পাদপদ্মের আলপনা দেওয়া হয়েছে। এরকম দেওয়া হয় প্রতি অঘ্রান মাসে লক্ষ্মীপূজা 'মাণবসা'তে প্রতি বৃহস্পতিবারে। জগাইয়ের ছেলে ভগাই মহান্তি বাপের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গাঁয়ের এ মাথায় এসে ঘর বানিয়েছে। জগাইয়ের বকাটে ছেলেটার ঘরেও লক্ষ্মীর পুজো হয়। চাষাভুষো, গোয়ালা সদ্‌গোপ, হাড়ি ডোম, ধোপা নাপিত, কামার কুমোর সবার ঘরে 'মাণবসা' হয়। আজও হচ্ছে। চণ্ডালিনীর ঘরে তো বেশি ধুমধাম। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের ঘরেই মেয়েরা মেতে ওঠে লক্ষ্মীপুজোয়।

কেবল রসিক পটনায়েকের মতো কয়েক ঘরকে বাদ দিয়ে যারা শহরে গিয়ে দোতলা বাড়ি তুলেছে; তাদের আর গাঁয়ে 'মাণ'* বসে না। কে জানে সেখানে হয়তো করতে পারে— ওই শহরে— এখানে কিছু হয় না। রসিক পটনায়েক — পটনায়েক সাহেবের এখানে সেখানে দু জায়গায় বাড়ি। আসল বাড়ি শহরে। এখানে দোসরা ঘর। কখনো সখনো বেড়াতে আসেন গাঁয়ে হাওয়া খেতে। শহরের হট্টগোলে এক এক সময় হাঁপ ধরে যায়। পালিয়ে আসেন কিছুদিন নিরালাতে থাকার জন্যে। রাজার চালভাজা চিবোনোর মতো।

মোহন পটনায়েক এখন আলাদা। রাসিকের ভাই,— ছোট ভাই। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে একগাদা মোহনের। তেমন কিছু ভালোভাবে চলে না আলাদা হওয়ার পর থেকে। কয় বিঘা জমি ভাগে যা পড়েছিল ওইটুকুই মাত্র সম্বল। একসঙ্গে থাকার সময় যখন যা দরকার পড়ত দাদা পাঠাতেন। ভাইয়ের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন মোহন। বছরের চাল যোগাতেন। পাঠিয়ে দিতেন যেখানে দাদা বদলি হয়ে থাকতেন সেখানে। মোহন পৃথক হতে চাননি। রসিক বোধহয় ভাবলেন ভাইয়ের ব্যাঙাচির মতো একগাদা বাচ্চা তিনি কেন পুষবেন, পড়িয়ে-টড়িয়ে মানুষ করবেন। ভিন্ন হয়ে গেলেন। মোহন আপত্তি করেননি। আপত্তি করার ছিল না কিছু। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে দুঃখে-সুখে পড়ে রইলেন।

মোহনের বাড়িতে 'মাণবসা' হয়। লক্ষ্মীর পাদপদ্মের আলপনা দেওয়া হয়। কিন্তু মা লক্ষ্মী কখনো প্রসন্ন হন না। যার দিকে লক্ষ্মী না তাকান, তাকে মা ষষ্ঠী বড় কৃপা করেন। তাই মোহনের বাচ্চাকাচ্চা গণ্ডাখানেক। বড় ছেলেটা পড়াশুনা করল না। বখে গেল। ছেলেবেলায় রসিকের কাছে থেকে পড়ত। ভারি ডেঁপো হয়ে যাওয়াতে রসিক কাছে রাখতে চাইলেন না, তাঁর ছেলেরা ওর সঙ্গদোষে বিগড়ে যাবে। গাঁয়ে এসেও কিছু করল না। চাষবাস দেখল না। বাপ যতই বলুক শুনছে কে? আজকালকার ছোঁড়া তো! বাপ আর কোনো উপায় না পেয়ে বিয়ে দিল। দুহাত এক করার পর থেকে মন ঘরে বসেছে। এখন পথে

---

* কাঠা বা রেক, লক্ষ্মীর ঝাঁপি

এসেছে। খেতখামারে যায়। কাজকর্ম দেখে। মজুরদের খাটায়।

বউমা ঘরে আনলেন মোহন। গরিব হলে কি হয়, খুব খানদানী বনেদী ঘর থেকে। এখন গরিব হয়ে গেছে। আগে জমিদার বলে নামডাক ছিল। জমিদারী যাওয়ার পর থেকে অবস্থা পড়ে গেছে। মোহন বললেন— পড়তি ঘর থেকে মেয়ে আনবে। উঠতি ঘরে মেয়ে দেবে। লেগে গেল ওঁর কথাটা। বউমা তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। গাঁ-সুদ্ধ সবাই বলে একমুখে। পড়াশুনা করেছে। মুখখু নয়। বিএ এমএ না হয় নাই হল। গীতা ভাগবত, পুরাণ পুঁথি, পদ পদাবলী, বচন প্রবচন সব জানা। মুখস্থ। গরিব দুঃখীদের তো প্রাণ। উপোসী খিদেয় আতুর কেউ গিয়ে মোহনের দরজায় দাঁড়ালে ফিরে আসে না কখনো খালি পেটে বা খালি হাতে, যদি একবার বউমা ঠাকরুণের কানে আওয়াজ পৌঁছোয়। শিক্ষা আর কাকে বলে? মানুষ লেখাপড়া করে কিসের জন্যে? যে পরের মন বোঝে না যতই বই পড়ুক সে গণ্ড মূর্খ। পুঁথিও সুন্দর পড়ে বউমা। শুনলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। চৌকিতে কাঠঝাঁপি সাজিয়ে, পাটের কাপড় আর গয়না পরিয়ে যখন সে লক্ষ্মীর 'মাণবসা' পাঁচালি পড়ে, পাঁচ দশ বাড়ির বউ-ঝি এসে শোনে—

নমস্তে কমলা মাগো সাগর দুহিতা।
নমস্তে নমস্তে লক্ষ্মী বিষ্ণুর বণিতা॥
নমস্তে কমলালয়া অতি দয়াবতী।
স্থাবর জঙ্গম কীট পালিতেছে নিতি॥
তোর দয়াবলে মাগো দরিদ্র জনের।
মিলয়ে অচল বিত্ত জিতে সে কুবের॥

লক্ষ্মীর দয়া হলে আগের যুগে মানুষ কুবেরকে জিতত। এখন কুবের লক্ষ্মীকে জিততে চাইছে। কলিযুগে লক্ষ্মীপুজো করলে ফল মেলে না। মেলে কুবের পুজোয়। এটা যে কলিকাল! লক্ষ্মীর ভাসান করে দিয়ে, কুবেরের পুজো কর সব। যে কুবেরকে বরণ করবে সেই জিতবে দুনিয়া। সেই মাথা তুলবে, ওপরে উঠবে। লক্ষ্মী কি আর সাগর-দুহিতা হয়ে বসে আছেন? সাগরে কি আর বাণিজ্য হয় যে 'বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী' বলবে? লক্ষ্মী আজকাল কুবেরের কথায় ওঠেন বসেন।

পটনায়েক সাহেবের বাড়িতে কুবেরের পুজো। টাকা ও সোনার মরাই বসেছে। লোকে বলে নোট জ্বেলে চা তৈরি হয় তাঁর বাড়িতে। লক্ষ্মীকে খাতির করেন না। বাড়িতে 'মাণ' ঝাঁপি বসে না। জমি দশ-বিশ একর সব ভাগে চাষ হয়। আইন খাটে না তাঁর বেলায়। কত মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। বর্গাদারেরা কেস করে করে হাল ছেড়েছে। ডিক্রী সবসময় পটনায়েক সায়েবের। হাকিম ডেপুটি সকলে তো তাঁরই গুষ্ঠি। এঁরা একটা জাত। খুব জাতিয়ানা ভাব এঁদের। ব্যবসা, ব্যবসার পরে চাষ, চাষের পরে রাজসেবা— কোন কালের কথা! সব শেষে ভিক্ষা। এখন সব উলটে গেছে। আগে ভিক্ষা। ভিক্ষায় সবচেয়ে লাভ। এখন আর পেটের জন্যে ভিখ মাগা নয়। যেটুকু আছে সেটা বড় হীনসেবা। ইদানিং 'পার্টির' নামে ভিক্ষা। একে চাঁদা বলে। মন্ত্রীরা তাঁদের পার্টির জন্যে চাঁদা তোলেন। ভিক্ষা চাওয়ারই

সামিল, সবখেকো বেদের ভিখ চাওয়ার মতো। না দিলে মানুষের খুলি দোরগোড়ায় রেখে দিয়ে যায়। এ এক নতুন ধরনের ভিখ। একমুঠো দুমুঠো চাল তো নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ভিখ। এই ভিখমাগাদের পরে আসেন ওই রাজকর্মচারী আমলারা। এঁরা অমলিন তাই আমলা। ভিক্ষা চাওয়া মন্ত্রীর নীচের ধাপের এঁরা। এঁরা অমর। এঁদের পয়সার কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই। খরা-বানের প্রকোপ নেই। মাস পয়লায় ঠনঠন। টাকা নাও দেখে, জল খাও ছেঁকে। তারপরে আবার উপরি, তার হিসেব নেই। সব কুবের পুজোর ফল। পাপের ধন, কুৎসিত ধন দিতে কুবেরের জোড়া দাতা নেই। এই পটনায়েক সাহেবের মতো যাঁরা কুবের পুজো করেন তাঁদের কাছে ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি কিছু নেই। পটনায়েক সাহেবের গোমস্তা জোরজবরদস্তি অর্ধেক ভাগ আদায় করেন চাষীর কাটা ফসলের। যদি কোনো চাষী ভাগচাষ আইনের কথা বলতে চায়, তার উচ্ছেদ হয়। মোকদ্দমা করে হক সাব্যস্ত করার জো নেই। সকলের কাছ থেকে 'মজুরি পেলাম' বলে লিখিয়ে নেওয়া হয়। আর যার যেমন ভাগ, ফসল আদায় হোক না হোক, পটনায়েক সায়েবের ভাগে কোনো ধুলোময়লা থাকে না। তাগাদার দরকার হয় না। গোমস্তা গিয়ে সবথেকে ভাল খেতে যতটা ফসল হয় তার অর্ধেক দিতে বলে আসে। অতটাই মেপে দিয়ে যায় ভাগচাষীরা।

এক বছর গোমস্তার কাছে খবর এল, গাঁয়ে তাঁরা লক্ষ্মীপুজো করবেন। মা ঠাকরুণ নয়, মেমসাহেব— বিশ্বজিতের স্ত্রী এসে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসাবেন। তাঁর ভারি ইচ্ছে — আসলে জেদ, সেটা মোহন পটনায়েকের বাড়িতে বসে। এঁদেরও বসবে। নতুন করে বসবে। সেবার তাঁকে কেউ বলে দিল মোহন কেমন করে এজমালি ঝাঁপি বসাচ্ছেন। ব্যস, চড়ল রাগ, লাগল জেদ। আলবাত বসাবেন। তিনি এ-ও-সে নন। স্বামী আইএএস। বাবা আইএএস। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি। আর যত সেক্রেটারি মায় চিফ সেক্রেটারি সবাই ডরান তাঁকে। কম রোয়াব নাকি। মেয়েকে কনভেন্টে দিয়েছিলেন ছোটবেলা থেকে। এমএ পাস করল ইংরেজিতে। দন্ত, ওষ্ঠ্য বর্ণ লাগিয়ে কথা বলে। মিস পরিজা মিসেস পটনায়েক হয়েছেন। আজ কেন সাধ হল গাঁয়ে এসে 'ঝাঁপি' বসাবার? কেবলই ঈর্ষা। ওঁদের বসছে, আমাদেরও বসবে। সব মেয়েমানুষ সমান। সকলের নাম ঈর্ষাদেবী।

মেমসাহেব খবর পাঠালেন কার্তিক মাসে। কার্তিক গিয়ে অঘ্রান এল। আগমন হল মিসেস পটনায়েকের। রসিক পটনায়েকের বধূ। গাঁ সুদ্ধু বউ-ঝি মেয়েরা দৌড়োল লেখাপড়া-করা বউ দেখতে।

"হাতী না ঘোড়া, বাঘ না ভাল্লুক — কি দেখলি লো?" কেউ একজন জিজ্ঞেস করে বসল। "মেলা দেখে ফিরছ যেন, খুব যে হাসি!"

বউ দেখে ফেরার পথে—

"চোখে চশমা পরেছে লো। সোনার চশমা! চিকচিক করছে।" নারাণের মা বলল।

"মুখে কি চুন কালি দেখবে গো!" শুঁড়ি-বউ বলে ফেলল ঠাট্টা করে। "দেখলি না?"

ফ্যা ফ্যা করে হেসে ফেললে কুন্দ। কদিন হল কুন্দ ফিরেছে মামাবাড়ি থেকে। মামার বাড়ি শহরে। শুঁড়ি-বউয়ের কথা শুনে ওর খুব হাসি পেল।

"বাপের তো নাম নেই। মামা শহরে গিয়ে কি একটা চাকরি করছে বলে পা পড়ে না মাটিতে মেয়ের, দেখ না!" রেগে গেল শুঁড়ি-বউ।

কুন্দ থেমে গেল। মেয়েটা ভাল। শহর দেখেছে। চোখ একটু খুলেছে। তবে শহরের চাকচিক্যতে মন মজাবার সময় পায়নি। শুঁড়ি-বউটা চটে যাবে সে ভাবতে পারেনি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল অজান্তে। খুব নরম হয়ে বলল, "না গো মাসি, সে কি চুন কালি মেখেছে নাকি? সেটা হল পাউডার। চুন নয়। শহরে পয়সাওলা ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শেখা ছুঁড়িরা ওরকম লাগায় মুখে— মিহি সাদা সাদা গুঁড়োগুলো মুখের সঙ্গে মিশে যায়। তোফা দেখায় লাগালে। কেয়া ফুলের রেণুর মতো সুন্দর গন্ধ। ওই পাউডারে ঘাম লেগে অমন ছোপ ছোপ দেখাচ্ছে। আর ওই কালিটা কি জান মাসি? কাজল, চোখের কাজল। ওখানে কি আমাদের মতো ঠিক চোখের পাতার নীচে লাগায় নাকি মাসি? এই রকম টেনে দেয় আঁকড়টা দু চোখের দু কোনা থেকে একেবারে কানের গোড়া পর্যন্ত। সেই কাজলটা কেমন যেন লেপটে গেছে, ওটাই তো ফ্যাসান। এইসব বড় ঘরের লেখাপড়া করা বউ-ঝিদের কাপড় চোপড় ধরন-ধারণ যেমন তেমন হলেও ফ্যাসান হয়ে যায়। অন্যেরা দেখে শেখে। বুঝলে মাসি?" বুঝিয়ে বলল কুন্দ।

"হয়েছে লো হয়েছে। দেখিনি যে দেখাচ্ছে। এতেই এত, আংটি নেই পা নাচাস কত! যতই বড়লোকের মেয়ে কি বউ হোস, যত নেকাপড়া করে থাকিস, মা সরস্বতী হতে পারিস, তবু বাড়ির বউমানুষ তুই, তোর এ কি সাজ লা? ছেনাল মাগীদের মতন! ছিঃ।"

শুক বলল— "তাই বা কোথা মাসি? কুলের বউ তুই। সিঁথেয় একদাগ সিঁদুর দিবি না? তা না, কিসের বউ কে জানে লো মা, এত বড় একটা টিপ! ভোরবেলা আকাশ রাঙিয়ে সুয্যি উঠছে যেন। এমনধারা না দেখালে শহুরে মেয়ে বলে চিনবে কেন কেউ!"

পরী বলে উঠল— "শুধু কি তাই? হ্যাঁ লা, এয়ো স্ত্রী তুই, হাতে একগাছা শাঁখা পরতে নেই? যত বড়মানুষী দেখাস না কেন, সোনায় গা মুড়ে রাখ না কেন, এটা ত হিন্দু মেয়ের ভূষণ। তা না, এক হাতে ঘড়ি, আর হাতে কিচ্ছু নেই! হ্যাঁ, চুড়ি দু-চার গাছা আছে বটে, কিন্তু খাড়ু, বটফল, বাজু আর বালা কই? এ কেমন রাঁড়ের হাত করে রেখেছে গো মা!"

ঘনার মা পিঠোপিঠি আরো দু-পদ জুড়ে দিল— "না আছে নাকে নথ, দন্তি কি ফুল, না আছে হাতে বাজু কি অনন্ত। এ কোথাকার ঢং লা মা।"

কুন্দ হাসি চাপতে পারছিল না। আমুদে ধাতের মেয়েটা। গলা মেলাল— "সত্যি তো, এটা কিরকম হল! শুধু কি বাজুতে অনন্ত? মাথায় থাকত মুকতার ঝরা, বুকে থাকত ইন্দ্র গোবিন্দ কাঁচুলি, কোমরে গোট নয়ত চন্দ্রহার, কানে হীরের কুণ্ডল না হোক অন্তত ঝুমকো চাঁপা, গলায় সাতনরি হার ত থাকবে। পায়ে বাজন নূপুর নয়তো মল পাঁয়জোর, পায়ের আঙুলে রুপোর, আর হাতে মানিকবসা আংটি। কই, কিছু নেই, তাতেই আমি বড়ঘরের বউ! ছিঃ!"

"চুপ কর নিলাজ", কুন্দের মা কুন্দকে থামিয়ে দিলেন। "বড়দের ওপরে কথা বলিস? এই কথা শিখে এলি শহরে মামীর কাছ থেকে?"

শুঁড়ি-বউ এবার সাহস পেয়ে বললে— "কোন শহরের ছুঁড়ি লা তুই? দেখ ছুঁড়ির ফেয়সান!"

পদিনী তার নিজের মনে যা বুঝল তাই বলল—"বলাই-মা কাকী, যাই বল মানুষের মতো মানুষ বটে। আদরযত্ন, আদবকায়দা কোনটাতে কম? এত লেখাপড়া করেছে কে বলবে? একটুও কি গরব আছে?"

"আচ্ছা লো আচ্ছা। দেখিনি তো, আমায় দেখাচ্ছে।" শুঁড়ি-বউ জবাব দিল— "আমাদেরও বিশ-পঞ্চাশ থাকলে আমরা কি তেমনি আদর করতাম না? খাতির করতে মন নেই কার? আসল হল পয়সা। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে, হাঁক দিচ্ছে। চাকর বাকর একগাদা। নিজেকে কি গতর খাটাতে হয়? বল না? কুটুম-বাটুম খাতির যত্ন করতে কোমরের জোর চাই, দাস-দাসী গণ্ডা গণ্ডা থাকা চাই, তবে গিয়ে না সামলাবে। বলে কিনা, ট্যাকেতে নেইকো ধন, ছেলের বিয়েতে মন।"

বালুঙ্গার কানে সব পৌঁচেছে। সারা গাঁয়ের খবর তার কাছে। সেদিন পাকি গেছিল। দেখে এসে একটি একটি করে বর্ণনা করতে থাকে ঠাকুর্দার কাছে। মিসেস লিলি পটনায়েক তাঁর নাম। রসিক পটনায়েকের বউমা ঠাকরুণ। তাঁর সঙ্গে যে চাপরাসী এসেছে সে শুধু মিসেস পটনায়েক মিসেস পটনায়েক আওড়ে যাচ্ছিল। পাকি জানাল—"দাদু, তুমি যেমন হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বল ঠিক তেমনি। মিসেস পটনায়েক খাবেন, মিসেস পটনায়েক শোবেন, মিসেস পটনায়েক বাথরুমে যাবেন, মিসেস পটনায়েক বই পড়ছেন, মিসেস পটনায়েক বাগানে বেড়াচ্ছেন— সবসময় খালি সেই লিলি পটনায়েক — মিসেস লিলি পটনায়েক'।

মিসেস লিলিকে তাঁর শাশুড়ির আদেশ— মোহনের বাড়ি মাড়াবে না। ডাকলে বলে দিও— শরীর ভাল নেই।

লিলি নাকি বলেছিল শাশুড়িকে — মিথ্যে কি করে বলব? শাশুড়ি বললেন— আহা, ভারি সত্যবাদী বাপের ঝি রে আমার!

পাকি শুনে এসেছে ওই চাপরাসী বাহাদুরি করে মিসেস পটনায়েকের বড়াই করছিল কারো কাছে।

মিসেস পটনায়েক নামটা শুনে সেই শুঁড়ি-বউ এমন করল! টাটকা দইয়ে পোকা দেখার মানুষ সে। "এ আবার একটা নাম নাকি? কুন্দ, মন্নী সব চুলোয় গেল, এবার এল লিলি ডলি। ওই যে, ও পাড়ার রামবাবুর মেয়েব নাম ডলি, বিয়ে করল কে এক বড়লোক মিলওলার ছেলেকে। চম্পা, তুলসী, বেলা এ নামগুলো আর কেউ ধরে না। সোহাগে বাবা আমার নাম দিয়েছিল 'চাঁদমণি'। গাঁয়ের সবাই বলত লখিয়ার ঘরে সত্যি সত্যি একটি চাঁদ উঠেছে। ছেলেবেলায় দেখতে ভারি সুন্দর ছিলাম। কি বলব, আমার ভাগ্য আমায় এত হেনস্তা করল, না হলে আমার বিয়ে এখানে হত না আর আমার মাথার সিন্দুর আজ মুছে যেত না।" বলে কেঁদে ফেলল শুঁড়ি-বউ।

বালুঙ্গা একথা শুনে হাসল। ওর মনে পড়ল রাসো পটনায়েকের মেয়ের জন্ম এইখানে। এই গাঁয়ে। রাসো বড় উকিল হলেন। শহরে বাড়ি করলেন। মেয়ের নাম রেখেছিলেন দেবী। সবাই ডাকত 'দেবী' বলে। দেখতে দেখতে মেয়ে শহরে গেল, কি পড়াই যে পড়ল ওর নাম হয়ে গেল বেবী। দেবী ডাকলে খেপে যায়। ঠিক তেমনি ফেলুর মেয়ে বুলি। বিয়ে হল। শ্বশুরবাড়ি শহরে। বউভাতের দিন শ্বশুর নাম দিলেন বুলবুল। ব্যস, বুলি বুলবুল হয়ে গেল।

পাকি বলল, "শুনেছ দাদু? লিলি ঠাকরুণ জেদ ধরে বসেছিলেন। তিনি এই জন্যে এসেছেন। তাঁরও ঐ লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসবে। একজন গিয়ে বড়দেউলের লক্ষ্মীমন্দির থেকে একটা ঝাঁপি নিয়ে এসেছে। পাণ্ডা নিল একশ টাকা ঝাঁপি আর কড়ি দিতে। দেবীর মুখ বসিয়েছে কটকী কারিগর। কেমন সুন্দর মুখটি হয়েছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণের মুখটি যেন।"

আলপনা আঁকা হল এবার রসিক পটনায়েকের বাড়িতে। একটার পর একটা পদ্মফুল, লক্ষ্মীর চরণ চিহ্ন কত শত আর পাকির মা যত রকমের ঝাড়ুর মুঠো, ধানের শীষ, কড়ির গাদা সব করে তার চেয়ে বেশি। এঁকে দিয়ে গেল গাঁয়ের বউয়েরা এসে। সব হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এ বলল আমি লিখব, ও বলল আমি আঁকব।

যতই করুক লিলি ঠাকরুণের মনে কিন্তু ধরল না। বললেন— এত শিগগির সেরে ফেললে? মেয়েরা কিইবা করবে? মাটির দেওয়াল কই যে আলপনা দেবে? সব তো পাকা বাড়ি। মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা। সেখানে আলপনা ঠিকমতো ফুটে ওঠে না, বাহারে দেখায় না। নাচার সবাই। ঠাকরুণ যা দিলেন নিয়ে চলে গেল চুপচাপ।

অঘ্রান মাসের বেস্পতিবারের আগের দিন।

পটনায়েক সায়েবের বাড়িতে নতুন করে ঝাঁপি বসছে। সাতপুরুষের ঝাঁপিকে জোর করে নিয়ে রেখেছিলেন মোহন পটনায়েকের স্ত্রী আলাদা হওয়ার দিন। রসিক পটনায়েকের স্ত্রী চেঁচামেচি করেছিলেন। মোহনের স্ত্রী 'ছোট ঠাকরুণ' বলেছিলেন, 'কোনোকালে কি ঝাঁপি বসিয়েছিলে দিদি? শাশুড়ি ঠাকরুণ তো আমায় দিয়ে গিয়েছেন, তুমি কি ছিলে এখানে? তিনি চলে যাওয়ার বছর থেকে তো আমিই বসাচ্ছি। আজ তোমার ঝগড়া করা কি সাজে?'

গাঁয়ের মেয়েরা বললে, 'যতই হোক তারা বড় তরফ। তাদের পাওয়াটা হকের। নদীয়ার মায়ের এটা অন্যায়।" মোহনের বড় ছেলের নাম নদীয়া।

বড় জা সারদার মা ধরে বসলেন— 'ঝাঁপি যদি কাছে রাখতে চাও তবে নদীয়া দু একর ছেড়ে দিক।' এই সে-দিনের কথা। বালুঙ্গার সব মনে আছে। রসিকবাবুর মেয়ে সারদা তখন শ্বশুরবাড়িতে একপাল ছেলেমেয়ের মা। ওর কথা ওঠে মাঝে মাঝে, গাঁয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ছোট জা শ্রীমতি — মোহনের স্ত্রী মহা আনন্দে। যেদিন থেকে পূর্বপুরুষের আমলের 'মাণ' ঝাঁপি মোহনের বাড়িতে। প্রতি বছর অঘ্রানের সব বেস্পতিবারে পুজো হয়। অশৌচ হলে রেখে দেওয়া হয় মাঘ পর্যন্ত। শ্রীমতি বললেন 'ছেলে বউ যদি মানুষ হয়, কত 'দু একর' জমি পাওয়া যাবে। এই 'ঝাঁপি' পাব কোথায়?'

অন্য মেয়েরা বলল— 'ঠাকুরাণী থাকলে আপনি ধনদৌলতে ঘর ভরে যাবে। জায়গা পাবে না রাখবার।' তা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ঘর আলো করে রইলেন সত্যি, তবে মোহনের ঘর আর ভরে উঠল না। ভরল রসিকের। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে যেখানে যত জায়গায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী পুজো পেয়ে থাকেন, কার ঘর ভরেছে বল? তবুও এই ঠাকরুণ পুজো পাবেন, পাচ্ছেন।

বউ ঠাকরুণ লিলি দেবী যেদিন শাশুড়ির কাছে এ গল্প শুনলেন, সেই দিনই বললেন— 'আমাদেরও ঝাঁপি বসবে।' জেদ ধরে গাঁয়ে এলেন। এখন বসাবেন কি করে। বাতলাবে কে? খুড়-শাশুড়ি নদীয়ার মায়ের সব জানা। কিন্তু তাঁর বাড়িতে যাওয়া বারণ। করেন কি এখন? গাঁয়ের মেয়েদের কাছে জেনে নিতে লজ্জা করে। শুনলে হাসবে। 'এত লেখাপড়া করে কি লাভ'— বলবে সবাই। লক্ষ্মীর পাঁচালী 'মাণবসা' একখানা কিনে এনেছিলেন আসার সময়। বড় বড় বইয়ের দোকানে খুঁজে খুঁজে হয়রান, কোথাও পাওয়া যায়নি। নভেল উপন্যাস কাব্য কবিতা সব রাখে বড় বড় দোকান। সেখানে লক্ষ্মীপুরাণ মিলবে কোত্থেকে। চাপরাসি আনল আদালতের কাছে দেওদার গাছের তলায় মাদুর পেতে বই সাজিয়ে বসে থাকা লোকের কাছ থেকে — আর্তত্রাণ - ভজন, বিষ্ণু সহস্রনাম, লাট্টু চুরি, কপট পাশা এমনি যত রাজ্যের বই সব তার কাছে— সেখান থেকে দশ পয়সা দিয়ে কিনে এনেছিল ওই পাঁচালী একখানা। কিন্তু সেটা পড়লে কি হবে? যে এক-আধবার পুজো করেছে সেই কিনা করতে পারে পুজো বই থেকে শুনে শুনে। যার আদপে কিছুই জানা নেই তার তো চোখে অন্ধকার ঠেকবে।

গোলামবাড়ির বউ ছিগুলার স্ত্রী এসেছে। সে বলল, "বড় ঝামেলা এই ব্রতয়। হাজারো ব্যাপার। শতেক কম্ম। আঁধার ভোরে উঠে গোবরজলে ঘরদুয়ার লেপে লক্ষ্মীর পাদপদ্ম আলপনা দাও। নতুন ঝাঁপি আনো। তাকে ধুয়েমুছে শুদ্ধু কর, শুকিয়ে নাও। তাকেও চিত্রবিচিত্র করতে হবে। কড়ি বসিয়ে চোখ নাক তৈরি কর, গন্ধ হলুদ লাগাও। ধোয়ামোছা চৌকিতে নতুন ধান ঢেলে রাখতে হবে। সব শুক্ল সরু ধান। কালো কিম্বা মোটা হলে চলবে না। ঝাঁপির মধ্যে শুক্ল ধান পুরো ভর্তি করে তিনটে সুপুরি হলুদ জলে ধুয়ে তার ওপরে রাখ। এমনি কতসব আচার। সে কি সোজা কথা?"

লিলি বললেন— "যা সব বললে সে-সব তো বইতে লেখা আছে। সেগুলো না হয় করলাম, কিন্তু ধানের শীষ দিয়ে তোড়া কেমন করে বাঁধে সে তো আমি পারব না।"

"আমি মা তোমার জন্যে একটা তোড়া বেঁধে পাঠিয়ে দেবো।"— বলে গোলাম বউ চলে গেল। লিলি ঠাকরুণ আবার পাঁচালী পড়তে বসলেন।

"অন্ধ বিশ্বাস। ডাহা কুসংস্কার এগুলো। অশিক্ষিত লোকদের মন ভোলানো।"— বলে নাকি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বইটা লিলি দেবী, নাকি লিলি মেমসাহেব, কি বসে ডাকে কে জানে। — 'আমরা ঝাঁপি না বসালে কি ভেসে যাবো? আমাদেরই কি লক্ষ্মী ছেড়ে চলে গেছেন কোথাও? ওঁদের বাড়িতেই বা কোন লক্ষ্মী জেঁকে বসে আছেন? লক্ষ্মীছাড়া যতসব। বলে কিনা সকালে বিছানা ছেড়ে হাতমুখ যে না ধোয় তার মুখ দেখা পাপ। লেখা রয়েছে দেখ না বইটাতে। কোন কালের কথা, কি অসম্ভব কথা। রাতভোরে বাসি বিছানায়

পড়ে থাকলে নাকি লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চলে যান। তা যদি হত, পাঁচা লক্ষ্মীর বাহন না হয়ে মোরগ হত। সে রাত থাকতে ওঠে। পাঁচা তো সকাল না হতেই কোটরে ঢোকে। শহরে যত বড়লোক, লাখপতি, কারখানার মালিক, মন্ত্রী, সেক্রেটারি— বড় থেকে ছোট সকলেই কে না আটটায় উঠে বেড-টী খায়, বিছানায় শুয়ে খায়! তাঁদের লক্ষ্মী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন কই? চলে যাচ্ছেন, না আরো বেশি সেঁদিয়ে ঢুকছেন? সকালে উঠতে না উঠতেই দেখা করার জন্যে একগাদা লোক দাঁড়িয়ে থাকে এঁদের দোরগোড়ায়। সবাই তো মোটরে গাড়িতে আসে। লক্ষ্মীর বরের দরকার কি? লক্ষ্মীপুরাণে এগুলো যতসব মনগড়া কথা। গুল গালগল্প।"— এইসব ভেবে ছুঁড়ে দিয়ে থাকবেন বোধ হয় লিলি ঠাকরুণ 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' নামে ছাপা চটি বইখানা।

পাকি বলছিল সে নিজের চোখে দেখেছে, সে যখন যায় ঠাকরুণ বইটা পড়ছিলেন। হয়ত পড়ছিলেন 'হাড়ির বাড়ি যাবে লক্ষ্মী ডোমের বাড়ি যাবে', আর ভাবছিলেন— 'এ কেমন কথা? যাকে সকলে জগতের ঠাকুরাণী বলেছে— ধন ঐশ্বর্যের অধিকারিণী— তিনি কেন হাড়ির ঘরে ডোমের ঘরে ঢুকতে যাবেন? আজকাল না হয় অস্পৃশ্যতা উঠে গেছে। যে ছোঁয়া ছুঁয়ির বারণ করবে সে শাস্তি পাবে। কিন্তু এ বই লেখার সময় কি কেউ হাড়ির ঘরে ঢুকত?' আরো পড়ে থাকবেন—

যে নারী ভকতি চিতে না সেবে স্বামীবে
স্বামী সুতে হয় দুঃখী জন্ম জন্মান্তরে॥
যে নারী স্বামীকে দেখে দেবতা সমান
তুসে তার মতি জেনে করি সেবা দান॥

'এগুলো সব পুরুষদের মনগড়া কথা।' বলে হেসে থাকবেন বউ ঠাকরুণ। স্বামী কে? পুরুষ স্বামী আর স্ত্রী দাসী? এ বই আবার মানুষে পড়ে? এই বলে হয়তো তিনি বই ফেলে দিয়ে থাকবেন। 'বলরাম দাস এহা গীতরে কহিলা'— আর কে বলত? সেই পুরুষ ছাড়া এমন অসঙ্গত অসভ্য কথা কে লিখবে? রাগ চড়ে গিয়ে থাকবে লিলি মেমসায়েবের।

আরো রেগে গিয়ে থাকবেন যখন চোখে পড়ে থাকবে জগন্নাথ বড়ভাই বলরামকে বলছেন, 'তুমি তো বিনা দোষে লক্ষ্মীকে বের করে দিলে, সে ছাড়পত্র দিতে চাইবে না?' বলভদ্র উত্তর দিলেন, 'আমাদের জাতে ছাড়পত্র চলে না'। আর কি চলে তবে? লিলি মেমসাব দাঁত কড়মড় করে থাকবেন। কেবল পুরুষ বের করে দেবে বাড়ি থেকে স্ত্রীকে, স্ত্রী কিন্তু পুরুষকে ছাড়পত্র দিতে পারবে না। বলিহারি প্রেম। পুরুষ না হলে এমন আর কে লিখবে? এখন তো আইন হয়েছে, স্বাধীন দেশে সকলে স্বাধীন। স্ত্রী-পুরুষ কেউ কারো অধীন না। যে যাকে চাইবে ছাড়পত্র দিতে পারবে এটাই তো ন্যায়। তা না, খালি পুরুষ যা ইচ্ছে তাই করে যাবে আর নারীরা শুধু সইতে থাকবে। এ সব পুরোনো কথা। মরচে-পড়া ঘুণ-ধরা কথা। পুরাণ নয়। ওই বাইবেলও তো একটা পুরাণ। ছোটবেলায় কনভেন্টে পড়েছিলেন লিলি দেবী। স্ত্রী হল পুরুষের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস। মানে এক আত্মা এক মন, এরই নাম হল পুরাণ, আর এগুলো কি পুরাণ নাকি? ছ্যা!

ঠিক এই সময়েই নাকি ছোট জা গিয়ে নীচে মাথা ঠেকাল।

"কে?" জিজ্ঞেস করলেন লিলি মেমসাব।

"আমি সুলি— সুলক্ষণা।"

"ও,— নদীয়াবাবুর...."

মাথা হেলিয়ে সেখানে বসলেন সুলক্ষণা। পাকি দেখেছে। 'বস' বলেও একবার বসতে বললে না বড় জা।

বলবে কি করে? নিজের লজ্জা নিজেকেই খাচ্ছে। বড় হয়ে— বয়সের হিসেবে, ধনে, মানে সবেতে — তোমারই না আগে যাওয়ার কথা। খবর নেওয়ার কথা। না হয় ডেকে পাঠাতে! কিম্বা একটা খবর পাঠিয়ে দিতে এসেছ বলে। তবে কিনা তোমার বড়পনা বোঝা যেত। এখন তার মান ধ্যান সে দেখিয়ে দিল, লিলি মেমসাহেবের নাক সিঁটকে গিয়ে থাকবে। এ কেমন ঢং গো মা! এক হাত ঘোমটা। ওই মহল থেকে এই মহলে আসতে এত লাজ? বাস্তবিক এখনো নিরেট অন্ধকারে রয়েছে গাঁয়ের লোকেরা। গা থেকে হয়তো গেঁয়ো গন্ধ বেরোচ্ছে সুলক্ষণার। সাবানে গা ধোয়নি জন্মে। মফস্বল থেকে এসে মফস্বলে পড়েছে। শহরের হাওয়া লাগেনি, ছোঁয়নি। হাতের চেটো দুটো হলদে। হলুদ বেটে থাকবে। মালক্ষ্মীর কাপড় ছুপিয়ে থাকবে। দুপায়ে আলতা পরে থাকবে, বেস্পতিবারের পুজোর জন্যে। সব নিয়ে কেমন বাধো বাধো লেগে থাকবে লিলি মেমসাহেবের।

"তুমি কি গুরুবারের ব্রত করছ?" জিগ্যেস করলেন লিলি।

"হ্যাঁ"। মাথা হেলিয়ে উত্তর দিল সুলি।

"এই যে সব নিয়ম লিখেছে, সে-সব মেনে কাজ করতে তোমার সময় হয়?"

সেই একই ঢঙে মাথা হেলান উত্তরে— মানে 'হ্যাঁ'।

"তুমি বেস্পতিবার দিন পান সাজ না, আমিষ খাও না? সব বেস্পতিবারে মাথা ধোও? একবেলা খাও?"

ওই মাথা নাড়া-নুইয়ে। যেন কথা বলতে শেখেনি— বোবা কিম্বা হাবা মেয়েটা।

"দেখত দেখত, এ বইতে কি লিখেছে! তুমি কি এসব কর?

'গুরুবার সকালেতে গোময় লইয়া
দুয়ার যে নাহি লিপে অলস হইয়া।'

পাকাবাড়িতে তা বলে গোবরের জল ছিটোবে? ফিনাইল আছে কেন তবে? পাকা দুয়ারে মাটি গোবর গোলা জল দিয়ে নিকোবে? আবার, চুলো থেকে ছাই সাফ করবে বলে লিখেছে। ছাই কোথায় পাব? আমাদের তো সব ইলেকট্রিক অভেন। ওতে ছাই কোথায়?"

বালুঙ্গা কখন এসে পাকির কাছে দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব শুনছে। 'একটু পরে যাব' বলে দিয়ে সে পাকিকে আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল সুলক্ষণা বউমার। বললে, "এ সব পুরাণ-শাস্ত্রের কথা। মুনি ঋষিদের কথা। আমরা মুখ্যু লোক। যা বললে সত্যি বটে, তবে আমরা ওসব নাকচ করব কি করে? যতটা পারা যায় করতে

হবে। না পারলে করব না। তা বলে কি নিন্দা করতে পারি?"

বালুঙ্গা শুনে যাচ্ছিল, আর সামলাতে পারল না। ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। বলল— "ছোট ঠাকরুণ, পেন্নাম। আমি বালুঙ্গা। আমাকে তুমি চিনবে না। চিনবেন বিশ্বজিৎবাবু। তাঁকে জিগেস কোরো। শুনলাম তুমি এয়েচ। ভাবলাম একটু দেখা করে আসি। বাড়িতে স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। এটি আমার নাতনী। তাকে আগে থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বলল আমি ছোট ঠাকরুণকে দেখব। আবদার করল। এমন জেদখোর মেয়ে। ছেলেবেলায় বিশ্বজিৎবাবুও এমনি ছিলেন। হলে কি হয়, বালুঙ্গার কোলে সব চুপ। বড় ভালবাসেন মা। জিগেস কোরো। বিশুবাবুর গিন্নি তুমি। দেখব বলে বড় সাধ ছিল। বাবু ত ছেলের বিয়ে দিলেন শহরে। আমাদের আশা টুটে গেল। পিঠে-পায়েস আর জুটল না কপালে। না জুটুক। এখন তোমায় দেখে আমার পেট পুরে গেল মা। শুনলাম, 'মাণ' ঝাঁপি বসাতে নাকি এয়েচ। ভাল, ভাল। সুতোর খি লাগিয়ে রাখ মা। সুতো ছিঁড়ে ফেললে সব গেল। পুরাণ শাস্তরে ত এটাই লেখা আছে। মানচে কে আজকাল? শুনচে কে সেকথা! যে ইঞ্জিরিমিঞ্জি পড়ল সে পুঁথি-পুরাণ ছাড়ল। বললে যে এই পাঁজি-পুঁথি সব মনগড়া মিছে কথা। মিছে কি সংসারে কিছু আছে মা? সংসারে সব সত্যি। যা দেখচ সে সত্যি, যা না দেখেচ সেও সত্যি। আমার নাম বালুঙ্গা, মা। বাবুদের সেবা করে বুড়ো হলাম। বিশুবাবু বলবেন সে-কথা। কত কোলে করেচি, কাঁধে তুলেচি, খেলিয়েচি, ভুলিয়েচি, মা। সেদিন আর নেই। কাল, কাল, কালের গর্ভে সব যাবে। কিছু থাকবে না। থাকলে থাকবে এই সুতোর খেইটুকু। সুতোটাকে ছেড়ে দিও না মা। বড় বড়রা যে রাস্তায় গেছেন, সেই ত ঠিক রাস্তা। আচ্ছা, আসি মা।"

লোকটা পাগল নাকি? লিলি ঠাকরুণ ভাবছেন। আবার বলে উঠল বালুঙ্গা পেছনে মুখ ফিরিয়ে, চলে যেতে যেতে, "আমায় মা পাগল বলে সবাই। এমনি মেলা বকি আমি। কিছু মনে কোরো না। রাগ কোরো না, আমি তোমার বুড়ো ছেলে। ঈশ্বর করুন মা— এ কুল উজ্জ্বল হোক। কোলে চাঁদপানা ছেলে হেসে উঠুক। আচ্ছা, চললাম মা। সুবিধা অসুবিধায় দরকার হলে খবর দিও, আমি আসব।"

বালুঙ্গা এইটুকু বলে চলে এল। পরের দিন বৃহস্পতিবার। শুনল, রসিক পটনায়েকের ঝাঁপি বসেনি। বেস্পতিবারের মতো দিনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরে চলে গেলেন বউ ঠাকরুণ। গাঁয়ের মেয়েরা চোখ ঠেরে গা টেপাটেপি করছে।

আজ সেইসব কথা শোনাচ্ছিল বালুঙ্গা শুকুরাকে। জামবাটিতে পুরো একবাটি পান্তাভাত দিয়ে গেল পাকি। নুন পেঁয়াজ, তার সাথে শাক, বড়িভাজা। মণিয়া দেখতে থাকে। রাক্ষুসে খিদে। বাটি বাটি ভাত আর পান্তার জল টেনে নিতে থাকে ওই খিদে। যেন কতদিন খায়নি।

"লক্ষ্মীর দিকে চোখ দিলেন না পটনায়েক সায়েব। যে কুবেরের বর পেয়েছে, তার লক্ষ্মীকে কি দরকার?" বলছিল বালুঙ্গা। "বলা হয়— সেটা নাকি ভারি অসুন্দর। কদর্য স্বভাবের। পটনায়েক সায়েবের মতন যারা সব ধেয়ে চলেছে এই কুবেরের পেছনে টাকা

টাকা করে, তাদের মনও তেমনি কুবেরের মতন। ইস!"

বালুঙ্গা শোনাতে থাকে শুকুরাকে জিজ্ঞেস করে, "তুই কত রোজগার করলি রে শুকুরা? কুড়ি কুড়ি বছর। একটা দুটো দিন নয়। এত কামালি, কি এনেছিস শুনি। না না থাক, বলিসনি। এই গাঁয়ের লোক হিংসা করবে তোকে। নিজে ত কামায় না। ছ মাস খাটে ত ছ মাস ঘুমোয়, কুম্ভকর্ণ যত সব। আর কেউ যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কামিয়ে আনল, বলবে— তোর আগে গেছে চলে যত জন, সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গেছে কত ধন? খালি হিংসা। জ্বলে যায় এই লোকগুলো পরের বাড়ন্ত দেখলে।

ও বালুঙ্গাদা— "কেউ চেঁচাল বাইরে। তোমার বাড়িতে শুকুরাবাবু এসেছেন বুঝি? কলকাতা থেকে ফিরেছেন নাকি। গোটা গাঁয়ে শোর উঠেছে শুকুরা গাঁয়ে ফিরেছে।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাল চকরা। অঘাসুরের মতো মানুষটা। ওই হরিজন পাড়ার। চকরা চৌকিদার। চক্রধর দাস। চৌকিদারী গেছে। সরকার কোমরপেটি তকমা সব নিয়ে নিয়েছেন। বয়স পঞ্চাশের মতো, ঠ্যাঙ্গার মতো দাঁড়িয়ে আছে। অভ্যাস পড়ে গেছে নিশিরাতে চিৎকার করে করে— ওহ্ হেই।

চৌকিদারী উঠে গেছে। এখন গ্রাম আর কারোরই নয়। সবাই মাতব্বর। অসুখ বিসুখে, ওলাউঠা বসন্তে পুজো দিয়ে আর কেউ গ্রামদেবতাকে প্রার্থনা জানায় না কিম্বা গরিবের মা-বাপ পুলিসের কাছে নালিশ করে না।

অকাট মূর্খ চকরা বুঝতে পারে না। চৌকিদারী তুলে দিয়েছে বলে সরকারকে গাল পাড়ে। ওর দানাপানি গেল। তার বদলে মিলল পোড়ো পতিত জমি খানিকটা। পাঁচ প্রাণীর সংসার চালাবে তাই দিয়ে। এখন লেখাপড়া শেখা গ্রামরক্ষী সব হয়েছেন। পনেরো দিনে একমাসে রাস্তায় বেরোয় কিনা ঠিক নেই। পাহারা দেয় না রাতে। লজ্জা করে বোধহয়। ভেঁপু বাজায়, শিস দেয়। হুইসিল না কি যেন বলে তাকে। গার্ডসাহেব রেলগাড়িতে যেমন হুইসিল দেয় তেমনি।

চৌকিদারী গেলে কি হল, চকরা ওর অভ্যেস ছাড়েনি। কথা বলে দারুণ চেঁচিয়ে। কারো ভাল-মন্দ হলে পাশে এসে দাঁড়ায়। সকলের হাঁড়ির খবর ওর জানা। গাঁ ওর খবর নেয় না কিন্তু সে গাঁয়ের খবর রাখে। কারোর সম্বন্ধে তার নালিশ নেই। বলে, ফরিয়াদ করবে তো একজনেরই কাছে। একেবারে সুপ্রিম কোর্ট। মানুষের কি কেরামতি আছে? তাকে জানিয়ে কি লাভ?

তুকতাক জানে চকরা। সাপে কাটলে ভয় নেই। তক্ষুনি চকরার কাছে কেউ খবর নিয়ে দৌড়ে গেলে হল। অবশ্য সে খুব মজবুত লোক হওয়া চাই। শোনামাত্র চকরা একটা দারুণ থাপ্পড় গালে কষে দেবে। সেই খবর দেওয়া লোকের কান ঝাঁ ঝাঁ করবে, চোখে অন্ধকার দেখবে, মাথা ঘুরিয়ে দেবে। তবে সেই থেকে জানবে বিষ নামতে শুরু করল, চড় খাওয়া লোক যতই ধাতে ফিরে আসতে থাকবে, সাপে কাটা লোকের অবস্থাও ভালোর দিকে আসতে থাকবে তত। ক্রমে বিষ নেমে যাবে। আর ঝাড়-ফুঁক কিছু না।

শুধু কি সাপে কামড়ানো? পাগলা কুকুর কিম্বা শেয়ালে কামড়ালে তোমাকে ডাক্তারখানা

গিয়ে তলপেটে ইনজেকসান নিতে হবে না। চলে যাও চকরার কাছে একটা সুপুরি আর তামার পয়সা নিয়ে। তামার পয়সা তো আজকাল স্বপ্ন। যদি কারো কাছে ছেঁদা পয়সা থেকে থাকে তো ভাল, নচেৎ চোরাই তামার তার গলিয়ে যদি রেখে থাকে কেউ, তার থেকে একটুকু হলেও চলবে। চকরা রুগিকে বসিয়ে দেয় একটা থালার ওপর। শরীরে বিষ থাকলে থালাটা ঘুরবে— আপনি ঘোরে, ঘুরে ঘুরে যখন থেমে যাবে তখন জানবে যে বিষ কেটে গেছে পুরোপুরি।

কারো ছেলেমেয়ের ওপর 'দৃষ্টি' পড়েছে, নজর লেগেছে ভূত কি ডাইনিতে ধরেছে— বাস, এক ফুঁয়ে সাবা। ফুঁ দিয়ে দিলে উবে যায় সব। জ্বর হয়েছে বা ফিট হয়ে যাচ্ছে— ডাক চকরাকে। কি সব মন্ত্র পড়ে কে জানে, কয় গাছা দুব্বোঘাস নিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝেড়ে দিলে বাস, জ্বর নেমে যায়, ফিট থেমে যায়।

একটি পয়সাও নেয় না কারো কাছ থেকে। বলে, গুরুর আজ্ঞা নেই। পয়সা নিলে গুণ থাকবে না গুণীর। লোকে গিয়ে নিজের থেকে চুপি চুপি ওর বউয়ের কাছে দিয়ে আসে। সে জানতে পারে না। বলে একমাত্র দাতা 'সে' যেমন হোক সুখে দুঃখে চালিয়ে নিচ্ছেন।

"হাঁ হাঁ, যাচ্ছি রে চক্র যাচ্ছি। শুকুরা এইখানে আছে, খেতে বসেছে— পানতা। বসে পড় ওইখানে বারান্দায় একটু।" ঘরের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল বালুঙ্গা।

মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে এসে শুকুরা দেখল চকরা বসে আছে বারান্দায়। শুকুরাকে দেখে হাত মাথায় ঠেকাল। শুকুরাও দু হাত জুড়ে নমস্কার করল।

"কোথায় হারিয়ে গেছলে শুকুরাদা এদ্দিন?" বলল চকরা। "আরে, মরতে যে হবে এইখানে।"

"তোর খবর কি রে চকরা?"— জিজ্ঞেস করল শুকুরা, "তোর ছেলেপুলে কটি? কত বড় হল? তুই ঘরসংসার করলি তা হলে?"

"করলাম যে সেও রইল না। দু ছেলে, একটি মেয়ে, দাদা। মেয়েটাকে জন্ম দিয়ে নটের মা চোখ বুজল চিরদিনের জন্যে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে পারিনি। সে চলে গেল। ডাক্তারখানায় নে চল, ডাক্তারখানায় নে চল বলে আতুর হচ্ছিল। নিতে পারলাম না। অভিমানে মুখ ফুলিয়ে সেই যে শুয়ে পড়ল আর উঠল না। ডাকলে আর কি শোনে!" চোখ ছল ছল করে এল চকরার। "আমার জেবনকে ধিক! টাকা কুড়িটা হলে হয়ে যেত। সেটুকু পেলেম না। এত লোকের কাছে ধার ছিল যে কাউকে আর ধার চাইতে সাহস হল না, লজ্জা করল। যারও কাছে চাইলাম বেহায়া মুখে শেষবেলায়, সে মুখ ফিরিয়ে রইল। কি আর করতাম?"

এবার চকরার চোখে জল। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে থাকে — "মা-হারা বাচ্চাগুলো করবে কি? আমিই মা, আমিই বাপ। কাজকর্ম করে। সংসার দেখে। পড়াশুনাও করে। সরকারের বৃত্তি পেত ছেলে— ওই পুরিয়া পুরুষোত্তম। ... বৃত্তি দেয় সরকার থেকে হরিজন ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়, সেলেট, বই সব দেয়।"

"হরিজনদের জন্যে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে আমাদের সরকার।" মণি বললে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সুবিধা করেছে। নেমকহারাম হতে চাই না বাবু। সরকার দেয় বটে— আমাদের হাতে আসে কতটুকু? ফুটো কলসি, বুঝলে বাবু? ছাড় সে-কথা। এখন তোমার কথা বল ত! তোমার ত ঘরদোর কিছু নেই। ভাগু মহান্তি কি আর কিছু রেখেছে? সেই বছর ডিক্রি জারি করে কোরক আর নিলাম করাল। ওই বছরেই ঘর ভেঙে সমান করে দিল। লাঙল চালিয়ে তিল বুনে দিল। কি রোষ! রতিদিদি ওর কথায় রাজি হল না বলে যত রাগ। ভেবেছিল 'রতিনানী' ওর রাখেল হয়ে থাকবে।"

দাঁতে দাঁত ঘষল চকরা। যেন খুন মাথায় উঠেছে। শুধু চকরা কেন, মণিও। মণিয়ার বুকের ভিতর থেকে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে এল। শুকুরা গুম মেরে রইল।

শুকনো কাঠের চেলা একটা শুকুরা। আগুন নেই। আগুন জ্বলছে না। বাইরে দেখা যাচ্ছে না। হু হু করে জ্বললে বা কেউ দেখত। গনগনও করছে না। কিন্তু ভিতরে খালি ধিকি ধিকি করছে। জ্বলছে হয়তো কোথাও। দিনেরবেলায় দেখা যাচ্ছে না। আলোতে দেখা যায় না। দেখা যায় আঁধারে।

"শুকুরাবাবু থাকবেন কোথায় মণিবাবু? আজকের মতো কোথাও মাথা গুঁজে থাক। কাল রাত না পোয়াতে আমি লেগে পড়ব। কালই একটা ঝাটিমাটির কুঁড়েঘর না দাঁড় করাতে পারি ত আমার নাম চকরা নয়। তুমি যাও ত শুকুরাদা, আগে রতিদিদিকে নিয়ে এসো রাউত বাড়ি থেকে। না, না, এখন নয়। আমি আগে ঘর বানিয়ে দি, তারপর গিয়ে নিয়ে এসো।"

চকরার এই বড়াই শুনে মণিয়া বলল, "ঘর তৈরি করে যে দিবি বলছিস, জানিস কত কাঠ-খড় পোড়াতে হবে? এটা খেলাঘর না।"

"কেন হবে না? পয়সা থাকলে সব হবে। শুকুরাবাবু কলকেতিয়া। তাঁর কি তোমার আমার মত এতই খ্যামতার অভাব? কোমরে জোর না থাকলে কেউ ঘর করবে বলে কি কলকাতা হতে দৌড়ে আসে? না কি বল না শুকুরাবাবু।"

"তোরও চোখ পড়েছে ওর পয়সার দিকে? সেরেছে।" বলে ফেলেই মণিয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে কথাটা ঘুরিয়ে বলে, "আরে চকরাদা, আমি কি বলতে চাই বুঝলি না। শুধু কি পয়সাতে সবকিছু সবসময় হয়? ঘরের জন্যে ত আগে ঘরতলি চাই! ভাগু মহান্তি কি ওর ভিটে আর খালাস করে দেবে? না হলে নতুন এক টুকরো বসতজমি কেনা কি সোজা কথা? এ সব ভেবেচিন্তে বলা চাই। খালি বড় বড় কথায় কি ঘর আপনি তৈরি হয়ে যাবে?"

"তা ঠিক।" চকরা এবার নরম হল। শুকুরা চুপ। কোনো কথা বলছে না।

বালুঙ্গা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ বীর দর্পে ফণাতোলা সাপের ফোঁস করার মতো বলে উঠল— "আজকাল কে বাড়ি করবে অ্যাঁ? কোনার্কের চূড়া তুলবে কে? কার খ্যামতায় কুলোবে? পাপের ধন না থাকলে বাড়ি তুলবে এমন ছেলে কে আছে দেখাও দেখি? এ যুগে পাকা কুঠি দাঁড় করানো সোজা আটচালা একখানা তোলা কষ্টের ব্যাপার। পাপের ধন চালায় রাখা যায় না রে চক্র, ওটা ঢোকে পাকাবাড়িতে, দোতলা, তিনতলা, নতলা প্রাসাদে।

বুঝলি? সুবর্ণপুরী লঙ্কা তৈরি হয়েছিল এই পাপের ধনে। কুবেরের মতো ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে লঙ্কায় রাজা হল রাবণ। কিন্তু হল কি?''

''সব গেল— হনুমান লেজে পাক দিয়ে ..'' বলল চকরা।

''একটা কথার মত কথা বলেছিস বটে। সাবাস। হনুমানের লেজে কেবল আগুন লাগার অপেক্ষা। দাঁড়া, দাঁড়া, আর বেশিদিন না। অহল্যা ভুঁইকে উদ্ধার করতে জনক-রাজা চষা খেতের নালী থেকে যে লক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণীকে এনে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁকে সুবর্ণপুরীর রাবণ পাতার কুঁড়েঘর থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। হনুমান সন্ধান চালিয়েছে। আর দেরি নেই।

হইবে বহু দ্বন্দ্ব জাত। হইবে নিগূঢ় সংঘাত॥
লাগিবে ঘরে ঘরে কলি। অস্থির মতি যে সকলি॥
কেহ রহিবে নাহি সুখে। পড়িবে বহু দ্বন্দ্ব দুঃখে॥
দমন চলিবেক পুনঃ। বচন মোর সবে শুন॥

''কেবল দমন চলেছে।'' বড়লোকদের দমন। পয়সার দমন। গাঁয়ের ওপর শহরের দমন। গরিবের পরে বড়লোকের দমন। মুখ্খুর ওপরে শিক্ষিতের দমন। সরলের ওপর চালাকের, সত্যির ওপর মিথ্যের দমন। এই সব হচ্ছে কি না? শহরে যে বাড়ির ওপর বাড়ি উঠছে, সে কার পয়সায়? এরা কখনো ধন তৈরি করেছে? ধন সৃষ্টি করছি আমরা, এই গাঁয়ের ধুলোমাখা চাষী মজুর যাদের এই বসে খাওয়া শহরের লোক ছাগল-কুকুর বলে মনে করে— সেই তুমি, আমি। আর পয়দা করে এই গাঁ থেকে যারা সব টাকা-পয়সা রোজগারের আশায় শহরে যায়, গিয়ে শহরের ফাঁদে পা দেয়— এই শুকুরার মতো একদল বোকা কারখানার কুলিগিরি করতে যায় যারা। এরা কাঁচা ডাইনির কুটো। ডাইনি কুটো লাগিয়ে রক্ত শুষে নেয়। কুটো না হলে সে রক্ত টানতে পারে না।... কলিকাল রে চক্র, কলিকাল।''

চকরা বলল,''না বালুদাদা, এরা কুড়ুলের হাতল। কাঠকেই কাটে।''

''যা বলেছিস।'' বালুদা সঙ্গে সঙ্গে খেই ধরে ''কলিকালই বটেরে চকরা।

''সত্যের অন্তে তপ গেল। শউক ত্রেতাতে হরিল॥
দ্বাপর গেল দয়া সঙ্গে। সত্য রহিল কলিযুগে॥
তপেরে গর্ব কৈল নাশ। শৌচে হরিল বিষয়াশ॥
দয়া হরিল মদ বলে। সত্য রহিল এ মন্ডলে॥

''তখন সত্য যদি চলে যেত, তবে কলি কি আর থাকতে পারত সংসারে? ধর্মের তিনপাদ গিয়ে এই সত্যটি বাকি ছিল। তাকেও কলি পিটতে শুরু করল। পা ভেঙে দেবে এই মতলব। পড়ল পরীক্ষিতের সামনে। রাজা পরীক্ষিৎ। ধর্ম-বৃষভকে কলি রাজপুত্রের বেশে মারছে। লাগালেন ধনুকে তীর, অত্যাচারীকে শেষ করে দেবেন। কিন্তু কলি ভারি চালাক। অমনি শরণে গেল। দয়ালু রাজা যদি শরণাগতকে দয়া না করতেন, আমরা কি

আজ এভাবে ভুগতাম? কলিকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন তাঁর রাজ্য থেকে। মানে আমাদের এই ভারত-ভুঁই থেকে। সে আর যেখানে হোক থাকত। কিন্তু পায়ের নীচে পড়ে ভিক্ষে চাইল সে। 'আমাকে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই দাও।' পরীক্ষিৎ বললেন, 'আচ্ছা যাও, তুমি এই চার স্থানে থাকবে, অন্য কোথাও গেলে তোমার মুণ্ডু ফেটে যাবে। দ্যূত-বা পাশা খেলা, পরস্ত্রীগমন, হিংসা আর মদ্যপান।' ওইটুকুতে কি কলি তুষ্ট হল নাকি বাপ! বলল, আমায় আর একটু জায়গা দাও। অতি দয়ালু হয়ে নাশ করে দিলেন সংসারটাকে রাজা পরীক্ষিৎ। আরো পাঁচটি থান দিলেন। যেখানে মিথ্যা, যেখানে মনের অহঙ্কার দম্ভ, যেখানে কামনা, যেখানে রজোগুণ মানে হিংসা, রাগ, পরের ভালো দেখতে না পারা এসব থাকবে আর ওই যে কি বলে যেখানে বৈরভাব থাকবে সেখানেও কলি থাকতে পারবে। এ পাঁচালী ছাড়া আর একটা বড় জায়গাও দিয়েছিলেন। যেখানে এগুলো সব শিরা-প্রশিরার মতো গিয়ে মিশেছে সেই জায়গা। সেটা একেবারে পুরো দিয়ে দিলেন। আর অন্যগুলো সব দিলে বা না দিলে কিছু যেত আসত না। কিন্তু সেই একটা জিনিস যার পিছনে এরা সব যে কোনোমতে নিয়ে ঢুকে পড়ে। জান সেটা কি চিজ?"

সকলে মাথা নাড়ল।

বালুঙ্গা বলল— "সুবর্ণ, সুবর্ণ! মানে অর্থ। সব অনর্থের মূল। অর্থের পেছনে ধাওয়া করলে ওই যে চারটি স্থান পরীক্ষিৎ দিলেন কলিকে সেখানে পৌঁছে যাবে। মানে, বাজি রেখে পাশাখেলা, তিন পত্তির তাস খেলা, মদ খাওয়া, পরস্ত্রীর দিকে নজর দেওয়া আর হিংসা করা— যত সর্বনাশ। যে-কেউ ধন অর্জন করে এইসব ব্যাপারে মন দেবে সে ধন তো ওড়াবেই, তার সঙ্গে আর যে পাঁচটি জায়গা পরীক্ষিৎ দিলেন কলিকে সেখানে গিয়ে ঠেকবে। কোথায়? না— একে মিথ্যা, হামবড়া ভাব; দুইয়ে লোভ মানে যত পেলে তাতে পেট পুরল না। আরো চাই এমনি চলবে যার শেষ নেই; তিনে এল রজোগুণ। মানে সত্ত্বগুণ লোপ পেল। দম্ভ, দর্প, অভিমান, দুরাচার, ভ্রষ্টাচার, ব্যভিচার, অনাচার, মদ, মাংস এমনি কত কি। তারপর গভীরে এল 'ঈরিষা'। কারো ভাল দেখতে পারে না, পরের ধন মেরে নেবার জন্যে মন খালি ছটপট করে। শেষে শত্রুতা। এবার বুঝলে অধর্ম ধনের কত কেরামতি? বলেছে —

অধর্ম পক্ষে মূঢ় প্রাণী। ধন সঞ্চয়ে গৃহে আনি ॥
পুত্র কলত্র বন্ধু ভায়ে। সঞ্চিত ধন তার খেয়ে ॥
যে যার পথে যায় বেগে। দুষ্কৃতি রহে তার সঙ্গে ॥..."

মুখের কথা শেষ হয়নি, রামবাবু এসে হাজির। হুঁশ নেই বালুঙ্গার। রামবাবু প্রতিবাদ করল— "এখন আর সঞ্চিত ধন ভাই বন্ধু খেতে পারবে না। যে ধন সঞ্চয় করবে সেটা সরকার নিয়ে নেবে। মৃত্যু-কর বসেছে বালুঙ্গাদা, বাপ মারা গেলে ছেলে মৃত্যু-কর দিলে পরে গিয়ে সম্পত্তির অধিকারী হবে, না হলে নয়।"

মনে মনে হাসেন রামবাবু। এ দেশের লোকগুলো এত বোকা! সে দেশের মতো সচেতন নয়। ভালো করলে এরা উলটো বোঝে। আত্মসচেতন না হলে গণতন্ত্র বেঁচে

থাকবে কি করে? তাই একচ্ছত্র শাসন চাই। 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' ধুয়া তুলছে কংগ্রেসওলারা। গণতন্ত্র প্রথায় কি সমাজবাদ কখনো হতে পারে? অসম্ভব, একচ্ছত্র না হলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বললেন, "মরার জন্যে কর বসে না, বাঁচার জন্যে বসে। বালুক্সা, সম্পত্তির ওপরে কর বসে, মানুষের ওপর নয়। বেঁচে থাকার সময় সম্পত্তি ভোগ করি বলে আমরা কর দিই, আবার মরে গেলে সে সম্পত্তি যে ভোগ দখল করবে সে দেবে, বুঝলে?"

"না বাবু, ম'লে ত মোটে সাড়ে তিন হাত জায়গা দরকার।"

"না, না, সেরকম নয়। সমাজবাদী সমাজে কেউ শুধু বসে থেকে ভোগ করতে পারবে না, আয় করতে পারবে না। খাটো খাও, বাপের সম্পত্তি ছেলে বিনা পরিশ্রমে কেন ভোগ করবে? সেজন্যে সে কর দেবে। এটা একরকম সম্পত্তিকে সরকারের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার মতো হল আর কি। বুঝলে?"

"কেন, কেন, বাপের অর্জিত সম্পত্তি ছেলেকে কিনতে হবে কেন?"

"ঠিক কিনবে না। কম দামে পাবে। করটা দরের চেয়ে কম, বুঝলে? ধনীদের কাছ থেকে টাকা এনে গরিবদের দেওয়ার জন্যে এই মৃত্যু-কর। এরই নাম সমাজবাদ।"

"সরকার এখানে ইন্দ্রদেবতা হয়েছেন বল। সমুদ্রের জল নিয়ে নীরস ভুঁইকে সরস করছেন। ভালো কথা, বাঃ খুব ভালো কথা। তবে ইন্দ্র যতটুকু নেয় ততটা দেয়। আকাশে ত জলের ভাণ্ডার নেই। সরকার আমাদের যতটা নেন ততটাই দেন, না কলসিতে ফুটো থাকে?"

"পুঁজিপতি সরকারের কলসিতে ফুটো থাকে। সমাজবাদী সরকারের কলসি..." কথা কেড়ে নিয়ে বলল বালুক্সা—

"নিরেট। ছেঁদা নেই। এটাই বলছ ত? ইংরেজের আমলে আমরা দু-রকম কর দিতাম। রাজস্ব আর পথ-কর।"

"চৌকিদারী ট্যাক্সোও দিতে হত।" শুকুরা মনে করিয়ে দিল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কর আর ট্যাক্সো। নুনের করও ছিল। গান্ধী মহাত্মা তুলে দিলেন। পরে নেহেরু আবার বসালেন। কর খাজনা নিচ্ছিল জমিদারেরা। তারা ত গেল। এখন নেয় হাকিম তহসিলদার। জমিদার যখন ছিলেন, তাঁর দর্শন বরং পাওয়া যেত। সবাই ত আর 'কলকেত্তিয়া' বাঙালি জমিদার ছিল না। গ্রামেও জমিদার থাকতেন। এ গাঁয়ে না হলে ওগাঁয়ে। এক ক্রোশ - দু ক্রোশ তফাতে দেখা পাওয়া যেত।... এখন কই, কে আছে আমাদের ওজর আপত্তি শুনবে?"

"কেন, সরপঞ্চ আছেন।" মণি বলল।

"সরপঞ্চ কে?" শুকুরা জিজ্ঞেস করল।

"যার দোরগোড়ায় বসেছিলি।" বলল মণিয়া। "ভাও মহান্তি?" চমকে উঠল শুকুরা। "ওই জোচ্চোরটা?"

"জোচ্চর নয়— একটা জন্তু।" মণিয়া বলল।

"জন্তু নয়, সে একটা ভূত।" বালুঙ্গা বলল— "সে ভূতটা কয়েক বছরের জন্যে একজনের ওপর চেপে বসে। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে ধরে। ভূত আর সরপঞ্চের মধ্যে তফাত এই— গুণী হলে ভূত ফাঁকা, সরপঞ্চের চাই টাকা। ভূতে ধরা সহজ, সরপঞ্চ ধরা কষ্ট। ভূত ছাড়ানো কষ্ট, সরপঞ্চ ছাড়ানো অতি সহজ। বুঝলি? তোমার কলকাতায় সরপঞ্চ নেই? নদীতে ঘর করবি তো কুমীরের সঙ্গে ভাব কর। গাঁয়ে ঘর করবি তো আগে সেই সরপঞ্চের সঙ্গে পীরিত। ভাগু মহান্তি সরপঞ্চ কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা।"

শুকুরা বলল—"আমি ত জানতাম না সরপঞ্চ বলে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা গেলাম ওর কাছে। যত টাকা আমি তার কাছে পাঠিয়েছি, সব হিসেব রেখেছি। কয়েকখানা মণি-অর্ডারের ফেরত রসিদও রেখেছি। অথচ দশটা টাকার জন্যে সে আমার ভিটেটুকু নিলেম করে নিল! বাড়িতে সে ছিল না, অনেকক্ষণ বাদে ফিরল কোনো অফিসারের গাড়িতে। আমি ডাকলাম। 'আসছি' বলে সেই যে ঘরের মধ্যে ঢুকল আর দেখা নেই।"

"তুই কি ভেবেছিস সে টাকা পেয়েছে বলে কবুল করবে আর আক্কেল সেলামী দিয়ে তোর ভিটে তোকে ফিরিয়ে দেবে? মনে মনে গুড় খাচ্চিস 'বাপধন নীলমণি' বলে ভাগু মহান্তি তোকে আদর করে ডেকে নিয়ে যাবে।" বলল বালুঙ্গা।

"কেমন করে ফিরে পাব বালুঙ্গাদা, আমায় একটু বুদ্ধি বাতলে দাও। আমার বাপ-ঠাকুরদার ভিটেখানা কি সত্যি আর ফিরে পাব না?"

"আলবাত ফিরে পাবে।" রামবাবু হাত মুঠো করে বলতে থাকেন। "আবেদন নিবেদন নয়— জবরদস্তিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। যেমন করে হোক হাসিল করতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুত হওয়া দরকার। যত সব দলিত, শোষিত, অত্যাচারিত সবাই একজোট হও। প্রতিশোধ! প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে রাখ। বিনা বিদ্রোহে, বিনা বিপ্লবে দুনিয়াতে কোনো কাজ হয়নি— হতে পারে না।"

"ওগুলো খালি কথার কথা। আমি কত বিদ্রোহ দেখলাম, কত বিপ্লব। দেখে দেখে চুল পেকে গেল। এই যে গান্ধী মহাত্মা বিপ্লব করলেন, বিদ্রোহ করলেন, কত লোক মরল, জেলে গেল, তাতে হল কি? কার দুঃখ গেল? দুঃখ গেল এই বুদ্ধিমান লোকদের যারা গাঁ ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকে গাঁকে শুষে খাওয়ার জন্যে। এরাই চিৎকার করে। বিদ্রোহ কর বলে চেল্লায়। তোমার মতো শিক্ষিত বড়লোক যত উসকিয়ে দেয় শুকুরা চকরাদের। মাথা ফাটে তাদের। তারাই মরে। মন্ত্রী হন রামবাবু। হাকিম হন রসিক পটনায়ক। না কি বলিস, মণি? রাগ কোরো না রামবাবু, রাগছ নাকি?"

"রাগ করব কেন?" রামবাবু জবাব দিলেন, "সাপকে মারলে সাপ ফোঁস করে ওঠে। না ওঠাটা অস্বাভাবিক। কিন্তু তাতে সাপে কাটা বিষ চলে যায় না। সাপকে মারার সঙ্গে সঙ্গে বিষকেও ঝেড়ে ফেলতে হবে। এ সব প্রতিক্রিয়া আমি চিনি।"

"বিষ ঝেড়ে ফেলবে? কার বিষ? সাপকে মারবে? কে সাপ? সাপ ত সব তোমরা—

যত শিক্ষিত বুদ্ধিমানের দল। আমরা, এই গাঁয়ের যত ন্যাংটা হাভাতের দল; তোমাদের দুধ দিয়ে পুষি আমরা। তোমরা আমাদের দংশন করো। আর বল যে চুমু খাচ্ছ।"

"কি করল তোমার শিক্ষিতেরা? তোমাকে পড়বার জন্যে কি কেউ মানা করছে? আমরা পড়াশোনা করলাম, আমাদের চোখ খুলে গেল। সেজন্যে তুমি ঈর্ষাতে এমন বলছ।" অভিযোগ করল রাম।

"আমাদের সে আলোর দরকার নেই রামবাবু! তোমরা সবসময় ওই আলোয় থাক। কয়েকজন আঁধারে না রইলে, কাদের ঠকাবে তোমরা? ভোলাবে কি করে?"

"কি ঠকিয়েছি তোমাদের আমরা? ঠকিয়েছে তো এই কংগ্রেসওলা, গান্ধীওলারা।"

"সবাই একই গাইয়ের গোবর হে। বললে 'ইংরেজ তাড়াও'। আমরা সামিল হলাম। বললে 'গণতন্ত্র' হবে। হল গণতন্ত্র। ওদিকে আবার বললে 'সমাজবাদ' না কি যেন। তারপর কংগ্রেস বলল গণতন্ত্রও হবে, সমাজবাদও হবে। আতপও হবে, সেদ্ধও হবে। সোনার পাথরবাটিতে আমরা খেতে পাব। সব আমাদের ভুলিয়ে উসুল করার ফন্দি। আগে কথায় বলত 'রাজা নেয় বলে, বেদে খায় ছলে'। এখন যে রাজা সে প্রথমে ভুলিয়ে ভোট নিল, তারপরে কর চাপিয়ে খাচ্ছে।"

রাম ততক্ষণে নরম হয়ে এসেছে। বলল, "বালুঙ্গাদাদা, তুমি রেগে যেও না। এসব তোমার মান্ধাতার আমলের কথা। আজকালকার ছেলেরা শুনলে হাসবে। তুমি তো রাজনীতি কি জানলে না। মারাঠার আমলে রাজনীতি ছিল— 'মারো, ধর, লুট কর'। এখন..."

কথাটা লুফে নিয়ে বালুঙ্গা বললে— "এখন হয়েছে পিঠে হাত বুলিয়ে কিলটি বসিয়ে দাও। নয়?"

"না, না, তা নয়।" রামবাবু বললে। "রাজনীতিকে একটা বিজ্ঞান বলে মানা হয়। এতে অনেক কথা আছে। অনেক জানবার কথা, সারা পৃথিবীটাকে আয়ত্ত করে রেখেছে এই রাজনীতি। তার অধ্যয়ন দরকার, নাহলে কিছু বোঝা যাবে না।"

বাড়ির ভেতরে অপর্তি পড়তে আরম্ভ করেছে বড়গলায় —'ব্যাঘ্র একটি হিংস্র জন্তু।' সন্ধ্যা কখন গড়িয়ে গেছে। এক ঝুড়ি তারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা ল্যাম্প এনে রেখে দিয়ে গেল পাকি।

"ওই শোন শোন, কি পড়ছে সে, বাঘে এসে ঘাড় ধরেছে। রামবাবু বলবে বাঘে কি মানুষ খায়? কই, কোন পুঁথিতে লেখা আছে? মানুষ খায় বলে শুধু শোনা যায়। পুঁথিতে কোথায় আছে?"

সকলে হাসল বালুঙ্গার হাসিতে তাল দিয়ে। "আরে, আগে শুকুরার মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা কর। তারপর তোমার শাস্তর দেখে বিপ্লব করতে থাক। কে মানা করছে। আসল কথা আগে।" বালুঙ্গা আবার বলল।

"ঠিক আছে। দেখা যাক।" বলে রামবাবু হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। "ওরে বাবা, ছটা বেজে গেছে! আমার আবার একটা সভা আছে। আমি আসি। পরে

দেখা হবে শুকুরা। তুই ঘর বানা। আমাদের পার্টির তরফ থেকে যা কিছু সম্ভব আলবাৎ করব। আচ্ছা, নমস্কার।"

সকলে পালটা নমস্কার করল। চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ রে শুকুরা, তুই সেখানে ফ্যাকট্রিতে কাজ করতিস না কি প্রাইভেট বাড়িতে?"

"পয়লা পয়লা বাবুদের বাড়িতে। তারপর মাটিয়াবুরুজ চটকল সুতাকলে, আরো ঢের ঢের জায়গায়।"

"মাটিয়াবুরুজ? ওহ্ মেটেব্রুজ, না? সেখানে তো আমাদের কম্রেড্রা আছে। মেম্বার হয়েছিস নিশ্চয়ই আমাদের ট্রেড ইউনিয়নে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"— শুকুরা উত্তর দিল।

"লাল সেলাম কম্রেড্— আমি আসছি— পরে দেখা হবে।"

মণিয়া তাকাল পশ্চিম আকাশের দিকে, শরতের শেষ। সূর্য ডুবে গেছে। লাল গুলাল হয়ে গেছে সেই দিকটা।

শুকুরার চমক লাগছে। রক্ত, রক্ত! মাটিয়াবুরুজের রক্ত। ইম্ফালের রক্ত। সব লাল গুলাল। খুন খারাব।

"দুখিয়াম্না কোথায়, মণিয়া?" শুকুরা জিজ্ঞেস করে।

"তার কি কিছু ঠিক থাকে? আজ এখানে, কাল ওখানে।"

"ওর কাছে একবার গেলে হত। সে উপায় বাতলে দিত।"

"তাই চল।" মণিয়া উঠল।

"আমার জিনিসপত্তর তোমার কাছে রইল বালুঙ্গাদা।"

"ওরে, তুই কত কি সোনাদানা হাতি ঘোড়া এনেছিস। কেউ যদি হাতসাফাই করে ত আমি গেছি।"

"না বালুঙ্গাদা, তেমন ধনদৌলত কিছু নেই। দুখানা কাপড়, কটা টাকা।"

"ঠিক আছে, রেখে দিয়ে যা তবে। আমি তুলে রাখছি আমার শোবার ঘরে।"

শুকুরা চলে গেল মণিয়ার সঙ্গে। ওদিক থেকে দুঃখী আসছিল রাস্তায়। আবছা অন্ধকার। খুব কাছাকাছি না হলে চেনা যায়নি।

"দুখীদা নাকি? দুখীদা, শুকুরা!" মণি চিনতে পারে দুখীকে।

"কে? শুকুরা? আমায় চিনতে পারছিস ত? আমি তোর সেই দুখিয়াম্না রে।" জড়িয়ে ধরে শুকুরাকে দুখিয়া।

শুকুরার চোখে জল।

"ছি শুকুরা, কাঁদছিস? কেন, তোর কি হয়েছে যে তুই কাঁদছিস? ঘরদোর করবি। রজনীর কোলে আবার বাইয়া হেসে উঠবে। আমি দেখব এই চোখে।"

"আমায় আশীর্বাদ কর দাঠাকুর, আমি বড় অভাগা।"

''ভাবিস কেন? তুই চল এখন। আমার ঘরে থাকবি। আমি সব শুনেছি। তোর জিনিসপত্তর?''

''বালুস্নাদার কাছে জিম্মা দিয়ে এসেছি।''

''যা, গিয়ে নিয়ে আয়। আমি যাই, তোর থাকার বন্দোবস্ত করি গিয়ে।''

মণি আর শুকুরা ফিরে এল বালুস্নার বাড়ি। শুকুরার ভিতরটা যেন কতদিন থেকে শুকিয়ে ছিল। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ছেড়ে যাওয়ার মতো লাগল। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অনেকটা।

চোখের সামনে নেচে গেল শুকুরার কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার গাঁ-টা। কত লোক ছিল। কে কোথায় মরে হেজে নতুন জন্ম নিয়েছে। বেঁচে আছে একা এই দুখিয়াদা। এতবড় বুকখানা। খুব চওড়া। অনেকখানি জায়গা। আর কাউকে চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু তার দুখিয়াদাকে সে ঠিক চিনতে পারল। অন্ধকারেও। যেমন ছিল তেমনি। মনটাও তেমনি আছে। রূপ যৌবন সব অজর অমর নাকি? কেউ বলবে না চালশে ধরেছে বলে।

নিরালাতে বললে মণিকে — ''দেখলে মণি, আমায় কেমন জড়িয়ে ধরল দুখিয়াদা। কোন হিসেবে ওর সমান আমি! এ কি মানুষ? এমন মানুষও হয়?''

ককিয়ে উঠল শুকুরা। বলল— ''আমাকে ওর ঘরে ঠাঁই দেবে। কথা নেই, বার্তা নেই, সব জানার মতো আমার দুঃখ বুঝে বলে ফেলল 'আচ্ছা চল আমার বাড়িতে থাকবি।' দেবতারা স্বর্গে থাকে না মাটিতে মণি?''

''দেবতা সব এই মর্তেতেই থাকে, তবে পুজো পায় না— কলিযুগ যে!''

চুপ করে রইল শুকুরা। কি সব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে বলে উঠল— ''দুখিয়াদা কেন একটা মন্ত্রী হল না মণি? বঙ্গদেশে কত খদ্দরপরা গান্ধীওলা সব মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি হয়ে গেল। দুখিয়াদার নখের যুগ্যি না তারা।''

''দুখিয়াদা কি গান্ধীওলা যে মন্ত্রী হবে?''

''কেন? দুখিয়াদা গান্ধীওলা নয় ত কে গান্ধীওলা আছে শুনি?''

''আজকালকার গান্ধীওলারা আলাদা। দুখিয়াদা ওদের সঙ্গে নেই।''

''দুখিয়াদা কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে নাকি?'' জিজ্ঞেস করল শুকুরা চোখ দুটো বড় বড় করে।

''উ হুঁ!'' মণি উত্তর দিল।

''পি এস পি?''

''না।''

''জনসংঘ?''

''না।''

''তবে কোন দলে যে?''

''কোনো দলের নয়। একচরা মোষ।''

"তবে করে কী? ও ত খালি বসে থাকার মানুষ নয়।"

"কি করে শুনবি? শুনতে হবে না। আপনি দেখতে পাবি চল।"

বড় বারান্দা। মাটির ঘর। দরকার হলে পাঁচ পঁচিশ শুতে পারে দাওয়ায়। বেড়া বেঁধে দিয়েছে দুঃখী। নিজের হাতে। বারান্দার একপাশে। সেখানে শুকুরার থাকার জায়গা। দড়ির খাটিয়া একটা হেলান দিয়ে রাখা। শুকুরার জন্যে।

সেই বাড়িই আছে। কিছু পালটায়নি। শুধু এই বারান্দাটা একটু বাড়িয়ে নিয়েছে দুখিয়াদা। চওড়া করেছে। নিমগাছটা ঈশান কোণে আজও ঝাঁকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে ওই বেলগাছটা ছিল না? আহ্, কি ফসল করেছে দুখিয়াদা! শুকুরার বুক ভরে গেল দুঃখীর বাগানের দিকে তাকিয়ে।

"মন্টি, আজ এখানে একমুঠো হোক। শুকুরা এসেছে। গল্প করা যাবে।" বলল দুঃখী।

মাদুর পেতে দিল দুঃখী। সবাই বসল।

কি সুন্দর গল্প। রূপকথার মতো। শুকুরার জীবনকাহিনী। কাহিনী নয়। গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের ইতিহাস। ভারত ইতিহাস নয়। ওড়িশা ইতিহাস নয়। একটা মানুষের জীবনের ইতিহাস। পঁচিশ বছরের জীবনী— একটা পুরুষের অলেখা ইতিহাস, অদেখা ইতিহাস। মনে না রাখতে পারার ইতিহাস। মনে না পড়ার ইতিহাস। মনে না আনারও। কেউ পড়ে না। কেউ শোনে না। কেউ লেখেও না। লিখলে তবে তো পড়ত বা শুনত কেউ! পাছে কেউ পড়ে বা শোনে তাই কেউ লেখে না। এ ইতিহাস পড়লে পাছে মানুষ মানুষকে চিনে ফেলে তাই কেউ লেখে না। মানুষ মানুষকে চিনে ফেললে যদি কখনো কেউ চলন্ত গাড়ির চাকায় হাত দিয়ে ফেলে, যদি গাড়িটা চাকার সাবেক মাড়িয়ে চলা খাঁজের বাইরে সরে গিয়ে অন্যদিকে বেরিয়ে যায়। মানুষের ইতিহাসকে মানুষ ভয় পায়।

মানুষ পড়ে অমানুষের ইতিহাস। চোর ডাকাতের ইতিহাস। মানুষ হয়ে যারা এই শুকুরার মতো জন্ম নেয় এ মাটিতে, আসে এ সংসারে, বাঁচে, চলাফেরা করে, ঘুরে বেড়ায় এর বাটে ঘাটে, এ দেশের ইতিহাসে তাদের জীবনের একটা লাইনও টানা হয় না। আঁক কষা হয় না।

শুকুরাদের জীবনী এক একটা চলন্ত জীবনী— জ্যান্ত জীবনী— জ্বলন্ত ইতিহাস। সেটা পড়ার ধৈর্য আছে কটা লোকের? মমতা আছে কটা বুকে যে ঘেঁসবে তার কাছে? তার আঁচ সইবে?

বালুঙ্গাও এসে যোগ দিল ওই আড্ডায়। এসে বলল, "ওগো দুখীবাবু শুনেছ? পঞ্চায়েত ট্যাক্সো, গ্রেনগোলার টাকা, সোসাইটির মূলধন সব মেরে দিয়ে বসে আছে। ওই যে দেখ না, কেমন চালে চলেছে দেখ চেয়ে। সামনে দুটো, পেছনে দুটো-চারটে লোক না নিয়ে বাইরে বেরোন না কর্তামশাই। কর্তা নয়— সায়েব, সাহাব।

"কে গো, কে?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"কে আর? ওই ভাগু মহান্তি, সরপঞ্চ। কোরক পরোয়ানা এসেছিল। সরকারী টাকার। ওর চুলকে বেঁকা করতে পারল কই?"

"কি কোরক করল?"

"কোরক যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল। হবে আবার কি? বুঝতে পারছ না?"

"ট্যাঁক গোঁজা দিয়ে পার হয়ে গেল?"

"ট্যাঁক গোঁজা? সেটা আবার কি? আজকাল কি আর ট্যাঁক গোঁজা আছে? ওর নাম পকেট গরম। খোলাখুলি দেওয়া নেওয়া দিন দুপুরে— কারো মুখে কথা নেই। সকলের মুখ যেন কেউ সেলাই করে দিয়েছে।"

"কি বলছ? এ গাঁয়ের লোক সব কি মরে গেছে নাকি?"

"মরে গেছে মানে? কবে বেঁচে ছিল বল? আমি ত সারা জীবন দেখে আসছি। ইংরেজরা যখন ছিল, তবুও যা হোক চাবুক খেয়ে, বেতের ঘা খেয়ে জাগছিল। এখন ত অঘোর ঘুমে। যে শাসন করে, যে রাজা হয়ে রাজত্ব করে,— সে রাজা হোক বা মন্ত্রী হোক — সে যদি ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে, তার কি?"

বালুঙ্গার কথা শুনে তেতে উঠল দুখিয়া। "কি বলছ বালুঙ্গাদা! আমরা এমন অন্যায়, পাপ সব চুপ করে সয়ে যাব?"

"সইব না ত করব কি? আর কি বয়েস আছে — জেল যাবার— লাঠি খাবার?"

"এ গাঁয়ের ছেলেছোকরার দল সব গেল কোথায়? ডাকো সবাইকে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করব।"

"আর প্রতিবাদ! ছোকরারা করবে প্রতিবাদ?" হাসল বালুঙ্গা। "মরদরা কি আর মরদ হয়ে আছে? সকলের কোমর ভেঙে গেছে। পয়সার পাহাড় ভেঙে পড়েছে তাদের ওপরে। সরকারের টাকায় যুবক সংঘ গড়া হয়েছে। সপ্তাঘরে বসেছে ক্লাব। সেখানে চলে তাস, পাশা, সতরঞ্চ, গাঁজা। কলিকাল, কলিকাল! ঘোর কলি। পরীক্ষিৎ মহারাজ কি করলেন দেখ। এক চোটে যদি সাবাড় করে দিতেন! রাজা দোষীকে দয়া দেখালে যা হয় তাই হল। কলি গিয়ে রইল সুবর্ণের কাছে। রাজা থাকতে দিলেন।"

"কি হল, কি হল?" ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মণিয়া - শুকুরা একসঙ্গে। "বিনা মেহনতে পয়সা আসবে কি করে?" জিজ্ঞেস করল মণি বালুঙ্গার কথা শুনে।

"পয়সা কোথা থেকে আসবে? আসছে কোথা থেকে? সব সেই দিচ্ছে— সে...ই।"

"কে — কে?"

"চেনো না? যুজিয়াম্না! যুজিয়াম্না!"

"যুজিয়াম্না?" সবাই হেসে উঠল।

"আরে, তোমরা যুজিয়াম্নাকে চেনো না? হাসছ? ওর নাম তাই। সবাই সেই নামে ডাকে। ওর ভালো নাম দুর্যোধন। দুর্যোধন হল পন্নগ— নারায়ণ। শঙ্খনিধি পদ্মনিধি ওর

কাঁধে। যা ছুঁয়ে দেবে সোনা হয়ে যাবে। রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের। ভারি চালাক শ্রীকৃষ্ণ। বললেন দুর্যোধনকে ভাঁড়ারের জিম্মায় রাখো। রেখে দিলেন। ওদিকে দুর্যোধন মহা খুশি। মনের ইচ্ছেতে খরচ করে। খোলা হাত। ভাবল, পাণ্ডবদের ধন উজাড় করে দেবে। সে যত দেয়, ততই পূরণ হয়ে যায় ভাঁড়ার। দুর্যোধনের হাত ঠেকলে মাটি হয়ে যায় সোনা। পাণ্ডবদের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তেমনি আমাদের সরকার। যুজিয়াদ্মাকে ডেকে এনেছে। যত ইচ্ছে তত নাও। সরকারের তবিল ফুরোয় না, যুজিয়াদার দেওয়াও শেষ হয় না।"

সকলে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। বালুঙ্গার এই ধরনের কথা শুনতে ভারি ভালো লাগে। কথা। কথা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে শেষ করে কেউ ঠাওরাতে পারে না। সবাই আশঙ্কায় থাকে দেখবার জন্যে চালের মাত হবে কোথায় গিয়ে।

বালুঙ্গা বলতে থাকে, "আজকাল যুজিয়াদাকে দেখতে পাও না? গাঁয়ে কেল্লাব ঘর, যুবক সংঘ। সেখানে চলে জুয়া, তাস, পাশা; তারপরে আছে মহিলা সমিতি! মানে কামিনী। আর মদ। ওটার ত ঘরে ঘরে আমদানী। গান্ধীজীর কুটির শিল্প। বাকি রইল প্রাণী হিংসা। কত দেখবে মাছের চাষ, মুর্গীর চাষ, ছাগলের চাষ, ভেড়ার চাষ। এর থেকে ফলবে কি জান? সোনা-সুবর্ণ। সবগুলো কলির আগল, বুঝলে?"

"ওহ্— যোজনার কথা বলছ?" দুঃখী বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যোজনা— যোজনা। যুজিয়াদ্মা সেই। আমি তাকেই বলি যুজিয়াদ্মা— যুজিয়াদা-দুর্যোধন।" উত্তর দিল বালুঙ্গা। সবাই হেসে উঠল।

"বালুঙ্গাদা, যদি খারাপ না ভাবো ত একটা কথা বলি।" বললে মণিয়া।

"ভাবব কি রে? ভাববার আছে কি? দেশ স্বাধীন হল কি জন্যে? আমরা যদি ভাবব ত এ স্বাধীনতার কীমত দুগণ্ডা দুকড়া। আমাদের জন্যে ভাববে সরকার। আমরা কেন ভাবতে যাব রে?"

"তুমি সব কথা বাঁকা করে দেখ।" বলল মণিয়া। যোজনা কি খারাপ? আমরা তাকে ঠিক রাস্তায় নিতে পারছি না বলে যত অনর্থ। এই যে লোকসংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে, যোজনা বলছে বেশি ফসল কর। যে যত চাও টাকা নাও। বেশি ফসল ফলাও। তোমরা সে টাকা নিয়ে বিয়ে শাদিতে খরচ করলে। সেটা কি যোজনার দোষ? যোজনা ত মানুষ নয়— আগের থেকে কল্পনা করা, জমা-খরচের অনুমান করা হিসেব— কাগজে কলমে।"

"হ্যা, হা, হা— কলমে। কলমীলতা কলমীলতা, জল শুকালে থাকবি কোথা!" বলতে বলতে উঠে পড়ল বালুঙ্গা। মুখে একগাল হাসি। বললে, "চললাম গো দুখিয়াদ্মা, চলি রে শুকুরা - মণিয়া। আমার কথা গায়ে মেখো না। আমার মুখটা ওমনি। পেটে কিছু থাকে না। যা দেখি তাই বলে ফেলি। কিছু মনে কোরো না। এগুলো সব জলের দাগ বলে ভেবো। আচ্ছা আসি, পেন্নাম দুখিয়াদা" বলে বালুঙ্গা উঠল।

বালুঙ্গা চলে গেল। তার কথার একটা কাঁপন, গাছপাতা বাড়িঘর যেন নাড়া দিয়ে গেল। সবাই তাকিয়ে থাকে তার পথের দিকে। চুপচাপ।

দশ কদম গিয়ে বালুঙ্গা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, "দুখিয়াদা, শুকুরাকে কদ্দিন আর বাড়িতে

রাখবে? তার জন্যে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দাও। মাথা গোঁজার জায়গা একটা হলেই হল। না কিরে শুকরা? রতনী আর সে। দুটো প্রাণী ত। চলে যাবে। আচ্ছা, যাচ্ছি। শিগগির রতনীকে গিয়ে নিয়ে আয় রে শুকরা।"

রতনী! রতনী!! ঘরদোর চারদিকে যেন ছাপ মারা হয়েছে— রতনী · রতনী, ডেঁপো ছেলেরা রাস্তায় ঠাট্টা করে শুকরাকে দেখলে— 'কোন শুকরা? রতনীর শুকরা?'... 'নীলা রাউতের বেটা-- শুকরা পথের কাঁটা'।...'কান্দিলে কি হবে করীন্দ্র-গমনা নীলো কি সহজে ছাড়িবে'। এমনি কত কি।

শুকরা সব শোনে। উঁ-চুঁ করে না, কিছু বলে না। ভাবতে থাকে মনে মনে। নীলমণি রতনীকে রেখেছে। সবাই বলে সে-কথা। ওর বুকের ভিতর থেকে কেমন একটা কাঁপুনি বেরিয়ে আসে। শরীরে নাড়া দিয়ে যায়। তাকে মানে রতনীকে কবে যেন নীল কলকাতা নিয়ে গিয়েছিল। কই, সে তো কখনো দেখতে পায়নি রতনীকে কলকাতায়। নীলের তো বিয়ে করা বউ আছে, একগাদা ছেলেপিলে। প্রতি বছর একটা করে নতুন বাচ্চা। তবুও...?

অভ্যাসের দোষ। কি করবে? যার পয়সা আছে, বালুঙ্গাদা যেমন বলে, কলি একেবারে তারেই কাছে। পয়সা থেকে, ধন থেকে, সোনা থেকে আসে মদ, মাংস, মেয়েমানুষ, জুয়া সব। সব নেশা। নেশা ধরে যায়। না হলে চলে না। গত হলেও অকুলান।

পয়সা কোমরে গুঁজে রাখলেও ফুটে বেরোয়। ট্যাকে আগুন গোঁজার মতো। তার আবার ডানা আছে। সে ওড়ে। যার কাছে পয়সা থাকে সে তাকে না উড়িয়ে থাকতে পারে না— ভাল লাগে না। জমিয়ে রাখতে চায় যারা তাদের কথা আলাদা, নীলমণি রাউতের পয়সা আছে। ওড়াবে না কেন?

ভাবতে থাকে শুকরা। তাকিয়ে থাকে বালুঙ্গার দিকে। বালুঙ্গা চলে গেল। মুখ খুলল না তো, মনটাকে খুলে দিয়ে গেল। শুকরা আর মন খুলে বলতে পারবে না। একদিন পারত। তখন সে মন খুলে হাসতে পারত। আজ যেন কেউ কেড়ে নিয়েছে ওর মনখোলা হাসি, মনখোলা কথা।

"শুকরা আর একটা বিয়ে করে ফেলুক।" বলল মণিয়া, "না কি বল দুখীদা?"

শুকরা হাসে। মণিয়ার কথায়। কথাটা হালকা মনে হল তার। এত হালকা যে একটুখানি হাসিতে সেটা কোথায় উড়ে গেল। বয়েস হল এসে দু-কুড়ি চার কি পাঁচ। এ বয়েসে আবার বিয়ে?

"না বাপু, আমি ওসব ভাবছি না।" মুখে বলল শুকরা। "রতনী রাজি হয় ত তাকে নিয়েই ঘর করব নাই বা কেন? একটা অজানা অচেনা বাইরের মেয়েছেলে আনলে কোন সুখটা উথলে উঠবে এত?"

"সে ত পরের কথা।" বলল দুঃখী দাশ। "পরের কথা পরে। গোড়ার কথা আগে। প্রথমে আমায় বল দেখি, কলকাতায় কিছু কাজ-টাজ হাতে আছে তোর? এখানে ঘর বানিয়ে আবার তুই কলকাতা যাবি না এখানে মজুরী খেটে পেট পুরবি?"

শুকরার মুখে কথা বেরোয় না। "কি রে শুকরাদা, ব্যাপার কি? কিছু বলছিস না যে?" মণিয়া জিজ্ঞেস করে।

নিঃশ্বাস একটা ছাড়ল শুকুরা— "সে অনেক কথা। চাকরি একটা ছিল। আর নেই। তবে কাজ পাওয়া যাবে। শুকুরার কাজ মিলবে না কলকাতায়? কলকাতা ত যেতেই হবে। না গেলে এখানে খেতে দেবে কে? জমি নেই, জায়গা নেই, ঘর নেই, দোর নেই — চলবে কি করে কলকাতা না গেলে? চাকরি না করলে?"

"উকিলের সঙ্গে পরামর্শ কর ত মণি, শুকুরা ওর ভিটে ফিরে পেতে পারে কি না।" বলল দুঃখী দাশ।

"না, উকিল-টুকিলের কাছে আমি যেতে পারব না," বলে উঠল শুকুরা,— "আমার পয়সা কোথায়?"

"পয়সা আমরা চাঁদা করে দেব। সে-কথা ভাববার দরকার নেই।" বলল মণিয়া।

"আইন-আদালতের রাস্তা বাপু আমার জন্যে নয়। মামলা-মোকদ্দমা করতে পারব না। অন্য যদি কিছু রাস্তা থাকে — আমায় দেখতে হবে।" শুকুরা বলল।

"অন্য রাস্তা আবার কি? পাঁচজনের কাছে নালিশ আর বিচারের কথা বলছ?" মণিয়া জানতে চায়।

"না, না— ন্যায় নালিশ সালিশ— ওসব রাস্তা আমার নয়। সংসারে ন্যায় আছে? ন্যায় দেবে কে? যে বিচার করবে সে ত নিজে দোষী। সে আবার কি ন্যায়-বিচার করবে?"

"তবে আর কোনো রাস্তা আমার ত কই দেখা যাচ্ছে না।"

"আছে। রাস্তা আছে। সোজা রাস্তা। তার নাম ঠ্যাঙানি।"

দুঃখী চমকে ওঠে। শুকুরা এ কি বলছে? তার মধ্যে এক নতুন রূপ দেখতে পায় সে। কিম্ভূত-কিমাকার। অর্ধেক পশু, অর্ধেক মানুষ। নৃসিংহ অবতার। চোখের তারা বেরিয়ে এসেছে, দাঁতকপাটি লেগে গেছে।

"ছি শুকুরা, ও সব বোম্বেটে বুদ্ধি ছাড়। দেখা যাক যদি ভালোয় ভালোয়..."

"ভালোয় ভালোয়!" দুঃখীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে শুকুরা বলে— "ভালোয় ভালোয় কথা মিটিয়ে ফেলার মানুষ ভাইগি মহান্তি নয়। সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে কখনো? আমার হকের ভিটে। আমি ধর্মের ডাক দেব। 'সুদে-আসলে তোর যা কিছু গুণে নে। আমার ভিটে আমায় ফিরিয়ে দে।' নাহলে তোর মাথা, আমার লাঠি। এক লাঠির বাড়িতে মামলা খতম।"

"শুকুরা!" ডেকে উঠল মণি। ভয় পেয়েছে শুকুরার দিকে তাকিয়ে। সত্যি বুঝি উঠে যাবে এক্ষুনি। গিয়ে বসিয়ে দেবে এক লাঠির বাড়ি ভাইগি মহান্তির মাথার মাঝখান লক্ষ্য করে। ফটাস!— সব শেষ। ইস! রক্ত যেন পিচকারী দিয়ে বেরুচ্ছে। তারপর—

তারপর পুলিস। তারপরে অ্যারেস্ট। তারপরে জেলখানা। শুকুরা আবার পরবাসী— পরদেশী!

"মণিয়া ভয় পাচ্ছে দুখীদা। আমার কিসের ভয়? কে আছে আমার যে আমি এত ভয় করব? কায়া ত গেছে। মায়া তবে কিসের জন্যে? ধর্ম কি নেই? ধর্ম কি ছেড়ে পালিয়েছে?" কেঁদে ফেলল শুকুরা।

দুঃখী দাশ বলে, "ছি শুকুরা! তুই বেটাছেলে হয়ে কাঁদছিস? যে অন্যায়ের বিরোধ করে সে কাঁদতে ভুলে যায়। ভুলে থাকতে হয়। আপনি সে ভুলে যাবে কান্না।"

মণিয়া বলে— "আমি আগে একটা কথা জানতে চাই। হ্যাঁ রে শুকুরা, তুই কার জন্যে ঘর করবি তবে? রতনীকে এনে কাছে রাখবি ত?"

"কেন, হয়েছে কি তার? গোহত্যা না ব্রহ্মহত্যা? কি করেছে সে? হলই বা তার হাজার দোষ আমিই বা কোন ভালো? নিজের চোখে আঙুল যায় না। কিন্তু সে হল কেন এমন? কে তাকে ঘর থেকে তাড়াল? হাত ধরে বিয়ে করেছিল। একদিনের জন্যেও সুখে থাকেনি। সুখের স্বপ্নও দেখেনি হয়তো। কালাপানি পার। কি করত সে? কুলের বউটা, বিধাতা পুরুষ কি দেখতে পায়নি তা? কিন্তু, রতনী কি আর আমার কাছে ফিরে আসতে চাইবে দুখিয়াদা?"

আবার কাঁদে শুকুরা। পাথরের মতো শক্ত মনটা যেন পাথরের বাটির মতো ফেটে গেল। দুখিয়া দেখল শুকুরার আর এক রূপ। একটা রূপের দুটো দিক। একপাশে কোমল, অন্য পাশে নির্ভয়। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।

"ধৈর্য ধর শুকুরা। কি ছেলেমানুষি করছিস!" দুঃখীশ্যাম বলে— "রতনী তোর আসার কথা জানুক আগে।"

"সে কি এতক্ষণ বাকি আছে? রাউতপাড়া আমাদের পাড়া থেকে কতই বা দূর।" মণি বলল।

মণিয়ার দিকে তাকিয়ে দুঃখী বলল— "খবর পাক আর নাই পাক, তুই গিয়ে খবরটা দিয়ে আয়। দেখা যাক কি হয়। ওর মনের ভাবটা ত বোঝা যাবে।"

"মণি কেন যাবে? আমি নিজে যাব। কেনই বা যাব না? হক হাত ধরে বিয়ে করেছি — ভয় পাবার কি আছে?" দাঁড়িয়ে উঠল শুকুরা।

"ওমনি বেরিয়ে পড়লি? একটু ভেবেচিন্তে যা বলার কথা বলতে হবে। রতনী যদি আসে থাকবে কোথায়? আগে একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।" বলল মণি।

দমে গেল শুকুরা। ধপ করে নিবে গেল ভিতরের আগুনটা। জ্বলে উঠেছিল চিতার আগুন লাফিয়ে ওঠার মতো। তার লজ্জা করল। বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে। দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কি ভাবতে লাগল অনেক সময় ধরে। সবাই চুপ...।

তার পরের দিন।

সকাল সকাল নিত্যকর্ম সেরে বসে আছে শুকুরা। ওদিক থেকে এক এক করে এসে পৌঁছোল মণি, বালুয়া, চকরা এবং আরো চার-পাঁচজন গাঁয়ের লোক। শুকুরাকে সঙ্গে নিয়ে সকলে পৌঁছোল গিয়ে সরপঞ্চ সাহেবের বাড়িতে। দুঃখী দাশকেও ধরে নিয়ে গেল সঙ্গে।

দরজার বাইরে থেকে ডাক পাড়ল — "সরপঞ্চ আছেন?" কেউ যখন শুনল না আবার হাঁকল— "ও সরপঞ্চমশাই! সরপঞ্চ সাহেব বাড়ি আছেন?"

থামিয়ে দিল দুঃখী। এরকমভাবে কি ডাকতে আছে? ভদ্রলোকদের এমনভাবে ডাকতে নেই।

"ভারি ত ভদ্রলোক — ভদ্দর নোক!" টিপ্পনী দিল মণি।

দুঃখী খবর পাঠাল চাকরের হাতে — "মহান্তিমশাই-কে গিয়ে বল, আমি দুখী, সঙ্গে বালুঙ্গাদা, মণি, শুকুরা, আরো অনেকে এসেছি। সরপঞ্চের কাছে আরজি করতে এসেছি আমরা সবাই"।

বার বার খবর পাঠানো হয়। ওদিক থেকে জবাব আসতে থাকে — সরপঞ্চ সাহেব পায়খানা গেছেন। সরপঞ্চ পুজোয় বসেছেন। এখন প্রসাদ পাচ্ছেন। মুখ ধুতে গেছেন। দাঁত খুঁটছেন। বিশ্রাম করছেন।

একঘন্টা গেল। দু-ঘন্টা গেল। তিন হতে চলল। তখন মণিয়া চলে গেল। কাছারির সময় হয়ে এসেছে। দশমাইল সাইকেলে যেতে হবে তাকে। আর সকলে তেমনি বসে থাকে। সরপঞ্চের বৈঠকখানা। ভাগু মহান্তির কাছারির বাংলো। উঁচু মাথার চাল। ইয়া বড় বড় শালের খুঁটি। খুব পুরোনো। বড় টেকসই। আলকাতরা লাগানো। পোকা যাতে না কাটে। এককোণে একটা পালকি ঝুলছে। তলার বেত ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে রয়েছে এলোমেলো হয়ে। মাড়িয়ে গাওয়া সময়কে, গড়িয়ে যাওয়া বয়সকে, নড়িয়ে দেওয়া খানদানীকে হাসছে সেটা।

একটা বেতের চেয়ার। তার ওপরে একটা গদি। আসন। লাল রঙের। খয়েরি রং ধরেছে তেলচিটে হয়ে। পিছনের হেলান দেওয়া জায়গায় ঘাম লেগে একটা নতুন রং বেরিয়েছে। মানুষের ছায়ার মতো। ছায়া নয়, ভূত। বসে থাকা লোকের ভূত সেটা। অতীতের ইতিহাস বলে ওই ভূতটা।

সকলে বসে থাকে বেঞ্চের ওপরে। তিন-চার ঘন্টা বাদে ভাগু মহান্তি সরপঞ্চ বেরলেন। চাকর এসে বলে দিয়ে গেল সরপঞ্চ আসছেন। সবাই নড়েচড়ে বসল। বাহিরিল ভোজরায় বিজয়ে।

খদ্দরের কাপড়। খদ্দরের পাঞ্জাবি, খদ্দরের চাদর। একটা টুপিও থাকে। গান্ধীটুপি। কালেকটার বা মন্ত্রী এলে সেটা পরা হয়।

ভাগু মহান্তি! ভাগু মহান্তি সরপঞ্চ! নমস্কার করল সকলে। শুকুরা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। অনেকদিন হল দেখেনি ভাল করে। ভাগু মহান্তি বদলেছে। যুগের সঙ্গে, বয়সের সঙ্গে যেমন করে বদলায় মানুষ তেমন ত কৈ দেখায় না। সেই চিতা চৈতন কৈ? তিলক কাটা আর পোষায় না বোধ হয়।

"কি রে দুখী, শুকুরা, বালুঙ্গা, কি কাজে এসেছ সব? তোমরা সকলে সুতো কাটছ ত? সুতো কাট, সুতো কাট। গান্ধী মহাত্মা বলেছেন— সুতো কাট। আমিও সুতো কাটছিলাম এতক্ষণ। বুঝলে কিনা? রোজ কাটি। হেঁ, হেঁ, সুতো না কেটে বাইরে বেরোই না। অন্য কিছু করি না। প্রথমে সুতো কাটি।"

চোখ গোল গোল করে তাকাল শুকুরা। এটা কি ভাগু মহান্তির জবানি? গান্ধীজীর

ধর্মবেটার মতো কথা বলে। তিলক কাটা ছেড়ে সুতোকাটা ধরেছে। 'রাধাকৃষ্ণ সীতারাম' ছেড়ে আজকাল গান্ধীর নাম ভজতে শুরু করেছে।

"কর্তা, আপনার মালাঝুলি?" শুকুরা আর সামলাতে পারে না নিজেকে।

"হেঁ হেঁ হেঁ— মালাঝুলি? ও সব সিকেয়।" খোশ-মেজাজে বললেন ভাণ্ড মহান্তি। হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে বলে ওঠেন— "জান দুখী, আমাদের কংগ্রেস নেতারা কত বই, ইতিহাস লিখেছে। চমৎকার বই সব। আমাদের দেখা এই ওড়িশা দেশ পরাধীন হল কেন জান? চৈতন্যের জন্যে। চৈতন্যদের খণ্ডায়েৎদের খোল করতাল ধরিয়ে দিতেন। মেয়েলি স্বভাবের হয়ে গেল জাতটা। রাধাকৃষ্ণের নামে ভ্রষ্টাচার চলল। যেই আমি একথা পড়লাম আমার চোখ খুলে গেল। সেইদিন থেকে তিলক, জপের মালা ছেড়ে ধরলাম খদ্দরের ঝোলা।"

দুঃখী দাশের মুখ লাল। এই ভাণ্ড মহান্তি অষ্টপ্রহর সংকীর্তন করত। কি উদ্দাম নাচ! আজ তারই মুখে এই কথা!

"মহান্তিমশায়, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সম্বন্ধে আপনি কিছু পড়েছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"পড়িনি?" রেগে উঠলেন ভাণ্ড। "আমি পড়িনি, তুই পড়েছিস আমার চেয়ে বেশি?"

"পড়লে আপনি এমন বলতেন না।"

"আমি না হয় পড়িনি। এই পণ্ডিতেরা, আমাদের কংগ্রেস নেতারা একথা লিখেছেন। তাঁরা কি পড়েননি চৈতন্যের কথা? তুই একা পড়েছিস? হেঁঃ, বাঙালিরা চক্রান্ত করে চৈতন্যকে ওড়িশায় পাঠিয়েছিল, ওড়িশাকে পরাধীন করার জন্যে— একথা কি মিথ্যে?"

"আপনি বিতণ্ডা যুক্তি করছেন। আমি তার কি উত্তর দেব? যা বলছেন সেটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। নেতারা যা লিখেছে সেটা কেবল অনুমান। নিজের মূর্খতাকে ঢাকা দিয়ে বাংলা-ওড়িশা বিভেদ সৃষ্টি করে সস্তা নাম কেনার অভিসন্ধি মাত্র।"

"সত্যি নয়? আহা এলো রে আমার ভারি সত্যবাদী একটা। শোন শোন হে রাম— এই দুখিয়া কি বলে। সেই এ কথার ঠিক জবাব দেবে। দাঁড়াও একটু।"

"কি, কি? কি ব্যাপার?" রামবাবু এসে সবাইকে নমস্কার করতে করতে বললেন।

"চৈতন্যের জন্যে দেশ পরাধীন হয়নি? বল ত দেখি।"

"একা চৈতন্য কেন— এই যত সব ধর্মপ্রচারক সবাই ওই দোষে দোষী।" বললে রামবাবু।

"ওই যে শোন, রাম কি বলছে। বল ত বল ত রাম। আমাকে মূর্খ মনে করে আমার কথা উড়িয়ে দিচ্ছে, দেখ হে। এবার তোমাদেরি পাস করা লোক ত একই কথা বলছে, শোন।"

"ধর্ম একটা নেশা— ওপিয়াম— মানে আইফেন— যাকে বলে আফিং।" রাম উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকে — "এই ধর্মকে নেশা করে লোকে অন্ধকারে পড়ে আছে। যত সামন্তবাদী রাজা জমিদার, ধর্মযাজক, পাণ্ডা পুরোহিত সবাই এই ধর্ম-নেশাখোরদের ঠকিয়ে খাচ্ছে।

সমাজে বাঁচার অধিকারও ভুলে যাচ্ছি আমরা। আমাদের হকের পাওনা পেতে পারি না। এই ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। সবসময় আমরা ধর্মের দিকে চেয়ে রয়েছি। ন্যায়কে ভুলে ধর্মের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলে ধর্ম তো পাওয়াই যায় না— ন্যায়কেও হারাতে হয়। আজ আমাদের কর্তব্য ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সে চৈতন্যই হোক বা শঙ্কর।"

ছোট বক্তৃতাটি রামবাবুর যেই শেষ হল, হাতটা চাপড়ে দিলেন ভাঙা টেবিলের ওপর। দুঃখী মুচকি হাসতে থাকে। বালুঙ্গা আর সামলাতে পারল না, গর্জে উঠল— "কি বললে? ধর্ম হল আপিম? চৈতন্যের জন্যে আমরা পরাধীন হলাম? চৈতন্য 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' প্রচার করলেন বলে লোকেরা মেয়েলি ভাবের হয়ে গেল? আর মহাত্মা গান্ধী 'রঘুপতি রাঘব' গেয়ে দেশকে স্বাধীন করে দিলেন, নয়? এই তো তোমাদের বিদ্যে! তোমার পণ্ডিত নেতাদের বুদ্ধি! বলে—

'বিষ্ণুর অভয় চরণ। অশেষ মঙ্গল কারণ॥'

বিষ্ণু নাম নিলে অমঙ্গল কাছে ঘেঁষতে পারে? সকলে যদি বিষ্ণুর নাম ধরত দেশ কি কখনো পরাধীন হত? আমরা বিষ্ণুকে ভুলে গেলাম। ধর্মকে ত্যাগ করলাম। তারই জন্যে এ দুর্গতি। দুর্দশা। কামনা রোগী এরা। এই পাঠ পড়া ইংরিজি-জানা বাবুরা। এঁদের দুনিয়াটা হলদে দেখায়। মায়া, মায়া! বিষ্ণুমায়া! মায়াতে পড়ে স্বপন দেখবে। ভাগবতে বলেছে —

'যেমন স্বপ্ন মনোরথে। বিচরে নিদ্রার আয়ত্তে॥
সত্যের মতো ভাবে তাহা। নিদ্রা বোধনে সর্বমায়া॥
এ মন কৃষ্ণপদে দিলে। কভু না পড়ে মায়াজালে॥'

কৃষ্ণনাম, রামনাম এঁদের খালি আফিঙের মতো লাগছে! নারায়ণ, নারায়ণ! আজ রাতটা কেমন করে পুইয়েছিল কে জানে, কৃষ্ণনিন্দা কানে ঢুকল। নারায়ণ, নারায়ণ!"

"হো, হো, হো"— হেসে উঠলেন রামবাবু। "এইটাই তো আফিং। এর থেকে একগাদা খাইয়ে লোকদের নেশা ধরিয়ে দিলে তখন পট্টি মারা সুবিধে।"

রেগে উঠল বালুঙ্গা। লাঠিটা নীচে পড়ে গেছিল। হাতটা তার লাঠিটাকে হাতড়াল ওর অজান্তে। বলল— "কি বললে? লোকদের ঠকাচ্ছি। তোমরা না আমরা? তোমরা বাবুভায়ারা না আমরা মুটে-মজুররা? কার জন্যে তোমাদের এই বাবুগিরি? কার জন্যে এই চিকন-ধোপদুরস্ত পোশাক? আমাদের কামাই, আমাদেরই ঘাম, আমাদেরই রক্ত। আমরা যদি ধর্মের নামে ঠকাচ্ছি, তোমরা কর্মের নামে ঠকাচ্ছ। কি করেছ তোমরা আমাদের জন্যে? কেন আমরা তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে বাড়িয়ে তুলব? সাপ, সর্প তোমরা!

'সর্পেতে জাত কৈল মোরে। স্বভাব ছাড়ি বা কি করে?' আবার যদি ঠাকুর দেবতার নাম ধরো ত দেখবে বালুঙ্গার মূর্তি।"

সকলে চুপ। বালুঙ্গার কথায় কথা বলে এমন সাহস কারো নেই। সারা গাঁয়ে নেই। এর জোর দুটো জায়গায়। একটা মুখে, আর একটা হাতে। মুখে কথা। হাতে লাঠি। কোনো

এক-কালে বালুঙ্গা ভালো লাঠিয়াল ছিল। জোয়ান বয়স তখন ওর। তখনকার সেই নামডাক এখনো কাজ দেয়। বালুঙ্গার হাতে লাঠি দেখলে মহা মহা চোর-ডাকাতও পালিয়ে বাঁচে।

রাম কিন্তু ভয় পাওয়ার লোক নয়। বলল— "নেশাখোর মানুষকে দূর থেকেই নমস্কার। নেশার ঘোর লেগেছে।"

"হা... হা..., নেশা, নেশা। ধরে কই বাবু ওই নেশাতে! ভগবানের নামের নেশা লাগলে আর কোনো নেশায় ধরে না। যে আসল ভক্ত তাকে সে নেশাতে ধরে। আমার সে ভাগ্য কই?"

"হয়েছে, হয়েছে, তোমাকে সে নেশাতে ধরুক। তুমি একাই স্বর্গে যাও। আমাদের ওই স্বর্গ দিয়ে কাজ নেই।"

রামের মুখ থেকে কথা না ফুরোতে বালুঙ্গা পদ আওড়াল—

" 'স্বর্গ নরক যুগ্ম বাণী। এ আমি এক বলে জানি॥
সে হেতু মোর দুঃখশোক। সমান ভাবি সর্বলোক॥'

এরই নাম সাম্যবাদ। ঈশ্বরভক্তি বিনা সাম্যবাদ হয় না রামবাবু। জেনে রেখো, হ্যাঁ। তোমার শাস্তর আর আমাদের শাস্তর আলাদা। ঈশ্বরকে ভুলতে পারলেই তোমার সাম্যবাদ। ঈশ্বরকে মানলেই আমাদের সাম্যবাদ।"

"আমরা কি ঈশ্বর মানি না? তোমরাই শুধু মান?" বলে উঠলেন ভাণ্ড মহান্তি।

"মান বটে, তবে ঈশ্বর তোমার কথায় চলেন বলে মান। কথা না শুনলে ঈশ্বরকে ঘর থেকে বার করে দাও। ঈশ্বর তোমায় ধন দিতে থাকেন, মান দিতে থাকেন, পান দিতে থাকেন ত ভাল। না দিলে কে কাকে মানে? আর এই রামবাবুরা ওই পুঁজিপতি সাগররাজার মেয়ে লক্ষ্মীদেবীর বর ভগবানের সব সম্পত্তি লুঠ করে এনে বলে ভগবান বলে কেউ নেই। ভগবান মরে গেছে। তার ধন মেরে নিলে পাপ হয় না। তাই না রামবাবু? কি বল?"

রামবাবু রেগে আগুন। বললেন— "ভাণ্ডবাবু কংগ্রেস। আমরা কম্যুনিস্ট। তাদের আর আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। এসব বড় গভীর রাজনীতির কথা। তুমি কিছু না বুঝে মেলা ভড়র ভড়র কোরো না। কংগ্রেস বুর্জোয়া। আমরা প্রোলেটেরিয়েট। মানে— মানে,— তারা সবখেকো, আমরা সর্বহারা।"

"সব বুঝেছি। সব বুঝেছি।"— বালুঙ্গার জবাব— "তোমার আর তাঁর নাগ নাড়ি। রাম রাবণ। কৃষ্ণ কংস। গান্ধীওলা গবর্মেন্টো। কংগ্রেস কম্যুনিস্ট নয়। তাই ত? এবার, বড় বড় রাজনীতির কথা আমি বুঝি কি না বল দেখি?"

"না, না, আজকাল কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসে মিশে গেছে।" দুঃখী বললে।

"আহা আমি আর বলছি কি? কম্যুনিস্ট জড়িয়ে ধরেছে কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের প্রাণ কণ্ঠাগত। ফল কি হবে জান? কংগ্রেস কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে। ...'কৃষ্ণেরে চেয়ে প্রাণ গেল। কৃষ্ণের দেহেতে মিশিল'... কে? কংস। রাবণের ভিতরেও 'রাম রাম' শব্দ শোনা গিয়েছিল মরবার সময়। ইংরেজ গবর্মেন্টো গেল। এখন এই গান্ধীওলাদের ইংরেজি ভূত কেমন

চেপে বসেছে দেখছ না? তেমনি কংগ্রেসওলারা কমমিস্ট কমনিস্ট বলে বলে কমোনিস্টি পালটে যাবে। বলেছে—

'দেহ বিয়োগকালে জন্তু। মনে চিন্তয়ে যত হেতু॥
একান্ত স্নেহ বশে ভয়ে। নিশ্চল ধ্যান যেথা রহে॥
জন্মায় ওই রূপ ধরি। যেমনে পেচক বিচরি॥
নানা প্রকার কীট লয়ে। রাখে সে নিজের আলয়ে॥
সে কীট প্রাণনাশ কালে। যাহারে বিলোকে বিকলে॥
জন্মায় ধরি সেই রূপ। ভয়ে চিন্তিল যে স্বরূপ॥' "

কথাগুলো বড় বেয়াড়া গতি নিচ্ছে দেখে ভাগু মহান্তি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল, "আরে ছাড় ছাড়, ও সব কথায় আমাদের কি যায় আসে। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়া কেন? বল ত দুখী দাশমশাই, সকালেই আমার দুয়ারে পা পড়ল কেন? কি কাজে এসেছ সবাই?"

"একটা আবেদন আছে।"

"অ্যাঁ— আবেদন? এত্ত বড় কথা? ওরে দুখী, তোর মুখে আবার এমন কথা? অগনি দাশের ছেলে দুখীদাশ এসেছে ভাগু মহান্তির কাছে আবেদন করতে? কি এমন হয়ে গেছি রে আমি? ছার একটা সরপঞ্চ বই তো নয়। যদি আজ 'অগাদা' বেঁচে থাকত, এ কথা শুনতে পেলে কি বলত সে? হায়রে কপাল! সে চলে গেল। আমি না মরে যা বেঁচে রয়েছি এ সব শোনার জন্যে! হ্যাঁরে বালুঙ্গা, ওরে শুকুরা, কি বলো তোমরা সব? এমন কোন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এল যে? সবাই তোমরা এই গাঁয়ের তো বটে? প্রতিদিন সকালে মুখ দেখাদেখি। আবেদন আবার একটা কি? আমি কি সরপঞ্চ হয়েছি নিজের জন্যে? হ্যাঁ রে, আমাকে এ সিংহাসন দিলে কে? আজ এস.ডি.ও. কালেক্টার থেকে মন্ত্রী গভর্ণর সকলের মুখে ভাগিরথী পটনায়েক ছাড়া কথা নেই এ গৌরব কাদের জন্যে? কাদের কেরামতি? কার বাহুবলে কীচক রাজা? বল তো, আমার নাম হলে কি এ গাঁয়ের নাম হয় না? তোমাদের নাম বাড়ে না?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!" সায় দেয় সবাই।

"কি যে বল কর্তামশাই, আমরা সব গোয়ালের গরু। আর ওই যেমন বলে, তুমি মানুষ চরাও। তোমার সঙ্গে কি সমান আমরা? ছি ছি, মুখেও এনো না কর্তা ওরকম কথা। আমাদের আর্জিটা কানে তোল আগে। দাতা তুমি, মালিকও তুমি।" আবেদনে মুখর হল বালুঙ্গা।

"আর্জি আবার কি রে?" সরু গলায় বলে ভাগু, "তোদেরই জন্যে তো এ বুড়ো বয়েসে এত মেহনত, এত খাটনি। সরপঞ্চ তো গাদা গাদা। কজন আমার বয়েসের আছে? আর পাঁচ সাত বছরে চার কুড়িতে ঠেকব। এ বয়েসে কে কোথায় দেশসেবা করছে? সারা জীবন তো আপন-স্বার্থের কাজ করলাম। শেষকালে যদি পাঁচজনের সেবা করে জীবন যায়!"

"হাঁ, হাঁ, যা বলেছ কর্তা"— বালুঙ্গা দরদ দেখিয়ে আরো সোজা করে বলল—

" 'জীবের ভাল-মন্দ বাণী। মরণকালে তাহা জানি।।'

"পাঁচজনে ভাল বলে ত জানবে সে স্বর্গে গেল। বিদ্যা নগরীতে কালিদাস বুদ্ধি শিখলেন যেমনভাবে' যা ত লো মেয়ে, অমুক লোক যে মারা গেল, সে স্বর্গে গেল কিম্ব নরকে গেল দেখে আয়। ছোট মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল— মা, ও স্বর্গে গেল। কালিদাস ত অবাক! কেমন করে জানল? জিজ্ঞেস করলেন বুড়িকে। বুড়ি বললে— মরে যাই, এটুকু জান না? তবে আর কিসের পণ্ডিত! মরার পরে লোকে যার জন্যে ঝুরে মরে সে স্বর্গবাসী। সে যা হোক কর্তা সে-কথা এখন কেন? তোমার আয়ু ঢের। ঢেরদিন বাঁচবে শুধু এই মানুষদের ভাল করার জন্যে।"

"আমার আর কোনো চিন্তা নেই রে বালুঙ্গা। কেমন করে সকলের মঙ্গল হবে, কি করে মানুষের হিত করব খালি সেই কথা ভেবে ভেবে— তোমাদের গিন্নি ঠাকরুণ বলেন— আমি নাকি রোগা হয়ে গেছি।"

ভাও মহান্তির হাই তোলাতে তুড়ি দেওয়ার মতো বালুঙ্গা বলল— "আমি কি আর জানি না সে-কথা? কর্তামশাই ত পরম ভাগবত। পরে হিতে দিন কাটে। কৃষ্ণ ত ওই কথাই উদ্ধবকে বলেছিলেন— দেখনি কর্তা ভাগবতে?

'ছাড় তু এবে সুত বিত্ত। দারা সেবক প্রেমচিত্ত॥
এ সর্ব মায়ার সঞ্চার। কর না বিশ্বাস অসার॥
তু এবে সর্ব প্রাণীহিতে। নিরতে রহ শান্তচিতে॥'

আর কি কর্তামশায়ের দারাসুতের চিন্তা আছে? সব সময় ত সেই আর পাঁচজনের কথা। লোকের সেবা। আমরা কি দেখি না?"

"তুই একা আমার মনের কথা বুঝেছিস রে বালুঙ্গা। এ কথা আর কেউ কি বুঝল? দেখি তুই-ই একটা লোক। সব কথা তোর রোক ঠোক। আর একবার গা তো রে ভাগবত গোঁসাই কি বলেন।"

"বলেছেন— 'কর্ম আদরি সহি দুঃখ। কভুও না হবে বিমুখ॥
দৃঢ়ে না ছাড়ি নিজ পথ। চঞ্চল না করিবে চিত্ত॥
কর্মবেদনা সহি ধীরে। ভ্রমে যে সংসার সাগরে॥
ধন্য সে প্রাণী মহীতে। ধরে যে প্রাণ পরহিতে॥' "

"হরিবোল। হরিবোল!" ভাও মহান্তি পাছাটাকে তুলে আছড়ে দিলেন চেয়ারের ওপর, বালুঙ্গার মুখে ভাগবত পদের সঙ্গে তাল ঠোকার মতো, "শুনলে, শুনলে দুখী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলছেন?"

বালুঙ্গা বলে, "পুরাণে কি নেই? যা নাই ভারতে, তা নাই ভূ-ভারতে। তবে, তা মেনে চলে কটা লোক? কর্তামশায়ের মতো সে-সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করার লোক বোধহয় কোথাও নেই। ধর্মাত্মা, যেমন, দয়বন্তও তেমনি। আমি ত আসার সময় সেই কথাই সবাইকে

বললাম। কর্তামশাই শোনামাত্র রাজি হয়ে যাবেন। কত সামান্য কথা একটা। তাঁর আশ্রয়ে কত লোক বেঁচেবর্তে আছে। শুকুরাকে কি মানা করে দেবেন— আশ্রয় দেব না বলে? ওরে শুকুরা, পায়ে পড়! কারণ রক্ষণ কর্তামশাই তোকে তাঁর অভয় দিয়ে রক্ষা করবেন।"

শুকুরা সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হল।

"আরে ও কি করিস? ওঠ, ওঠ। আগে কথাটা কি শুনি। কি হয়েছে তোর?" জিজ্ঞেস করলেন ভাগু কিছু না জানার মতো।

"আ-হা হা, কি মধুর কথা। এমন বচন কোথা শুনতে পাবি বলত! — 'অমৃত বিনয় বচন। কহি তোষিবে প্রাণীমন।' কি রে শুকুরা, আমি বলেছিলাম না? শুনলি ত? দেখলি ত? দেখলি ত? সাক্ষ্য লক্ষ্য, পেরতক্ষ! নে এবার তোর দুঃখু জানিয়ে দে।" বালুঙ্গা উসকায়। ততক্ষণে ভাগু গম্ভীর হয়ে গেছেন। মুখটা থমথমে। নাকের সামনে থেকে দুটো তেরছা রেখা কানের নীচে পর্যন্ত ফুটে উঠেছে।

"কি রে, বল! বলছিস না কেন? তোর জন্যে কি আমরা বলব? এ কেমন ছোঁড়ারে বাপু।" বালুঙ্গা বিরক্ত হয় শুকুরার ওপর।

শুকুরা ঘাবড়ে গেছে। পাছে না করে দেয় ভাগু মহান্তি, বিশ্বাস নেই।

একটা গাঢ় হুঁ শব্দ বেরিয়ে এল ভাগু মহান্তির গলা থেকে। সেই শব্দে শুকুরার বুক হিম হয়ে আসছিল। সে কাঁপা গলায় বলে ওঠে— "আজ্ঞে আপনার টাকা আমি চুকিয়ে দেবো।"

শুকুরার মুখের কথা ফুরানোর আগেই ভাগু বলে ওঠেন, "আহা হা, আমি কি আর চিনি না শুকুরাকে। সে কথার খেলাপ করবে? এ কি একটা কথা? সুদে-আসলে সব সে আপনি ধরে দিয়ে যাবে। ওতে আর বলার কি আছে। তবে আমি যে সেই জমিটা নিলাম করে দিলাম। না করে আর করতামই বা কি? সেই যে গেলি আর তোর পাত্তা নেই। বেঁচে আছিস বলে কেউ কি ভেবেছিল?"

"হাঁ, তা যা বললে কর্তা সত্যি।" শুকুরা নিজেই মানল।

"তবে কর্তা 'কালা' ত আবার ফিরল!"

বালুঙ্গার কথায় সায় দিয়ে ভাগু মহান্তি বলে— "রতনী শাঁখা-সিঁদুর পরুক, আমি আশীর্বাদ করছি।"

"পরবে যে মাথা গোঁজার ঠাঁই একটুকু হলে তবে ত? কেমন করে থিতু হবে তার ব্যবস্থা করে দিন কর্তা। শুকুরার দায় আপনার ওপরে রইল। আপনি না দেখলে সে ভেসে যাবে ধরে নিন।" বালুঙ্গা আর্ত স্বরে বলে।

"আহা আমি কি মানা করছি? তবে জিনিসটা হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেছে। উপায় কি?" ভাগু মহান্তির কপালে রেখাগুলো প্রকট হল। যেন সারা পৃথিবীর চিন্তা ব্যাকুল করে তুলল এক দণ্ডে।

"যাই হোক, সে-কথা কর্তা বুঝবেন। শুকুরার উপায় কি? কর্তা চাইলে দুনিয়া উলটে

দিতে পারেন। এটা আর কোন বড় কথা। দেড়-দু কাঠার জমি এক টুকরো। পিতৃপুরুষদের ভিটে শুকুরার। সেই জমিটুকু সে কি করে ফিরে পাবে আপনি সে ব্যবস্থা করুন। আমরা সবাই সেটাই নিবেদন করতে এসেছি।'' আবার অনুনয় করল বালুঙ্গা।

''আহা, আমি কি সেটা বুঝি না? আমারও কি মন চায় না শুকুরা রতনীকে নিয়ে ঘর করে থাকুক। তার ভিটেটুকু সে ফিরে পাক। ঘরদোর করে আরামে দিন কাটুক তার। কিন্তু এখন আমি কি করব? খরিদদার কি আর ফিরিয়ে দেবে বললেও। তোমরা সকলে যাও— গিয়ে জিজ্ঞেস কর তাকে। আমার তাতে কি? আমি কেন মানা করব? সেটা ত নিলাম করতে চাইনি। ভালো ভালো লোক সব পরামর্শ দেওয়াতে নিলামে তুলতে হল যারা সব ধার শোধ করতে বললে মুখ গোঁজ করে বলল— হেঁ হেঁ কর্তা, শুকুরাকে দয়া করলে, আমার দিকেও একবার মুখ তুলে চাও। সবাই শুকুরার নজির দিল। তাই বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনেরা বললে ন্যায় সকলের জন্য সমান। শুকুরাকে ছেড়ে দিলে তো আর সবাইকেও দাও। সকলের কাছ থেকে উসুল করবে তো শুকুরার কাছ থেকে আগে করো, ওর তামাদি হয়ে যাবে। ন্যায়ের চোখ কান নেই, মায়া মমতা নেই। সত্যি কি না বল।''

শুকুরা আরেকবার গড় করে জানায়— ''কর্তামশাই, তুমি— আপনি মা-বাপ ধর্মদেবতা। রাখলে রাখ, মারলে মার। আমার সব কসুর মাপ কর। সুদে-আসলে সব ধরে দিচ্ছি। ওই ভিটেটুকুন আমায় হুকুম হোক।''

''আরে, আমি কি বুঝছি না? তবে তুই বলচিস যে সুদে-আসলে গুণে দিবি, কোন সাহসে? কত টাকা কামিয়ে এনেছিস কলকাতা থেকে, অ্যাঁ? পঁচিশ বছরের সুদ কত দাঁড়াবে জানিস? আবার চক্রবৃদ্ধি হারে। সুদগুলো বছরে বছরে আসল হয়ে যেতে থাকবে। যা তুই কড়ার করেছিলি। আমি তো আর মন থেকে ভেবে বলছি না। কি রে বল না, সত্যি কি মিথ্যে?''

''আজ্ঞে আপনি ত মোটে দশটি টাকা দিয়েছিলেন।''

''আহা, আমি কি না বলছি? পঁচিশ বছর আগের কথা। এক পুরুষ বল। দু-দুটো যুগ। সে কালের গাছ-পাথর নেই। সব কি আমার মনে আছে? খাতাপত্তর দেখলে পরে জানা যাবে। আরে, আমি একটা কথার কথা বললাম। যা ন্যায়, যেটা হকের, সেটাই বললাম। তবে আমি কি সে কথায় গিঁট দিয়ে বসে আছি? সবসুদ্ধু টাকা দিলে দিবি, নয়ত দিস না। ওরে, তুই কি করে ঘর বসত করবি আমি সেটাই চিন্তা করছি। যতই হোক তুই এই গাঁয়েরই তো মানুষ।''

''আ হা হা — কর্তামশায়ের মতো আর কে এমন দয়াবন্ত পুরুষ হবে?'' বালুঙ্গা ওপরে তুলে দিল ভাগুবাবুকে, ''আমি বলিনি রে শুকুরা? কেমন-গো দুখী দাশমশাই? এই ত, দেখ না, আমার কথা মিথ্যে না সত্যি। আমি কি চিনি না ভাগিরথী পটনায়েককে? খানদানি বনেদী ঘরের বিচার। এমন কথা কি সবাই বলতে পারবে? এমন মেজাজ এত বড় ছাতি কার? জানেন ত কর্তা আপন ভিটেটুকুর ওপরে সকলের মোহ থাকে। শুকুরা বলছিল কি, ওরই ভিটের লাগোয়া কর্তামশায়ের যে জমি আছে তার থেকে দু-এক বিঘা বর্গাচাষ করতে পেলে সে বেঁচে থাকা পর্যন্ত কর্তার হয়ে থাকবে।''

"আহা-হা, আমি কি বুঝি না। আমার কি মন করে না। শুকুরাকে মানুষ করল কে? কলকাতা পাঠাল কে? হাওড়ার পুল দেখাল কে? কি রে শুকুরা, সত্যি কি না? হলেও জমিটা তো হাতছাড়া হয়ে গেল। নখ দিয়ে ছেঁড়ার জিনিস কুড়ুল কাটারি খুঁজল। আচ্ছা, দেখি কি হয়, বলা যাচ্ছে না। তবে ঠাকুর যা করেন।"

দুখী হাসল। এর বেলা 'ঠাকুর যা করেন'। এইমাত্র দেবতা ব্রাহ্মণের চৌদ্দপুরুষ তুলছিলেন। এখন 'ঠাকুরই' সব। ঠাকুর ছাড়া যেন আর কিছু জানেন না। জিজ্ঞেস করল— "আজ্ঞে, জমি হাতছাড়া কি রকম?"

"বললাম তো— নালিশ করেছিলাম। এক তরফা ডিক্রি হল। নিলামে উঠল, জমি কি আর আমার হাতে আছে?"

"কে নিলাম ধরল আজ্ঞে?" বালুঙ্গা জিজ্ঞেস করল।

"মারোয়াড়ি, মারোয়াড়ি।"

"মারোয়াড়ি?" শুকুরা জিজ্ঞেস করে ফেলে আর হাঁ করে চেয়ে থাকে।

"হাঁ রে হাঁ, সেই যে চিরঞ্জিলাল মারোয়াড়ি নয়াবাজারের। রাস্তাধারের জমি। নিজের গরজে নিল। কারখানা করবে বুঝি। মেশিন বসাবে।"

"রেজিস্ট্রি কি হয়ে গেছে?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

ভাগু মহান্তি চটে গেলেন শুকুরার কথায়। "তোর এত কথা জানার কি দরকার? রেজিস্ট্রি হয়েছে কি না, দখল নিয়েছে কি না। আমি কি তোর গোমস্তা? বলছি তো জমিটা হাত থেকে চলে গেছে। এত ভিতরি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কি লাভ? এত যদি অবিশ্বাস তো যা, চলে যা। আমি কিছু করতে পারব না তোর জন্যে। মিটে গেল কথা।"

"হাঁ-হাঁ-কর্তা! এমন রেগে গেলে চলবে কেন?" বলে ওঠে বালুঙ্গা। "শুকুরাটা একটা পাগল। কথার বাগ-বা-ছিরি আছে না কি? ওর কথা ধরলে কি চলে কর্তা? গোঁয়ার মুখ্‌খু; যত হোক আপনার কাছে ছেলেমানুষ বই ত নয়।"

"এহ্, এখন পাগল ছেলেমানুষ। বউকে ছেড়ে কলকাতা চলে যাবার বেলায় নিজে মুরুব্বি। শুনল কারো কথা? যত মানা করলাম শুনল না। সেই এক জেদ — কলকাতা যাব। গেলি; পেলি তো ফল? জমি নিল মারোয়াড়ি — মাগ নিল রাউতের পো— বারোয়ারি।"

"তুমি— আপনি ত বললে কর্তা— কলকাতা চলে যা, যা-যা! যে মানা করেছিল সে গিয়েছে সগ্‌গে।" শুকুরা জবাব দেয়।

"চুপ কর"— বালুঙ্গা দাবিয়ে দেয়।

"দেখলে, দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে আমায় মিথ্যুক বানিয়ে দল! আমি কলকাতা যেতে বলেছিলাম বলে কি সেখানে একেবারে থেকে যেতে বলেছিলাম? ঘরে এদিকে সোমত্ত বউ রেখে যাচ্ছিস; মাসে মাসে টাকা পাঠাস। ছমাসে বছরে একবার করে এসে দেখে যাস। বলে কিনা আমি বলেছিলাম তুই ছেলে-বউ ফেলে কলকাতায় থেকে যা। আরে, দেখ এর

আক্কেল! দয়া দেখানোতে পেয়ে বসেছে। আমাকে আবার মিথ্যুক বলে। জানিস আমি কে? আমার নাম ভাগু মহান্তি নয়— ভাগিরথী পটনায়েক। আমি কংগ্রেসের সভ্য— নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 'অ্যাক্টিং মেম্বার' মানে সক্রিয় কর্মী। আমি কিনা মিথ্যে বলছি! জানিস না বুঝি— জিজ্ঞেস করে দেখ আমার স্ত্রী সুতো কাটে কি না। মন্ত্রীকে সেদিন হাতে-কাটা সুতোর মালা পরিয়েছিল কে? এই ভাগিরথী পটনায়েকের সহধর্মিণী। আমার বাড়িতে খদ্দর পরে না কে? দাসী চাকরানী, চাকর-বাকর থেকে কুকুর-বেড়াল অব্দি দেখে আয় গিয়ে। হ্যাঁ হে, আমি হলাম আবার মিথ্যাবাদী? খদ্দর পরে আমি মিথ্যে বলব? আমার বুক ফেটে যাবে না? না কি বলিস রে বাপুঙ্গা? আচ্ছা, এখন এসো সবাই। আমি উঠব এবার। অনেক বেলা হল। ওদিকে আবার অনেক কাজ। মন্ত্রী আসচেন। ট্যুর প্রোগ্রাম পেলাম এই মাত্তর।"

ভাগু বেরোলেন। চপ্পল জোড়ায় পা গলাচ্ছেন। শুকুরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল— "যাচ্চেন কোথা কর্তা, আমার ঝামেলাটা মিটিয়ে দিয়ে যান।"

"কি বললি তুই?" ভাগু অগ্নিশর্মা— "আমি যাচ্ছি কোথা? তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে? আরে, তোর কি গেল আমি যেখানে যাই না কেন? এল বেটা আমার গোসাঁই কোত্থেকে।"

"বে বেটা করচেন কর্তা, মুখ সামলে কথা বলুন।"

শুকুরার হাবভাব দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। রামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনি একজন ভদ্রলোক, সরপঞ্চ। ও গরিব বলে কি মানুষ নয়? তার ইজ্জত নেই?"

"তবে কি আজ্ঞে আপনি করতে হবে? কলকাতার হাড়কাটা গলি থেকে ফিরেছে বলে? আমাদের চোদ্দপুরুষ তোমাদের চোদ্দপুরুষকে এমনি করে বলে এসেছে, এটা কি আজ নতুন?"

"সে সব দিন বাঘে খেয়ে গেছে আজ্ঞে। শুলো সখি, আপনার মান আপনি রাখি। আপন ইজ্জত আপনি সামলে কথা না বললে আমরা কেন আপনার ইজ্জত দেখব?" বলল শুকুরা।

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কি করবি করগে যা। ভাগু মহান্তি কাউকে আজ্ঞে-আপনি করতে শেখেনি।"

"হেঃ— শেখনি? সরপঞ্চ হলে কেমন করে? কত টিন তেল খয়রাত করেছ? কাকুতি-মিনতি আর জোহার করে করে মাথার চাঁদিতে কড়া পড়েনি তোমার? এত যে দেমাক?"

"আমি কাদের আজ্ঞে-আপনি করেছি তাতে তোর বাপের কি?"

"আবার বাপ-ঠাকুদ্দার নাম ধরেচ ত মান-ইজ্জত থাকবে না। সাবধান। আমাকে যা বলবার বল। বাপ-ঠাকুদ্দা সাত-পুরুষ তুলবে কেন?"

"কেন? মারবি নাকি? রোয়াব দেখাস কাকে?"

"মারব না ত কি ছেড়ে দেব?"

"এ সব কি হচ্ছে শুকুরা?" দুঃখী দাশ দাবিয়ে দিল শুকুরাকে।

"দেখ দেখ, কেমন বেসামাল হয়ে কথা বলে। আমি কি বলেছি? তোমরা তো সবাই আছ, আমি ওকে মেরেছি না ধরেছি না গালিগালাজ করেছি? তোরই ভালর জন্যে বলছিলাম, তুই কিনা উলটে তেরি মেরি করছিস!"

"ছাড়ুন, ছাড়ুন আজ্ঞে, বাউণ্ডুলে মানুষ এরা, এদের কথা ধরলে কি চলে? ওর কোনো দাম আছে? আপনি জ্ঞানী মানুষ। এটুকুতে চটে যাওয়া শোভা পায় না। আপনি ত কথা দিয়েছেন যেমন করে হোক শুকুরাকে থিতু করে দেবেন। ও আবার কবে আসবে, কতদিন লাগবে তাই বলুন।" দুঃখী দাশ বলল।

"আমি এখন কিছুই বলতে পারব না।"

"আমি কতদিন এমনি বাইরে পড়ে থাকব?" শুকুরা জিজ্ঞেস করল।

"তুই বাইরে পড়ে থাকিস না থাকিস তাতে আমার কি? আমি কি সেজন্যে দায়ী?"

"আলবাত দায়ী।" ভাগু মহান্তির কথায় খাপপা হয়ে শুকুরা জবাব দেয়। "আমার ঘরতলি নিলাম করল কে? আমার বউকে পথে বসাল কে?"

"শুকুরা, শুকুরা, ধৈর্য ধর। এমন খেপে যাচ্চিস কেন?" বালুঙ্গা ওর হাত ধরে ফেলল।

"ছাড় বালুঙ্গাদা"— বালুঙ্গার হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয় শুকুরা। "সব নাটের গোবর্ধন এই ভাগু মহান্তি, এখন কেমন খসে যাবার তাল করচে দেখ। যেন কিচ্ছু জানে না। আজকে আমি শেষ কথা শুনে যেতে চাই। আমার ভিটে আমায় ফিরিয়ে দেবে কি না?" ভাগু মহান্তির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে — "আমাকে জবাব দাও — হাঁ কি না?"

"কি, মারবি আমায়? জবাব না দিলে?"— ভাগু ভয় পেলেও মুখে তোড় দেখায়।

"মারধর পর্যন্ত কথা যাবে না। আমার ভিটেখানা আমি যেমন করে হোক ফিরে পাবই। দেখব কেমন না দাও। নিলাম-টিলাম সব মিথ্যে। আমি জানি। সব বেনামী। সব জাল।" শুকুরা রাগে কাঁপছিল।

ভাগু মহান্তি খুব চালাক। ওদিকে পুলিসে খবর দিয়ে রেখেছে আগে থেকে। কখন কি হয়? তাই একবার শুকুরার দিকে তাকায় তো একবার বাইরের দরজার দিকে। পুলিসের দেখা নেই। এত বেলা হল। কি উপায়? কথা মাজলে মোটা। কি জানি কি হয়ে যায়। নরম হওয়া ভালো।

"ওরে শুকুরা! তুই এমন পাগলের মতো কেন কথা বলিস বল তো? তোর হয়েছে কি? এমন রেগে আগুন হয়ে যাচ্ছিস? গুরুজন, মান-সম্মান সব জ্বলেপুড়ে খেয়েছিস? হ্যাঁ রে? আমি তো বললুম তোকে — তোর দায় আমার রইল। আবার কি বলিস তুই?"

"হয়েছে, হয়েছে, তবে কথাটা আসলে"— বালুঙ্গা থেমে যায়।

"কি কথা বল না।"

"এসব মন ভোলানো কথায় শুকুরা ভুলে যাবার লোক নয় ভাগু কর্তামশাই। জাপানীরাও এমনি দেশের মাটিকে আমাদের ভারত সরকারের হাতে দিয়ে দেবে বলে আমাদের খুব মারপিট করেছিল। ছাঁদা কথায় আর ভুলছি না। ঢের শুনেছি এমন কথা। সাফ সাফ

বলে দিন, কতদিনের মধ্যে আমার ভিটেখানা আমায় ছেড়ে দেবেন।" শুকুরা ফুঁসে ওঠে।

তবুও পুলিস আসে না। ভাণ্ড মহান্তির মন ধুকপুক করে। এত সময় হল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা। নাওয়া-খাওয়া সেবাপুজোয় যত দেরি করা হল, সব বাহানা, সব ফিকির ভেস্তে গেল।

"তুই এমন ব্যস্ত হলে কি চলে? বললাম তো, হাতের মুঠো থেকে খসে গেছে, আমায় তো আবার ফন্দিফিকির করে একখানা জমি দেখতে হবে। আচ্ছা চলি।" বলে থপ থপ করে ভাণ্ড ভিতর মহলের দিকে চম্পট দিলেন।

"আসছি" বলতে বলতে দরজার সেধারে। ঘরের ভিতরে গিয়ে ধপ করে খাটের ওপরে বসে পড়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লেন। রক্ষা পেয়ে গেল পৈতৃক প্রাণটা। আর একটু হলে শুকুরা হাত চালিয়ে দিত।

"কি হল, কি হল" বলে গিন্নিঠাকরুণ ওধার থেকে দৌড়ে এলেন। মহান্তি মশায়ের বুক আরো জোরে ওঠাপড়া করল বউকে দেখে। বললেন— "আর একটু দেরি হলে শুকুরা গায়ে হাত দিত।"

"অ্যাঁ, এত সাহস ওই আঁটকুড়ো ব্যাটার? গায়ে হাত দিত?"

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করবে না, ওইরকমই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল সে, বলিনি আমি?"

পাখা করতে লাগলেন গিন্নি। ঘামে নেয়ে উঠেছেন পতি-দেবতা। আহা, শুকুরার ধমক ধমক নয়, আশীর্বাদ, ভাবতে থাকেন ভাণ্ড।

বালুঙ্গা, দুঃখী, শুকুরা সকলে গেল দুঃখীর বাড়িতে পরামর্শ করতে। আর সব যে-যার পথে।

"লোকটা ধড়িবাজ। মানছে কিন্তু দিতে নারাজ। মান্যতে নদীয়াতে"।

বালুঙ্গার কথায় শুকুরা আবার তেতে উঠল— "আমি ওর ধড়িবাজি ছাড়িয়ে দোব।"

"শুকুরা, তুই সব ভণ্ডুল করলি আজ"— বলল দুঃখী।

"এমন বদরাগী হলে চলে?"

হঠাৎ কোথা থেকে এসে পৌঁছলেন হলধরবাবু। হলধর চৌধুরী। শুকুরা চিনি চিনি করে অবাক হয়ে তাকায়। খুঁজতে থাকে মনে মনে। যেন গতদিনের আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে আছে কোথাও।

খদ্দর পোশাক, ধুতি পাঞ্জাবি সব মিহি খদ্দরের। জহর জ্যাকেট। গান্ধী টুপি। নিরামিষ ডিমের মতো।

বয়স চল্লিশের মধ্যে। শুকুরা কলকাতা যাবার সময় সে নেহাত ছেলেমানুষ। গাল টিপলে দুধ বেরোত। শুকুরার মনে পড়ে গেল, বালুঙ্গার মুখে বাপ-ঠাকুর্দার নাম শুনে।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বানরসেনা সেজে জেলে গিয়েছিল। এখন গাঁয়ের একজন বড় মাতব্বর। ওদিকে ভাণ্ড মহান্তি তো এদিকে হলধর চৌধুরী। অহি-নকুল।

খবর পেলেন শুকুরা ভাগু মহান্তির কাছে কেন যেন গেছে। ব্যস, সুযোগ মিলে গেল। অমনি দৌড়ে এলেন। শুকুরাকে হাত করতে হবে। বড় শোল একটা। বাগে পড়লে হয়। শুকুরার মতো দেশ-বিদেশে ঘোরা একটা মানুষ হলধরের দলে এলে তো কিস্তিমাত।

হলধরের দল। গাঁ-টা এখন দু-ভাগ। একভাগ হলধরের, অন্যভাগ ভাগু মহান্তির। উভয়েই কংগ্রেসওলা। রামবাবুর যেমন তেমন একটা দল আছে বটে কয়েকজন চাষাভুষোকে নিয়ে। তারা একরকম একঘরে। সবাই আকাশকুসুমের আশায় বসে থাকে। এঁদের ঝগড়ার মধ্যে থাকে না। শুধু এঁদের ঝগড়া দেখতে চায়। যত ঝগড়া বাধে ততই ভাল। রামবাবু বুঝিয়েছেন। শ্রেণী-সংঘর্ষ, বুর্জোয়া সভ্যতার শেষ সময়। উনপঞ্চাশ বইছে।

বালুঙ্গা হলধরকে দেখেই বলে ওঠে, "এই যে আমাদের কুলপ্রদীপ এসে গেছেন। এঁকে চিনতে পারলি শুকুরা? আমাদের নেতা ইনি। ওপাড়ার চৌধুরীবাড়ির ছেলে। 'বে' 'মে' কত কি পাস। হেরে গেলেন বটে কিন্তু ভাগু মহান্তি এঁর ধারেকাছেও লাগে না। ভোট কিনতে অনেক পয়সা খরচ করেছে ভাগু মহান্তি। তাই সরপঞ্চ হতে পেরেছে। না হলে কি পেরে উঠত এঁর সঙ্গে?"

শুকুরা নমস্কার করল। চৌধুরী হাত তুলে প্রতি নমস্কার করলেন। "সবই তো জান। আমি আর বেশি কি বলব?" হলধর সায় দিলেন।

"হ্যাঁ গো, পৈসা ক্যা না করে কাম, আ'বে পরশু যা'বে পরশু বাবু পরশুরাম! ভাগু মহান্তি গাঁ-ফেরেববাজ এখন দশখানা গাঁয়ের সরপঞ্চ — নাম কিনা শ্রীযুক্ত ভাগিরথী পট্টনায়ক।"

"যা বলেছ বালুঙ্গাদা। দেশ কি চিনল আমাদের? ছেলেবেলা মানে সেই বার বছর বয়েস থেকে আমি দেশসেবা করে আসছি। জেলে গেলাম। লাঠি খেলাম। গুলিও লাগত, একটুর জন্যে রক্ষা পেয়ে গেছি।"

"ওহে, আজ শহীদ হয়ে বসতে। তোমার নামে নগর বসত। খাম্বা গাড়া হত।"

"সেই তো আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা বেঁচে গেলাম। যার জন্যে এত কষ্ট করলাম, এত দুঃখ সইলাম, তারা কি খোঁজ নিলে? আমরা মূর্খ। গান্ধীজীর কথায় লেখাপড়া ছেড়ে কংগ্রেসে ঢুকলাম। না একূল, না ওকূল— উকিল, মন্ত্রী— নেতা রাস পটনায়েক না সরপঞ্চ ভাগু মহান্তি! না কি বল বালুঙ্গাদা?"

"ভাবছিলাম" বালুঙ্গা গম্ভীর হয়ে বলে,"কার জন্যে এত নাচানাচি? কার সাতানব্বই পুরুষ উদ্ধার পেল এই তোমরা যতসব জেলে গেলে লাঠি খেলে তাতে? কত কি গেল?"

"কি? তুমিও ওই কথা বললে বালুঙ্গাদা? ভাগু মহান্তি যা বলে তুমিও তাই আওড়াচ্ছ? তোমার মতো সবজান্তা পাকা লোকের মুখে এটা কি শোভা পায়? বল তো, দেশ কার জন্যে স্বাধীন হল?"

"ও, স্বাধীন! দেশে স্বাধীন এসেছে? কই কোথায়? কতদূরে এসে পৌঁচেছে?"

বালুঙ্গার কথাগুলোয় যেন ধার নেই। হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল হলধর— "ওগো বালুঙ্গাদা, তুমি বোকা নও। সত্যি সেয়ানা, ন্যাকা সাজছ।"

"সত্যি বাবু হলধর, আমি বোকা মানুষ। বুঝতে পারি না সব কথা। স্বাধীন-টাধিন খুব বড় বড় কথা। আমার মগজে সত্যি ঢোকে না। আমায় বরং বুঝিয়ে দাও। দুখীদাও ত আছে। সেও নিশ্চই জানে স্বাধীনতা কি জিনিস। সেও ত জেল খেটেছে। তাতে হল কি? এত যে কষ্ট করলে, কি পেলে?"

"কি হল?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হলধর। "ইংরেজের মতো সরকার লেজ গুটিয়ে পালাল। আর কি হত? আমাদের হাতে শাসন তুলে দিয়ে গেল।"

"কার হাতে, কার হাতে?" কিছু না জানার না বোঝার মতো জিজ্ঞেস করে বালুক্সা। "কার মাথায় হাতী কলস ঢালল? কার মাথার মুকুট পরানো হল?"

"কিছু না জানার মতো কি জিজ্ঞেস করছ বালুক্সাদা? কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে গেল না?"

"কংগ্রেস? সেটা কেমন লোক হে? ঢ্যাঙা না বেঁটে, কালো না ফর্সা? মোটা না পাতলা?"

"কংগ্রেস মানে কংগ্রেস। বুঝতে পারছ না? মানে একটা দল, একটা পার্টি।"

"পার্টি না পেটি? পার্টিটা কেমন করে রাজা হবে হে?"

"মানে পার্টির প্রতিনিধিরা রাজা। অর্থাৎ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, নেহেরু আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ইংরেজ পালাল। দেশ স্বাধীন হল। বুঝলে? লোকে ভোট দিয়ে নেহেরুকে শাসন দায়িত্ব দিল।"

"তাই বল। এবার বুঝেছি।"

"কি বুঝলে?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

"কি আর বুঝব? ভোট মন্ত্রী হল আর কি।"

হেসে উঠল সবাই। দুঃখী কিন্তু বালুক্সার পক্ষ নিয়ে বলল — "বালুক্সাদা কি আর খারাপ বলেছে? যে মন্ত্রী হবে সে ভোটের জোরে হবে না তো কি আপনি হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কীচকের বাহুবলে বিরাট রাজা। তেমনি ভোটের জোরে যে রাজা হবে।" বালুক্সা বলল।

"রাজা নয় মন্ত্রী", শুকুরা শুধরে দিতে চাইল।

"রাজা হোক বা মন্ত্রী হোক, দিল্লীর সিংহাসনে এখন কে বসেছে বলত — কে এখন দিল্লীশ্বর অতএব জগদীশ্বর?"

"এটুকু খবর রাখ না?" বুক ফুলিয়ে হলধর বলতে থাকে — "পণ্ডিত নেহেরু। আমাদের প্রধানমন্ত্রী।"

"মন্ত্রী-সন্ত্রী নয় হে। কে রাজা হল ওই নিঠুর ভুঁইতে আগে বল।" বললে বালুক্সা। ওর কথার ধরন ওইরকম। হেঁয়ালি রেখে বলে।

"নিষ্ঠুর ভুঁই কি গো?" দুঃখী জিজ্ঞেস করে। "এখন তো ইন্দ্রপুরী কি দেখবে বাহার।"

"যত বাহারই খুলুক তবু নিঠুর ভুঁই।"

"কেমন করে?" হলধর জানতে চায়।

"আরে। নিঠুর ভুঁই কি জান না? কি গো দুখীদা, দিল্লীটা যে নিঠুর ভুঁই এটা কি আমার মনগড়া? পুরাণ-শাস্ত্রের কথা। পুরাণ-শাস্তর ত পড় না, জানবে কি করে? বলছি শোন।" পুঁথি খোলে বালুঙ্গা— "নাড়ি না চিনে-বৈদ্য সাজ। পুঁথি শাস্তর না পড়ে নেতা-কি না আমরা দেশসেবা করব। আরে, দিল্লীর নাম শুনেছ, দেখেছ কি? বাইরে বাইরে দেখে থাকবে। গভীরে দেখ। ওর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, বুঝলে? ওরই কাছে কুরুক্ষেত্র যেখানে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। ভায়ে ভায়ে কোন্দল বেধেছিল। সেটা মাটির গুণ, বুঝলে? সেখানে যে সিংহাসনে বসবে সে ভাই-বেরাদারের সঙ্গে ঝগড়া না করলে ভাত হজম হবে না।"

সবাই মনে মনে হাসে।

"হাসছ? আমার কথা ঠাট্টা বলে ভাবছ? আরে সেখানেই ত দুর্যোধন ছেলে লক্ষ্মণকুমারের মড়ার ওপরে রক্তনদী সাঁতরে পার হয়েছিল, মনে আছে? তারই জন্যে ওটা নিঠুর ভুঁই। সেখানে মা নেই, বাপ নেই, ছেলে নেই, নাতি নেই। খালি খ্যামতা আর পয়সা।" সবাই চুপ করে থাকে।

হলধর বলে উঠল— "সেখানে কি কারো ছেলে বউ থাকে নাকি? সব তো একা-একা ঘোরে।"

"আরে তা না। আমার কথার মানে হল সেখানে মায়া-মমতা কিছু নেই। পুরাণের গল্পটা তবে শোন",— বালুঙ্গা সোজা হয়ে আসনপিঁড়ি করে বসে— "কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হবে। সব ঠিক। মুস্কিল হল— কোথায় হবে। কোন জায়গায়? কৃষ্ণকে সঙ্গে করে কুরু-পাণ্ডবরা খুঁজতে বেরোল। চাই এমন এক নিঠুর ভুঁই যেখানে বাপ বেটার, ভাই ভাইয়ের মায়া-মমতা ভুলে মানুষ হানাহানিতে মেতে যাবে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছোল একটা নির্জন মাঠে। দেখল সেখানে দুজন চাষা লাঙল চষছে। চড়া রোদ। তেষ্টায় প্রাণ আকুপাকু। এক ফোঁটা জল নেই কোথাও। একজন একটু বয়স্ক। তাকে জিজ্ঞেস করলেন জল কোথায় পাওয়া যাবে। ঠাস জবাব— বলতে পারব না। অন্য লোকটির দিকে যাচ্ছেন, তাকে একটা নাগ এসে দংশে দিল। সেখানেই লোকটা ছটপটিয়ে পড়ে গেল। অন্য লোকটি তাকাল। উঁ-চুঁ কোনো কথা নেই। কুরু, পাণ্ডব, কৃষ্ণ সকলে অবাক। লোকটির কাছে গিয়ে দেখেন সব শেষ। আর একদিক থেকে এল এক মেয়েছেলে। জল ভাত নিয়ে এসেছে। চাষাটির বউ সে। ভাতারকে জলটল দিল। চাষাটি জল খেল চোঁ চোঁ করে। বউ বললে— ছেলে? স্বামী চোখ ঠেরে দিল— ওই যে! মানে ওখানে পড়ে আছে দেখ। মেয়েটি গিয়ে দেখল ছেলে মরে পড়ে আছে। চোখে এক্‌ফোঁটা জলও এল না। তেমনি ডগমগ করে চলে গেল বাড়ি। কৃষ্ণ বললেন, এটা বড় নিঠুর ভূমি। বাপ-মায়েরও ছেলের জন্যে মমতা উবে যায়। এ মাটির গুণ। এখানেই যুদ্ধ হবে। তাই হল। তার নাম হল কুরুক্ষেত্র। সেই কুরুক্ষেত্রতে ভোটের সরকার বসেছে মানে আবার কুরুক্ষেত্র হবে। কুচক্রতে তছনছ হয়ে যাবে মারপিট করে। গান্ধী বলি হয়েছেন— বল্লালসেনের মতো। এখন সামলাও—"

শুকুল্লু বলল— "আরে ভাই, বিনা রক্তপাতে শান্তি হয়েছে কোথাও? আমি কত মারপিট দেখে এলাম। কুরুক্ষেত্র সবখানে। ওখানে যদি হয় তো কি বয়ে যাবে? আপনি সব শুধরে যাবে।"

"আর শুধরেছে! আদপে বাঁকা, কখনো সোজা হবে না।" বালুঙ্গা বলে।

"আর তোমার ইংরেজ সরকার ভারি ভালো ছিল?" চৌধুরী হলধর বলে ওঠেন।

"ইংরেজ শাসন ঢের ভালো ছিল বাবু।"

"তুমি একটা খাঁচার পাখি বালুঙ্গাদা। পরের গোলামি এত ভালোও লাগে! সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে তোমাকে কান ধরে ওঠা বসা করাচ্ছিল ইংরেজরা, তাতে খুব সুখ হত, নয়?" হলধর বলেন।

"তারা সাত সমুদ্দুর সে-পার থেকে শাসন করত। এঁরা তের নদীর ওপার থেকে শাসন করছেন। তারা বিলেত থেকে, এরা দিল্লী থেকে। তারা গোরা, এরা কালা, এই ত তফাত।" বালুঙ্গার উত্তর।

"তফাত নেই? ওরা বিদেশী, এরা আমার দেশের লোক। তফাত নেই? আকাশ-পাতাল তফাত।"

"শত্রুর থাকে মায়ের পেটে, বুঝলে? তারা ছিল বণিক, ব্যবসা করত। দু পয়সা হলে হল। তাদের টাকা চাই, আমাদের কাঙাল করে ছেড়ে দিল। আর তোমরা? শুধু ধনে কি কালা সরকারের আকাঙক্ষা মিটচে? মোদের মান-মর্যাদা বুদ্ধি-বিচার সব দিয়ে মোরা দারুভূত হয়ে বসে আছি, না কি বল দুখীঠাকুর?"

"বালুঙ্গাদার চিরকাল ওই সেকেলে কথা। তুমি যতই চেঁচাও তোমার ইংরেজ সরকার আর ফিরছে না।" হলধরবাবু বললেন।

"ফিরে এসে কি আমাদের স্বর্গে নেবে? সে কেন আসতে যাবে? তোমরা ত ঠাকুর খেয়ে আসনসুদ্ধু হজম করে বসে আছ। তাদের জন্যে আছে কি?"

"কি, আমরা খেয়েছি? প্রমাণ দিতে পার?" তেতে উঠলেন হলধর।

"আরে, তুই এমন রেগে যাচ্ছিস কেন রে হলী?" দুখী দাশ বললেন, "তার কথা সে বলছে, তোর কথা তুই বল, বল না।"

"কি আর বলি? চোখে কি আঙুল খোঁচা মেরে দেখিয়ে দেব? সবাই কি কানা? দেখতে পায় না কি হচ্ছে? এই যোজনা, এই রাস্তাঘাট, সড়ক, স্কুল, ডাক্তারখানা— এ সব কি ইংরেজ করে দিয়ে গেছিল? গাঁয়ে গাঁয়ে রাস্তাঘাট কার কেরামতি?"

"ঠিক, ঠিক।" বালুঙ্গা জবাব দিল হলধরকে। "ঠিক বলেছ বাবু; গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্কুল, গাঁয়ে গাঁয়ে পথঘাট। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা সেই সড়কপথে— খালি মটর, খালি সাইকেল, কার মটর কার সাইকেল বাবু? শহরে লোকদের, আমাদের নয়। যত ইঞ্জিরি পড়ুয়া বড়লোক — তাদেরই সড়ক। তাদেরই ছেলেপিলেদের জন্যে ইস্কুল কলেজ। আমাদের পয়সা কোথা যে আমাদের ছেলেরা পড়বে? মন্ত্রী, নেতা, হাকিম, দিপুটি, আমলা পিয়ন, তোমাদেরই জন্যে যোজনা। গাঁ শুধু পেছনে পড়ে। গাঁয়ের লোকরা কি স্বাধীন হল?"

লেগে গেল দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি। হলধর বললে, "শিক্ষিতেরা তাহলে অপরাধ করেছে। কারণ পয়সা ফেলে লেখাপড়া করেছে যখন। সেটা তোমার চোখে লাগছে। শিক্ষিতেরা কি বসে খায়? কারো কাজ করে খায়।"

"আমরা খাটি না, নয়? আমাদের চেয়ার নেই, আমাদের খাটনি কি মেহনতে লেখা? তোমারই যা খাট। বিজলিবাতি, বিজলিপাখা। আমরা ত সব মানুষ-মড়া। রোদ-বৃষ্টি কি আমাদের শরীরে বাধে? বাধে কেবল পড়ুয়াদের, শহুরেদের।"

"তারা বুদ্ধি খরচ করে।"

"বুদ্ধি থেকে কি ভাত গজায়, না পয়সা গজায়? পুষছে কে কাদের? টাকা কার? খাজনা কে দেয়?"

হলধরবাবু মারের ওপর মার খেয়ে একটু নরম হয়েছেন। বললেন— "তা হলেও তারা তোমাদের চাকর। তোমাদেরই সেবা করে মাইনে কিছু পায়।"

"আ হা হা, কথা একটা বললে বটে। মনে লাগার মতো, মুনিব বড় না চাকর বড়? মুনিবের চেয়ে চাকর কোথাও বেশি অর্জন করে? যাও যাও, বাঁড়ি মেয়েদের সামনে তোমার ব্যাখ্যান করবে, তারা শুনবে। আমরা ত তোমাদের চাইনি। হাতী পুষবে কে? তোমরা জোর করে সেবা চাপিয়েছ আমাদের ওপরে। কেন এত সোহাগ বলত? মেগে পেন্নাম যেচে কল্যাণ! তোমরা চলে যাও বাপু গাঁ থেকে সব পড়ুয়া শহুরের দল। মোদের কথা মোরা বুঝব।"

"তুমি কি বলছ বালুঙ্গাদা? এই শিক্ষিত-শহুরে লোক সব চোর? পাড়াগাঁকে তারাই শোষণ করছে? মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, সরদার প্যাটেল এঁরা সব কি মফস্বলের লোক? এঁরা গ্রামকে শোষণ করতেন? দেশকে তাহলে স্বাধীন করল কে?"

শুকুরা বসেছিল। হলধরের মুখের কথা ফুরাতেই হঠাৎ বুক ফুলিয়ে লাঠির মতো মাথা সোজা করে বসে উঠল, যেন খুব খেপে গেছে তেমনি তার স্বর,— "কি বললে, কি বললে? কে দেশ স্বাধীন করল?"

"গান্ধী, নেহেরু আবার কে?"— ঠোস জবাব হলধরের।

"ও হো— ভারি আমার স্বাধীন-করনেওয়ালা! এহ, গান্ধী নেহেরু স্বাধীন করেছে? এরা কোন জন্মে স্বাধীনতা পেতে পারত?"

"গান্ধী নেহেরু করল না ত কে করল?"

"কে করল? জান না তুমি? এ দেশকে যে স্বাধীন করেছে সে হল"— হাত তুলে নমস্কার করল শুকুরা— "তিনি হলেন নেতাজী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।"

চোখদুটো যেন তার কানের গোড়ায় লেগে গেল। ইয়া বড় বড় চোখ। দেখলে ভয় পাবে লোক। বুকটা শ্বাস নিয়ে ফুলে উঠেছে। সূর্য মাথার ওপরে। প্রচণ্ড রোদ্দুর। শুকুরার শরীরটাও যেন জ্বলছে, উত্তাপে। সত্যি সত্যি তার রূপ দেখে ভয় পেল সবাই। দুঃখী বুঝতে পারল শুকুরার ভক্তি নেতাজীর প্রতি। দেশের প্রতি। ঝগড়ায় দাঁড়ি টানার উদ্দেশ্যে বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নেতাজীর মহৎ দান অস্বীকার করা যায় না।"

এই সময় রামবাবু এলেন। আলোচনার বিষয় জেনে নিয়ে বললেন— "আপনাদের

কারো কথা ঠিক না। গান্ধী নেহেরু স্বাধীনতা আনেননি কিম্বা নেতাজী পিতাজীও আনেননি, 'মিলিত চেষ্টাতেও' রুশ-আমেরিকা-ইংল্যান্ডের জয় হয় না আর ভারতও স্বাধীন হয় না। কেউ যদি বলে যে মিত্রশক্তির অন্যতম ব্রিটিশ সরকারকে পরাভূত করে ভারত স্বাধীনতা হাসিল করেছে, আমি বলব সে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করছে। ব্রিটিশ সরকার আমাদের ভয়ে স্বাধীনতা দিয়ে গেল বলে যদি কেউ দাবি করে তবে আমি তাকে প্রশ্ন করব— বার্মা, মালয় স্বাধীন হল কি করে? শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হল কি করে? প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য হল ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তির পরাজয়। গণতন্ত্র আর সমাজবাদী মিত্রশক্তির বিজয়ের ফলে পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত সৃষ্টি হল। সে যত বড় শক্তি হোক না কেন, কোনো দুর্বল দেশকে অধীনস্থ করে রাখা আর সম্ভব হল না। তাই ব্রিটিশ সরকারের এই দেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া এক ঐতিহাসিক আবশ্যকতা। ভুয়ো ধমকে ভয় পেয়ে ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে যায়নি।"

"বুঝতে পারলেন আপনারা রামবাবু যা বললেন? বুঝে দেখুন।" দুঃখী মন্তব্য করল— "তাঁর বলার কথা হল জনযুদ্ধে যারা সহযোগ করেছিল তাদেরই জন্যে দেশ স্বাধীন হল। না কি বলেন রামবাবু?"

"আলবাত"— রামবাবু বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতের মুঠো কিল মেরে বললেন— "দুখীদা না হলে এমন কথা কে বলবে? দুখীদা আজকাল একটু একটু পড়াশুনো করছো বোধ হয় আমার কথা শুনে। তা না হলে এত ভেতরে ঢুকলে কি করে?"

"আমি কি তোমার শাস্ত্র থেকে বলছি?" দুঃখী দাশ মুচকি হেসে বলে। "এ সব আমাদের শাস্ত্রের কথা। আমাদের ইতিহাসের কথা। বিভীষণ, সুগ্রীব, জয়চন্দ্র, মীরজাফর, রামচন্দ্রদের কি পুরাণ-ইতিহাসে স্থান নেই? জয় কার হয়েছে? ওদেরই শেষে জয় হল।"

"দেখ, দেখ, কোথা থেকে কথাটাকে কোথায় নিয়ে তুলল। তুই দুখীদা ওই সেকেলে ঢঙ ছাড়বি না।" রামবাবু ঘুরিয়ে দিলেন কথাটাকে। চালাক লোক। বললেন, "হ্যাঁ হে দুখীদা, তোমার ভাগে মন্ত্রী-টন্ত্রী একটা কিছু পড়ল না?"

"আমরা আবার কিসের মন্ত্রী হব গো? মন্ত্রী হবে তোমরা— না— যুদ্ধওয়ালা। আমরা তো অক্ষশক্তির ভাগীদার, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করলাম। আমরা সব দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, যুদ্ধখোর আর কি যেন তোমাদের ভাষায় বলে থাক — কুইস্‌লিং পঞ্চমবাহিনী। নয় কি?"

রামবাবু দেখলেন কথা ঘোরানো গেল না। দুঃখী তাঁকে গণ্ডগোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। তিনি ওর উপহাসকে ব্যবহার করে আক্রমণের সুবিধা পেলেন, "ঠিক বলেছ। এতদিনে তোমার মুখে ভাবপ্রবণ-ভাষার অভাব দেখলাম। চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গে আক্কেল হয়েছে তোমার। গান্ধীজী অবশ্য আন্দোলন করেছেন। মিত্রশক্তির সংগ্রামকৌশলের পক্ষে সেটা তেমন মারাত্মক ছিল না। কিন্তু তাঁর অনুচররা আগষ্ট বিপ্লবের নামে যে ভাঙচুরের কাজ করল, আমার মতে তাদের যুদ্ধবন্দীভাবে কোর্ট মার্শেল বিচার করে গুলি করে দেওয়া উচিত ছিল। সবথেকে বড় অপরাধী হলেন সুভাষ। মিত্রশক্তির শত্রুর সঙ্গে তিনি হাত

মিলিয়েছিলেন। ভারতকে চিরদিনের জন্যে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে দিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর ষড়যন্ত্র। জাপানের দালাল, জাপানের গোলাম, জাপানের পা-চাটা 'পাপেট' মানে হাতের পুতুল—"

মুখ থেকে কথা না ফুরোতেই শুকুরার চেহারা দেখার মতো, অসুর-গুরু শুক্র আর কি! বলল, "কি বললে, কি বললে? বলত আর একবার! তোমার জিব উপড়ে না নিই তো আমার নাম শুকুরা নয়। আমরা জাপানের পা-চাটা, গোলাম পাপেট? আর তোমরা? রুশের জুতোচাটা, এঁটোখাওয়ার দল। রুশ যখন জার্মানীর পক্ষে ছিল তখন তো ওর গু'ও ভালো লাগত। ব্রিটেন আমেরিকা তখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী। মিত্রশক্তিতে রুশ মিশে গেল তো তোমরা উলটে পড়লে, ডিগবাজী খেলে। কী, না জনযুদ্ধ! রাশিয়াতেই শুধু জন আছে। জার্মানী জাপানে কি আর কোনো জন আছে? তারা সব পশু। এহ্ — খুব বলতে পার যা হোক!"

রামবাবু শুকুরার গলার ওপর গলা চড়িয়ে বললেন— "আচ্ছা, সুভাষবাবুর আই.এন.এ.-টা কি আমায় বল দেখি? জাপানের অনুগ্রহে আই.এন.এ. গড়া হয়নি? জাপানের টাকা, জাপানের মিলিটারী অফিসার। আরে জাপানের পতাকার নীচে যুদ্ধ করত না তারা? আই.এন.এ.-র সাহায্যে জাপান ভারত দখল করে থাকলে সুভাষবাবুকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাত বুঝি? এত বেকুব!"

"চুপ কর বেইমান! দেশের জন্যে যে প্রাণবলি দিল, তাঁকে তোমরা এমনিই বলে থাক। প্রমাণ দিতে পার যে আমরা জাপানের পতাকার নীচে লড়েছিলাম। আমাদের অফিসার জাপানী ছিল? আমি প্রমাণ দেব মিথ্যে মিথ্যে, সব মিছে কথা। দেখবে? আমি দলিল বার করে দেখাব?"

উঠে গেল শুকুরা ওর চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া ঘরের দিকে। বলতে বলতে গেল— "বাপের ব্যাটা হও তো প্রমাণ দেবে। আমি দেখাচ্ছি কে কার পা-চাটা।"

সঙ্গে সঙ্গে ওর প্যাঁটরা নিয়ে বেরিয়ে এল। সম্পত্তির মধ্যে ওই প্যাঁটরাখানা,— দেখে গাঁ-সুদ্ধু কে কত কি ভেবে নিয়েছে। শুকুরা দৌলত এনেছে কলকাতা থেকে। হাজার হাজার টাকা, কত কি। বাক্সটা ভারিও বটে। শুকুরা ওর সেই রত্নভাণ্ডার এনে হাট-খোলা করে রেখে দিল সবার সামনে। সবাই অবাক। এ কোন শুকুরা? পঁচিশ বছর আগেকার সরল বোকা এ কি সেই শুকুরা? এ কি রূপ ওর?

এক এক করে প্যাঁটরার ভিতর থেকে বের করে রেখে দিল সবার চোখের সামনে। "এই যে দেখ আমার পোশাক — ইউনিফরম-ডেরেস। এই দেখ আমার র‍্যাঙ্কের ইনসিগনিয়া।"

শুক্র ছিল— ইন্ডিয়ান ন্যাশনল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজের ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। ল্যান্স্‌নায়েক থেকে প্রমোশন পেয়েছিল। আশা ছিল একদিন কাপ্তান হবে। তার সে আশা সফল হয়নি।

"এখানে কোথায় জাপানের মার্কা মারা হয়েছে — দেখ। চোখ খুলে দেখ। এই যে দেখ আমাদের শপথপত্র—"

পড়ে শোনাল সকলের সামনে। পড়তে পড়তে ওর শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বুক ফুলে উঠতে থাকে। ঘাড় সোজা।

"আমরা যত আজাদ হিন্দ সংঘের সভ্য ছিলাম সকলে এই শপথ নিয়েছিলাম— নিতে বাধ্য— ঈশ্বরের নামে— গীতা, কোরাণ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব, যার যে ধর্মশাস্ত্র তাকে ছুঁয়ে। আমরা এটা পড়তাম— নেতাজীর সামনে না হলে আর কোনো কমাণ্ডার— সেনাপতির সামনে। আমিও পড়েছিলাম এই কাগজ। পড়ে সই করেছিলাম—

"আমি শুক্রসেন বারিক, আজাদ হিন্দ সংঘের সভ্য, এতদ্বারা সমস্ত দায়িত্ববোধ ও গুরুত্ব সহকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণপূর্বক পণ ও প্রতিজ্ঞা করে এই শপথ গ্রহণ করিতেছি যে আমি কায়মনোবাক্যে আজাদ হিন্দ নামক অস্থায়ী সরকারের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে যে কোনো ত্যাগের নিমিত্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিব।

"এতে কোথায় আছে জাপানের পা-চাটা হওয়ার কথা, বল? কি হল রামবাবু? চুপ কেন? যে কথা জানেন না সে সম্বন্ধে তম্বি-তুফান করাটা কি ভাল?"

রামবাবু কিন্তু তাঁর দম্ভ ছাড়বার লোক নন, তিনি হেসে ফেললেন শুকুরার কথায়। বললেন— "সরকার, তায় আবার অস্থায়ী — হা হা হা— কচুগাছের গোড়ায় একটা ব্যাঙ নিজেই মনে মনে ভাবে যে সে রাজা। জাপানী কচুগাছের নীচে আজাদ হিন্দ সরকার।"

আর শুকুরাকে সামলায় কে? খেপে উঠল। বলল— "কি বললে? ব্যাঙ? দেখবে ব্যাঙের কেরামতি?'

কাপড় চোপড় এঁটেসেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল শুকুরা। তার হাতখানা ধরে টেনে বসিয়ে দিল দুঃখী দাশ। "বোস, বোস, বেশি গোঁয়ার্তুমি করিস না। এত বদরাগী তুই!"

"কেন উনি এমন করে বলছেন? যে সরকারকে জাপান, জার্মানী, বর্মা ফিলিপাইন, মাঞ্চুরিয়া, নানকিন্ এমন না জানি কত দেশ রাষ্ট্র স্বীকৃত দিয়েছিল, তাকে বলেন ব্যাঙ? তাঁর জিভে হাড় আছে?"

"না রে শুকুরা, রামবাবু তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলেন।" বলল বালুঙ্গা।

"কিছু না জেনে কেন উনি কথা বলেন? জান দুখীদা, জাপান আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। আর ইনি বলে কি না ব্যাঙ!"

"না রে, উনি মজা করে বলেছিলেন।" আবার বলল বালুঙ্গা।

"আমি মজা বার করে দেব, জান?"

দুঃখী দাশ পরিস্থিতিকে সামলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, "আমরা কোন কথার জন্যে বসেছিলাম আর কথা গিয়ে কোথায় ঠেকল। এখানে আর একটা মহাভারত শুরু হবে নাকি?"

রামবাবুও নরম হয়ে এসেছেন। তাঁর দেশপ্রীতি একটু দমে গেল বলাটা ঠিক নাও হতে পারে। তবে যুক্তি দেখানোর জন্যে তাঁর ভিতরে আর কিছু মশলা ছিল না। বললেন, "কোন কথার জন্যে বসেছিলে আমায় তো কিছু বলনি?"

"এই শুক্রা বারিকের কথা।" বালুঙ্গা বললে। "সে কেমন করে বসবাস করবে সেই কথা।"

"সরকার তো আই.এন.এ. লোকদের জন্যে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে," হলধর বললেন। "জমি জায়গা, বাড়িঘর সব করে দিচ্ছে। শুকুরার চিন্তা কিসের?"

"দুস্থ রাজনৈতিক কর্মীদের দেওয়ার মতো?" দুঃখী হাসল।

"হো - হো,"— হেসে উঠল বালুঙ্গা। "সব বসে খাওয়ার ফিকির। একদল ফোঁটা-তিলক কাটা লোক যেমন দিন কতক ভিখ মেগে পেট পুরত, এখন তেমনি একদল খদ্দরপরা সুতোকাটা খাদিওলা বেরিয়েছে। ভিখ ভিখ। সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষা। নয় ত কি? মন্ত্রীর এঁটোখাওয়া এরা সব। মন্ত্রীরা ছাগল-মুর্গির বংশ নিপাত করেন আর এদের জন্যে ছুঁড়ে দেন হাড় এক একখানা। ওতেই মশগুল। তাকিয়ে বসে থাকে আবার কবে ভোট হবে। তখন মন্ত্রী খোঁজ করবেন এই সুতোকাটাদের আর কর্মীরা খুঁজবে মন্ত্রীকে। সেই ভোটের দিনকে চেয়ে মাসে পঁচিশ টাকা মজুরীতে বসে থাকে। শুধু ঢেউ গোনা এদের কাজ।... 'কর্ম কষণে দেহ বয়। অরণ্যে অজগর প্রায়।।'... কই, দুখী দাশ ত দৌড়ে যায় না পেনসানের জন্যে? আরে, দেশসেবা করার ত ব্রত নিলে। তাতে আবার মজুরি, পাওনা এসব কি গো? ভগবান সেজন্যে উদ্ধবকে বললেন—

'তু এবে সর্বপ্রাণী হিতে। নিরতে থাক শান্তচিতে।।
আত্মকুশলে সর্বসিদ্ধি। তরিবে সংসার বারিধি।।' "

"এগুলো সব ফাঁকা আদর্শবাদ"— রামবাবু বললেন। হলধরের কথা শোনো শুকুরা, দরখাস্ত দাও। একটু দৌড়দৌড়ি করতে হবে। না করলে চলবে কেন? ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য—"

রামবাবুর মুখে সংস্কৃত! সকলে অবাক। হেসে উঠল একসঙ্গে।

"না, না, হাসির কথা নয়," বালুঙ্গা বললে— "রামবাবু যা বললেন সেটা ওর ইচ্ছে হয় ত করুক। মন্ত্রী, তাঁর কানফোঁকা, কারপরদাজ, এজেন্ট, কর্মীদের কাছে যতবার দৌড়োতে হয় দৌড়োক। পায়ে ঠেকাতে ঠেকাতে মাথায় টাক পড়ে যাক। আমার আপত্তি নেই। তবে এসব পাওয়ার আগে আমার ছোট কথাটি মানিস রে শুকুরা। গিয়ে রতনীকে নিয়ে আয়। এখন এখানেই থেকে যা তোরা দুজনে। দুখীদাদার ত এটা আশ্রম। সে কি মানা করবে? কাউকে কখনো মানা করেছে যে করবে? না কি বল দাঠাকুর? সে এখানেই থাকুক আপাতত।"

"সে তো আছে। থাকবে আবার কি? রয়েছে তো।" দুঃখী বললে।

"শুকুরা না হয় আছে। আমি ভাবছি রতনীর কথা। পাছে তোমার কোনো..." বালুঙ্গা দ্বিধায় বলে।

"রতনী আগে আসুক। এলে দেখা যাবে। কিচ্ছু আটকাবে না। ভাবনার কথা হচ্ছে ওর স্থায়ী ব্যবস্থার জন্যে। এই তালপাতার বেড়া দেওয়া জায়গা— ভিতরে থাকতে পারবে তো দুটো প্রাণী? চিরদিন? পারলে ভালো। আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"স্থায়ী ব্যবস্থা আমাদের হলধরবাবুর হাতে। ভাগু মহান্তির কান মলিয়ে নাক ঘষিয়ে বাগে আনার লোক পাড়াপড়শিতে আর কে আছে?" বালুঙ্গা উসকে দেয় হলধরকে।

"আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দেখছি কি করা যায়!" ফুলে উঠলেন হলধর। "শুকুরা, তুমি একটা দরখাস্ত লেখ আগে, সভাপতি উৎকল কংগ্রেস কমিটির কাছে। তন্ন তন্ন করে সব ঘটনা খুলে লিখবে। কিছু বাদ দেবে না। প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব"।

"দরখাস্ত কে পড়বে? কে যাচাই করবে? ভাগু মহান্তি তো? সে না শুনলে তার কে কি করতে পারে?" শুকুরা বললে।

"আচ্ছা, আমি তার ব্যবস্থা করব না? আমি গাঁয়ের ছোকরাদের লাগিয়ে ওদিকে দরখাস্ত করে দেব না যে ভাগু মহান্তি জাল সই দিয়ে কংগ্রেস সভা করেছে? কোনো লোক সই করেনি কিম্বা টাকা দেয়নি। ছোক এনকোয়ারি। বড় সক্রিয় সভা বননেওয়ালা। আমি ওর দেমাক ভেঙে দিচ্ছি। দাঁড়াও, দেখ কি হয়।" মতলব বাতলালেন হলধরবাবু। "এদিকে খবরের কাগজেও বেরোবে— 'অমুক সরপঞ্চের জাল দস্তখত সংগ্রহ।' না কি বল?"

"কোন কাগজ বের করবে কংগ্রেসওলাদের নামে?" রামবাবু বললেন। "সব কাগজই তো কংগ্রেস সমর্থক!"

"কংগ্রেস সমর্থক কেন বলছ? সরকারের সমর্থক বল।" দুঃখী দাশ সংশোধন করে বলল। "সরকারের ঝোলার মধ্যে সবগুলো!"

"যার হাতে থাকে থাকুক, খবরকাগজে কি করে বার করতে হয় আমার জানা। এক কাপ চা, দুটো শিঙাড়া— ব্যস!"

"খবরকাগজ ত নয়— কবর কাগজ।" বালুঙ্গা বলল। "সব মরার খবর, পুরোনো কথা। আরে বাবু, আজকের কথা কালকের কথা বল। আগামী ভবিষ্যৎ বল। লোকে শিখবে। সাবধান হবে। কই, কোথায়, কে বলে সে কথা? শাস্ত্র পুরাণ পড়লে তবে সে সব জানত। আজকাল কে আর পড়ে সে সব? এখন ত কংগ্রেসীবাবুরা শেখালেন সায়েবি ফ্যাসান, সায়েবি পোশাক, সায়েবি খানা, সায়েবি ঠাটবাট। আমাদের বাপ-ঠাকুরদা উষাকালে উঠত। যখন লোম দেখা যায় না, মুখ দেখা যায় না, তাকে বলে উষা। তখন গ্রহগুলো সব মূষা মানে ইঁদুর। সেটাই হল ব্রাহ্মমুহূর্ত। তাঁরা তখন থেকে উঠে পূজাপাঠ করত। এখন ত আমাদের বেটাবেটিরা সকাল আটটায় বিছানাতে আলস ভাঙে। শুয়ে শুয়ে বিছানাতে, মুখ না ধুয়ে, দাঁত না মেজে খায় 'বে - টী' না কি যেন হে রামবাবু?"

বালুঙ্গার কথায় হেসে উঠলেন রামবাবু— "বেড-টি মানে শেজ-চা।"

"ঠিক, ঠিক, শেজ-চা। তারপরে খবরকাগজ। বিছানা থেকে পায়খানা পর্যন্ত।"

"বাথরুম - বাথরুম।" রামবাবুর সংশোধন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাথরুম। সেই বাথরুমে বসে খবরকাগজ পড়া হয়। পায়খানায় কাগজ পড়লে নাকি বুদ্ধি খোলে। ইংরিজি কাগজ বলে বোধহয়।"

সবাই হাসল বালুঙ্গার কথা শুনে। শুধু হলধরবাবু একটু নাক সিটকে বললেন, "তুমি আমাদের যা বলবার বল না কেন বালুঙ্গাদা, সকালটা যে এত সুন্দর তার চরম উপভোগ

হয় কেবল ঘুমোনোতে। ভোরবেলার ঘুম যে আসল ঘুম। সকালে না ঘুমোলে কি ঘুমের আমেজ বোঝা যায়? রোদ ওঠার পর উঠলে শরীর তাজা থাকে। কাজে মন লাগে।"

"কি বললে? কাজে মন লাগে?" বালুঙ্গা জোর গলায় বলল— "বেলা আটটার সময় চাষার ছেলে বিছানা ছেড়ে বেড-টি খেয়ে খেতে যাবে? চাষ করবে না মাঠে গোরু চরাবে? ওসব বসে-খাওয়া শুয়ে-খাওয়াদের পোষায়। খেটে খাওয়াদের নয়।"

"যেতে দাও, আমাদের তাতে কি যায়।" দুঃখী বললে, "এ সব যুক্তির শেষ নেই। বলত হলধরবাবু, তুমি কেমন করে ভাগু মহান্তির কাছ থেকে শুকুরার ভিটেখানা হাসিল করবে? খবরের কাগজে এসব অত্যাচার পাপাচার যদি বেরোত তবে ভাগু মহান্তি সোজা হয়ে যেত।"

"বেরোবে তো?" রামবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"হলধরবাবু তো কথা দিচ্ছেন। নাকি, হলধরবাবু?"

"আলবাত বেরোবে।" হলধরের জবাব।

"এত ছোটকথা কি সম্পাদক বার করবেন?" রামবাবু জানতে চান।

"আরে, ছোট হোক বড় হোক, বেরোলে তো হল। সম্পাদক পর্যন্ত কথা যাবে কেন? এধার থেকেই মানে তলার দিক থেকে কাজটা হয়ে যাবে না? সংবাদ তো পাঠাবে স্থানীয় কাগজের লোক। তাঁর কিস্মৎ একটা শিঙাড়া এককাপ চা।"

"তার ওপরওলা মানে নিউজ এডিটার যদি..." রামবাবু বললেন। "এক প্লেট মাংস এক পেগ মদ," হলধর আর থামলেন না, বলে গেলেন।

"বেচারি সম্পাদক,"— দুঃখী দাশ সহানুভূতি দেখাল।

"আর খেজুর গাছে গোড়া থেকেই খাঁজ। সম্পাদক বা কোন ভালো। তাঁর দাম আর একটু বেশি। তিনি শ'য়ে থাকেন না, থাকেন হ'য়ে, বুঝলে?"

"সকলে কি তাই?" রামবাবুর প্রতিবাদ।

"সবেতেই অপবাদ থাকে রামবাবু।" হলধরবাবু বললেন।

"সব কম্যুনিস্ট দেশ কি সমান? রুশ চায়না কি এক?"

"যেতে দাও, পরচর্চা করে কিছু লাভ নেই।" দুঃখী দাশ বললে।

"পরচর্চা নয় বাবু, দেশচর্চা," বালুঙ্গা বললে। "গোটা দেশে অন্যায় পাপ ভরে গেল। সকালে পুরাণ-শাস্তর ছেড়ে আমরা যার পারায়ণ করলাম তার লেখনকাররা যদি এই হয় এ পুঁথি বসাল যে, পড়ল যে আর শুনল যে— শ্রোতা বক্তাদের অবস্থা একটু ভাবো ত বাবু!"

আবার একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বালুঙ্গা বললে "সে-সব কাগজ-টাগজের কথা বাদ দাও বাবু। এই টাউটার, ঘরভাঙানে, ধাপ্পাবাজ ভাগু মহান্তি সরপঞ্চের হাত থেকে ও নিরাশ্রয়ী বেচারা কি করে রক্ষে পাবে তার একটা উপায় কর কেউ।"

"আপনারা একটু সহায় হোন। আমার কাজ আমি করে নেব। মারকে মহাদেব ডরান।" শুকুরা বলে উঠল। ওর ধৈর্য ছিল না।

"ছি ছি, ওটা কি কথা!" দুঃখী বললে। "আমরা আর একবার-দুবার গেলে বুড়ো কথা মানবে বলে মনে হয়। যদি না মানে, সত্যাগ্রহ।"

"আমার ওই সত্যাগ্রহ-টত্যাগ্রহতে বিশ্বাস নেই। না কি বল রামবাবু?"

শুকুরা বললে, "নেতাজী কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন— 'গান্ধীজীর আইন-অমান্য সত্যাগ্রহ একদিন না একদিন সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেবে। তার জন্যে গুলি চালাবার শিক্ষা নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে।' এসব কালকের কথার মতো মনে হয়— তেতাল্লিশ সালের কথা। ভীষণ রোদ। তাকে খাতির নেই। হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে। রেঙ্গুন শহর। আমরা যত লোক যে যেখানে ছিলাম— বর্মা, মালয়, শ্যাম সব জায়গা থেকে আই.এন.এ-র সেনাদল সকলে শুনছিলাম। য়ুরোপ মহাদেশে যারা ছিল তারা ও রেডিওতে শুনে থাকবে। তাদেরও আমাদের মতো বুক ফুলে উঠে থাকবে। তাঁর কথায় আমাদের যে কি হয়ে যাচ্ছিল সে কথা ভাষায় কেমন করে বলব দুখীদা! এখনো সে কথা বলতে লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। সকলে যেন মরবার জন্যে রেষারেষি লাগিয়ে দিয়েছে। কে আগে মরবে। মরতে আবার এমন আপনা থেকে এগিয়ে আসে মানুষ! একটি লোক বাজুআদা, একটিমাত্র লোক। কি যাদু লাগিয়ে দিল সে। এই ওড়িয়া ছেলে তো! ওড়িশার মাটিতে জন্ম। তাঁর কথা আমার গুরুজ্ঞান।"

"সত্যি কথা। সোজা আঙুলে কোথাও ঘি উঠেছে?" বাজুআ বললে। "তবে কি জান বাবু? ভাগবত পদে বলেছে—

অমৃত বিনয় বচন। কহি তোষিবে প্রাণীমন॥
ধন কার্পণ্য সেবাবলে। কি বা অসাধ্য মহীতলে॥

দেখ বলে কয়ে, বাবা গো বাছা গো ডেকে, সেবায় কার্পণ্যে কতদূর যায়।"

"সে তো আমাদের সবাইকে সেবা করে গণ্ডুষ করে দেবে। ধৈর্য থাকলে হয়।" শুকুরার মুখ থেকে কথা ফুরিয়েছে কি না, বি.ডি.ও.-র চাপরাশি এসে ডাকল হলধরবাবুকে। বি.ডি.ও. বসে আছেন সরপঞ্চের বাড়িতে মানে ভাগীরথী পটনায়েকের বাড়িতে।

"কেন রে? হঠাৎ বি.ডি.ও. সাহেবের ডাক?" হলধর জিজ্ঞেস করলেন। চাপরাশি কিছু বলে না। ঠোঁটে মুচকি হাসি।

"কি রে, বল না?"

"আজ্ঞে, আমায় কিছু বলেননি। শুধু বললেন, ডেকে আন!"

"আর কে কে আছেন?"

"সরপঞ্চ আছেন। বৈদ্যনাথ মিশ্র আর কিশোরবাবুও আছেন।"

"আমাকে রামবাবুকে না আরো কাউকে ডেকেছেন?"

"না, আর কাউকে ডাকতে বলেননি।"

"দুখী দাদাকে?"

"না।"

"একটা কিছু সভা বসেছে?"

"আজ্ঞে আমি কি জানি? তবে কি একটা হচ্ছে।"

"কিসের সভা?"

"আজ্ঞে আমি জানি নাকি? বলছেন ময়লা সভা না কি যেন।"

"ময়লা সভা?"

"আজ্ঞে।"

"ও হো! মহিলা সভা। তাই বল।"

সবাই হেসে উঠল। "কার কার মহিলারা সব জুটেছেন?"

"আজ্ঞে আমি কি চিনি? তবে সব বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা।"

"মহিলারা কেন এসেছেন?"

"কি একটা মইলা সমিতি হবে বুঝি। গান্ধী মহাত্মা বলেছেন সব ময়লা সাফ করবে মেয়েছেলেরা। নারী জাতির কল্যাণ করবে।"

"কি বললি? নারী জাতি? ব্রাহ্মণ-কায়স্থর ওপরে না নীচে?" বালুঙ্গা জিজ্ঞেস করল। "স্বভাবে নারী জন্ম হয়ে। ধর্ম অধর্ম না জানয়ে।— সে আবার কি কল্যাণ করবে রে?"

রামবাবু উত্তর দিলেন, "এই সেকেলে কথা তোমার গেল না বালুঙ্গাদা। মায়েরা কি নারী নয়? তাদের কল্যাণ থেকে তো আমরা মানুষ?"

"আমাকে আর শিখিয়ো না রামবাবু। মাতৃবৎ পরদারেষু কজন দেখে গো? মায়েরা নারী ঠিক তবে সব নারী মা কেন হবে? বাঁজা মেয়েলোক থাকে না?"

"তোমার যে কথা বালুঙ্গাদা! এর আর কি উত্তর আছে?" রামবাবু বললেন।

"কেন, উত্তর নেই কেন?" বালুঙ্গা আরো জোর দিয়ে বলল— "মায়েদের কি সমিতি হে? বল আমায়। বাচ্চাকে কি করে দুধ খাওয়াবে মায়েরা সমিতি করে ঠিক করবে? একজোট হয়ে বলবে আমরা বাচ্চাকে দুধ দেবো না! আমাদের দাবি পূরণ হোক। মায়েদের কথা আলাদা। মহিলাদের কথা আলাদা। শাস্তর-পুরাণ দেয়। এত কথায় কি দরকার ভাগবত পদেই ত বলেছে —

বিচার মায়া মোহ করে। কপটে নারীরূপ ধরে॥
সৃষ্টি মোহিনী-নারী মায়া। ঘনে যেমতি বিদ্যুচ্ছায়া॥
যে রূপে না করিও সঙ্গ। যেমনে অনলে পতঙ্গ॥
সংযোগ কৈলে প্রাণনাশ। তাহে না করিও বিশ্বাস॥"

"বালুঙ্গাদা একটা আঠারশ বাষট্টি" বলতে বলতে হলধরবাবু উঠলেন। "একেবারে অচল"— রামবাবু সায় দিয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

বালুঙ্গাও উঠল তার পরে। সকলে চলে গেল। একা রইল শুকুরা আর দুঃখী।

দুপুর কাবার হতে চলেছে। জনমজুররা খেত থেকে ফিরছে। দুঃখী খুব সকালেই স্নান

করেছিল। রোজ করে। সূর্য ওঠার আগেই চান করে নেয়। অভ্যাস। লবণ সত্যাগ্রহের সময় থেকে। আশ্রম জীবনের দিন থেকে।

শুক্রার কোনো অভ্যাস নেই। কারখানার কুলি, পোঙার শব্দে ঘুম ভাঙে। তাড়াতাড়ি দাঁত মেজে যা থাকে দুটো মুখে দিয়ে ডিউটিতে ছোটে। দফায় দফায় ডিউটি। হপ্তায় হপ্তায় বদল হয়। কোনো হপ্তা দুপুরবেলা তো আর কোনো হপ্তায় রাতে। পালাক্রমে। তাই তার কোনো অভ্যাস নেই। তার অভ্যাসের গায়ে ঘা পড়ে প্রতি হপ্তায়। চোট বসায় ওই পোঙা। পোঙা আওয়াজ নয়। পেটের খিদে। পোঙার মুখ দিয়ে পেটে ডাকে — আমি খাব, আমি খাব, আমায় খেতে দে। এই স্বরটাই সে শুনতে পায়। সে দৌড়োয়। ওই পেটকে খাওয়াতে। নিজে খাওয়ার জন্যে নয়। নিজেকে সে ভুলে যায়। আগেকার দিনে গাঁয়ে থাকার সময়, যখন বাড়িতে থাকত, চান করে ফেললে ওর খিদে পেত। যেন খেটে আসা শরীর থেকে ময়লা তুলে ফেলে দিয়ে এলে, সাফসুতরো আস্থান দেখে খিদে চেপে বসে। কলকাতায় কাজ করার দিন থেকে পোঙা বাজলে খিদে পায়। চান করুক বা না করুক। খিদের ভারি আক্রোশ।

বাড়িতে থাকার সময় অন্যরকম। খেটে খেটে কাজ থেকে ফেরে। গায়ের ঘাম মারে একটু। তখন চেটোয় একটু তেল ঢেলে দেয় বায়ার মা। সরষে তেল। অশ্বত্থামা অশ্বত্থামা বলে তিনবার মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে মাথায় দেয়। তারপরে থাপড়ে দিয়ে যায় হাত পা গায়ে। পুকুরে চান করতে যাওয়ার পথে মালিশ করতে থাকে নিজের শরীরে। দুটো ডুব দেয় পুকুরে দুকানে আঙুল দিয়ে। পরনের গামছার কানিতে গা মাজে। আর একটা ডুব দিয়ে ওঠে। ওই কানিতে গা মোছে, নিংড়ে নিয়ে সেই ধারটা পালটে পরে নেয়। আবার অন্য ধারটা নিংড়োয়।

ক্লান্তিটা যেন ধুয়ে গিয়ে লেগেছে পুকুরের পানার গায়ে। দুলতে দুলতে বাতাসে দুলছে। সেটাকে খুঁড়ি দিয়ে ছেড়ে এসেছে সেখানে। নির্মাল্য এককণা মুখে ফেলে ভাত খাওয়া শেষ করা পর্যন্ত। খেয়ে ওঠা মাত্র ক্লান্তিটা আবার এসে চেপে বসে। মাদুরটা দাওয়ায় ফেলে গড়িয়ে পড়ে। ঘাটবার নিশ্বাস নিতে, অনেকক্ষণ পরে রতনী এসে বালিশ একটা মাথাটা তুলে তার নীচে গুঁজে দিয়ে যায়।

কারখানার ধকলটা কিন্তু দেহে থাকে না যে তাকে চান করে ধুয়ে ফেলে দেবে। কলঘরের কালো না হয় সাবান লাগিয়ে তুলে ফেলবে মানুষ— গায়ে সেটা লেগে থাকে বলে। মনের ময়লাটা ছাড়াবে কি করে? মনের সে অবসাদ ময়লার মতো লেপটে গিয়ে থাকে। চটচটে হয়ে যায় ক্রমে। মনের ধকল মেটে না সহজে।

ছুটি বা কামাই থাকলে সে পাঁচালি শুনতে যায়। ত্রিনাথ মেলার পাঁচালি। ভজন শুনতে বড় ভালো লাগে তার। কেন কে জানে। মনে হয় মনের ক্লান্তি থেকে একটা করে খোসা ঝরে ঝরে পড়ে যায় খঞ্জনির ঘায়ে তেহাইয়ের সঙ্গে।

তবু সেখানেও একটি তাল। মেশিনের তালের মতো হলেও ঢের তফাত। কারখানায় মেশিনের তাল বড় রুক্ষ। গ্রীজ দিলেও চিকন হয় না। শুধু আলসেমি ভেঙে দেয়। অলস

মনকে ভয় দেখায়। প্রথম প্রথম খুব ডরাত। অভ্যাসে পড়তে কমে গেল। মন সয়ে গেল। মেশিনের তালের সঙ্গে হাত চলে, মন চলে না। না চললেও চলে। মনটা পরতে পরতে মানুষের ভিতরে থাকে। তার থেকে ওপরে ওপরে একটা পরত মেশিনের সঙ্গে তাল মেলায় হয়তো। কিন্তু মনের গহন থাকে অন্য কোথাও পড়ে। তাই ক্লান্ত লাগে। এলোমেলো হাজার চিন্তা এসে গুটিয়ে গিয়ে সুতাকলের টাকু হয়ে যায়। এক এক সময় ছিঁড়েও যায়। সে বসে জুড়তে থাকে। কাজ থেকে ফেরা অবধি দেহের ক্লান্তি থেকে মনের ক্লান্তি যেন একশো বা হাজার গুণ বেড়ে যায়। চেপে ধরে। রতনী, বাইয়া, ধনী মাষ্টার, দুখীদাদা, অগনি দাশ। সবথেকে বেশি ভাগু মহান্তির টাকা। সবাই চেপে ধরে। কেউ দুঃখ দেয়, কেউ ভরসা দেয়। আর কেউ কখনো হাত বোলায়।

গাঁয়ের সেই বটগাছ। ডালকপাটি খেলার বড় বটগাছ। ঝুরিগুলো সব লম্বা হয়ে নেমে এসেছে। সে ঝুলত তাকে ধরে সঙ্গী বন্ধুদের সঙ্গে যেখানে। আর সেই পুকুর পারাপার। কে আগে এপার থেকে ওপারে পৌঁছোবে। গাঁ শেষে মশানটা, ভয় করে মনে পড়লে। গ্রামদেবতার পাশে সেই ভাঙা ভাঙা ঘোড়া-হাতীগুলো এক একদিন তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সব মনে পড়ে। সব। সারা গাঁ-টার ছোট বড় সমস্ত জিনিস। তার কান্না পায়। গাঁয়ের জন্যে যত নয়, ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া গাঁয়ের মায়াটার জন্যে মোহটার জন্যে তার থেকে ঢের বেশি। ওরা কেন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে — মায়ামোহ সব? সে গাঁ ছেড়ে এসেছে বলে রাগ করে ওরা গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে!

মেশিনের তেল ফুরোয়। আবার তেল দেওয়া হয়। তেমনি মায়াটা ছেড়ে গেলে নতুন মায়া এসে মনকে চালু করে না কেন? সে ভাবে এক এক সময়। মন সব খসিয়ে ফেলছে চলারপথে। কত কি হারিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে; সে পিছন ফিরে কুড়িয়ে নিতে পারছে না। এ ভুলোপনা, ভুলে থাকাটা বেড়ি ফেলে রেখেছে ওর হাতে। সকলে বেঁধে ফেলছে তাকে। এই মেশিন, এই কারখানা, এই খিদে, এই পেট, কোম্পানি-দেওয়া কাজ — সকলে। শিব ঠাকুরের পাঁচালি ভজনও। মায় বিনতি টোয়েন্টিনাইন সুদ্ধু। সিনেমা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড় সব। কেউ ছাড়ে না— সকলে তাকে বেঁধে ফেলছে। ওর দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সকলে একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে ফেলছে তাকে। জবরদস্তি। কেউ ওর মনের সঙ্গে পা মেলায় না। সে সকলের পেছনে পেছনে দৌড়োচ্ছে। দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো। অভ্যাসে পড়ে গেছে। তার অভ্যাস এমনই জবরদস্তি, বাধ্যবাধকতা। কেবল রেহাই মেলে ওই ত্রিনাথ ঠাকুরের পালায়। অস্থির মনের গতি কমায়, ঢিমিয়ে দেয় ওই ভজন মেলা। বাকি সব অভ্যাসের খেলা। পুরোনো অভ্যাস সব ভুলে ভুলে যাওয়া। নতুন অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাওয়া। দাঁড়াতে বাধা।

আর দুঃখী দাশ? তার অভ্যাস যেন বেড়ি দিয়ে রেখেছে জীবনের তাবৎ বিশৃঙ্খলার ওপর। শৃঙ্খলা শৃঙ্খলিত হয়ে গেছে তার দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে। খুব ভোরে উঠে সে প্রার্থনা করে। এখন তো একলা। যারা আশ্রমে একসঙ্গে থাকত তারা কে কোথায়

চলে গেছে কিন্তু সে তার অভ্যাস ছাড়েনি। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' থেকে 'সর্বে ভবন্তু সুখিনো — ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' পর্যন্ত। এক এক করে সমস্ত।

শুধু একটা অভ্যাস। সেদিনের। পুরনো কালের। পুরনো যুগের। তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের অভ্যাস। তিরিশ বছর পরেও কোনো একজনকে সুখী হতে শান্তি পেতে দেখেনি দুঃখী। বরং চারিদিকে অশান্তি। তবুও সে গায়। তবুও সে চরকাখানা নিয়ে এখনো সুতো কাটে। প্রতিদিন। নিয়মিত। পুজো-আহ্নিক করার মতো।

চান করে প্রথম ঢোকে গোয়ালে। দু-জোড়া বলদ, দুটো গাই, একজন বারমেসে মজুর আছে। সে আসার আগে গরুর মুখে ঘাস খড় ফেলে দিয়ে আসে। প্রণাম করে। অস্ট্রিয়াতে একমনের কম দুধ দেওয়া গাইকে কসাইখানায় পাঠানো হয় — কামধেনু সেখানেই — একথা জানার পরেও দুঃখী দাশ গাইগরুকে প্রণাম করে। তারপর গোবর মুত নিয়ে 'কম্পোস্ট পিট' ফেলে।

জলখাবার খেয়ে বাগানে মাটি কোপায়। মজুর লোকটি এলে কাজ ফরমাশ করে চলে যায়। এক একদিন খেতেও যায়। নয়তো ওই বাগানে। সকালে চারঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি। বসে থাকলে ঠেকছে। সব নিজের হাতে। রান্নাবান্নাও। একটা ছেলে আছে। অনাথ। বাপ-মা মরা। কাছে এনে রেখেছে। কোন জাত কেউ জানে না। অনাথ ছেলেটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে বলা চলে। সন্ধ্যাবেলায় একঘণ্টা তাকে পড়ায়। রান্না হল ভাত, ডাল আর সব্জির একটা সেদ্ধ তরকারি। তিরিশ বছর আগে আশ্রমে যা খেত তাই।

দুঃখী জেল থেকে যখন ফিরল, ওর বাড়িতে কাক উড়ছে। বাবা, মা সবাই গত হয়েছে। নতুন করে ঘরকন্না শুরু করতে হল। গাঁয়ের যারা আসে, বলে — 'দুখীদাঠাকুর, বিয়ে কর।' দুঃখী কিছু বলে না কিন্তু বিয়েও করে না। মনটা খাঁ খাঁ করে। শুধু ফাঁকা ঘরই নয়, জীবনটাও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তবুও বিয়ে করে না।

মনে কিন্তু পড়ে সবই। দেবতার মতো বাবা মা। লক্ষ্মীর মতো স্ত্রী মাস্টারনী দেবকী। মনে পড়ে আরো কত কথা। তবু হারিয়ে যাওয়া অতীতকে খুঁজে বার করতে সে বৃথা চেষ্টা করে না। কিন্তু সেদিন থেকে বিয়ে করতেও আর মন করেনি।

রামবাবু, যুক্তি শুনলে সে হাসে। বিদ্রূপে। সামন্তবাদী সমাজে নারী একটা সম্পত্তি। সম্পত্তিকে সামন্তবাদীরা যেমন স্বত্ব বলে সাব্যস্ত করে, নারীর সতীত্ব দাবি করাটাও একটা সামন্তবাদী মনোবৃত্তি। রামবাবুর এটা অসন্দিগ্ধ মত। কিন্তু রামবাবু বিয়ে করেছেন এবং দুঃখী দাশকে বিয়ে করতে বারংবার পরামর্শও দিতেন। দুঃখী দাশের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভের যে-কোনো ঔরসজাত সন্তানকে তিনি কিন্তু দুঃখী দাশের ছেলে বলে ডাকতে আজও কুণ্ঠাবোধ করতেন।

"তুমি স্ত্রীধন বল না? গো, কন্যা, ভূমি ভাগ্যে থাকলে মেলে, এমন কথা নেই কি?" একদিন জিজ্ঞেস করলেন রামবাবু।

"আছে, তাতে সামন্তবাদের গন্ধ আমি পাই না।" দুঃখী দাশ যুক্তি দেখাল। "গোধন

বলে আমরা গরুকে পুজো করি। স্ত্রীধন লাভ করি বলে আমরা নারীকে গৃহলক্ষ্মী বলি।"

"পুরুষ কেন শত শত স্ত্রী করবে, শতবার বিয়ে করবে? নারী কেন সতী হয়ে জীবন্ত পুড়বে?"

"পুরুষ অন্যায় করে বলে নারী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে আমি নই। সমাজের উভয় পক্ষ কলুষিত হলে সমাজ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষকে এরকম কাজ থেকে নিবৃত্ত করার বদলে নারীকে পুরুষের মার্গে প্রবর্তনা দেওয়া এক মারাত্মক মনোবৃত্তি।" বললে দুঃখী।

"নারী পুরুষের সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হওয়ার সপক্ষে আমি নই। তুমি যাই বল দুখীদা, নারী পুরুষের অধীন বিচারটা অত্যন্ত ভুল। নারী ও পুরুষ সমান।"

"কিন্তু নারী পুরুষের ভোগ্যবস্তু বলে বিবেচিত হওয়াও উচিত নয়।"

"দেহের ক্ষুধাকে অস্বীকার করা যায় না। উভয় উভয়ের ভোগ্য। যৌন ভোগে উভয়ের সমান অধিকার।"

"নারী কিন্তু সন্তানের গর্ভধারিণী!" বলে দুঃখী দাশ উঠে পড়ল। হাসলেন রামবাবু। উভয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অতি হালকাভাবে ফেলে রাখল সেদিন।

কিন্তু দেহের এই ক্ষুধাকে অস্বীকার করে না দুঃখী দাশ। দেহের ক্ষুধা থেকে নারীর প্রতি পুরুষের বা পুরুষের প্রতি নারীর এই যে আকর্ষণ তার শৃঙ্খলা থাকা দরকার। না হলে সে আকর্ষণের পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক। এ আকর্ষণের মূল্য অবশ্য রয়েছে; তবে তার সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত নিজের তথা সমাজের হিত চাইতে গেলে।

"একবার বিয়ে করেছ বলে আর করবে না এটা কোন কথা?" বালুঙ্গা দুঃখীকে বোঝাতে চেষ্টা করে। "পুত নামক নরক থেকে উদ্ধার করে বলে পুত্র। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। শুধু কি দেহ-সুখের জন্যে বিয়ে করে মানুষ?"

কিন্তু সে একবার বিয়ে করেছিল বলে যে আর করতে চায় না এটা ঠিক নয়। দুঃখী দাশ ভুলে গেছে সে কখনো বিয়ে করেছিল। স্বর্গতা স্ত্রী ওর স্ত্রী ছিল বটে, তবে যে তাকে বিয়ে করেছিল কি না ওর মনে পড়ে না তো! বিয়ে না করলে মানুষের কিছু অভাব থেকে যায় বলেও সে বোধ করে না। বরং নারী সান্নিধ্যে সংযত জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি হয়। নিজের কর্তব্য পালনে ত্রুটি থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে কিন্তু এক এক সময় তার বাবার শেষ প্রলাপ উক্তি মনে পড়ে গেলে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুকুরা! ওর যেন কোথায় একটা খেই ছিঁড়ে গেছে। মনের ভিতরকার সরু, খুব সরু সুতোর একটা খেই। এক বছর, দু বছর, চার বছর, পাঁচ বছর— একটার পর একটা 'রজ' পর্বের ছুটি। চালের ওপর ঝির ঝির বৃষ্টি অভিষেক সেরে চলে গেল। বিনা দক্ষিণায়। সে দক্ষিণা দিতে পারেনি। রতনীর কাছে মাসে মাসে তো দূরের কথা, প্রতি 'রজ' কামাইয়ের* সময়েও কটা টাকা বছরের পর বছরও সে পাঠায়নি। কলকাতা যাওয়ার পরে দু-এক বছর সে ভাগু মহান্তির ঠিকানায় যাও বা মনিঅর্ডার করেছিল, তাতে কি রতনীর পেট ভরে থাকবে যে রজ কামাইতে কস্তা পেড়ে শাড়ি একখানা কিনে থাকবে তার থেকে কিছু জমিয়ে? সে টাকাও ফেরেববাজ ভাগু মহান্তি তাকে দিয়েছে কিনা কে জানে?

তাছাড়া বাইয়াটাও বড় হচ্ছে, পড়তে শুরু করে থাকবে। পাঠশালায় যাচ্ছে হয়তো। সে বসে বসে ভাবত। রতনী কষ্টে পড়েছে আর মনে করছে। বই নেই, সেলেট নেই। অস্তব্যস্ত হয়ে রতনী তাকে বকছে। আবার বকেছে বলে নিজেই কাঁদছে। রতনী চটে গেলে তেমনি কখনো-সখনো শুকুরাকে বকত। সে কিছু বলত না। মুখটা তার শুধু গম্ভীর হয়ে যেত। হাঁড়ির মতো। সে মুখ দেখে রতনী কাঁদত। ওই কান্না কত নিরীহ সত্যি। যেন নিজের ঝাল নিজেরই ওপর মেটায়। কারো অনিষ্ট করার সাহস নেই। ওই কান্নার জল কখনো মুছে দেয়নি সে। মুছে দিতে এক একবার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু পারেনি। তবে তার মনে হয়েছে ওই চোখের জলে তাপ নেই। ভারি ঠাণ্ডা। রতনীর গালের ওপর গরম অশ্রু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একবার খুব সাহস করে সেই অশ্রুধোয়া গালে গিয়ে চুমু খেয়ে ফেলেছিল। সত্যি কি ঠাণ্ডা!

"আরে!" বলে সে শুকুরার হাতটা ছিটকে সরিয়ে দিয়েছিল। শুকুরার পৌরুষের গায়ে থাপ্পড় মারল কেউ। শুকুরা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল "লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার রতনী।" আর একবার ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতে রতনীর চোখ তখন বুজে এসেছে। গাল গরম হয়ে এসেছে। চোখের পাতাও। খালি ফর ফর করতে থাকে। রাগে নয়, সোহাগে।

পুতুলের মতো ছেলেটা— বাইয়া। কথা বলতে শিখেছে নিশ্চয়। বাবা বাবা বলে ডাকছে হয়ত। কাকে ডাকবে? খুঁজছে নিশ্চয়ই। অন্য ছেলেরা ডাকছে দেখে সে জিজ্ঞেস করছে— আমার বাবা কই মা? রতনী কি উত্তর দিচ্ছে? বলছে 'কলকাতা গেছেন?' ছেলে জিজ্ঞেস করে থাকবে— 'কবে আসবেন!' রতনী কি উত্তর দিত? একটা কিছু বলে বুঝিয়ে দিয়ে থাকবে। একবার, দুবার, পাঁচবার, দশবার ভোলাবে। তারপর—?

নিজেকে ধিক্কার দেয়, সে বাপ হয়েছিল। একটা কচি তুলতুলে ছেলের বাপ। হাত ধরেছিল শালুকফুলের মতো একটি আদুরে মেয়ের। কোথায় ফেলে এসেছে তাকে? তাকে ছেড়ে সে আছে কি করে এখানে?

না— এবার সে যাবে। সর্দারকে বলবে— এ মাসে টাকা দিতে পারবে না। পাঁচ বছর হয়ে গেল। তবুও সর্দারের দয়া হয় না। লাঠি দেখিয়ে মাইনের অর্ধেক কেড়ে নেয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর— পাঁচ বছর। কম সময়?

সত্যি সত্যি মাইনে পাওয়া মাত্র সর্দারের কাছে না গিয়ে সেবার সোজা পালিয়ে আসছিল বাসায়। কোথায় ছিল, ভূতের মতো মাঝ রাস্তায় এসে হাজির। লাঠিটা ঠুকে বলল, 'ক্যা রে, কহাঁ যাওল বানি? হামারা রুপেয়া নিকাল!'

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। থেমে গেল— একটা কৈফিয়ত দিতে চাইল— 'তোমার বাসায় পাইনি। আপনি গিয়ে দিয়ে আসতাম'। কিন্তু মুখে কথা ফুটলো না। দু-একবার এমনি মিথ্যে বলে ঠকেছে। আবার বলতে সাহস হল না। ঠনঠনিয়ে গুনে দিল। আর বাঁচল কত? মহাজনের পাওনা দেওয়ার পরে পুরো মাস চলবে তো?

[1] ওড়িশার বাৎসরিক বীজবপন সমাপ্তি উৎসব জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে

ধার কর্জ, চারধারে দেনা। দেনায় যেন ডুবে আছে দুনিয়া। দুনিয়াটা কর্জ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়। কর্জ নয়— গলার ফাঁসি। একবার মাথা গলালে আর বেরোবার জো নেই। কর্জ শেষ হোক না হোক নিজে শেষ হও! সামনে পিছনে এদিকে সেদিকে কোনোদিকে টানে না ওই ফাঁস। শুধু নীচে থেকে আরো নীচে নিয়ে যায়, বোঝার ওপর আরো বোঝা কেউ চাপিয়ে দেয়। তেমনি লাগে। ভাগু মহান্তির কর্জ তাকে ঘরছাড়া করল। কলকাতার কারখানার কুলিসর্দারের দেনা কোথায় নেবে তাকে?

ভাগু মহান্তিকে সে কত টাকা পাঠিয়েছে হিসেব রাখেনি। ওর দেনা শোধ হয়ে গিয়ে থাকবে। সে আপনমনে ভাবে। শোধ না হয়ে থাকে তো কত বাকি রইল? সুদে-আসলে মুজরো গিয়ে বাকির কথা রতনী লিখত তাহলে। সেই যা বছরখানেক আগে চিঠি দিয়েছিল পোস্টকার্ড একখানা। রতনী তাকে ভুলে গেছে? আর কারো সঙ্গে পালিয়ে গেছে? কাঁচা বয়েস। কি জানি। সবাই কি গাঁ ছেড়ে পালাল? ধনী মাস্টার— দুখী দাদা?

প্রথমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পতি*-ননা বা 'পতিয়ান্না'র (পতিন্দা) কাছে। বাবুদের বাড়িতে রাঁধুনী বামুনের কাজ করে পতিয়ান্না। ঠিকা। ওর নাম সেখানে 'ঠাকুর'। সে-ই সেদিন মাথা গোঁজার ঠাঁই দিয়েছিল। তার বাসায় এক খুপরি ঘর। মাঝে কেরোসিন কাঠের তক্তার দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা। একপাশে সে ও তার রক্ষিতা। অপর ভাগটা ভাড়া দেওয়া। ভাড়া-লাগা অংশের দেওয়ালে তিনটে বড় তাক। তিন তাকে তিন ভাড়াটিয়া। মাচানের মতো তাকগুলো। ঝাটিমাটির ঘর, খোলার চাল, রাতে তারা দেখা যায়। ওইটুকু পাঁচ টাকা— তাক পিছু। এটুকু বড় দয়া পতিয়ান্নার। সে যেদিন এসে পৌঁছোল বাড়ি থেকে, বললে 'চাকরি হওয়া পর্যন্ত থাক বিনা-ভাড়ায়'। রেলে একজন কলকেতিয়া পতিদার ঠিকানা দিয়েছিল। রিকশায় করে সেই গলির কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বাড়ির হদিস বলে দিয়ে।

"চাকরি পেলে সুদে-আসলে শোধ করে দেব"— শুকুরা পতিদাকে কথা দিয়েছিল। খাওয়াটাও দিত পতিদা। ওর রক্ষিতা রেঁধে দিত। খাইখরচ পঁচিশ। এরকম তিনশো টাকা হয়ে গিয়েছিল চাকরি পাওয়া পর্যন্ত। চাকরিটার জন্যেও হাজার-বারশো খরচ হল। সাহেব, কেরানি আর সর্দারের পাওনা। সব দিল ওই কুলিসর্দার। কর্জ হিসাবে। ওরই হাত দিয়ে সে সাহেব-কেরানিদের ঘুস দিয়েছে। সে দিল কিনা মা গঙ্গা কালী জানেন। যা বলল, শুকুরা মেনে নিল। উপায় কি?

সেই দেনা সে গত পাঁচবছর ধরে শোধ করে চলেছে। ষাট টাকা মাইনে। তিরিশ সর্দার নিয়ে নেয়। মাইনে পাওয়ার দিন লাঠি ধরে বসে থাকে। কবে ওর টাকা শোধ হবে কে জানে।

পতিয়ান্না লোক ভাল। মেয়েমানুষ একটা রেখেছে বটে। জাতপাত জানা নেই। বামুন হয়ে যা করেছে সে কথা ওর কিন্তু ঢাকা পড়ে গেছে। কেউ কখনো চর্চা করে না। এত ভাল লোক সে। সকলে তার গুণ গায়। ভারি দয়ালু। মাইনে পাওয়ার দিন থেকে কোম্পানির বাড়িতে আসা অবধি সে মাসে মাসে তাকে দিয়ে আসছে। আগামটা বাকি থাকে। দুই প্রাণী কেউ মুখ খোলে না, ওই টাকার বিষয়ে।

* 'পতি' - ব্রাহ্মণ বর্ণের পর্দার বা উপনাম

কোম্পানির ঘর পাওয়ার জন্যে দুশো হাতগোঁজা দিতে হল। সেটাও দিয়েছে ওই সর্দার ধারসূত্রে। নিজের ঘরে থাকার দিন থেকে সে হাতে দুটো ফুটিয়ে নেয়। আর পতিদার বাসায় যায় না। তবে যখন যায় পতিদার ঘরনী না খাইয়ে ছাড়ে না। খুব ভালোবাসে।

সে একটা উপাখ্যান। পতিদা ওর পাল্লায় পড়ল না সে পতিদার পাল্লায় পড়েছিল বলা মুস্কিল। আজকাল পতিদা সে ধান্দা আর করে না। আগে নাকি করত। একটা ব্যবসা ছিল তার। রাঁধুনীগিরি করে কতই বা কামাবে। তার কুলাত না। রাখেলটার জন্যে যত খরচ। তাছাড়া দেশের বাড়িতে পাঠায়। প্রতি মাসে। নিয়মিত। গাঁয়ে ছেলে বউ বাবা-মা। রক্ষিতাকে পতিদা জোটানোর মতো রতনীকে আর কেউ তেমনি ভুলিয়ে কলকাতা নিয়ে আসেনি তো! হে ঠাকুর! ত্রিনাথ গোঁসাই! মা গঙ্গা! তোমরাই ভরসা।

পতিদার চার-পাঁচটা দালাল ছিল। তারা ছমাসে বছরে দেশ থেকে একটা করে ধরে আনত। মেয়েছেলে ছুঁড়ি। ভালো ভালো ঘরের ঝি বউ থাকে। পতিদা তাদের বেচে দেয় সোনাগাছিতে, হাড়কাটা গলিতে, নইলে রেখে দেয় বাড়িতে ঝি করে। নচেৎ কোনো অভাগী লোককে ধরিয়ে দেয় রক্ষিতা করে। বিয়েও করায়। যাকে যেমন।

একবার পুলিস খবর পেয়ে পতিদার ঘর ঘেরাও করল। তল্লাশিতে দু-দুটো জোয়ান মেয়ে বেরোল। অনেক পয়সা খরচ করল পতিদা। পার পেয়ে গেল। সেদিন থেকে ওই ব্যবসা বন্ধ। নাক-কান মলল। আর সে ধান্দা করে না।

ওই কারবারের সময় এই রক্ষিতার আবির্ভাব। দেবীর আবির্ভাব হল বুঝি। সাক্ষাৎ মা কালী আর কি। তার কোনটা যে পতিদার মনে ধরল সেই জানে, চোখদুটো গরুর মতো নাকের ডগা থেকে কানের গোড়া পর্যন্ত তেরছা চলে গেছে। দেখলে ভয় করে। ছোট ছোট কান। তেঁতুলবিচি দাঁত। মুখের মধ্যে যা নাকটি সুন্দর। হলেও তাকে ঢেকে দিয়েছে নথ, নোলক, নাকছাবি। মেয়েছেলেটা বয়েসকালে না জানি কেমন দেখতে ছিল। এখন তো ইয়া মোটা, এত বড় পেট, ছেলেপিলে কিছু নেই, মনে হবে যেন সাতমাসের পেট। গয়নায় ভরে দিয়েছে পতিদা পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সে রক্ষিতা হোক, যা হোক, জাতি-কুল কিছু নাই থাক, মনটা খুব বড়। উদার, ওরই দয়ায় সে ছমাস ধরে থাকল সেখানে। সবাই ঠাট্টা করত শুকুরাকে। মেয়েমানুষটাকে জুড়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করত। শুকুরাকে বুঝি সে রেখেছে। শুকুরার কানে যেত। সে হেসে দিত ওরকম শুনলে। তবে ভিতরে ভিতরে খুব চটে যেত। এ মানুষগুলো অমনি। কারো ভালো দেখতে পারে না।

মেয়েমানুষটাও তেমনি গায়ে মাখে না কিছু। কেউ কিছু ভাববে, কেউ কিছু বলবে এসব না ভেবে চিন্তে এমন কাণ্ড করে ফেলে যে না বলার লোকও বলবে। একদিন শুকুরার ফিরতে দেরি হল। পতিদা বাড়ি আসেনি তখনো, পাড়াপড়শিদের জিজ্ঞেস করার পর শেষে সে পথচলা লোকদেরও ডেকে জিজ্ঞেস করতে থাকে — তুমি আমাদের শুকুরাকে দেখেছ? এতে সন্দেহ না করার লোকও করবে। সেদিন লজ্জায় সংকোচে শুকুরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর একদিন সে ছেঁড়া জামা পরেছিল। বাসা থেকে বেরানোর সময় পিছনের ছেঁড়া জায়গা তার নজরে পড়ল। পিছু ডাকল সে। বিরক্তি লাগল, শুকুরাকে সে পিছন

থেকে ডাক পাড়ল বলে। না শুনে উপায় নেই। খেতে-থাকতে দিচ্ছে। কি করবে? গেল অগত্যা। ঘরের ভিতর পর্যন্ত। ডেকে নিল সে। পতিদার তরফের অন্দরে। দুটো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "ছি, ছেঁড়া জামাটা খুলে ফেল। এই নাও— নতুন জামা ধর্মতলা থেকে কিনে পরে নিও।"

কেন এ মমতা? ওর অস্বস্তি হয়। লজ্জাও করে। শুকুরা চাকরি পেয়ে গেছে তখন। জীবনে প্রথমবার অন্যের দয়াতে ছোট হয়ে গেছে এমন বোধ হল, নেবে কি নেবে না ভাবল। সে মেয়েছেলেটা ওর হাত টেনে নিয়ে গুঁজে দিল। ওর কেমন গরম লাগল। টাকা না ওর হাত ঠিক বুঝতে পারল না। ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল একবার। তাতে শুধু দেখা গেল ওর নাকটা।

তারপর থেকে ওর কেমন একটা সম্ভ্রম হল— সে খেতে ডাকলে শুকুরা না করতে পারে না। অনেকবার খেয়েছে। জলখাবার। দিনে দুবেলা খাওয়া ছাড়া। খোরাকের পয়সা নেয়। তার বাদে এটা দেয়। পতিদা থাকুক আর নাই থাকুক। না থাকার সময় বেশি।

একবার পতিদা দেশে গিয়েছিল। সে তখন নিজের বাসায় উঠে গেছে। বেড়াতে এসেছিল পতিদার বাসায়, এরকম আগে মাঝে মাঝে আসত। পতিদার উপকার ভুলতে পারে না। তার ওপরে আবার দেনা আছে। না গেলে হয়ত ভাববে শুকুরা ওর টাকা ফাঁকি দিল।

সেদিন ভুরিভোজন করালো মেয়েমানুষটা, রান্নকরা জিনিস ছাড়াও দোকান থেকে কিনে এনে খাওয়াল। মাংস, কাটলেট, দই, সন্দেশ খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হল।

"এত রাতে আর গিয়ে কাজ নেই। বাসায় ছেলে না পিলে। সকালে উঠে যেও।" বলল সে। "তোমার দাদা নেই। আমার একা ভয় করে। গয়নাগাঁঠি আছে। রাত-বিরেতে কখন কি হয়।"

"সকালে ডিউটি যে"— শুকুরা এড়াতে চাইল।

"আমি খুব ভোরে তুলে দেব। রেঁধেবেড়ে রাখব। খেয়ে চলে যেও।"

শুকুরা মানা করতে পারল না। এসেছে যখন। অসন্তুষ্ট করাটা ঠিক হবে না। মেয়েমানুষটার সোহাগ আরো বেড়ে উঠল— "তোমার দাদা ফিরে আসাতক এখানে থেকে যাও। কি বল?" তাও মানা করতে পারল না শুকুরা।

এটা সেটা গল্পগুজব করে ঢের রাতে শুতে গেল। মেয়েটা ওর জন্যে আলাদা বিছানা পেতে দিল সেই ঘরে। এতটুকু এক কামরা। মাঝে কাঠের দেওয়াল। কেরোসিন কাঠের তক্তা। ও পাশের খোপে সে অনেকদিন কাটিয়েছে। এ পাশে তাক নেই। পতিদা নিজে থাকে বলে। খাটিয়া একটা আছে। ওই কেরোসিন তক্তার। তক্তপোষের মতো। তার ওপর শুয়ে মেয়েটা। নীচে মেঝেতে শুকুরা। তার আড়ষ্ট লাগে। ওপাশ থেকে যেন কেউ কান পেতে শুনছে। গা টেপাটেপি করে হাসছে।

মাঝ রাত হবে বোধ হয়। চট করে ঘুম ভেঙে গেল শুকুরার। তার পায়ে কি একটা চলছে। সুড়সুড়ি লাগছে। পাটা ছিটকে দিল। "কে"?

"চুপ কর। খেটে খেটে এসেছ। থকা লাগছে নিশ্চই। হাতে পায়ে ব্যথা হয়ে থাকবে। টিপে দিই একটুখানি।"

"না না থাক" বলে পা সরিয়ে নিল শুকুরা। কিন্তু মেয়েটা ছাড়ে না। "কথা বোলো না। ওপাশে কেউ শুনতে পাবে।"

পরদিন থেকে আর সে মাড়ায় না সেদিক — ওপাড়া, পতিদার সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়ে। সত্যি সত্যি একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল যাদুঘরের কাছে। পতিদা ডেকে নিল বাসায়। তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। আবার ওই মেয়েটা কি বলবে! কেন লুকিয়েছিলে? যদি জিজ্ঞেস করে? বোধহয় পতিদার সামনে কিছু বলবে না। তবে পতিদার সঙ্গে ওকে দেখলে তার বুক ফেটে যাবে না তো?

বুক কিন্তু ফাটল না। তাকিয়ে দেখে হেসে ফেলল। গানের সুরে বলল— মনে কি পড়িল এতদিনে? দেওর সম্পর্ক করে তো, তাই।

সে হাসিতে যেন বিষ ছিল। আর সে বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছিল শুকুরার শরীরে। সে অবশ অচল হয়ে যাচ্ছিল, সামনে পা বাড়াতে।

কি নির্লজ্জ মেয়েছেলে। এতবড় কাণ্ডকে কত সহজে হজম করে ফেলেছে। শুকুরার পৌরুষের গায়ে কে যেন আবার ঘা মারল। সেদিন বিছানা থেকে উঠে এসে যেমন সে ঘৃণায় বিরক্তিতে পালিয়ে যেতে চেয়েও যেতে পারেনি, আজ তেমনি আবার মনে হল। ঘরের ভিতরে যেন বড় দুর্গন্ধ পতিদা ডেকে না নিলে যেতে পারত না।

পতিদার ওপর ওর কেমন যেন দয়া হল। কত সতীকে সে অসতী করেছে। কত কুলের বউ-ঝিরা আজ হাড়কাটা গলিতে রূপের পসরা মেলেছে। পতিদার দয়ায়। কিন্তু এই রক্ষিতাটিকে রেখে সে যেন একজন অসতীকে সতী করে দিয়েছে। হেরে গেল শেষকালে।

নিজের ওপর ঘৃণা হল সঙ্গে সঙ্গে। সেদিন ওর কাছে টাকা ছিল। কি মনে হল, পঁচিশটা টাকা পকেট থেকে বের করে গুণে দিল। সে মাসের বাইখরচ বাবদ। পতিদার মেয়েমানুষ সঙ্গে সঙ্গে গুণে রেখে দিল। বলল না— কিছু দরকার হতে পারে, মাস ফুরোতে এখনো বাকি, এখন থাক না। এ জাতটা আবার এমনি! ভয় হল শুকুরার। সবাই কি স্বার্থপর? মনে পড়ে গেল রতনীর কথা। সেই দিন থেকে, সেই কালরাত্রি কাটার পর থেকে রতনী মনের মধ্যে এলে, তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো সে দৌড় দেয় মানে মনটাকে দৌড়ায়। রতনী পড়ে থাকে পিছনে। আজ সে সাহস বেঁধে রতনীর কথা ভাবল। বড় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে সে। শত শত মাইল দূরে।

বাসায় ফেরার পথে শুনল কালিয়া দেউরী চলে গেছে। ওর চেহারাটা খালি তার চোখের সামনে নাচতে থাকে। সেইসঙ্গে আরো দুজনের। কারখানায় অ্যাকসিডেন্ট। দেউরীর বাড়িতে কান্নাকাটি।

দুটো ছেলে কালিয়ার। বড়টি চোদ্দ পনের বছরের। ছোটটি ছয় কি সাত হবে। কি করবে তারা? গাঁয়ে জ্ঞাতিদের অত্যাচারে একদিন পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়! কত বছর আগে কে জানে? কালিয়ারও মনে নেই।

শুকুরার চোখে জল এসে গেল। সোজা ছুটল কালিয়ার বাড়ি। ওর বউ মাথা খুঁড়ে কাঁদছে নিশ্চয়ই। ছেলেরা আঁকুপাঁকু করছে। বড়টা বাবা বলে হয়ত ডাক ছেড়ে কাঁদছে কিন্তু ছোটটা বুঝতেও পারছে না মৃত্যু কি জিনিস। এমন ভালোমানুষের এই দশা! হায় ভগবান। পনেরো বছরের সংসার উজাড় হয়ে গেল।

ওর সঙ্গে কালিয়ার খুব ভাব, বড় দোস্তি। ছেলেবেলা থেকে কালিয়া ঘরছাড়া, বিদেশে এসে আর ফেরেনি। বাপ-মা কেউ নেই, কাকা-কাকীরা দেখতে পারে না। তাদের জন্যেই তো ঘর ছাড়ল। এখন খবর দিলে কেউ কি আসবে? বিয়ের সময় খবর পাঠিয়েছিল, কেউ আসেনি। বিপদের সময় খোঁজ নেবে কি কেউ?

বুড়ো শ্বশুর ছিল এই কারখানার কুলি। সে আর নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনে কেউ নেই। এক শালা। সেও থাকত কালিয়ার কাছে। বকাটে এক নম্বরের। দিদির বকুনি খেয়ে পালিয়েছিল একদিন। কালিয়ার মাথা খারাপ, পাগলের মতো হয়ে গেল। নিজের বোন যত না কেঁদেছে তার থেকে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়েছে ভগ্নিপতি কালিয়া। কত বড় ভালো লোকটা চলে গেল সত্যি। ভালো লোকেরা এমনিভাবেই যায়। রোগ-ব্যারাম কিছু নেই। কারো সেবা নেয়নি, কাউকে হায়রান করেনি। সট্ করে চলে গেল। নিশ্চই স্বর্গে গিয়ে বসেছে। কখনো কারো অনিষ্ট করেনি জীবনে। অস্থির জলে পা দিত না।

কালিয়ার স্ত্রীর কান্না দেখে নিজেকে সামলাতে পারে না শুকুরা। তাকে বোঝাবে কি - উল্টে নিজেই কাঁদতে শুরু করে দিল।

"রতনী— রতনী"!

সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা শুধরে নিয়ে বলল— "পরশুর মা, পরশুর মা, তুমি কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান আছেন। তিনিই ভরসা। তুমি চিন্তা কোরো না, তোমার চিন্তা এখন আমার।"

বলে ফেলে চমকে উঠল। ভয় পেল। সামলাতে পারবে তো সে? এত বড় সংসার! ওদের দুঃখে সে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। নিজের আয়ত্তে ছিল না। সে সময় যা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল সেটা কি সত্যি ওর মনের কথা? পরশুর মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে অমন বলে ফেলেছিল বই তো নয়। বড় ছেলেটা কটা দিনের মধ্যে পেরে উঠবে। ওদের কথা ওরাই বুঝবে তখন।

সে নিজেকে বোঝাতে থাকে বটে কিন্তু সত্যিই তাকে সব করতে হল। সে করল। কিছু না ভেবে করেছে। পিছিয়ে যায়নি একটুও। সরে যায়নি মোটেই।

সব করেছে। মড়া পোড়ানো থেকে দশদিন দশক্রিয়া পর্যন্ত।

আর বাড়ি ফেরা হল না। বাড়ির জন্যে যা রেখেছিল সব পরের জন্যে গেল। সেই টাকায় কালিয়ার শ্রাদ্ধক্রিয়া করল। পতিদা জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে। পতিদা রাগ করে। টাকা কি হল? কোন মাগীর বাড়িতে দিলি? জিজ্ঞেস করে। কিছু বলে না শুকুরা। পতিদা ওই পর্যন্তই জানে। রাঁড়ের ঘরে দেওয়া ছাড়া মানুষ যে আর কোনো কাজে খরচ করতে পারে সে কথা তার চিন্তায় নেই।

ট্রাম-বাস ঘোঁ ঘোঁ করে চলে যায়। একা শুকুরা চুপ।

খেটে খেটে শুকুরা বিছানা ধরল। সেবা করল সেই পরশুর মা। পরশু আর একটু লেখাপড়া করে পাস করলে চাকরি পাবে। এই কোম্পানিতে। ওয়েলফেয়ার অফিসার কথা দিয়েছেন। বলেছেন, আগে তার কথা বিচার করবে কোম্পানি। ওর বাপ — কোম্পানির কাজে প্রাণ দিয়েছে। শুধু পাসটা করে ফেলুক। তুমি চিন্তা কোরো না পরশুর মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার দুঃখ যাবে। ঈশ্বর ভরসা।

শুকুরা জ্বরের ঘোরে বকে। মাথার কাছে বসে পরশুর মা কাঁদে। চোখের জল শুকোয় না। শুকুরার যদি কিছু হয়ে যায়! সে কি করবে? হে ঠাকুর!

শুকুরা ভাবে সে কালিয়ার কথা মনে করে কাঁদছে। যে চলে গেছে তার কথা ভেবে কি লাভ? কালিয়ার চিহ্ন এই বাচ্চা দুটো। তাদের মানুষ করলে কালিয়া প্রাণ পাবে। আমি পরশুর মুখে দেখি— জলজ্যান্ত কালিয়াদা বেঁচে আছে। চেয়ে দেখ পরশুকে, আর ওই বাচ্চাটাকে।

পরশুর মা দেখবে কি, আরো ফুঁপিয়ে কাঁদে। চোখের জলে ভাসে। তাকে আর থামানো যায় না, স্তোক মানে না।

পতিদা খবর পেয়ে এল। দেখল, শুকুরা তার বাসায় নেই। খোঁজ নিয়ে এল কালিয়ার বাসায়। ওর সঙ্গে সেই মাগীও। কালিয়ার বউকে দেখে সে উঁ চুঁ কিছু বলল না। যা কিছু বলল পতিদা। পতিদাকে দেখে পরশুর মা ওর পা ধরে কান্না জুড়ে দিল। 'ওষুধ-পথ্যির জন্যে পয়সা আছে?' জিজ্ঞেস করল পতিদা। মাথা নেড়ে মানা করল পরশুর মা। পতিদা রাঁড়ের দিকে তাকাল। মাগী সঙ্গে সঙ্গে দশটা টাকা বের করে বাড়িয়ে দিল। শুকুরার মাথার কাছে টাকা রেখে দিয়ে পতিদা কালিয়ার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, "নাও, রাখ। ওষুধ-পথ্যির জন্যে।" যাবার বেলায় বলে গেল— "ঠাকুর ভালো করে দেবেন।"

শুকুরা তাকিয়েছিল— তার রক্ষিতা স্ত্রীটা কি বলে। কিছু বলল না। পতিদার পিছন পিছন চলে গেল। দরজা পেরোবার সময় কি মনে হল কে জানে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ভালো হয়ে গেলে এসো।"

সেরে উঠল শুকুরা। কার আশা ছিল সেরে উঠবে বলে? কালিয়ার প্রেত নাকি ধরেছিল। সে শুকুরাকে না নিয়ে ছাড়বে না। এ ওর বউকে নিয়ে রেখেছে। খাবে না তাকে? এমনি ভাবত সবাই।

শুকুরার টাইফয়েড। ওষুধ নেই সে রোগের। ডাক্তার বললে, কেবল সেবা-শুশ্রূষা। সে-সময় ওষুধ ছিল না। তবু ভালো হয়ে গেল। পরশুর মায়ের যত্নে। ঠাকুরের কৃপা।

কিন্তু ফেল হয়ে গেল পরশু। পরীক্ষায়। বাপ মারা যাওয়ার পর ছেলেটা ভেঙে পড়েছিল। তারপরে শুকুরার অসুখে অনেক খেটেছে। পাস করত কি করে?

সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দেওয়ার আগে শুকুরা দুমাসের জন্যে একটা মাস্টার রাখল। ভালো মাস্টার। এমন লেগে থেকে পড়াল যে একেবারে পাস। সবই ঈশ্বরের দয়া। সব খরচ জুগিয়েছে শুকুরা। কোম্পানি থেকে যা ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেল কালিয়ার স্ত্রীর জন্যে সেটা ব্যাঙ্কে রেখে পাসবই বাড়িয়ে দিল পরশুর মার হাতে। কখন কি হয়।

বড় দুর্বল। রেঁধে খাওয়ায় কালিয়ার বউ। কিন্তু ভালো লাগে না। বারো লোকে বারো কথা বলছে। যে যাই বলুক সে অরক্ষিত ছেলে দুটোর মুখ চেয়ে সব সয়ে যায়।

ধীরে ধীরে নিজের ব্যবস্থা সে নিজে করল। নিজের বাসায় আপনি রেঁধেবেড়ে খেল। প্রতিদিন কালিয়ার বাসায় যায়। ভালোমন্দ খবর নেয়। কাজের চাপ, তবু মনটা খাঁ খাঁ করে ওঠে; সব কেমন ফাঁকা। কেবল ওই ত্রিনাথ ঠাকুরের পুজোর পাঁচালি শোনা। সেখানে গিয়ে বসলে মনটা একটু হালকা হয়। তবে সারারাত তো আর ত্রিনাথ পুজোর আসর বসে না।

বাসায় এসে শোয়। বুকের ভিতর জ্বলে। জ্বলে না, ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে। ভয়। ভয় নয়, ভাবনা। খুব ব্যথা। ব্যথা কার জন্যে? পতিদার রাঁড়ের জন্যে? কালিয়ার বউয়ের জন্যে? না - ন া - না— সে চেঁচিয়ে ওঠে। রতনী, বাইয়া! ঘুমের মধ্যে বকে। ঘুম ভেঙে যায়, কেউ নেই।

একসময় তাকে ছিলিম টানা শিখিয়ে দিল ত্রিনাথ পুজোর আসরে। খেল। চুপ করে এসে শুয়ে পড়ল নিজের ঘরে। কাশি। খুব কাশল। শেষে ঘুমিয়ে পড়ল কখন। গাঢ় ঘুম। সকালে উঠে দেখল ওর গা অবশ। সেই ব্যথার জায়গায় রক্ত নিংড়ে নিয়েছে কেউ। বেদনা কমে গেছে বোধ হচ্ছে।

তারপর? তারপর সে কাজে গেল। ভুলে গেল সব। তবে কতক্ষণ? বাসায় ফিরে দেখল ব্যথাটা আবার বেড়েছে। রতনী, বাইয়া নাম দুটো জিভের ডগায় উঠে মিলিয়ে যায়। আবার কলকে ধরল।

শুধু কলকে নয়। একদিন সে যেন কারো কাছে শুনল শুকুরা মদ খাচ্ছে। আপনাকে আপনি জিজ্ঞেস করল— তুই মদ খাচ্চিস শুকুরা? নিজেকে নিজেই উত্তর দেয়— খেয়েছি তো কি হয়েছে? মদ মানুষে খায় না পশুতে?

কালিয়ার বাসা কোম্পানি কেড়ে নিল। কালিয়ার বউ নিরাশ্রয়। ওরই বাসায় এসে রইল কালিয়ার বউ আর তার ছেলে দুটো সবাই। কি করবে? কালিয়ার খুড়োর কাছে শুকুরা চিঠি পাঠাল। তিনি জবাব দিলেন না। শুকুরা নাচার। কালিয়া ওর বন্ধু, কত দিনের বন্ধু। কলকাতায় আসার দিন থেকে। একই মেসিনে কাজ করত। সেদিন কালিয়ার ডিউটি না থেকে ওর থাকলে কি হত? কালিয়ার মতো উপকারী বন্ধু সহজে মেলে না। খুব কম। দরকার হলে কালিয়া ওর জন্যে ডিউটি করত। ডবল ডিউটি। রাতের পর রাত। খাসা মানুষ ছিল, সেইজন্যে বোধহয় ভগবান তাকে কাছে টেনে নিলেন। তবে ভাসিয়ে দিয়ে গেল কালিয়া তার ছেলে বউকে। হে ঈশ্বর! অবোধ ছেলে দুটো। নিরীহ। অসমর্থ। কি দোষ করেছিল তারা? তাদের পথে দাঁড় করিয়ে দিলে।

কালিয়ার স্ত্রী ওই পতিদার দান। হাতকে দুহাত করেছিল পতিদা। মেয়েটিকে এনে দালাল ছেড়ে দিয়ে গেল পতি ঠাকুরের জিম্মায়। তার পাওনা সে নিয়ে থাকবে। নগদ নারায়ণ। ওত পেতেছিল সোনাগাছির কারবারীরা। হাজার টাকা পর্যন্ত নাকি হেঁকেছিল কেউ কেউ। পতিদা নিজেই বলেছে। লাবণী খালি কাঁদত। খেত না, কোনো কথা শুনত না। না খেয়ে

খেয়ে বিছানা ধরল। মুখে একফোঁটা জলও দিল না। পতিদার মেয়েমানুষটা আসেনি তখনো। লাবণী খুব চালাক মেয়ে। পতিদা যখন অনেক করে বোঝাতে লাগল, লাবণী বলল 'আমায় এক কণা নির্মাল্য দাও।' পতিদার আশা হল। নির্মাল্য পায় না বলে খাওয়াদাওয়া করে না বোধহয়। যেই নির্মাল্য বাড়িয়ে দিয়েছে সে চট করে নিয়ে পতিদার মুখে গুঁজে দিয়ে বলল— 'তুমি আমার বাবা।' লাবণী হল পতিদার ধর্মসন্তান। পতিদা আর যায় কোথায়? কাবু, নিরুপায়।

এ সব গল্প খুঁটিয়ে কালিয়া বলেছে শুকুরাকে। পতিদা সব কথা বলেনি, গোপন করেছিল এটুকু। রাত কাবার হয়ে যায় এক একদিন এসব গল্পে। তার জীবনের গল্প। তার কথা। লাবণীর ভালোবাসার কথা। শুকুরাও বলে— রতনীর কথা, বাইয়ার কথা।

বেচারা কালিয়া। খুড়োর কাছে মানুষ। বড় হল। আঠারো বছরের জোয়ান। দু - দু জন খুড়ো। বাপ মারা যাবার সময় এতটুকু বাচ্চা ছিল। বাপ বলে সে খুড়োকেই জানত। বড় খুড়ো ছোটখুড়ো না ডেকে বড়বাবা ছোটবাবা ডাকত। তারাও আপনার করেছিল। দেখতে পারত না ছোটমা, বড়মা— ছোটকাকী বড়কাকী রাক্ষসী দুটো। বড়খুড়ো অকালে চলে গেল। বাপের পরে পরে। কালিয়ার যখন বারো কি তেরো, ছোটখুড়ো বললে আলাদা হয়ে যাবে। কালিয়ার মাকে ডেকে বললে, আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো। এ শুধু নামে আলাদা, কাগজপত্রে। বউদি, সকলে আমরা এক অন্নে থাকব। হাঁড়ি আলাদা হবে না। বাড়ির মাঝখানে দেওয়াল উঠবে না। বুঝলে? ওপরের ডাল মাঝের ডাল খসে পড়ল। কে জানে কখন কি হয়। ছোটকাকা বেঁচে থাকা পর্যন্ত না হয় ভালো কাটবে। তাঁর অন্তে? তাই তিনি আগেভাগে কাগজপত্র করে রেখে যাচ্ছেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁর ছেলে ভাইপোর জন্যে ঝামেলা থাকবে না। কালিয়ার মা রাজি হলেই হয়।

বিধবা মানুষ। এত ব্যাপার কে বোঝে? বিশ্বাসে টিপসই দিয়ে বসল। সব শেষ। আপন হাতে সর্বনাশ। কিই বা করত? বিশ্বাসে বিষ দেবে বলে কি সে জানত? কালিয়ার মা'র ছোটখুড়োকে খুব বিশ্বাস। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। ছেলের সমান দেওর। কালিয়া থেকে দশ-বারো বছর বড়। সেইদিন সে কালিয়ার ভাগ্যে ন্যাতা বুলিয়ে দিল।

আলাদা হওয়ার পরের দিন ছোটখুড়ি সাফ সাফ শুনিয়ে দিল, চিরদিন কে রেঁধেবেড়ে খেতে দেবে? আমি সিধে দিচ্ছি তুমি তোমার ছেলে রেঁধে খাও। ছোটবাবা শুনে খাপ্পা। লাঠি নিয়ে মারতে ওঠে আর কি! বড়খুড়ি গিয়ে হাত ধরে ফেললে। সব বাহানা, ওপর দেখানো। সিধে দেওয়া বন্ধ হল না। আলাদা হাঁড়ি বসল। আলাদা চুলো। শুধু বাড়ির মধ্যে যা দেওয়াল উঠল না।

সেই রকম চলল ছোটখুড়োর সবচেয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত। প্রতিবার কাকা আসে। কালিয়ার মায়ের কাছ থেকে দলিল করিয়ে নেয়। ওর মা কি জানে কি সম্পত্তি? কার সম্পত্তি?

ছোট মেয়ে বিদেয় হওয়ার পরের দিন ছোটকাকী ঝাড়ু মেরে বের করেদিল মা-ছেলে দুজনকে। ছোটকাকা বাড়িতে ছিল না। জেনেশুনে লুকোল। পথে এসে দাঁড়াল কালিয়া আর

তার মা। খুড়ো আসা পর্যন্ত দাসেদের বারান্দায় আশ্রয় নিল। খুড়ো শুনতে পেয়ে খবর দিল, বউদি আর এসে কি করবে? তাদের তো আর নেই কিছু। যা কিছু তাঁর ভাগে ছিল, আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে সব সম্পত্তি তিনি বিক্রি করে ফেলেছেন। কালিয়ার মা স্তব্ধ। গয়না দু-একটা যা ছিল বেচে চালাল কিছুদিন। গাঁয়ের ধারে চালা বানিয়ে মা-ছেলে রইল। কালিয়ার মা ধান ভেনে পেট পুষল শেষকালে। দেউরী বাড়ির বউ— বড়বউ ধান কুটল শেষে! সেই চিন্তায় জ্বলে গেল, ভেঙে পড়ল কালিয়ার মা। একদিন হঠাৎ গাঁয়ে সবাই শুনল মরে শুয়ে আছে কালিয়ার মা। খুড়ো এলোই না। মড়া তুলল গাঁয়ের লোক। ফেলে দিয়ে এল মশানে। কালিয়া ওর মায়ের মুখে আগুন দিতে পেল না। শেয়াল-কুকুরের মুখে গেল শেষে।

এতবড় ঘটনা। কেউ টুঁ শব্দ করেনি। কালিয়ার খুড়োকে কেউ একটা কথাও টোকেনি। গাঁয়ের মাতব্বর কালিয়ার কাকা।

দশদিন বাদে এগারোর দিন। শুদ্ধিতে এল না ওর খুড়ো, কাউকে কিছু না বলে কালিয়া ঢুকল ওর কাকার ঘরে। গহনাপত্র যেখানে থাকে ওর জানা। তোরঙ্গ ভেঙে একটা জিনিস হাতে করে পালিয়ে এল। সোনার হার। সেইদিন রাতে পগার পার। বেনের কাছে বেচে দিয়ে সোজা টিকিট কাটল— হাওড়া।

পনেরো বছর আগের কথা। কালিয়া এসে চাকরি করেছে। পতি ঠাকুরের সঙ্গে কেমন করে জানাশোনা হল কে জানে, বিয়ে দিয়েছিল ওর ধর্মমেয়ের সঙ্গে। পতিদা মানুষ চিনত বটে। গুণী চেনে গুণীকে। তবু দু-শো গুনে নিল কালিয়ার কাছ থেকে। না নিত কি করে? অতটাই দিয়েছিল যে দালালকে। হাজার হাজার টাকার লোভ তো ছাড়তে পারল, ধর্মের জন্যে। কেবল ধরমবাপ হয়েছিল বলে।

পরশুর মা দেখতে বেশ সুডোল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব সুছাঁদ। লাবণীকে বিয়ে করল কালিয়া। লাবণী তার বাড়ির ঠিকানা বলে দিল। চিঠি দিল কালিয়া। তারা ওদিকে খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে। সবাই ব্যাকুল, অস্তব্যস্ত। কোথায় গেল মেয়েটা। বয়েসের মেয়ে, আসছে বছর গুরুশুদ্ধি হলে বিয়ে। সব ঠিকঠাক। বরপক্ষ পছন্দ করে গেছে।

সার্কাস হচ্ছিল থানার মাঠে। কি সার্কাস মনে নেই লাবণীর। সঙ্গীসাথী হয়ে দেখতে গেল এক দঙ্গল মেয়ে-বউ-ঝির দল। তিন ক্রোশ পথ। সার্কাস ভাঙল। খুব ভিড়। বেরোতে বেরোতে, এমন বোকা মেয়ে— কে একজন হাতটা ছুঁয়ে যেই বলেছে 'জলদি, জলদি, সবাই এগিয়ে গেছে, তুমি পিছনে থেকে যাবে'— সে তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক না দেখেই লোকটার পিছু ধরল। কতক্ষণ পরে বুঝতে পারল সে ভুলপথে এসেছে। সঙ্গীসাথী কেউ নেই কোথাও, নিরালা ঝোপের কাছে। হুঁশ উড়ে গেল লাবণীর। ঝোপের গোড়ায় কয়েকজন লোক। কেউ তার গাঁয়ের নয়। মেয়েগুলো গেল কোথায়? মাথায় কাপড় দেওয়া মেয়েছেলে একজন বসেছিল। সে ডাক দিল "আয় লো আয়। খিদে পেয়ে থাকবে। বোস মা, খেয়ে নে।"

সামনে খাবার জিনিস রাখা ছিল। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল। সে আর খাবে কি? ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। তার কান্না থামাতে চেষ্টা করছিল মেয়েলোকটি। "ভগবান তোকে

দিলেন যে মা। আমার মেয়ে নেই। তুই আমার মেয়ে। নে খেয়ে নে। খা না।"

মেজ মা যতই সান্ত্বনা দিতে থাকে, লাবণী আরো জোরে জোরে কাঁদে। লম্বা মরদ একটি হঠাৎ ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে বলল "চুপ কর, নইলে ভাল হবে না বলছি।"

ভয় পেয়ে গেল লাবণী। মেয়েছেলেটি বললে, "ওকে ভয় দেখিও না। ও খেয়ে নেবে। লক্ষ্মী মেয়ে।"

লাবণী চুপ মেরে গেল ভয়ে। যেন বাধ্য হয়ে। ওদের সঙ্গে গাড়িতেও গেল। তারপর আর কি। তারপর অনেক কথা, শেষে এই কলকাতা। পতি ঠাকুরের বাসা।

বিয়ের দিন লাবণী সারাদিন সারারাত খালি কেঁদেছে। কালিয়া যতই সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে, বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিছুতে কান্না থামে না। "লাবণী, আমার বাবা মা কেউ নেই। তোমার আছেন ..." শুধোল কালিয়া। মাথা হেলাল লাবণী। সেই তার প্রথম কথা।

"তোর বাবা-মা আমারো বাবা মা জানবি। আমি কালই তাদের চিঠি দিচ্ছি।"

তাকাল লাবণী। বড় বড় চোখে। ছল ছল। রং মুছে গিয়েছে ফর্সা গোলাপী চোখের কালো কালো তারা দুটো থেকে। বলেছিল কালিয়া একবার শুকুরাকে। "শুক, সে দিনের সেই চোখ আমি আর কখনো লাবণীর মুখে দেখিনি।"

চিঠি দিল সঙ্গে সঙ্গে, পরের দিন। আজ চিঠি দিল, কাল গেল, পরশু গেল, তার পরদিন, তার পরের দিন বাবা মা, ভাই সকলে এসে হাজির। তেমন পয়সাওলা লোক তারা নয়। কালিয়ার ভয় ভেঙে গেল। মেয়েকে আবার নিয়ে যাবে না তো তারা? কালিয়ার ভয় ছিল। এমন হয় যে বউমারের মেয়ের বাবা-মা খবর পেয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় দেশে। আবার বিয়ে দেয়। কেউ জানতে পারে না কলকাতা আসার কথা। এমনও দেখা গেছে, গর্ভবতী মেয়েকে খালাস করিয়ে আবার অনূঢ়া বলে বিয়ে দিয়ে দেয়। কে জানতে পারছে? কলকাতা শহরে এমন কত ডাক্তার আছে। খালাস করা তাদের পেশা। বেশ পয়সা কামায় তারা। লাবণীকে তেমনি যদি নিয়ে চলে যায় ওরা! কালিয়া অনেক এদিক-সেদিক ভেবে শেষে চিঠি লিখেছিল। ভাবল লাবণীর যদি মন না থাকে, তাকে জবরদস্তি করে কোনো লাভ নেই। বেশি ভয় ছিল তাকে যদি পুলিসে এসে ধরে। লাবণী যদি বলে ওর ইচ্ছে নেই, ওকে জোর-জবরদস্তি করে এখানে রাখা হয়েছে, তাহলে? তাকে তখন ধরে নিয়ে যাবে। আর, বাপ-মা যদি মেয়েকে ছিজ্যা করে?

কিছু হল না, বাবা-মা যা দু বিঘা জমি ছিল বাঁধা রেখে দিয়ে চলে এল কলকাতা। সঙ্গে ছেলেটাও। সকলে রইল কালিয়ার বাসায়, কালিয়ার ঘরে জম-জমাট সংসার ভরপুর। কিন্তু দায়িত্ব বেড়ে গেল। পুষতে পারলে হয়। শ্বশুরের জন্যে কালিয়া একটা কাজ জুটিয়ে দিল কোম্পানিতে ওই সর্দারকে ধরে। তারা এখন আর কেউ নেই। শ্বশুর-শাশুড়িকে এখানেই গঙ্গার ঘাটে দাহ করেছে সে। বাউণ্ডুলে শালাটা কোথায় থাকে ঠিক-ঠিকানা নেই। বছরে দু বছরে একবার আসে, আবার পালায়।

কালিয়ার স্ত্রী এই লাবণী; বাবা-মা ডাকতেন 'নাদ'। শুকুরা বেঁচে থাকতে সে হেনস্তা হবে? বারো দুয়ারে ঘুরবে? না, না, শুকুরা সেটা সইতে পারবে না।

তাহলে ওদিকে? রতনী-বাইয়া কি করবে দেশে? ঈশ্বর ভরসা। তারা ভালই থাকবে। তাদের দুঃখ তো চোখে পড়ছে না। ভগবান এতদূরে দেখার জন্যে চোখ দেননি। সে খাটবে। প্রাণ দিয়ে। ওভারটাইম করবে। গায়ের রক্ত জল করে সে লাবণীকে পুষবে। তার ছেলেদের মানুষ করবে। যে যা বলুক। পতিদাও সে-কথা বলল। "ওরে শুকুরা, যা করছিস কিছু খারাপ নয়, লোকে বারো কথা বলবে। বলুক। তুই ওপরের দিকে চেয়ে তোর কাজ করে যা। অরক্ষিতের দৈব সহায়। তবে বাড়িতে টাকা পাঠাস, কেমন? নইলে পরের জিনিস হেপাজত করতে করতে নিজের জিনিস পরে খাবে। হ্যাঁ, সাবধান।"

পতিদার রক্ষিতা ওই মেয়েমানুষটা। সেও একদিন ঠাট্টা করে বলল পান সেজে দিতে দিতে — "এই পান কি আর সোয়াদ লাগবে? পরশুর মায়ের পান কত মিষ্টি।" বলে মুচকি হাসে। চোখের পাতা ওঠে নামে। নাকের নোলক নাচে।

মাইনে যা ছিল তাই। কটাই বা টাকা। তাতে আবার কর্জ শোধ করা আছে। একটা পেটের বদলে চার চার জনের খাওয়া। তিনটে প্রাণী ওর ঘাড়ে। মাথা ঘুরে যায় ভাবলে। পতিদার কাছে চাইলে টাকা দিত। কর্জ। আজকাল মুখের ওপর না করে দেয়, 'আগের বাকি তো শোধ করলি না, আরো মন করছিস কর্জা খেতে?" সেই বা আর দেবে কেন? পাচ্ছিল রাঁড়ের সুপারিশে। এখন তো আর আগের দরদ নেই তার।

যেটা সে সবথেকে বেশি ভয় করত একদিন শেষে তারই শরণ নিল শুকুরা নিজে। সঙ্গীসাথীর পাল্লায় পড়ে না হয় একবার করে ফেলেছিল নেশা, তবে পরে কম পস্তায়নি। ঝকমারি মেনে ছেড়েছিল। এখন আবার ওরই কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। মদ।

আবার মদ খাওয়া শুরু করল শুকুরা। লাবণীকে লুকিয়ে। তবে পাপ লুকোয় না। লাবণী জানল। কাঁদল। এ কি করছ তুমি? শুকুরা বলে, ও কিছু না। এমনি একটু চেখেছি।

কিন্তু শুধু চাখা নয়। এক একদিন মাতাল হয়ে ফেরে বাসায়। মাঝরাতে।.... সেদিন বিলকুল হুঁশ ছিল না। এসে লাবণীকে কি সব যা-তা বলল। পরদিন সকালে দেখল লাবণী তার পোটলা পুঁটলি গোছাচ্ছে। আর সে থাকবে না শুকুরার বাসায়।

নেশা চলে গিয়েছিল। গরম ভেঙে গিয়েছিল। গায়ে জোর নেই, মনেও। পায়ে পড়ল লাবণীর। লাবণী লজ্জা পেল। এত বড় পুরুষমানুষটা পায়ে পড়েছে! শুকুরাও কম লজ্জা পেল না! .... লাবণী গেল না। থেকে গেল। গেল শুকুরা। সেই যে বেরিয়ে গেল আর তার দেখা নেই। লাবণী খুঁজে খুঁজে অবশ।

দু-মাস কেটে গেল। যেমন সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় তেমনি, দেখতে দেখতে চলে গেল কোনদিকে। মাসের পর মাস। দু-মাস। দিন আর মাস সব যেন সেই বিকেলবেলার আকাশের নীচে একটা করে খসে পড়ে। লাবণী তাকিয়ে দেখে, চোখ অতদূর যেতে পারে না। সামনে শহরের কোঠাবাড়ি ঢেকে ওই হারিয়ে যাওয়া দিনের আগুন-জ্বলা জায়গাটা। পশ্চিম আকাশটাকে। ডুবে যাওয়া সূর্যকে।

● কোম্পানি থেকে নোটিশ দিল। শুকুরার চাকরি গেছে। ঘর খালি করতে হবে।

এ কি করল শুকুরা? এত রাগ? আশ্রয় দিয়ে নিরাশ্রয় করে গেল! নিয়তি যাকে দিয়েছিল

তাকে ধরে রেখে তো দিন গেল না। শুকুরাকেই বা কি করে ভরসা করত? এখন তার সহায় আর কোন জন হবে? লাবণীর ভাই? কোথায় সে? তার পাত্তা নেই।

সাতদিন পুরো হয়নি। লাবণীর মাথা ঘুরছে। সকালে উঠে শাঁখচিলের মুখ দেখেছিল বোধহয়। ডাকওয়ালা এসে দরজায় দাঁড়াল। মনিঅর্ডার। শুকুরা টাকা পাঠিয়েছে বর্মা থেকে। সে এখন পল্টনে আছে। জাপানীদের সঙ্গে লড়ছে। বর্মায়। লাবণীর বুকখানা ধড়ফড় করে উঠল। শুকুরার কিছু খারাপ হবে না তো? কতক্ষণ পর্যন্ত শুধু শুকুরার মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। চোখ ছলছল করে উঠল। ভাবল সেপাইর ডেরেস পরে ওকে না জানি কেমন দেখাচ্ছে। হাসিও পেল। তালপাতার সেপাই!

ধেয়ে এল জাপানীরা। কলকাতার ওপর বোমা। লাবণীর বুক কাঁপতে থাকে. শুকুরা কি করছে! কোথায় আছে? আর চিঠি নেই, খবর নেই। শুধু টাকা সে প্রতি মাসে পাঠাচ্ছে। শুধু টাকায় কি মানুষ বাঁচে। লাবণী আজ নিজেকে ধিক্কার দেয়। কি করল সে! শুকুরাকে সে-ই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আজও শুকুরার জন্যে লাবণীর মনটা এত আকুলিবিকুলি করে কেন? শুকুরাকে কি সে সত্যি ভালোবাসে? সে কেমন ভালোবাসা? বুঝতে পারে না লাবণী। এ ভালোবাসাটা যেন না থাকা মানুষের ওপর হয়। বেঁচে থাকার সময়কার কালিয়া আর আজকের কালিয়ার মধ্যে যেন কত ফারাক।

শুকুরাকেও সে ভালোবাসে। শুকুরাকে তার ভালো লাগে। শুধু ওর যেন না থাকার সময় শুকুরাকে সে ভালোবাসে, সে ভালোবাসাটা ওর ভিতরে কোথায় লুকিয়ে উঁকি মারছিল। সে দেখতে পেত না। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যে। সে যদি বুঝতে পারত তখন শুকুরাকে ভালোবাসে, তবে সে যে কোথায় গিয়ে উঠত তার ঠিকানা নেই। কোন খাদে গিয়ে পড়ত কে বলবে? তার কি থই পেত আর? মানুষের মন কি শালিধান যে বছরে বছরে নতুন চাষ নতুন আবাদ চলবে? মানুষের মন কলকারখানাও না। খালি সুতোর পর সুতো কাটা হয়ে যেতে থাকবে, কার জন্যে জানা নেই। কারো মমতার দিকে চেয়ে বোনা হবে না, কাটা হবে না, এমন তো নয় মানুষের মন। সেটা দেওয়া-নেওয়াতে বাড়ে। জল থেকে তেষ্টা, তেষ্টা থেকে জলের মতো। শুধু দেওয়াটা মানুষের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আগুন জ্বলে না বেশিক্ষণ, তেল না থাকা প্রদীপের মতো। নিবে যায় দপ করে। খালি ধিকিধিকি করতে থাকে সলতেটা ছাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। একতরফা ভালোবাসাটা তেমনি। হলেও সেটাও তো ভালোবাসা!

তেড়ে এল জাপান। ওড়িশাতেও বোমা পড়ল। ঘুমিয়ে আছে সবাই। ঢো ঢো আওয়াজ হল। ভূমিকম্প হল নাকি! তেমনি মনে হল। বাড়ি, দেওয়াল কেঁপে উঠল। মাঝরাতে অঘোর ঘুমের মাঝে চমকে উঠল সবাই। হাজার হাজার লোক। শত শত রাজনৈতিক বন্দী আটক আছে জেলখানায়। বেরিয়ে পড়ল দলে দলে কুপরির ভিতর থেকে। কোথায় কি হল? জেলের বড় বড় পাঁচিল। কেউ বলল জাতীয়তাবাদী গান্ধীপন্থী নেতাদের মারতে বোমা ফেলেছে জাপান। কেউ শুনে হাসল। কতক্ষণ বাদে ওধারে শোরগোল শোনা গেল।

বাইরের দিকে জেলের দেওয়ালের ধারে বোমা ফাটছে। ওয়ার্ডাররা এসে খবর দিল। বোমারু জাহাজ খুব কাছে এসে বোমা ফেলে পালিয়েছে। দেশবাসীকে কত নিঃসহায় করে রেখেছে ইংরেজ সরকার। ভাগ্যিস কেউ মরেনি। আর একটু হলে নেতাশূন্য হয়ে যেত ওড়িশাভুঁই। সমস্ত নেতা জেলের মধ্যে। ভরে দিয়েছে ইংরেজ সরকার। আটকবন্দী করে রেখেছে। যার প্রাণে দেশের জন্যে এতটুকুও মমতা আছে, যার গায়ে দেশপ্রীতির গন্ধ আছে, হাওয়া লেগেছে, ধরে নিয়েছে তাকে। দুঃখী দাশকেও ধরে এনেছে সেই জেলে।

বোমা পড়ল না এই রাজনৈতিক বন্দীদের ওপরে, পড়লে অন্তত শহীদ হওয়ার গৌরব পেত। অন্তত পঞ্চাশ বছরের জন্য ওড়িশার শাসন নিষ্কলঙ্ক হয়ে যেত। জাপানের কীর্তি থেকে যেত ওড়িশার মাটিতে।

আজ বসে সাঁঝের ডুবন্ত বেলায় যেমন ভাবছে, সেদিনও তেমনি বসে ভাবছিল। বোমা পড়ে মরে গেলে কি হত? দেশমাতা খুঁজছে বলি। বিনা বলিতে সে রণচণ্ডী শান্ত হবে না। ঘরের বাইরে পা ফেলে মরার জন্যে এসেছে। মরতে ভয় পাবে কেন? সে দেখতে পাবে না স্বাধীনতা তার জীবনে। সেজন্যে চিন্তা কিসের? এই মাটিতে যে জন্ম নেবে, সে তার জন্মমাটি ভোগ না করুক, এদের মরণভুঁইতে নিজেকে দিতে পারে তো?

তারই চোখের সামনে ফাঁসিতে গেল লক্ষ্মণ নায়েক। এইতো সেদিন। লক্ষ্মণ বন্ধু লক্ষ্মীছাড়ার চোখ খুলে দিয়ে গেছে। দুঃখী দাশ নিজেকে একটা লক্ষ্মীছাড়া বলে ভাবে। কারণ সে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে বোধ হয় দেশ স্বাধীন হতে পারল না আজও। তার ভাগ্যে হল না দেশের জন্যে প্রাণবলি দেওয়া।... চোখ থেকে একফোঁটা জল গড়ায়নি। উঠে গেল ফাঁসিকাঠে। লক্ষ্মণ নায়েক। জয় লক্ষ্মণ নায়েক। অমর তুমি। তোমার সেই হরি হরিবোল বলা গলাটাকে বন্ধ করে দিল মোমমাখানো ফাঁসির দড়িটা। কই, আজ তো দেশের লোকদের মুখে সে ধ্বনির আর প্রতিধ্বনি ওঠে না। আজ সকলে হরণ করতে শিখেছে, হরিবোল শেখেনি।

রামবাবু সেদিন যা বলছিলেন আজকে দেশের অনেক যুবকও সেই কথা বলে, নেশা, নেশা। হরিবোল একটা নেশা। লক্ষ্মণ নায়েক যে নেশায় ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল, সেই নেশায় যদি ধরত একটু দুঃখী দাশকে। সে নমস্কার করে। প্রতিদিন সকালে। সেই হরিবোল বলা ফাঁসিতে লটকানো লক্ষ্মণ নায়েককে।

রামবাবুও গিয়েছিলেন সেই জেলে। তাঁকে আর তাঁর কম্যুনিস্ট সঙ্গীসাথীদের কংগ্রেসওলারা বলত 'স্পাই'। ইংরেজ সরকারের গুপ্তচর— গোয়েন্দা। দুঃখী বিশ্বাস করতে পারে না। রামবাবু শিক্ষিত মানুষ। স্বচ্ছল ঘরের ছেলে। সে কখনো গোয়েন্দাগিরি করবে না।

কিন্তু কেন? ধন-জন দিয়ে ব্রিটিশ সরকার 'মিত্রপক্ষকে সাহায্য কর' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দুঃখী দাশের মতো 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকারী তাবত দেশদ্রোহী জার্মানীর কুইশলিংদের সঙ্গে জেলখানায় এসে হাজির কেন? কি উদ্দেশ্যে? দুঃখী বুঝতে পারে না। তাঁর সঙ্গে ছিল আরো পাঁচ দশজন।

তাদের কিন্তু গোষ্ঠী ভিন্ন। খোঁয়াড় আলাদা। পঞ্চাশ-ষাট করে রাজনৈতিক কয়েদী আটকবন্দী একটা করে খুপরিতে থাকে। ঝাটিমাটির বেড়া দেওয়া দেয়াল। মাথায় খড়ের চাল। লম্বা লম্বা গোয়ালের মতো ঘর। নম্বর অনুসারে গুনতি। এক, দুই, তিন, চার। একটা মাত্র দরজা যাওয়া-আসার জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় তালা পড়ে। রাতে আগুন লাগলে সবাই খতম। পঞ্চাশ-ষাটজন লোক। চলল আন্দোলন। রাতে তালাবন্ধ চালাঘরে শোবে না। সরকার মেনে নিলেন। রাতে দরজা খোলা থাকল।

খুপরির ভিতরে দু সারি করে তক্তাপোষ। জনপিছু একটা করে। একটা করে ছোট টেবিল আর টুল প্রতি খাটের ধারে। কম্বল, বিছানা, চাদর, মশারি। কাপড়চোপড় যার যার নিজের। চাইলে পাওয়া যেত। কিন্তু মিলের কাপড় কেউ পরে না। কম্যুনিস্টরা খদ্দর না পরলেও চাইত না।

রামবাবুর ভাষায় এই খদ্দরধারী ধর্ম আফিম খাওয়া গান্ধীবাদীরা সকাল সন্ধ্যায় গান্ধীপ্রার্থনা করে। সে সময় প্রবাস্ত আশ্রমগুলোতে গান্ধীপ্রার্থনা হত। এই জেলের মধ্যেও তেমনি। প্রবাস্ত আশ্রমে সব নিরামিষ। এখানে কিন্তু গান্ধীওলারা মাছ মাংস ডিম সব চালায়। যাদের খাঁটি গান্ধীওলা বলে শ্রদ্ধা করা হয়, তারা আলাদা দল বেঁধে থাকে। অকম্যুনিস্ট অগান্ধীওলাদের সংখ্যা বেশি। তাদের আলাদা মেস। নানারকমের খাওয়াদাওয়া। বুর্জোয়া মেস, প্রোলেটারিয়েট মেস ইত্যাদি। কম্যুনিস্টদের ঘৃণা করতে করতে তাদের ব্যবহৃত শব্দের ওপরে মোহ এসে গিয়ে থাকে অগান্ধীওলাদের মনে। এদের মধ্যে কেউ নেহেরুপন্থী, কেউ জয়প্রকাশপন্থী, কেউ সমন্বয়পন্থী — এমনি কত রকমের পন্থা। দুঃখী থাকে 'প্রজাপতি' মেসে। খাঁটি গান্ধীওলাদের ওই নাম দেওয়া হয়েছিল।

'প্রজাপতি' ওয়ার্ডে প্রার্থনা অবশ্যকর্তব্য। অন্য সব ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক নয়। ওই নম্বরগুলোকে ওয়ার্ড বলা হয়। কম্যুনিস্ট ওয়ার্ডে প্রার্থনা হয় না। সময় সময় কেউ গান গায় সকালে — 'এই লাল পতাকার নীচে হও আগুয়ান', আরো কি সব। দুনিয়ার শোষিত দলিত মানুষ সব বিদ্রোহ করবে। বিপ্লব করবে। দেশমাতা একটা বুর্জোয়া ধারণা। সাম্রাজ্যবাদের তাঁতাকল এই দেশভক্তি। সামন্তবাদী মনোবৃত্তির প্রতীক। ভগবানের প্রতি, দেশমাতার প্রতি ভক্তি শোষণের অস্ত্র। এ সমস্তপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আমাদের করতেই হবে। আরো কত কি। বক্তৃতা দেওয়ার তালিম দেওয়া হয় কম্যুনিস্ট ওয়ার্ডে।

দুঃখী বলে, ভগবান সকল মহত্ত্বের প্রতীক। লাল ঝাণ্ডা যেমন এক ভাবের প্রতীক। তেমনি দেশমাতাও আর এক ভাবের প্রতীক। দেশমাতার নামে শোষণ সম্ভব হলে লাল ঝাণ্ডার নামেও শোষণ অসম্ভব নয়।

রাম ও দুঃখী দাশ।

"ভগবানের নামে ঠকিয়ে খাচ্ছ তুমি সামন্তবাদী ব্রাহ্মণ" — একদিন যুক্তিতে হেরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন রামবাবু।

"ঠকিয়ে কে না খাচ্ছে রামবাবু? তোমরা মজুরদের একজোট করার নামে ট্রেড-যুনিয়নের নামে পয়সা নাও না? পুঁজিপতিদের ধর্মঘটের ধমক দিয়ে পয়সা নাও না? প্রোলেটারিয়েট

নেতাদের শোষণটা শোষণ নয়, তবে কি পোষণ?" চটপট বলল দুঃখী দাশ।

আগুন হয়ে গেলেন রামবাবু। "ভুল— ভুল, কখনো নয়। প্রমাণ করতে পার আমরা পয়সা খাই? সব অপপ্রচার। পুঁজিপতিদের দালালদের অপপ্রচার। সারা বিশ্বের দলিত শোষিতদের একমাত্র প্রতিনিধি আমাদের এই কম্যুনিস্ট পার্টি শোষণ করে— কার জিভে হাড় আছে বলবে এ কথা?"

দুঃখী হাসল,— "রামবাবু, রাগ কোরো না। একটা কথা বলব? ধীর স্থির চিত্তে বিচার করে দেখ, তোমাদের শ্রমিক সংঘ স্ট্রাইক করে কারখানার মজুরদের জন্যে যে বর্ধিত হারে মজুরি আদায় করে বাহবা নেয়, সে মজুরি দেয় কে?"

"পুঁজিপতি, কলকারখানায় মালিক।" সঙ্গে সঙ্গে রামবাবুর উত্তর।

"পুঁজিপতির গচ্ছিত ধন থেকে দেওয়া হয় না চড়া দরে বিক্রি করে সে ক্ষতিপূরণ করা হয়?"

"করলে করুক। যে জিনিস ব্যবহার করবে সে তার হকের দাম দেবে না? তাতে কার কি গেল?"

"কারো কিছু যাবে আসবে না বটে, যাবে কেবল পাড়াগাঁয়ের গরিব-গুর্বো খেটে খাওয়া মানুষের। তারা ওই জিনিস চড়া দরে কিনবে। তাদেরই পয়সায় কলের শ্রমিকদেব গতর মোটা হবে। গাঁয়ের মজুরদের আধভরা পেট কেটে কারখানার মজুরদের বাড়ন্ত পেট ভরবে।"

"কলের উৎপন্ন জিনিস কি কেবল গাঁয়ের মজুররা কেনে? আর কেউ নয়?"

"কেনে নিশ্চয়। কিন্তু অন্যেরা কোনো না কোনো উপায়ে কলের মজুরদের বর্ধিত প্রাপ্য থেকে কিছুটা পায়। উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, কেরানী, হাকিম, দোকানদার সকলে কলের মজুরদের কাছ থেকে তাদের পাওনা পেয়ে থাকে। পায় না কেবল এই মূর্খ খেতমজুর।"

"পায়, পায়। পায় না? ধান চাল কি করে তৈরি হয়?"

"আমি কি তোমায় অর্থনীতি শেখাব রামবাবু? তুমি তো 'দা কাপিতাল'-এর পোকা। ধান চালের দরের ওপরে শিল্প থেকে উৎপন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হবে, না শিল্পদ্রব্যের মূল্যকে দেখে ধান চালের দর স্থির করা হবে?"

"একই কথা। গাছ আর বীজ। কোনটা আগে কোনটা পরে বলা যায় না। পরস্পর নির্ভরশীল।"

"পরস্পর নির্ভরশীল নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? ভালো ফসল হলে খেয়েদেয়ে কিছু ভালো বীজ রাখি, তেমনি মৌলিক আবশ্যকতার দিকে তাকিয়ে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নয় কি? কিন্তু আপনারা খেতমজুরদের না দেখে কলের মজুরদের স্বার্থ বাঁচান।"

রামবাবু স্বীকার করেন না। তাঁর মতে : দুঃখীটা অর্ধশিক্ষিত। অর্থনীতির গূঢ়তত্ত্ব সে বোঝে না। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেটা অনুভব করা দুঃখী দাশের বুদ্ধির বাইরে। তিনি বলেন এই কলকারখানার শ্রমিকদের সংঘই প্রগতির লক্ষণ। এই সংঘ

বা ট্রেড-য়ুনিয়ন যত সংগঠিত হবে ততই পুঁজিপতি সমর্থিত সরকারের অবসান ঘটবে। নিষ্পেষিত জনতার সরকার প্রতিষ্ঠা সহজ ও সরল হয়ে যাবে।

দুঃখী বলে— "ওই 'সর্বহারা সংঘ সংঘ নয়, ডাকাতের দল। যতসব কলকারখানার শ্রমিক, অফিসার, কেরানী, রেলওয়ের কর্মচারীদের সংঘ, অ্যাসোসিয়েসান বা ট্রেড-য়ুনিয়ন সব কেবল পাড়াগাঁকে শোষণ করার জন্যে শহরের ষড়যন্ত্র।"

রামবাবু হাসেন। দুঃখী দাশের অজ্ঞতার কথা ভেবে। দয়া হয় দুঃখীর ওপর। জিজ্ঞেস করেন, "দুখীদা, এটা কি তোমার গান্ধীবাদ? গান্ধী কি এই কথা বলেছেন? এসব গান্ধীবাদের অপবাদ।"

"গান্ধীবাদের অপবাদ হওয়ার আশঙ্কা নেই রামবাবু। দুটো পরিণতি ছাড়া গান্ধীবাদের তৃতীয় সম্ভাবনা নেই। হয় গান্ধীবাদ থাকবে নয়ত লোপ পাবে। যেটা মার্কসবাদের ব্যাপারে সম্ভব, গান্ধীবাদের ক্ষেত্রেও সেটা সত্য বলে তোমার ধারণা ভুল।"

"গান্ধীজীর অহিংসার নামে হিংসা করে যে ফাঁসিতে গেল তাকে গান্ধীবাদীরা তবে শহীদ বলছে কেন?"

"গান্ধীজী বলেছেন দুর্বলের অহিংসার চেয়ে হিংসা বরং ভালো। তবে অহিংসা শ্রেয়স্কর। অথচ আপনারা বলেন কেবল হিংসাই একমাত্র পথ। সেখানেই আপনাদের ও আমাদের মধ্যে তফাত। কিন্তু লক্ষ্মণ নায়েক হিংসাচরণ করেনি। সে কাউকে হত্যা করেনি। উত্তেজিত জনতা হত্যা করল গোরাসাহেবকে। লক্ষ্মণের দোষ হল সে সেখানে ছিল। মানা করছিল লোকদের হিংসা করতে। কিন্তু ইংরেজ সরকার প্রাণের বদলে একটা প্রাণ চাইল। চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান চাওয়ার মতো।"

"লক্ষ্মণ নায়েক মারেনি?" রামবাবু বাজি ধরার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

"না"। জোর দিয়ে দুঃখী বলল, "উত্তেজনার জবাবে পুলিস লাঠি চালাল। জনতাও প্রতিশোধ নিল। গুলি চলল। কে কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পালাল। একা রইল সাহস বেঁধে লক্ষ্মণ নায়েক। সাহসই হল তার অপরাধ।"

সাহসের পরীক্ষা শেষ হল সেদিন। মনে পড়ে দুঃখী দাশের। রামবাবুরা বুঝতে পারে না সে কথা। একজন শিক্ষিত শহরবাসী ফাঁসিতে গেলে হয়ত কিছুটা বুঝতেন। মূর্খ গেঁয়ো চাষাভুষো একটা লোক কি দেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণবলি দিতে পারে? সে বিশ্বাস নেই রামবাবুর।

রামবাবুরা উঠে গেলেন 'এ সব ভাবপ্রবণতা' বলে।

দুঃখীর চোখের সামনে নেচে উঠল সেদিনের স্মৃতি। কিন্তু রামবাবুর চোখে ঠুলি বাঁধা ছিল— পাশ্চাত্য সভ্যতার ঠুলি। সেদিন সকালে হয়তো আরামে ঘুমোচ্ছিলেন রামবাবু তাঁর ওয়ার্ডের ভিতরে।

সে এক রোমাঞ্চকর সকাল। ভোরের সকাল। একটা বিচিত্র চৈত্র রাতের শেষ। চারটে বাজে। শীত ছাড়েনি— যাব যাব করছে। শীতল হাওয়া দমকা নিশ্বাস ছাড়তে থাকে রাতের বুক থেকে মধ্যে মধ্যে। ভোর হয়ে আসছে। নতুন বসন্ত ওদিকে হোরি খেলছে

পলাশ গাছে, ঠিক পাঁচিলের ওপাশে, এপাশে রক্তের হোরি। এক ফোঁটা নীচে পড়েনি। কিন্তু গরম রক্তের স্রোত ছুটিয়ে দিয়ে গেল। শ'য়ে শ'য়ে দেশপ্রেমী রাজনৈতিক বন্দীর শিরায়। লক্ষণ নায়েক।

ফাঁসিকাঠের শুকনো বুকও তেতে উঠে থাকবে। কেঁপে উঠে থাকবে। লক্ষণ নায়েকের হরি হরি ধ্বনিতে। ধন্য হয়ে গিয়ে থাকবে। কত নরহত্যাকারীর ছোঁয়ায় বছর বছর ধরে জমে থাকা পাপ আজ মুছে গিয়ে থাকবে লক্ষণ নায়েকের পবিত্র পায়ের ধুলো পেয়ে।

হরিবোল! হরিবোল!

সেটাই একমাত্র ধ্বনি লক্ষণের মুখে। সেলের মধ্যে। জেলের ভিতরে। ফাঁসির ঘরে যাওয়ার রাস্তায়। ফাঁসিঘরের ভিতরে।

এদিকে শত শত রাজনৈতিক বন্দীর মুখে গর্জে উঠছে; স্বাধীন ভারতকি জয়। মহাত্মা গান্ধীকি জয়। লক্ষণ নায়েককি জয়। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কারো চোখেই ঘুম নেই। রাত দুটো থেকে শুরু হল জয়ধ্বনি। ধ্বনি নয়, কালের আহ্বান। রণহুঙ্কার। অত্যাচারী শাসনের প্রতি দুর্মদ আহ্বান।

ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। ফাঁসির ঘরে খট করে আওয়াজ হয়ে থাকবে। তারি সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব।

পূর্ণাহুতি, স্বাধীনতার যজ্ঞবেদী। বলি পড়েছে লক্ষণ নায়েক। শাঁখ নেই, উলু নেই, ঘন্টা নেই, মাদল নেই। আছে শুধু লোমহর্ষণকারী মন্ত্র - ভারতমাতা - স্বাধীন ভারত - মহাত্মা গান্ধী - বীর লক্ষণ।

একটা কোণে কম্যুনিস্ট ওয়ার্ড। চুপচাপ। নীরব। গোড়া থেকে।

এপাশেও ওয়ার্ড আর একটা; ঠিক মাঝামাঝি। সেখানে কোলাহল নেই, শব্দ নেই। শুধু উষ্ণতা। সামান্য। উষ্ণ নীরবতা। বোদ্ধা তারা। বুদ্ধি-বিদ্যের অহঙ্কার আছে। মান-সম্মানের জ্ঞান আছে। আসন পদবীর গৌরব আছে। ধ্বনি তোলার প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে, তবে নিজে ধ্বনি দেওয়াতে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার বাধাও আছে।

ধ্বনি দেওয়ার জন্যে অন্যকে উৎসাহ দিতেও সঙ্কোচ। তবে ধ্বনির জন্য নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার ধৃষ্টতায় কেউ কখনো অভিযোগ করেনি।

লক্ষণ নায়েকের ফাঁসি হওয়ার ছিল, হল। চেঁচিয়ে চিৎকার করে কেউ তার ফাঁসি আটকাতে পারবে না। কিম্বা ধ্বনি দ্বারা আর একজন লক্ষণ নায়েক তৈরি হবে না। এঁদের মতো। এঁদের তাই ছেলেরা স্থিতপ্রজ্ঞ বলে থাকে। মানে উপহাস করে।

ওদিকে শোরগোল হচ্ছিল। এদিকে শব্দ না করলেও এই স্থিতপ্রজ্ঞরা চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। ঘুমোবার উপায় নেই। কি আর করে এই স্থিতপ্রজ্ঞের দল! চলেছে ফিসফিসানি। পরামর্শ নিজেদের মধ্যে। কে কি হবে। আন্দোলন বিফল হয়েছে। আগষ্ট আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী শতই উপবাস করুন ব্রিটিশ সরকার কি এমনি এমনি ভারত ছেড়ে

চলে যাবে? কখনো নয়। কিন্তু এই রাজনৈতিক বন্দীদের কি চিরদিন বিনা বিচারে আটক করে রাখবে? অসম্ভব। ছেড়ে দিতে শুরু করেছে। কতজন বন্ড লিখে দিয়ে খালাস হয়ে গেছে। বন্ড মানে মুচলেকা। ঘাট মানছি। আর এ কাজ করব না। ক্রমে ক্রমে নৈতিক পতন দেখা দিতে শুরু করেছে সত্যাগ্রহ ছাউনিতে। স্থিতপ্রজ্ঞরা দুঃখিত সেজন্যে। একটু অপমান বোধ হয়। ওরা সেটা করতে পারে না। লজ্জা করে। লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু ছেলের বিয়ে, স্ত্রীর অসুখ বলে 'প্যারোলে' খালাসী নিয়ে যায়। সাময়িক মুচলেকা। বাইরে থাকার সময় সরকার-বিরোধী কাজ করবে না। তারপরে আবার জেলে আসবে। যাওয়াটা অল্প সময়ের জন্যে। তাই দোষ নেই তাতে। সবার এ সুযোগ মেলে না। যাদের রক্তে মানসম্মান, ভাবী পদ-পদবীর লোভ বিপ্লবের আগুনকে নিবিয়ে দিয়েছে, যাও বা একটু ধিকি ধিকি করছে তাও সেই ভাবী পদ-পদবীর লোভে, যারা এক আধবার মন্ত্রী-নেশা বা চেয়ারম্যান নেশা খেয়ে মজে গেছে, শুধু তাদেরই প্যারোলে রেহাই দেওয়া হয়।

তারাই শুধু ব্যস্ত হচ্ছিল কি করে একটা এককালীন ছাড়ান হয়। তাহলে আবার নির্বাচন হবে। আবার চেয়ারম্যান হওয়া যেত। মন্ত্রী হওয়া যেত। মতভেদ হচ্ছে। সব স্থিতপ্রজ্ঞরা একমত হতে পারছে না— কে কে মন্ত্রী হবে। কে ছিল কে বাদ পড়বে। কাকে মন্ত্রীমণ্ডল থেকে বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান পদে সন্তুষ্ট রাখা যাবে। কাকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদটা অন্তত দিতে হবে।

সেদিকে লক্ষণ নায়েকের গলা আটকে আছে ফাঁসির দড়িতে, এদিকে স্বপ্ন দেখছে স্থিতপ্রজ্ঞরা কার গলায় কত ফুলের মালা কত অভিনন্দন। এমনি কত লক্ষণ নায়েক মরবে। আগস্ট বিপ্লবে কত গুলি খেয়েছে। এই স্থিতপ্রজ্ঞদের মাঝ থেকে কেউ একজনও সে দুর্ভাগ্য বরণ করেনি। ইংরেজ সরকার ভারি সাবধান। সে আগে থেকেই এই নেতাদের আটক করে রেখে দিয়েছে। যেন তাদের গায়ে আঁচ না লাগে। এরাই ইংরেজ সরকারের তাঁবেদার হতে পারবে। কারণ এরা ইংরেজি ভাষা শিখেছে। ইংরেজি সভ্যতা চালচলনে অভ্যস্ত। এদের দিয়ে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা বেঁচে থাকবে ভারতবর্ষে। এরা চলে গেলে মূর্খ অসভ্য গেঁয়ো লোকেরা, কুলিমজুর চাষাভুষোরা দেশকে সামলাতে পারবে না।

গোরা শাসন চলে যেতে পারে। যাক। কিন্তু এই কালো চামড়ার ভিতরে গোরা শাসন অব্যাহত থাকবে। চিরন্তন হবে। সনাতন হবে। ইংরেজরা চলে গিয়ে ইংরেজি পড়ুয়ারা শাসন করবে। ইংরেজদের দুঃশাসন লোপ পাবে। শাসন করবে ইংরেজের প্রেতাত্মা।

সেই ফাঁসিকাঠ এখনও আছে। লক্ষণ নায়েকের আত্মা হয়ত এখনও চোখের জল ফেলছে ওই ফাঁসিঘরে বসে। মাঝরাতে এখনও হয়তো সেই কান্না শোনা যায়। পেঁচা ডাকে। একটা জাতির অধীর আকাঙ্ক্ষার অসফল চিৎকার-ধ্বনি।

সেই ফাঁসিঘরও তেমনি থাকে। ওদিকে বার হলে দুঃখী নমস্কার করে। সেইদিন থেকে দুঃখী দাশ দুঃখী দাসে পরিণত হয়েছিল। জেল সুপারকে লিখে জানিয়েছিল— ওর নাম দুঃখী দাস— তালব্য 'শ' নয় দন্ত্য 'স'। সে দুঃখীদের দাস বা সেবক রূপে পরিচয় দেওয়া গৌরবের মনে করে। নিজের ব্রাহ্মণ কুলশীল বলি দিয়েছিল সেদিন। সেই ফাঁসিঘরের সামনে।

তার সঙ্গে ছিল সেদিন ঘনশ্যাম, দীনবন্ধু, কাশী এবং আরও দু-চারজন। সকলে একটা সেফটিরেজার ব্লেডে হাত চিরে রক্ত বার করেছিল। সেই রক্ত দিয়ে লেখা হল পণ,— প্রতিজ্ঞা, ফাঁসিঘরের দেওয়ালে। "দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ জীবন দেশের জন্য।" উৎসর্গ, জীবনদান।

কোথায় চলে গেছে তারা। কে কোথায় আছে জানা নেই। মরেটরে গেছে কিনা তার ঠিক নেই। দশ টাকা থেকে পনেরো টাকা, পনেরো থেকে এখন পঁচিশ হয়েছে। পেনসান পায় কাশীনাথ। একদিন অকস্মাৎ কাশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দুঃখী দাসের। দুই স্যাঙাতের ভেট। বলল দু-দুটো নির্বাচনে কংগ্রেসী মন্ত্রীর জন্যে প্রচার করে তার উন্নতি হয়েছে— দশ থেকে পঁচিশে। আর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের স্বাধীনতার আগে যে এক হাজার ছিল সেই এক হাজার। কত ত্যাগ!

দুঃখী দাস কাশীনাথেরা এখন ঘরের কেউ নয়। কিন্তু ঘরের চালে কাককে বসতে না দেওয়ার দায়টা তাদের। এই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদীদের ঘোর সমালোচক রামবাবুর সঙ্গে যে কজন থাকত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রামবাবুর সঙ্গে এখন আছে। কেউ কেউ রং পালটে ফেলেছে। উঠেছে গিয়ে কংগ্রেস শিবিরে। তাদের এই অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। দেশের প্রকৃত সেবা। প্রতিক্রিয়াশীলদের ভিতরে ঢুকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত। কুরুবংশের ধ্বংসসাধন। শকুনির ভূমিকা, দুঃখীর মতে।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে তাদের বুকে। জাতীয়তার ভাবপ্রবণতায় লোকেদের মাতিয়ে তাদের সমাজে ঘৃণ্য দেশদ্রোহী বলে প্রমাণ করেছে এই কংগ্রেসওলারা। তার প্রতিশোধ না নেওয়াটাই অপরাধ। ছলে বলে কৌশলে তাদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করতেই হবে। তার জন্যে সব কমরেডকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

দুঃখ নেই। অবসাদ নেই। এগিয়ে চল, লাল পতাকার নীচে আগুয়ান হও। কংগ্রেসের লোকপ্রিয়তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ কোরো না। লোকনিন্দায় বিব্রত হয়ো না। সমস্ত নির্যাতন অকুণ্ঠ চিত্তে সহ্য করে যাও। যারা নিজেকে সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে কম্যুনিস্টদের মতো আন্তর্জাতীয়তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়, বিশ্ব শ্রমিকের প্রতীক এক মহান রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যারা ভাবপ্রবণতার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সাম্যবাদের পরম ধর্মে অনুরক্ত হয়, তারাই সমাজে নির্যাতিত হয় সবচেয়ে বেশি। এটা স্বাভাবিক। বিশ্ব-ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এতে সাম্যবাদের স্নাতকদের বিচলিত হলে চলবে না। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। বিপ্লবের আগুন লাগিয়ে দাও। চারিদিকে। জীবনের স্তরে স্তরে।

সত্যি সত্যিই একদিন আগুন লাগল কম্যুনিস্ট ওয়ার্ডে, বিপ্লবের বহ্নি নয়। নিরেট আগুন। কেরোসিন আর দেশলাইয়ের সাহায্যে। খড়ের চালের ওপর সে এক পরীক্ষা নয়। প্রতিশোধের পরীক্ষা! কেউ বলল— সাধু, সাধু! দেশদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি।

কেউ বলল, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। মানবিকতার ধর্ষণ— অহিংসার অন্তরায়। কেউ বলল— লাগিয়েছে কংগ্রেসওলারা। কেউ বলল— অসম্ভব। কংগ্রেসীরা এমন কুৎসিৎ কাজ করতে শেখেনি। কেউ উত্তর দিল— শেখেনি নয়, শিখছে। আর কেউ মত দিল— এমন

কাণ্ড কেবল সেই আগস্টবাদীরা করতে পারে যারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের কলঙ্ক। যারা হিংসাত্মক কাণ্ড বাধিয়ে গান্ধীজীর অনশনের জন্যে দায়ী।

ওয়ার্ড খোলা ছিল, তাই কেউ আহত হয়নি। কারো কোনো ক্ষতিও হয়নি। যা ক্ষতি সরকারের। ইংরেজ সরকারের। বিলেত থেকে যে টাকা এনে ভারত শাসন করত সেই টাকা থেকে কিছু গেল আর কি। আরো ক্ষতি হত কিন্তু শুধু ছপ্পরটুকু যা জ্বলে গেল। ঝাটিমাটির দেয়াল। কাঠের খুঁটিতে আগুনের আঁচ লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে দেওয়া হল, হুইসিলের ওপর হুইসিল বাজল। পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল। ওয়ার্ডাররা আসার আগেই আগুন নিবে গিয়েছিল। নিবিয়েছিল ওই দুঃখী দাস ও তার সঙ্গীরা।

তার পরের দিন কে একজন দুঃখীর হুঁশ ফেরাতে চাইল— "দাদা, তোমার পৈতা?"

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক নিষ্ফল প্রতীক, উচ্চ জাত্যাভিমানের এক নির্লজ্জ প্রকাশ যে 'দাশত্ব' সৃষ্টি করেছিল তাকে জলাঞ্জলি দিয়েও যেন দুঃখী দাসের মনের মধ্যে কোথাও উঁচু জাতের অভিমান উঁকি মারছিল। ভগবান তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন যাহোক। পৈতেটা কোথায় খসে পড়েছে বা পুড়ে গেছে কাল। জানতে পারেনি। আগুন নেভানোর ঝামেলায়।

কত যত্নে পরা পৈতা দুঃখীর। সাফসুতরো, পরিষ্কার। সেটা নাকি তার ব্রত। উপনয়নের দিন থেকে পরছে। ইংরিজি-পড়ুয়া বাবুরা অনেকে দেখে হাসে। অন্ধবিশ্বাস! সেটা গায়ে থেকে তাকে নাকি সবসময় মনে পড়িয়ে দেয় পৈতা হওয়ার সময় সে যা সব নিয়ম মেনে চলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

"সে প্রতিজ্ঞা গেল কোথায়?" কেউ একজন টিপ্পনী করল। "সর্বনাশ করলে দুখীদা, জাত গেল যে।" আর একজন টীকা করল।

"চেনা বামুনের পৈতের কি দরকার?" বলল দীনু।

দুঃখী কিছু বলল না। চেয়ে দেখল বুক, কোমর। সত্যি কোথাও খসে পড়েছে। বিচলিত হল না। ব্যস্তও হল না আর এক গাছা আনবার জন্য। জেলখানায় পৈতে পাওয়া কষ্ট।

এ ব্যাপারে সমস্ত জেলখানার ভিতরে একজন খুব খুশি। এই পৈতে নিয়ে কত ঝগড়া দুঃখীর সঙ্গে। আজ দুখীদা তাঁর মতের কাছাকাছি এসে গেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক পৈতে পরে না। তারাও মানুষ, পৈতে পরলে মানুষ অতিমানব হয় না।

"হ্যাঁ, তারাও মানুষ।" এবার দুঃখী মুখ খুলল রামবাবুর টীকা টিপ্পনী শুনে। "পৈতে না পরলে নয় তা তো আমি বলিনি কখনো। কিন্তু কারো কারো পৈতের আবশ্যকতা থাকতে পারে। তারা ঘৃণ্য নয়।"

"তারা আদর্শও নয় কিন্তু।" রামবাবু বললেন।

"দেখ রামবাবু। মানুষ আদর্শ অনুসরণ করলে আদর্শ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আদর্শ হওয়ার কল্পনা নিয়ে আদর্শের অনুসরণ করায় বিপদ আছে।"

"তাতে কি বিপদ থাকতে পারে? আদর্শ হওয়ার কামনাই শ্লাঘ্য। যতই বিপদসঙ্কুল হোক।"

"আদর্শ হওয়ার কামনার মূলে অন্যদের থেকে উঁচুতে থাকার অভিলাষ থাকে। সেটাই বিপদ।"

"তাই বলে আদর্শ হওয়ার বাসনা কি প্রগতিশীল মানুষ পরিত্যাগ করবে? আদর্শ হওয়ার আকাঙক্ষা না রেখে মানুষ আদর্শের পেছনে দৌড়োবে কেন?"

"হ্যাঁ, আদর্শ হওয়ায় আকাঙক্ষা না রেখেও আদর্শ অনুসরণ করা যেতে পারে।"

"কোন প্রেরণায়?"

"পিতাপিতামহের প্রতি ভক্তি প্রীতিই তার প্রেরণা। পরম্পরা রক্ষাই তার লক্ষ্য।"

"ক্ষমা করবে দুঃখীদা, আমি তোমার মতো গাড়ির চাকার চিহ্নিত পথে চলতে সুখ পাই না। পরম্পরা এক মারাত্মক রক্ষণশীল ব্যাধি। পরম্পরাকে আঘাত না করলে মানুষ এগোতে পারবে না। প্রগতিশীল হতে পারবে না। অসম্ভব। এই পরম্পরাই আমাদের মনের কদর্য বেড়ি। তাকে ভাঙতে হবে।"

"পরম্পরা টুটে গেলে আমরা মানুষ হয়ে থাকতে পারি না।"

"ভুল, ভুল, ভুল! অস্পৃশ্যতা নিবারণ করার জন্যে তবে চিৎকার করছ কেন? সেটা কি পরম্পরা নয়?"

"না। সেটা সমাজের এক কলঙ্ক। মানুষের মন অকেজো অচল হয়ে গেলে জং ধরে। অস্পৃশ্যতা সেই অচল সমাজের মরচে ধরা মন। তাকে সাফ করতে হবে।"

"কোনটা পরম্পরা কোনটা জং-ধরা মরচে জানবে কি করে?"

জং-ধরা মরচে সাফ করা যায়। সাফ হলে সুন্দর দেখায় আসল জিনিস। কিন্তু পরম্পরাকে পরিষ্কার করতে বসলে মূল জিনিস আর থাকে না। ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায় সব।"

"কিন্তু মরচে ছাড়লে কি মূল জিনিস কিছু নষ্ট হয় না?"

"রামবাবু, আপনি তাত্ত্বিক আলোচনা করছেন, ভালো কথা। মূল পদার্থের কতকাংশ ক্ষয় পাওয়া স্বাভাবিক, তবে ক্ষয় করার জন্যে আমরা চেষ্টা করব কি? যতটুকু ক্ষয় না হলে চলবে না ততটুকুই যাক। তার সঙ্গে কিছুটা ভালো কিছুটা মন্দও চলে যায়। যাক। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু আসলটা থাক।"

"তোমার পৈতেটা চলে গেল যে! সেটাও তো একটা পরম্পরা।" রামবাবু ঠাট্টা করে বসলেন।

দুঃখী দাসও হাসল। বলল, "দেখুন রামবাবু, পৈতে গায়ে রাখার পরম্পরাকে আমি ইচ্ছে করে ছাড়িনি, পৈতে আমাকে যা যা করতে প্রেরণা দিয়েছে, সেইসব কাজ অভ্যাসে হয়ে যাওয়ার পরে হয়ত পৈতে আপনি খসে পড়েছে। তার ফলে যে জন্যে পৈতে পরেছিলাম সে অভ্যাস আমার ক্ষুণ্ণ হয়নি। ব্রত নিয়ে পৈতে পরেছিলাম। পৈতে উড়ে গেল। কিন্তু ব্রত যায়নি। পৈতেটা ব্রত নয়। ব্রতের স্মারক। আমি ব্রত থেকে বিরত হইনি।"

এমন সময় কাশী বলে উঠল, কিছু দূরে সুতো কাটতে কাটতে কানটা রেখেছিল এদিকে, বলল, "পুড়ে মরতে রামবাবু, পুড়ে মরতে যদি পরোপকার ব্রত না নিত দুখীদা, শত্রু-মিত্র

সমজ্ঞানে সেবা করার পণ যদি সে না করত। দেশের শত্রু বলে তোমাকে যেমন সবাই ঘৃণা করছে, কেউ কি যেত আগুন নেভাতে? সেটা জানো? বাহাদুরী মেরো না।"

"তা ছাড়া, পৈতে খসে পড়ল বলে আমি আর পৈতে পরব না একথা তোমায় কে বলল?" দুঃখী বলল, "আমি পৈতে পরতেও পারি। নাও পরতে পারি। যদি পরি তবে সেটা হবে লোকশিক্ষার জন্যে। আমার চেয়ে যারা বয়সে ছোট, তারা যদি প্রশ্ন করে কেন পৈতে পরি না তবে তাদের কি উত্তর দেব? আর যদি না পরি তবে বুঝবে সে এই পৈতে ব্যবহারে আমার জাতিকুলের অভিমান বাড়ছে বলে আমি পৈতে ত্যাগ করলাম।"

সেইদিন থেকে দুঃখী দাস কিন্তু আর পৈতে পরেনি। এটা আভিজাত্যের এক চিহ্ন। খসে পড়ল তো পড়ুক, কোনো দুঃখ নেই। এতে পরম্পরা বাধা পায়নি। পরম্পরার এই ভেকটুকু অনেকদিন থেকে বাধা পেয়ে আসছে। তুমুল বিপ্লবের ইতিহাস সেটা। বলা হল 'বারো জাতি তেরো গোলা, বৈষ্ণব হলে সবই গেলা'। জাতি কুল পাণ্ডিত্য অহংকার না গেলে কৃষ্ণভক্তি হয় না। পড়েছিল দুঃখী দাস। তাই তার মনে দ্বিধা নেই।

পাঁচশো বছর পরে আজ সেই বিপ্লব আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। দুর্বার নদীস্রোতের বিরাট প্লাবনের মতো সেই বিপ্লবকে যুগোপযোগী করেন মহাত্মা গান্ধী। সে এক সর্বগ্রাসী বিপ্লব। সর্বগ্রাসী নয়, সর্বমুখী— বলে দুঃখী দাস।

রামবাবু বলেন— তিনিও বিপ্লবী। তাঁর বিপ্লব কিন্তু একমুখী একটা ধারা। তিনি চান অর্থনৈতিক বিপ্লব। দুঃখী শোনে। বিপ্লবের কথা শুনতে সে ভালোবাসে। রামবাবুর কাছ থেকে তাঁর বিপ্লবের কথা সে মন দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার মন মানে না। বলে, 'রামবাবু, এ তো নতুন গেলাসে পুরোনো মদ খাওয়া। মনের বিপ্লব ছাড়া, মানসিক আভিমুখ্যের পরিবর্তন ছাড়া কি শোষণের শেষ হওয়া সম্ভব? কখনো নয়।'

কিন্তু রামবাবু বলেন, 'মনের গোড়ায় এ জগৎ নয়, জগতের মূলে রয়েছে মানুষের মন। যা বাস্তব, যা আমরা চোখে দেখছি সেটাই সত্য। মন, বুদ্ধি, অহংকার সবেরই সেই বস্তু থেকে উদ্ভব। বস্তুর জ্ঞানই জ্ঞান-বিজ্ঞান। বস্তুর সংস্পর্শ ছাড়া জ্ঞান অসম্ভব। বস্তু ও বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষই বিপ্লব। দুই পরস্পরবিরোধী বস্তুর সংঘর্ষে নতুন সৃষ্টি। নতুন মনের বিকাশ। বাস্তবের রাজ্যে এই সংঘর্ষ বিনা মানসিক বিপ্লবের অবকাশ নেই।"

দুঃখী অস্বীকার করে না। সংঘর্ষ না হলে সৃষ্টি অসম্ভব। এটা সত্যি। কিন্তু সে সংঘর্ষ হিংসার সংঘর্ষ নয়। সে সংঘর্ষ প্রীতির। প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষতেই সৃজন। হিংসাত্মক সংঘাতে প্রলয়।

কিন্তু সেদিন শুক্রসেন বারিকের সামনে ছিল বিপ্লবের আর এক দিক। সে অর্থনীতি বোঝে না, অর্থনৈতিক বিপ্লব কি তাও বোঝে না। মানসিক বিপ্লবের রূপ সে কখনো চিন্তা করেনি। তার মনে এক বিরাট প্রশ্ন। তার ভিতরে এ কি উত্তাপ? তার বুকের মধ্যে? সে আজ কেন এমন মাতোয়ারা হয়েছে— খেপে উঠেছে, কেন বেসামাল হয়ে পড়েছে মরার

জন্যে? দেবতা কি ভর করেছে? মরতে আবার মানুষের এত লোভ হয় বুঝি? সে বুঝতে পারে না।

এই প্রশ্নের উত্তর তাকে কেউ দিতে পারছে না। দেখা ও শোনা যত কথা আছে এ দুনিয়াতে, সত্যি হোক মিথ্যে হোক কেউ দিতে পারছে না একথার উত্তর। ওর মনে কল্পনাতে কখনো ভাবেনি যে এরকম একদিন সে হবে। যেন এক ভীষণ কালো আঁধার ধূ ধূ করে জ্বলছে। মরতে পারাটা যেন ভারি একটা মজা।

সামনে দাঁড়িয়ে একটা মানুষ। বস্তু। কিন্তু সে কি বস্তু? কি পদার্থ? হাত-পা-মাথা থাকা কেবল মানুষের শরীর একটা। তা হয়ে থাকলে, তাকে দেখামাত্র শুকুরার বুকটা এত ফুলে উঠছে কেন? গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, গা-টা শিরশির করে উঠছে কেন? পোকায় ধরলে যেমন হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সেই দেখার ভিতরে একটা অদৃশ্য হাত এসে তাকে নাড়া দিচ্ছে। তার কথার আঁচ এসে তাকে তাতিয়ে দিচ্ছে। কথা নয়, ডাক। ডাক নয়, হাঁক। হাঁক নয়, হুঙ্কার। রণহুঙ্কার। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আহ্বান।

একদিন হুঙ্কার দিল সে মানুষটা— 'দিল্লী চলো'। দিল্লী যেতে হবে। সবার মনে এক নতুন উৎসাহ, দিল্লী যাব। বড়লাটভবনের ওপরে ত্রিরঙ্গা ঝাণ্ডা ফরফর করে উড়বে। আমরা ওড়াব। লালকেল্লার ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্যারেড করবে। কুচকাওয়াজ করবে। "দিল্লী চলো! দিল্লী চলো! আটতিরিশ কোটি ভারতবাসী চেয়ে রয়েছে— তাকিয়ে বসে আছে— আশীর্বাদ দিচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের মাথায়। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত— চলো দিল্লী চলো।"

বুক ফুলে উঠল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। চোখে আগুনের হলকা। সকলেরই। মাথায় রক্ত উঠেছে।

এ হুঙ্কার কালের আহ্বানে। এ ডাক মরণের ডাক। মুক্তির নির্ঘোষ। সামনে সর্বোচ্চ সেনাপতি— নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।

সেদিন শুকুরা— শুক্রসেন আর শুক্রসেন নয়। আর একটা মানুষ। সে বুঝতে পারল তার মাথার ভিতর থেকে একটা উত্তাপ এসে তার বুকের মধ্যেকার যন্ত্রটাকে খালি ফোটাচ্ছে। সেই ফোটানোতে সে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছে, চাল ফুটে ভাত হওয়ার মতো। তার ভিতর থেকে ভয়-ডর সব পালিয়েছে। ছোটবেলায় মা শিখিয়েছিল রাত বিরেতে ভূতপ্রেতের ভয় করলে তিনবার 'দুর্গা দুর্গা দুর্গা' বলে ডাকতে। ভয়-ডর পালাবে।

আর আজ?

কে সে সিরাজউদ্দৌলা? কে সে মোহনলাল? কোথাকার লোক হায়দার আলী, টিপু সুলতান, আপ্পা সাহেব, ভোঁসলা, পেশোয়া বাজিরাও? কোথায় গেল অযোধ্যার বেগম, সর্দার, অক্রিওয়ালা? কোথায় আছে রানী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি, কনওয়ার সিং আর নানাসাহেব? সে চেনে না জানে না কাউকে। শোনেইনি আগে কারো নাম। তবে তাদের কথা সব শোনার পর থেকে তার ভয়-ডর কোথায় উবে গেছে। ভূত-প্রেতের ভয় তো অতি তুচ্ছ। মরণের ভয়ও পালিয়েছে। শুধু তাই নয়, মরবার জন্যে কেমন একটা লোভ হচ্ছে। মরণের সঙ্গে খেলবার ইচ্ছে হচ্ছে।

মরণ নয় - মরণ নয়— লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবন। জীবনের মেলা— মহোৎসব।

সেদিন ঘোষণা করা হল স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার— বিদেশে। ভারতের বাইরে। সিয়ানান্-এ। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, রক্ষামন্ত্রী, বৈদেশিক মন্ত্রী সকলের নাম ঘোষণা করা হল। ঘোষণা করলেন নিজে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস!

"বন্ধুগণ, হে মোর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিবাহিনী; আমাদের আজ একমাত্র সঙ্কল্প— একমাত্র পণ— স্বাধীনতা নচেৎ মৃত্যু। একটি মাত্র ধ্বনি— এক্‌হি আওয়াজ—দেহলী - চলো! দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ"।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলেন আমাদের প্রিয় অতিপ্রিয় সর্বোচ্চ সেনানায়ক নেতাজী।

সে ডাক শোনা গেল আরাকানে। সে আওয়াজ উঠল ঈরাবতীর তীরে তীরে। নেতাজীর ডাক। দেশের ডাক। জাতির ডাক। সে গর্জন কানের ভিতরে মগজে গিয়ে ঢোকে। আগুন ধরিয়ে দেয় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি প্রাণে— যে যেখানে ছিল।

আজ আর সে আগুন নেই, কিম্বা উত্তাপ নেই। সব শুনল দুঃখী দাস। শুকুরা বর্ণনা করতে থাকে। দুঃখী ছাড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস— দীর্ঘনিঃশ্বাস।

আজ আর সেই আগুন বা তার আঁচ নেই। সব অন্ধকার। সব ঠাণ্ডা। আশা নেই। আকাঙ্ক্ষা নেই। বাস্তব নেই, কল্পনাওনেই। স্বপ্ন নেই, সত্য নেই। শুধু আছে বস্তুবাদ ও ছায়াবাদের দ্বন্দ্ব, প্রগতি আর রক্ষণশীলতার তাত্ত্বিক তর্ক।

বারো বছর। একটা যুগ। কেটে গেছে বছরের পর বছর। আগষ্ট পনেরো জানুয়ারি ছাব্বিশের সরকারী উৎসব ছাড়া কোথাও কিছু নেই। ভারতের বহু কল্পনার রূপ বাস্তবতার রঙে রঞ্জিত হতে পারেনি আজও। জগন্নাথের নতুন কলেবর হয়ে গেছে। কিন্তু জোড়া আষাঢ় আসেনি আজও ভারতের ভাগ্যপঞ্জিতে।

তার জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই। ডুবে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে দুঃখী এক একদিন ভাবে। অন্ধকার এগিয়ে আসছে। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে আত্মার জ্যোতি, ভারতের আত্মাকে সে যেন নতুন করে আবার আবিষ্কার করছে।

এ মাটিতে কেউ তিষ্ঠতে পারেনি। কেউ তিষ্ঠতে পারবে না। গান্ধী, মার্কস, মনু কারো নাম নয়। চিরদিন থাকবে শাশ্বত চিরন্তন হয়ে ভারতের এক দুর্বিনীত অপরাজেয় আত্মা। যা কারো আধিপত্য স্বীকার করেনি আজ পর্যন্ত।

কারো নয়। কত সম্রাট, কত শক্তি এ দেশকে অধিকার করেছে, ইতিহাসের পাতার পর পাতাকে আপনার গৌরবে মণ্ডিত করে। করেছে সত্যি, কিন্তু কেউ পদানত করতে পারেনি তার অনবদমিত আত্মাকে।

কই সে চেঙ্গিজ কই সে সিকন্দর? পাঠান, মোগল, ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ? এ দেশের মাটির গন্ধেও তাদের পাত্তা নেই।

কোথায় নন্দ, কোথায় মৌর্য? কোথায় গেল পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, সিরাজউদ্দৌলা, মিরজাফর। কই, কেউই তো রাখতে পারেনি এই পূণ্যভূমির উপরে তাদের কীর্তি অপকীর্তির কালজয়ী স্তম্ভ? ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যাবে বহুবার বহুধা-খণ্ড বিখণ্ড ভারত আসিন্ধু হিমালয়, আসিন্ধু ব্রহ্মপুত্র এক বিরাট ভূ-ভাগের আত্মা এক। ধ্বনি এক। বাণী এক।

কিন্তু এই আত্মা স্বীকার করেছে একটিই আলোড়নকে। অবনত মস্তকে। ভারতের ইতিহাস কেবল সেই আত্মিক বিপ্লবে প্লাবিত হয়ে এসেছে। সেই আধ্যাত্মিক চেতনায় তার চৈতন্য চিরদিন চিরন্তন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মনু, পরাশর, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদের মহা-চেতনার জোয়ার তার বেলাভূমিতে ঢেউ তুলে গিয়েছে। সকলের চরণরেণুতে, পাদোদকে তার বেলা আজ সিক্ত-পললিত।

কিন্তু রামবাবু বলেন, সব লাল হো যায়েগা। দুঃখী হাসে। ইংরেজ সরকার রুশকে না তুলে দিয়ে যায় এ দেশটাকে!

ঘনশ্যাম বলে— কভি নেহি হোগা। এ দেশ গান্ধীর দেশ। গান্ধী অমর। গান্ধীবাদ অমর।

দিনু বলে, "না রে ভাই, কিছু বলা যায় না। এ দেশ এক বিচিত্র দেশ। এ দেশের মানুষগুলো আরো বিচিত্র। এ দেশ বুদ্ধকে কোন পাতালে চেপে দিল। তিনি গিয়ে উঠলেন চীনে, জাপানে। গান্ধীকে তেমনি তক্তায় ওপরে-নীচে কাঁটা দিয়ে না গেঁথে কি ছাড়ছি?"

তখন কে জানত যে এই দেশের একটি সন্তান গান্ধীকে গুলি করে মেরে ফেলবে। সেদিন জেলের মধ্যে দীনবন্ধু ভবিষ্য-সূচনা ঠিকই দিয়েছিল।

কিন্তু গডসে গান্ধীকে মারেনি। গান্ধীকে মেরেছে আসলে তাঁরই ভক্তরা। গডসে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে গান্ধীকে। আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তিনি তিল তিল করে মরতেন। তাঁকে জবাই করত তাঁর ভক্তের দল।

"ভগবান, আমাকে নিয়ে যাও। আমার কথা কেউ শুনছে না।" প্রার্থনাসভায় গান্ধী বললেন শেষে। কাতর হয়ে। দিল্লীর মসনদে তাঁর যে ভক্তরা বসেছিল ক্ষমতা-মদমত্ত হয়ে কর্ণপাত করল না। ভাবল না একবার— যে গান্ধী মাস কয়েক আগে বলতেন কলিযুগের পরমায়ু একশো বিশ বছর, পুরো বেঁচে থেকে আমি দেশের সেবা করতে চাই, সেই গান্ধীর মুখে একথা কেন। ভগবান ভক্তের ডাক শুনলেন। গান্ধীকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। গডসের গুলিটা খালি লোকদেখানো, জরা শবরের তীরের মতো।

গান্ধীজী তো চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের ভারতও উবে গেল। রামরাজ্য, গ্রামরাজ্য খালি কথার কথা। কথার মাঝেই রয়ে গেল।

মার্কসের বস্তুবাদের অবস্থাও তাই হবে। কি জানি বা গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না বলে গান্ধীজীকে ভুললেও দূরের পর্বত সুন্দর দেখায় বলে আমাদের লোকেরা মার্কসকে বাঁচিয়ে রাখলে রাখতে পারে। সময় সময় মনে হয় দুঃখী দাসের। কিন্তু কই? এখন কতপ্রকার বামপন্থী মার্কসবাদী সার্কাস দেখাচ্ছে। মার্কসের সাচ্চা সন্তান কে— বলা মুস্কিল। দক্ষিণপন্থী মার্কসবাদী, বামপন্থী মার্কসবাদী, সমাজবাদী, সাম্যবাদী, ফরওয়ার্ড ব্লক বামপন্থী, আরো কত প্রকার কত

কিসমের কম্যুনিস্ট গজিয়েছে এ মাটিতে। কেউই তো টিকতে পারছে না।

সেটা বোধহয় গান্ধী বা মার্কস কারো দোষ নয়। এক এক সময় দুঃখী একটা সমাধান করে মনে মনে। দোষটা আমাদের দেশবাসীর। এখানে তো প্রচ্ছন্ন মার্কসবাদী বারো বছর ধরে ভারত শাসন করছে। মার্কসবাদীর দেশ রাশিয়া থেকে ধার করে এনে বিধিবদ্ধ যোজনা করছে। একটার পরে একটা পঞ্চবার্ষিক যোজনা— বালুঙ্গার কথার ছটায়, রুষিত যোজনা এসেছে। সে কি নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে টিকবে?

সত্যি টিকছে না, বাড়ছে না। শুধু কি যোজনা? এ মাটিতে কিছুই তো গজাচ্ছে না। মার্কসবাদী, প্রচ্ছন্ন মার্কসবাদী সবাই মিলে শ্রমিক সংঘগুলো গড়ল। যোজনায় শিল্পের প্রসার হবে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন সব গড়ে উঠবে। প্রোলিটেরিয়েট সৃষ্টি হবে। বিপ্লবের জন্যে সর্বহারা তৈরি হলে তারপরে গিয়ে দলিত শোষিতদের একচ্ছত্রবাদ। কই, কোথায় কি হল?

শিল্পাঞ্চল হল। শ্রমিক সংঘও হল। প্রোলিটেরিয়েট হল। তাদের নেতাও হল। কিন্তু প্রোলিটেরিয়েট ডিকটেটর কই? সোনা হল, পাথরের বাসনও হল। কিন্তু সোনার পাথরবাটিতে খাওয়ার সখ মিটল কার?

কিন্তু রামবাবু বলেন, "হবে, আলবাত হবে। সব লাল হো যায়েগা। ভারতবর্ষে একচ্ছত্রবাদ অবশ্যম্ভাবী। কেউ রুখতে পারবে না। হাজারটা মহাত্মা গান্ধী জন্মালেও বিপ্লবের সঙ্গে সালিশ করে বিপ্লবকে ঘিমিয়ে দেওয়াটাই কেবল তাদের চেষ্টার ফল হবে। দলিত শোষিতদের একচ্ছত্রবাদ আলবাত হোগা।"

নেতাজীও সেই কথাই বলতেন। খেতে বসে শুকুরা বলতে থাকে দুঃখীকে। একসঙ্গে বসেছে। নেতাজী নাকি বলতেন, ভারতবর্ষে প্রথমে একজন একচ্ছত্র শাসক দরকার। কয়েক বছর কাটার পর গিয়ে যাকে বলে গণতন্ত্র শাসন টিকতে পারবে। লোকেরা লেখাপড়া করবে, শিখবে, জানবে, তবে না গণতন্ত্র। মূর্খের জন্যে কিসের গণতন্ত্র? কত লোক ঠাট্টা করে বলে, মূর্খদের নিয়ে গণতন্ত্র হবে না, হবে গণ্ডতন্ত্র।

খাওয়া শেষ করে একটু গড়াতে গেল শুকুরা। ভারি দয়া হল দুঃখীর এই শুকুরা লোকটার প্রতি। অনেক কথা গল্প করে গেল শুকুরা ভাতের থালার সামনে বসে। দুঃখী শুনতে থাকে সব। তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

জিতে গেল শুকুরা। হারেনি কোথাও জীবনযুদ্ধে। রতনী আসুক আর নাই আসুক, রতনীকে নিয়ে সে ঘর করুক বা নাই করুক, শুকুরা আর ভেঙে পড়বে না। ভেঙে পড়ার আর নেই কিছু। গান্ধারী দুর্যোধনের গায়ে হাত বুলানোর মতো তার গায়ে কে যেন হাত বুলিয়ে দিয়েছে। জানুটাও বাদ দেয়নি। সব শক্ত হয়ে গেছে। শুধু শরীর নয়, মনটাও।

ইস্পাতের মতো শক্ত। পাথরের মতো কঠিন। কিন্তু সুন্দর ভাস্কর্য সম্ভব হতে পারে তাতে। দয়া যদিও হয় তাকে দেখলে, কারো দয়া পেলে কিন্তু ওর আত্মা বুঝি অপমানিত হবে। দুঃখীর বাড়িতে সে সুস্থ বোধ করছে না, স্বস্তি পাচ্ছে না। বাধো বাধো ঠেকছে, পা আটকে যাচ্ছে, চলতে চলতে হোঁচট খাচ্ছে পথে। শুধু শুধু, নিজের একটা ঘর বানিয়ে ঘর না বাঁধা পর্যন্ত শান্তি পাবে না মনে।

সেইজন্যে সে নিজে গেল শুকুরার সঙ্গে। শুকুরা যাচ্ছে রতনীকে ডাকতে। রতনী কি বলবে? আসবে তো?

গাঁয়ের মাথায় রাউত-বাড়ি। রাউতদের ছেলে নীল। এখন সে কত না জানি সম্পত্তির মালিক। দেদার। শহরে দোতলা বাড়ি। গাঁয়েতেও পাকা বাড়ি। কলকাতায় সর্দারী আর নেই। অনেকদিন হল গেছে। এখন একটা কারখানা আছে সেখানে। লোহা ঢালাইয়ের কারখানা। কলকাতায়, কটকে, ভুবনেশ্বরে সবখানে বাড়ি। ভাড়ায় দেওয়া সব। বাপ ভিখারী রাউত মারা গেছে। লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ ছিল। ওরই আমলে যা-কিছু উন্নতি। নীল অবশ্য সামলে রেখেছে। নয়-ছয় করেনি। ভারি হুঁশিয়ার। সবেতে থাকে, আবার কোনোটাতে থাকে না।

বাপ মরার সময় সোনার ইঁটগুলো যা পুঁতে রেখেছিল দেখিয়ে দিয়ে গেল নীলকে। পাঁচটা কি দশটা। কাঁচা সোনা।

নীলটা কি কম বখাটে ছিল? ওকে পথে আনল এই মেয়ে। যার হাত ধরে সে বিয়ে করল। নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাল বসাল সেই মেয়ে। যাবে কোথায় বাপধন। ভারি হুঁশিয়ার মেয়েটা। রাতদিন হিসেব কষতে থাকে। নিচু জাত বলে নীলের একটু সঙ্কোচ থাকে। মনের নিচু ভাব। তাই সে বউকে ডরায়। নীলের বাপের পয়সা দেখে মেয়ে দিয়েছিল রাউতদের ঘরে নীলের শ্বশুর। কেউ কেউ ছি ছি করত। কিন্তু নীলের শ্বশুর ঢেউ গুণে পয়সা করা বংশের ছেলে। দেমাকে বলে, আমরা আধুনিক। এই জাত জাত করে দেশটা গেল! আবার জাত?

রতনী সেখানেই আছে এখনো। নীল বিয়ে করার পরও। কে কত টিটকারি দেয় রতনীকে। সে কিছু বলে না। ভাগ্যকেই যা দোষ দেয় মনে মনে। কিই-বা আর করত? সে যা করেছে সেটা ঠিক বলে কেউ বলুক আর না বলুক, সেটা আপনাআপনিই ঠিক হয়ে গেছে। আর কেউ হলেও বেশি আর কিই বা করতে পারত?

হলেই বা কি বয়ে গেল! হ্যাঁ, নীল তাকে গড়িয়ে দিয়েছে সত্যি, হাতে রুপোর খাড়ু, পাছায় চন্দ্রহার, গলায় সোনার সুতিহার। তাতে কার কি গেল? আর তো কিছু নেই তার। বিশ-পঁচিশ বছর খেটে খেটে, ধান ভেনে, শুকিয়ে নিকিয়ে পাঁচজনের দোরে রোদ-বৃষ্টিতে ঘুরে পেটের দায় মিটিয়েছে। একটা পেট বই ত নয়। আর বাদ বাকি কিছু হয়তো বাঁচিয়ে রেখেছে।

নীলের শ্বশুর জেনেশুনে কি করে মেয়ে দিল? গাঁয়ের লোক ফিস ফিস করে। সত্যি কথা। হলেও এটা কি এমন একটা মারাত্মক ব্যাপার?

নীলের শ্বশুর দারুণ বিষয়ী লোক। সংসারে কেমন করে চলতে চালাতে হয়, জানে। সে কি এসব কথা পরোয়া করার মানুষ? বললে, "হলই বা। মেয়েমানুষ একটা রেখেছে তো? বেটাছেলে। এমন কি আর হয় না? পায়ের জুতো। পুরোনো হলে ফেলে দেবে। আপনি ফেলে দেবে। মাগনা সোহাগ কি থাকবে চিরদিন? বয়েসকালে কে কত কিই না করে। আমার জামাই তো লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করেনি। চুলকানি হলে লোকে চুলকোয়। কণ্ডু করে

বলে, ভালোও লাগে। তাই বলে কি চুলকানি ধরে বসে থাকে? ওষুধ লাগিয়ে ভালো করে না? এখন আমার মেয়ে গেলে কোথায় রোগ পালাবে। আপনিই পাঠ পড়াবে সে।

ওই শ্বশুর এককালে ছিলেন জমিদার। কিছু পয়সাকড়িও ছিল। একটি ছেলে আর এই মেয়ে। মেয়েটির একটু কাহিনী আছে। দেখতে মন্দ নয়। লোকে বলে নীলের পয়সার ওপর চোখ রেখে তিনি তাকে মেয়ে দিয়েছিলেন এই জনরব তিনি করিয়েছিলেন। নিজের নিন্দা প্রচার করিয়েছিলেন তাঁরই লোক দিয়ে।

আসল ব্যাপারটা হল মেয়ে পড়ত কলেজে। ছেলেদের কলেজ। মেয়ে যারা পড়ত, আঙুলে গোনা যায়। তখন এত রিক্সা-মোটর ছিল না। বড়লোকদের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। ভাড়াও পাওয়া যেত। অনেক মেয়ে একসঙ্গে যেত। এই মেয়েটির বাপের একটা ফিটন ছিল।

মেয়েটি খুব মুখরা; তুখোড়। তবুও সামলাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। যতই মুখে তোড়ফোড় করুক ভিতরে নরম থাকেই সব মেয়ে। কোনো এক চালাক ছেলে বাইরের শক্ত খোলা দেখে ঘাবড়ায়নি। লেগে রইল পিছনে। সবুরে মেওয়া ফলে। সবাই জানল। বলল, ছেলেটা ভাগ্যবান, বেশ কিছু পাবে।

কিন্তু মেয়ের বাবা শুনে খাপ্পা। একেবারে না। ছেলের কি ঠাট-বাট আছে, খানদানী আছে, বনিয়াদী আছে যে জামাই করব? কখনো না।

তবু মেয়েটার খুব সাহস। ছেলেটাকে লুকিয়ে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে একদিন চিড়িয়া ফুড়ুৎ। আঁধার রাতে ছেলেটা অপেক্ষা করছিল রাস্তার ধারে কিছুদূরে ঘোড়াগাড়ি দাঁড় করিয়ে। ব্যাস, দিল চম্পট।

কিন্তু বাপ ঝানু লোক। মায়ের কান্না অনেক বুঝিয়েটুঝিয়ে বন্ধ করল। পুলিসে খবর দিল। পুলিস গিয়ে ধরল ট্রেনের মধ্যে। পনেরো-ষোল স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছিল দুই বগা-বগী কেদার-গৌরী। পুলিস বলেছিল হাজতে পুরবে। কিন্তু মেয়ের বাবা অতি চতুর। খুব সাবধান। মানা করল। কথাটা চাউর করাতে চায় না। পুলিসের পকেট ভারি করে দিল। পুলিস ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। মেয়েকে পাঠিয়ে দিল বাপের সঙ্গে। ছেলেটা তারপর গণ্ডগোল বাধাতে চেষ্টা করেছিল। মেয়ের বাপ অনেক কায়দা করে ছেলেটা চরিত্রহীন বলে মেয়েকে বিশ্বাস করিয়ে তোতাপাখির মতো পড়িয়ে শিখিয়ে ওই মেয়েকে দিয়েই ছেলেটাকে অপমান করে ভাগিয়ে দিল।

রতনী জানে না সেই ছেলেটা কোথায় গেল। সেই বা কেন জিজ্ঞেস করবে? কাকে জিজ্ঞেস করবে? তার কি দরকার। বাড়িতে বউ এল। আসার কথা, এল। তার মনে দুঃখ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সে রাগ করেনি। অভিমান করেনি। যেমন বাড়ির চাকরানী ছিল তেমনি রইল।

দুঃখী কিন্তু চেনে সে ছেলেটাকে। রামবাবু একদিন চিনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেওছিলেন, "রাউতবাড়ির বউয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা চলেছিল।"

সেইদিন ছেলেটি বাড়ি এসে কেবলি ভাবতে থাকে। আওড়াতে থাকে — সামন্তবাদ,

পুঁজিবাদ। ট্রেড ইউনিয়ন, বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দুটি বস্তুর সংঘর্ষ। দুটি ভাবধারার সংঘর্ষ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, সমাধান। অন্বয়, প্রত্যন্বয়। দুইয়ের সংঘর্ষে তৃতীয়ের উৎপত্তি। নারী আর পুরুষ। আর নারী পুরুষের সম্পত্তি নয়। পুরুষ নারীর বিপত্তি নয়। নারী পুরুষের একচেটিয়া বাণিজ্য নয়— অবাধ বাণিজ্য।

অনেকে এখন সে ছেলেটাকে চেনে। বিয়ে করেছে। সেজন্যে যে চেনা তা নয়। সে একজন বিপ্লবী। বিয়ে করেও বিপ্লবী। তারপর থেকে পড়া ছেড়ে দিল। লেখাপড়া করা একটা আদর্শ। একটা ছায়াবাদ। মরীচিকা। সে বাস্তববাদী হয়ে গেল সেইদিন থেকে।

এখন সে একজন বামপন্থী নেতা। বামপন্থীরা বাম পন্থী। ভাগ্য বাম হলে যারা এ পন্থা ধরে তাদের বামপন্থী বলা হয়— সেরকম বামপন্থী নয়। বামার কাছ থেকে গুঁতো খেয়ে এ পন্থা কেউ ধরল তাই সে বামপন্থী— এমন কোনো কথা নেই। পেইন বাম অমৃতাঞ্জন বলে তার বন্ধুরা রাগানোর মতো সে যে বামপন্থী, তাও নয়। সে প্রকৃতই বস্তুবাদী বামপন্থী। আদর্শ ওর কাছে একটা মায়া, ছায়া।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, "বাম মানে কি?" সে শুধু হাসল।

"মানে, বাঁ হাত, যা দিয়ে বাহ্যে যাওয়ার পর শৌচক্রিয়া করা হয়?" সে আরো জোরে হাসল।

"মানে, দক্ষিণের উল্টো!"— সে হাসতে হাসতে মাথা হেলায়।

"মানে, দেখিয়ে যেটা নেয় সেটা দক্ষিণা। আর লুকিয়ে বাঁ হাতে যেটা নেওয়া হয়। মানে, হাতের মধ্যে গুঁজে দেওয়ার নাম বামপন্থা। নয়?"

সে রেগে যায়।

"না, না, না, আমি ভুল বললাম। মানে ইংরেজিতে যাকে রাইট বলে তার উল্টো তো?"

"এতক্ষণে পথে এলে", বলল সেই ছোকরা।

"রাইটের উল্টো তো রং। মানে ভুল, বামপন্থা মানে ভুল পন্থা?"

"বামপন্থা মানে অগ্রগতি। রক্ষণশীলতার বিরোধী।"

"কোন দিকে গেলে অগ্রগতি, কোন দিকে গেলে পশ্চাৎগতি?"

"আমাদের বাঁ হাত কোন দিকে? উত্তর দিকে কি না? উত্তরকালে অর্থাৎ পরবর্তী ভবিষ্যৎকালে খাপ খাওয়ার মতো পন্থা হল বামপন্থা, বুঝলে?"

"এবার বুঝলাম। আমি মনে করেছিলাম বাঁ হাত যা যা করে সেগুলো করার নাম বামপন্থা"

ছোকরা আবার রেগে গেল। "আমাদের কি মেথর পেলে?"

"সমাজের ময়লা সাফ করাটা কি খারাপ কথা? যাবতীয় সামাজিক আবর্জনার সংস্কার হল বামপন্থীর কাজ।"

রাগে সে পালিয়ে গেল উত্তর না দিয়ে। লোকটা তার এক বন্ধু। সেও ছোকরা। শুধু রাগানোর জন্যে কি সব বলছিল। রেগে না গেলে কথা ফুরোত। রেগে যাওয়াতে আরো

খেপাল। পালাতে গেলে এ কি তাকে ছাড়ে? ধাওয়া করল পিছনে।

হঠাৎ রাস্তায়, বাজারের মাঝখানে, সামনে উপস্থিত এক বিরাট সংঘর্ষের সম্ভাবনা। একটা ষাঁড়। বাজারের রাস্তায় ভিড়ের মাঝে যে-সব ষাঁড় 'চারিদিকে দেখে যাহা আমার নজর, সে সবের আমি একমাত্র অধীশ্বর' ভাব প্রকট করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারই একটা, তেড়ে এল কি জানি কেন এই ছেলেটার দিকেই। সে হাত দুটো সামনে তুলে বলল 'হাঁ-হাঁ একি কর কম্রেড, এটা বিপ্লব নয়। বিপ্লব কি এরকম দেখাতে হয়? মার্কস বলেছেন,— কি বলেছেন— কি বলেছেন— দাঁড়াও একটু বই দেখতে সময় দাও।'

ষণ্ড মহাশয় সময় দিলেন না। মার্কসের কথা মানলেন না। যে ছেলেটা তার পিছনে ধাওয়া করছিল সেই একটা দোকানের সামনে থেকে বাঁশের খুঁটি টেনে এনে এক ঘা লাগাতে ষাঁড়টি মুখ ঘোরাল। যদিও ছেলেটা খুব জোর একটা আছাড় খেল কিন্তু ষাঁড়ের গুতো থেকে রক্ষা পেল।

ভুঁই থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গা হাত ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'এটা অ্যান্টি-থিসিস!' সেই সময় বাজার-বেড়ানো একটি মেয়ে হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে ওর গায়ে হাত বুলাল। সঙ্গী ছোকরা বলে উঠল, 'এটা সিন্থেসিস'।

বাস্তবিক সিন্থেসিস হয়ে গেল। বিরাট সমন্বয়। যুবতীটিও একজন কমরেড। সেদিন প্রথম দর্শন না হলেও প্রথম স্পর্শন। সহানুভূতিশীলা যুবতী আখেরে একটি যুবককে পাগলা গারদে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিল। বিয়ের দিন সঙ্গী যুবকটিও যে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিল এটা না বললেও চলবে। দুজনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করল। রেজিস্ট্রারের খাতায় দস্তখত করার পর সাক্ষী পড়তে হল সেই বন্ধুটিকে। সই করতে করতে বলল, "বন্ধু, বস্তুবাদী সত্য সময় সময় অবাস্তব কল্পনা, এমনকি মনগড়া ঠাকুর্মার গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর।"

এদিকে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা চলল, খুব যখন খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছেন নীলের শ্বশুর, এমনি সময় ধরা পড়ে গেল নীলমণি। ওর বাপ তখন গত হয়েছেন। শ্বশুর হলেন নীলের মুরুব্বি। দুজনেই ধুরন্ধর ধড়িবাজ। দুজনেই দুজনের ওপর নজর রেখে চলে।

মেয়েও কিছু কম যায় না। খুব সেয়ানা। দুদিক থেকেই হাত তেলায়। নীলকে পটিয়ে পাটিয়ে তার কারখানার একটা শেয়ার ওর ভাইয়ের নামে করিয়ে নিল। বাপ মানে নীলের শ্বশুর ভীষণ খুশি। বাপের বেটি। এদিকে মায়ের গয়না থেকে বেশ কিছু মেরে নিয়ে এসে বলল চোরে নিয়েছে। রাতে সে নিজে দেখেছে, খিড়কির দোর দিতে ভুলেছিল তারা। পুলিস চোরের সন্ধান পেল না।

এখন সে তিন ছেলেপিলের মা। নদী-উজান বইছে। একদিন তিন তিনটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এল বাপের বাড়ি। বললে নীল তাকে মেরেছে। সে আর সেখান থেকে যাবে না। ছাড়পত্র মোকদ্দমা কর।

চলল মোকদ্দমা, একদিন বসে কাঁদতে লাগল, খাওয়াদাওয়া বন্ধ। বলল মোকদ্দমার যাই হোক ছেলেমেয়ে কি ভেসে যাবে? কটা টাকা খোরপোষ পেয়ে তার কি হবে? বাপ

আর কি করে। লিখে দিল নাতির নামে এক বাড়ি, নাতনীর নামে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা।

ও মা, তারপরে পনেরো দিন পার হয়নি, বাবাকে বলল, "তিনি আসবেন লিখেছেন। এলে তুমি কথা বোলো না। দোরগোড়া থেকে ফিরে যাক। আমি আর এত মার সইতে পারি না।"

সত্যি সত্যি নীল যখন এল শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুর বেরোল না। কথা বলল না। নীল ব্যাপার কি বোঝার জন্য সোজা গেল বউয়ের কাছে। "চল, বাড়ি চল।"

ব্যস, কি দেখবে, বাবা-মা চেয়ে আছে, টং টং করে বেরিয়ে গেল স্বামীর সঙ্গে। সবাই অবাক। চখা-চখী উড়ে গেল।

প্রথম প্রথম এসে রতনীকে সে খুব নজরে রাখত। বাবুর ধারে কাছে ঘেঁষতে দিত না। এখন সব কড়াকড়ি উঠে গেছে। বাসি ফুল। ভোমরা আর আসবে কেন?

রতনীর কানে গেল— শুকুরা নাকি এসেছে। অ্যাঁ, শুকুরা সত্যি এসেছে? একা এসেছে? এসেছেও বা। এলেও কি তাকে নিতে চাইবে? আর কি তাকে নিয়ে ঘর করবে? বাসা বাঁধবে? খুব গভীর একটা নিঃশ্বাস হালকাভাবে বেরিয়ে যায়।

বাসন মাজছিল রতনী। তাকিয়ে দেখে, শুকুরা! শুকুরাই তো। না অন্য কেউ? তারই মতো দেখাচ্ছে তো। সঙ্গে দুখীদাঠাকুর। দুখীদার সঙ্গে আর কে হবে? তখনি হাত থেকে বাসন একখানা পড়ে গেল। মাজছিল। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল ঘরের ভিতরে। গায়ের দিকে চেয়ে দেখল। নোংরা কাপড় পরে আছে। শুকুরার সামনে যাবে কি করে? কস্তা শাড়ি একখানা পরতে নেই?

সেজন্যে নয়। সেই জন্যে কি পালিয়ে এল? সে ভাবতেই পারছিল না যে সত্যি সত্যিই শুকুরা এসেছে। শুকুরা কলকাতা থেকে এসেছে। শুকুরা পঁচিশ বছর পরে ফিরেছে। আর এখন এসেছে তারই কাছে। না - না, এলে এসে থাকবে বাবুর বাড়ি।

মানুষের মনের ভিতরে যেখানে বিশ্বাস বাসা বেঁধে থাকে, সেটাই তার শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আকাশের মতো। খালি শূন্য। মহাশূন্য। চন্দ্র তারা কিছু নেই। আলো-অন্ধকার সব সেই শূন্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। শূন্যটা খালি পড়ে আছে। এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। শূন্যের ভিতরে শুধু শূন্য ভরে আছে। তাকালে শূন্য, চোখ বুজলেও শূন্য। বাইরে যে শূন্য, ভিতরে ঘরের ভিতরেও সেই শূন্য।

কি আর করত সে? সেই শূন্যটা তাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল। সে নিজে ইচ্ছে করে আসেনি। এসে বসে পড়ল তার ঘরের মধ্যে ধপ করে। নীলবাবু তাকে একটা কুঠরি দিয়েছিল। সেই কুঠরিতে। এই কুঠরিখানাতে সে কাটাল দু-দুটো যুগ। এরই দরজায় নীল একদিন এসে ঠক ঠক করত। সেই ঘর।

সে অনেক কথা। সব কথা আজ শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তাকে পিছনটা দেখা যাচ্ছে না। সামনেটাও নয়। সামনে কেমন ঝাপসা। ঘাম দিচ্ছে গায়ে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ভাগ্যিস বাড়িতে ছিলেন বাবু-গিন্নি দুজনেই।

শুকুরা তাকে দেখতে পায়নি নিশ্চয়ই। দেখবে কি করে? সে ছিল বাড়ির ভিতরে উঠোনে।

সদরটা দেখা যায় সেখান থেকে। বাইরে থেকে কি উঠোনের কোণ দেখা যায়? একপাশে বসে সে বাসন মাজছিল কুয়োর ধারে। না, সে দেখতে পায়নি। সূর্য ঢলে গেছে। দোমহলা বাড়ির ছায়াটা অর্ধেক উঠোনে চলে এসেছে কুয়োতলায়। সে মোটেই দেখতে পারেনি।

অনেকদিন বাদে আজ তার খেয়াল হল— তার চুল পেকেছে। সিঁথির কাছে অর্ধেক চুল উঠে গেছে। গাছের পাতা ঝরে গেলে আবার গজায়, বছরে বছরে। মানুষের বয়েসের চুল ঝরে গেলে আর গজায় না।

হ্যাঁ, এই তো শুকুরা। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দুজনে— দুখীদা আর শুকুরা। দরজার আড়াল থেকে তাকাল রতনী। শুকুরারও চুল পেকেছে। ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু। অল্প খানিকটা পাকা চুল। সাদা সাদা। চক চক করছে। রুপোর জরি দেওয়া যেন। মানুষের মতো মানুষ বটে। পাঁচ-দশজনের মধ্যে হয়ে থাকবে একজন। কোন কালের মানুষ। পথে যেতে আসতে নিশ্চয়ই খাতির দেখায় মানুষে।

কেমন বড় বড় দেখাচ্ছে শুকুরাকে। একটু কি ঢ্যাঙা হয়েছে? তেমন কিছু নয়। রতনীর কেমন লজ্জা করল শুকুরার সামনে যেতে। নতুন বউটি যেন।

"রতনী, রতনী আছিস নাকি? রতনী?" ডাক দিল দুখীদা।

রতনী কি জবাব দেবে? কি বলে সাড়া দেবে? শুকুরা আছে যে। সাড়া দেবে নাই বা কি করে সেখানে আছে যখন। সে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে না আবার শুকুরার সামনেও যেতে পারে না। এ কি হল তার? সাপুড়ে বাঁশি শুনিয়ে দিয়েছে দুঃখী দাস। নিজেকে সামলান দায় রতনীর পক্ষে।

রতনী যাবে। যাবার জন্য পা বাড়াল। বাঁ পাটা ভারি হয়ে গেছে, তোলা যায় না। ডান হাতে যেন ধরে আছে কিছু বাটিভর্তি। পা বাড়ালেই চলকে পড়বে। তবুও সে যাবে। এই যে গেল বলে। আঁচলটা কি কেউ টেনে ধরেছে? কোথাও কি আটকে গেছে? না তো। কেউ কি আঁকশিতে তার গলা টেনে ধরেছে পিছন থেকে?

তবুও সে পা বাড়াল। ওদিকে ডাকের পর ডাক ছাড়ছে দুখীদা, আর সে শুনে চলেছে, তবু থেমে রয়েছে। কোন মুখে যাবে সে শুকুরার সামনে?

বাইয়া! হায় বাইয়া!

ঝরঝর করে চোখে ধারা ছুটল, না, সে যেতে পারবে না। মরণ হত যদি।

শুকুরা দিয়ে গিয়েছিল এতটুকু এক সন্তান। দুলত দোলনায়। সেই ধন মানি কোথায় হারিয়ে গেছে। না, না, হারাবে কেন? সে বিসর্জন দিয়েছে। জেনেশুনে রাগ করে। শুকুরা কেন তার খবর নেয়নি? কোন রাঁড়কে ধরে কলকাতায় রয়ে গেল? কেন? দু-দুটো যুগ। না, সে যেতে পারবে না শুকুরার সামনে।

কেন যাবে? আর কি সে ফিরে আসবে? শুকুরা কি আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? না-না-না, পারবে না। রতনীর পেটরায় আর কানাকড়িও নেই। না না, সে কখনো যাবে না।

ফিরে যাক শুকুরা। কি জন্যে এসেছে সে? পোড়া ব্যান্ননে আর কি সোয়াদ? সে এক

পাও নড়বে না। এতদিনে মুখ দেখাতে এল। আহা-হা, কি মুখ রে। নিলাজ, লাজ নেই এ মরদের মুখে। মরে মাটিতে মিশে যেতাম কবে। দিনে নাই কালে নাই, বারো বরষে এল সাঁই। একে তাকে দিয়ে ডাক পাড়াচ্ছে— রতনী আছিস কি লো? আহা-রে আমার সোহাগ!

ডাকলে কেন যাবে সে? আবার যদি তেমনি করে? কলকাতা পালিয়ে যায়? হাওয়া একবার যখন লেগেছে। আধবুড়ো মেয়েছেলেটা কি আর তেমনি গতর খাটিয়ে রোজগার করতে পারবে? সে যেখানে আছে যেমন আছে সেই ভালো। শতগুণে ভালো। যে মানুষ পঁচিশ বছর কাল সব ভুলে বিদেশে পড়ে রইল, একদিনের জন্যেও একটু মন কেমন করল না তার? ভাবল না রতনী কেমন করে বাঁচে? পয়সা না হয় নাই দিলে, একটু ভালোমন্দের খবরও নেবে না? সেই যে গেলি, এসে খোঁজ নিচ্ছিস পঁচিশ বছর বাদে? কেন, কার কথায়? ভারি আমার মরদ দেখাতে এসেছে? যা চলে যা। আবার সেই কলকাতাওয়ালী খানকীর কাছে যা। সেই তোকে সোহাগ করবে। পায়ে তেল মালিশ করে দেবে। যা চলে সেইখানে। রতনী আর যাবে না।

"ওলো রতনী, রতনী!" আবার ডাক ছাড়ল দুখীদা। এর মুখে কি কুলুপ আঁটা নাকি?

"কে?" এই যে, যাহোক নীলবাবু সাড়া দিয়েছেন। ঘুম ভেঙেছে বাবুমশাইয়ের। দুপুরের ঘুম।

"আমি দুখী। দুঃখী দাস।" শুনতে পেয়েছে দুখীদা।

"আসছি, আসছি।" বাবু আসছেন। বাঁচা গেল! রতনী ভাবল। তা, খুব খাতির করে দুখীদাকে নীলবাবু। এই যে ফট ফট করে নামছেন নীচে।

এই সেরেছে। ওর কথাই তো হচ্ছে। শুকুরা বুঝি এসেছে রতনীকে নিতে। দুখী ওরই হয়ে বলছে তো। আর কি বলছে? ভালো শোনা যায় না। তবে আর কিসের জন্যে আসত? মরে যাই সোহাগ দেখে। কি বেআক্কেল লোকটা। জানা নেই শোনা নেই, বলা নেই কওয়া নেই, সোজা চলে এল রতনীকে নিয়ে যাবে। রতনী কি একটা ঘুঁটের ঝুড়ি যেখানে সেখানে রেখে দিলেই হল। আবার দরকার হল তো তুলে নাও।

সব ফিকির ওই দুখীদার। সেই শিখিয়ে পড়িয়ে ডেকে এনেছে। না হলে শুকুরার কি আর চলছিল না রতনীকে না নিলে? রতনীর দুঃখ কি ওতেই যাবে? মাগ তো নেই। জানবে কি করে মাগের মন কিনতে হলে কি করে ভাতারে। মাগের সোহাগ কাকে বলে জানা তো নেই বুঝবে কি করে? আমি বলে কিনা পরের বাড়িতে রয়েছি। তুই কিনা সোজাসুজি এসে ঢুকে পড়লি? আগে যাকে বলে দূতীর হাতে খবর পাঠাতিস চুপি চুপি, কেউ জানত না। অশোক বনে সীতাকে হনুমান ঠাওর করার মতো। মুদ্রিকা পাঠাতিস। তবে গিয়ে প্রেত্যয় হত যে এ আর কেউ না, শুকুরা। এসেছে কলকাতা থেকে। এখানে আসবে তার বিয়ে করা বউকে নিয়ে যেতে। কোথাও কিছু নেই, কী - না - রতনী, রতনী! এই ত আবার দাঠাকুর হাঁক পাড়ছে— 'রতনী, রতনী, শুকুরা এসেছে, এদিকে আয়।' সে কি জানে না শুকুরা এসেছে বলে? খালি এদিকে আয়? কেন, সে কেন যাবে ওদিকে? ওর কিসের গরজ পড়েছে? যার গরজ সে এসে হাত ধরে নিয়ে যাক না। নিয়ে যে যাবে সেটা কোথায়? কোথায় যাবে

সে? ঘর আছে না দুয়ার আছে? মাথা গোঁজার একটুকু ঠাঁই তো নেই। কী - না, বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বেহায়া আর কাকে বলে। যদি নিয়ে যাবার না থাকে তবে এলি কেন? চেহারা দেখতে? যখন রূপ ছিল তখন গিয়ে রইলি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে এখন এসেছিস কি দেখতে? বেহায়া নিলাজ কোথাকার।

সকলে গিয়ে জমা হয়েছে বাইরের ঘরে। বাবু, গিন্নিমা, ছেলেমেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা কেউ আর বাকি নেই। কি একটা আজব জীব এসেছে বুঝি। একটা মানুষ বই তো না। তাকে দেখতে এত হাঁকপাঁক কিসের? দেখুক, দেখতে থাকুক।

শুকুরা এসে রয়েছে দুখীদাঠাকুরের বাড়িতে। শুনতে থাকে রতনী কান পেতে। কথাবার্তা হচ্ছে দুখীদা নীলবাবু ও অন্য সকলের মধ্যে। ভাগু মহান্তি নাকি মানা করে দিল। জমি দেবে না। এক জিদ ভাগু মহান্তির। রতনী গিয়ে থাকবে সেই দুখীদাদার বাড়িতে। ছি ছি— তাহলে সে যাবে না।

গিন্নিমা এসে ডাকলেন— "কি লো রতনী, যাস না কেন? লুকিয়ে আছিস? শুকুরা ডাকছে যে। অনেকক্ষণ এসেছে।"

রাগ হল রতনীর। সে কি নতুন কনে বউ নাকি যে তুমি এলে মধুশয্যা ঘরে পাঠাতে! ছি লো, লাজ নেই? আমাদের চাষাভুষোর ঘর হলেও কি হয়। বড়লোকের রীত থেকে আলাদা। সোয়ামির সঙ্গে স্ত্রী কি হুম হুম করে বেরিয়ে চলে যায় নাকি? লাজ-সরম কি ভুলে গেলে?

"কি লো, আয় না"— ঘরের ভিতর থেকে টেনে আনল গিন্নিমা। আর চারা কি? টানা হেঁচড়া করা লাজের কথা।

"যা লো যা, তোর ভাগ্যি খুলে গেল।" বলতে থাকে নীলের বউ। "এখন থেকে আমার ভাবনা বাড়ল। যতই হোক রতনীর মতো লোক আর কি পাওয়া যাবে?"

চিরদিন কি তোমাদের বাড়িতে পড়ে থাকবে বলে লিখে দিয়েছে রতনী? ওর সোয়ামি ফিরেছে পঁচিশ বছর পরে বিদেশ থেকে। সে যাবে না? ওর আর ঘরকন্না নেই, একা তোমারই আছে? স্বামী বলে যেটা বলছ সে শুধু বড়লোকদের বেলা? গরিব গুরবোরা যার হাত ধরে তারা সব লোচ্চা, পরগাছা?

আরে, শুকুরা ফিরে গেল যে। অ্যাঁ চলে গেল? তাকে নিয়ে গেল না ওর সঙ্গে? একটু দেখাও করল না? বাবু নাকি বললেন— "এখন যা শুকুরা। আমি রতনীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোর পিছনে পিছনে। ও লজ্জা পাচ্ছে। এত লোকের সামনে শুকুরার সঙ্গে সে কি কথা কইবে?"

"ভ্যালারে লজ্জা। মরে যাই আর কি" বলতে থাকেন গিন্নি ঠাকরুণ। "বুড়ো বয়েসে আবার এত লজ্জা!"

শুকুরা সত্যি সত্যি ফিরে গেল। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। পশ্চিমের আকাশটা মনের লজ্জা ফোটাচ্ছে হলুদ-চুন গোলা রং বুলিয়ে। রতনী তার ঘরের ভিতরে গিয়ে আস্তে আস্তে একটার পর একটা গয়না গা থেকে খুলল। তোরঙ্গ থেকে দু-চারটে আরো কি সব বের করে সব

একসঙ্গে রাখল। কিই বা গয়না। রুপোর খাড়ু ছিল হাতে আর গলায় চম্পাকলি হার। কোমরে চন্দ্রহার। তোরঙ্গে ছিল রুপোর মটরদানা। নিজের পয়সায় করেছিল পায়ের আংটি কয়টা। সব নতুন। সবগুলো একসঙ্গে কাপড়ে বাঁধল। নিজের হলেও মার্কা তো মারা নেই। পাছে ভাবে যে তাদের গয়না রতনী লুকিয়ে নিয়ে পালাল। সেজন্যে নীল যা দিয়েছিল তার সঙ্গে নিজের কেনা গয়নাও মেশাল।

নীল কি মাত্র এইটুকু দিয়েছিল? সে দিয়েছিল অনেক। সোনার গয়নাতে ভরে দিয়েছিল রতনীকে। তখন তার বয়স ছিল। ভেজা ঠোঁটে গরমাগরম রস, চিনির রসের মতো মিষ্টি।

দিন ছিল যখন সে পরত সেগুলো। দিনেরবেলা নয়। যদি কেউ দেখে কিছু বলে! নীল রতনীকে গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, রতনীকে রেখেছে। রতনীটা রক্ষিতা। কে বা আর না বলত। তবুও। অথচ, রাতে গয়না পরে কি লাভ? কিন্তু না পরে আর উপায় কি? সে পরত ওই রাতের বেলাতেই। খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার সময়। না পরলে নীল রাগ করত। মনে খুব কষ্ট পেত। খেত না। বলত মাথা ধরেছে। তখন গিয়ে মাথার ওপর বসে, মাথা টিপে দেয়। তবুও না। রতনী বুঝতে পারে। সে গয়না পরে পাশে এসে বসে। জানালা দিয়ে রাতের আঁধার মিটি মিটি তাকিয়ে থাকে। আর কেউ থাকে না।

নীল খেতে বসে তখন। আর তাকেও জোর করে খাওয়ায়। খাইয়ে দেয়। কিছুতেই শোনে না। আর তার মুখের এঁটো নিয়ে নিজে খায়।

রতনী গয়না পরলে সে যা হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকে! সেই লোভ যেন তার মেটে না ওর এঁটো না খাওয়া পর্যন্ত— আর— 'রতনী, তোকে দেখতে কি সুন্দর লাগছে এই গয়না পরে' বলে জড়িয়ে ধরে। সে জড়ানোতে যেন একটা ঠাণ্ডা আগুন তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরটা গরম, মনটা ঠাণ্ডা।

যাক সে কথা। সে দিন বলে কোথায় উবে গেছে। সে গয়না— সেই গোপালের মাল গোপালের ভান্ডারে রেখে দিয়েছে। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল— এই গিন্নিমার সঙ্গে নীলবাবুর। রতনীকে লুকিয়েছিল সে কথা। এত বোকা এই নীল। বাজনা বাজিয়ে যাকে বিয়ে করা, তাকে আবার লুকোবে ঘরের একজন মানুষের কাছ থেকে।

বিয়ের আর চারদিন বাকি। নীল কিছু বলে না। রতনীও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সব আয়োজন চলেছে। নীল বুঝে ফেলেছে যে রতনীর আর কিছু বাকি নেই জানতে। তবু সে মুখ খুলে কিছু বলতে পারে না। রতনী সব কাজ করে যায়। শোবার ঘর সাজানো থেকে নর্দমা সাফ করা পর্যন্ত। এদিকে আবার সব দেওয়ালগুলোয় আলপনা আঁকাও শেষ করে ফেলেছে।

খাওয়া সেরে শুতে যাচ্ছে রতনী। লোকের ভিড় আর নেই। নীল ডাকল শোবার ঘর থেকে — 'রতনী, রতনী'।

গলাটা ভারি ভারি শোনাল। তারই রাগ করার কথা। তবে রাগ হল না, দয়া হল এই ছেলেটার ওপর। বিয়ে করে ঘর সংসার করুক। করছিল না আজ পর্যন্ত তারই জন্যে। লোকে কি বলত না সে কথা? এখন তাদের মুখ বন্ধ হল।

তবে তাকে যে এত আদর করত নীল সেগুলো কি শুধু ওপর দেখানো? ভালোবাসাটা কি এমন একটা অগভীর ডোবা যাতে পড়ে গেলে বেরিয়ে আসা যায়, ডুবে যায় না মানুষ সাঁতার না জানলেও? আশ্বিনের ভাসা বাদলের মতো শুধু উড়ে যায়, শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের মতো গুম মেরে থেকে থেকে পশলার পর পশলা উজাড় করে দেয় না? জলে দাগ-কাটার মতো ভালোবাসার ভালোলাগার দিনগুলো নিত্যিদিনের ঘটনাগুলোকে খালি লিখে দিয়ে যায় মুছে যাবার জন্যে? ভালোবাসার মানুষও পড়তে পারে না সেগুলো, বাইরের মানুষের তো কথাই নেই।

"রতনী"!

"যাই"।

আবার ডাকল নীল। রতনী কি মনে করল কে জানে। যা ছিল সব সোনার গয়না নিয়ে সে নীলের কাছে গেল। আজ যেমন পুটলি করেছে তেমনি। খালি গলা, খালি কানের দিকে তাকিয়ে নিয়েই নীল বলল, "গয়না কি হল?"

"এই যে" বলে রেখে দিল রতনী খাটের পাশে গয়নার পুটলিটা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল সে রতনীর দিকে। রতনী আজ আর এক মানুষ। চোখে কাজল নেই, চুল বাঁধা হয়নি। ফুর ফুর উড়ছে। মাথায় এক টিপ সিঁদুর লাগাত, তাও নেই। গয়নাগাটি কিছু নেই। তার চোখে যে নেশা ছিল সে কোথায়? মনে হত তার জন্যে মরে গেলে জীবনের সব সাধ মিটে যাবে। আর পুনর্জন্ম হবে না। ঘাড়ের ওপর যে মাথাটা বুকে আছড়ে পড়ার জন্যে, চিপটে যাওয়ার জন্যে আকুলি বিকুলি করত, সেই ঘাড়টা আজ যেন সোজা হয়ে আছে নিজের ইচ্ছায় নিজের আয়ত্তে, আপনার খুশিতে অনড় হয়ে থাকার অহঙ্কারে এমন কেন হল?

"ওটা কি?" জিজ্ঞেস করল নীল আশ্চর্য হয়ে।

"তোমার গয়না।"

"আমার গয়না?"

"তুমি গড়িয়ে দিয়েছিলে।"

চুপ মেরে গেল নীল। কত কি ভাবল। আবার বলল, "ফিরিয়ে দেবার জন্যে কি দিয়েছিলাম?"

হাসল রতনী। বলল, "তুমি ভারি ছেলেমানুষ ছোটবাবু। কিছু বুঝতে পার না কেন? অযথা দুঃখ করছ।"

"সব বুঝেছি। তুই আর ভালোবাসিস না আমায়। এটুকু বুঝেছি।"

হাসি ওর মুখ থেকে সরে না। রতনীর মুখ থেকে। ভাবে, হ্যাঁ, যে ভালোবাসাটাকে জমি-বাড়ি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মতো ভাগ করা যায় তার জন্যে আবার দুঃখ কেন? বললে, "ছোটবাবু, অমন কথা মুখেও এনো না। কাল সকালে যে নতুন মানুষটি ঘরে আসছে তার কথা একটু ভাব।"

"ভাবিনি, শুধু শুধু ঘরে আনছি? তার ভাগ সে পাবে। তোর ভাগ তুই পাবি। তার জন্যে মন খারাপ করছিস? তোর গা ছুঁয়ে বলছি, তাকে বিয়ে করছি বলে তোকে কখনো পর করে দেব না।"

"আমার জন্যে দুঃখ করি না দুঃখ করছি সেই কচি লাল টুকটুকে কাঁচের পুতুলটির জন্যে। সে যেন এসব কথা কিছু জানতে না পারে। জানলে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। মনটা ওইরকম। ভাঙলে জুড়ে দেওয়া যায় না।"

"আর তুই?"

"আমি বিয়ে করা মেয়েছেলে। আমার কথায় কি যায় আসে?"

"তুই তবে আমায় ভালোবাসিস না রতনী? আজ পর্যন্ত আমায় শুধু ঠকিয়েছিস তুই?

"অমন বোলো না বাবু। আমি তোমায় ভালোবাসি না কেমন করে জানলে তা? এত কথার পরেও মুখে এ কথা আনতে পারছ?"

কাঁদল রতনী। নীল তাকে কাছে টেনে নিচ্ছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল রতনী। "না বাবু, থাক। লক্ষ্মীটি, আমার কথা রাখ। আমি চোখে দেখব এ সংসারটা হাসবে। আমার খুব ভালো লাগবে। আমি যা করেছি তোমারই সুখের জন্যে। তোমারই সুখের জন্যে আমি সব দিয়েছি। কিছুমাত্র লুকোইনি। আজ তোমারই সুখের জন্যে আর যা দেবার ছিল তাও দিয়ে যাচ্ছি। এ গয়না তাকে দিও। তার জন্যে গড়িয়ে রেখেছিলে বোলো। ভুলেও আমায় ধরো না তার কাছে। পেটের মধ্যে ময়লা থাকে। তাকে কেউ দেখতে পায় না। দেখায় না। ভগবান মানুষকে তেমনিভাবে গড়েছেন। দেহটাকেও, মনটাকেও, বুঝলে বাবু? আমি যাই। তোমার বাড়িতে দাসী চাকরানী হয়ে থাকব। সুখে থাকব। কুতকুতে খুদে পুতুলরা এ ঘর উজ্জ্বল করে আসবে, ঠিক তোমার মতো। তোমারই হাসি, তোমারই কথা। তাদেরই কোলে কাঁখে করে আমার দিন কাটবে। তাতে আমি ভারি খুশি, বড় আনন্দ পাব। তবুও যদি না রাখ চলে যাব। আমার ভাগ্য। নিজের থেকে আমি কোথাও চলে যাব না। রতনী যাই হোক কেন, কুলটা হোক খানকী হোক, নেমকহারাম হবে না।"

চলে গেল রতনী। নীল কি বুঝেছিল কে জানে। তারপরে আর একদিনের জন্যেও রতনীকে সে আগের চোখে দেখেনি। দাসী হলেও মানে।

আজ সেই পরবের আর এক পালা। গয়নাগুলো কাপড়ের টুকরোতে বেঁধে নিয়ে রেখে দিল গিয়ে গিন্নিমার সামনে। রেখে মাথা নামিয়ে গড় করল। বয়সে কত ছোট উনি হলেও সে তো দাসী।

"এ কি?" আশ্চর্য হলেন গিন্নি ঠাকরুণ।

"আমি যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"সে যে ডাকতে এসেছিল।"

"কে? কার কথা বলছিস?"

রতনী হাসল। মুখে লজ্জা। ঘোমটার ওপর হাতটা উঠে গেল।

"এটা কি?" জিজ্ঞেস করলেন গিন্নি মা।

"তোমার গয়না। কর্তা দিয়েছিলেন। ছোটবাবুও কখনো সখনো দিতেন। মা দিয়েছিলেন, সব আছে।"

এই কটা মাত্র সে রেখেছিল, ছোটবাবু অনেক বলার পর। রুপোর গয়না পরলে কেউ কিছু ভাবে না। তাও সবসময় পরত না। পরত কেবল খাড়ু চম্পাকলি। সোনার গয়না সে ফিরিয়ে দিয়েছিল আগেই।

পুঁটলিটা খুলে গয়নাগুলো দেখলেন বউমা। মুখ কুঁচকে রতনীর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখে সে নেই! রতনী হাওয়া।

"ওগো শুনছ? রতনী যে বেরিয়ে গেল!"

"বেরিয়ে গেল? মানে?" ওদিক থেকে বাবু চেঁচিয়ে বললেন। "বেরিয়ে গেল মানে চলে গেল," বললেন গিন্নি।

"আপনি গেল?" জিজ্ঞেস করলেন বাবু। ছোটবাবু।

"আপনি নয় তো কি কেউ বের করে দিল? সে চলে গেল শুকুরার পিছে পিছে।"

রতনী শুনল। কান খাড়া করে সদর দরজার ওপারে এক দণ্ড দাঁড়িয়ে রইল। বাবু কি উত্তর দেন শুনতে চায়।

বাবু বললেন "তা বেশ"। ব্যস ওইটুকু।

জোর কদম ফেলে রতনী দিল ছুট। চোখ তার কি জানি কেন ছলছলিয়ে উঠল। সে আর ফিরে তাকায়নি বাবুদের বাড়ির দিকে। মন করছিল। মনটাকে জোর করে সে দাবিয়ে রাখছিল মনের সঙ্গে এমন জোর-জবরদস্তি করলে মন খালি কামড়াতে থাকে, গুড়িয়ে তুড়িয়ে যায়। সময় সময় এমন গেরো পড়ে যে আর খোলা যায় না সহজে। রতনী ভয় পেল। সে কি ভুল করল? না, না, ভুল কেন হবে?

নীলকে একবার বলে আসত। দেখা করে আসত। পারল না কেন? বিপদের সময় সে সহায় হয়েছে। কি না করেছে? এটা কি নেমকহারামি নয়? সে না বলেছিল যে নেমকহারাম হবে না। এইতো সেদিনের কথা। এখন কি করল সে? হায় হায়। না, সে ফিরে যাবে। নীলকে দেখা করে আসবে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? সে কেন নেমকহারাম হতে যাবে? তিনি দয়া করেছিলেন এমনি এমনি? সত্যি দয়া করেছিলেন এই অরক্ষিতাকে? তিনি দয়া করেছিলেন রতনীর রূপটাকে। যৌবনটাকে। সেই রতনী মরেছে, মিটেছে। তার মুখে আগুন। এ রতনী সে নয়। এ রতনী শুকুরার স্ত্রী। বুড়ি হয়েছে দেখে সে তো আর একটা বিয়ে করে বসেনি। গাঁয়ে ফিরে আসতে না আসতেই দৌড়ে এল নিয়ে যেতে। ওই শুকুরা কত কথা না শুনে থাকবে। কত কি দুর্নাম না লোকে শুনিয়ে থাকবে তাকে। মিথ্যে তো নয় কিছু। সব সত্যি। যে যাই বলে থাকুক, শুকুরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে না হয় এমনি ওপরে 'না' বলে দেবে। ওর ভিতরটা কি তাতে সায় দেবে? ওর ভিতরটা কি তাকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে না মিছে

কথা বলার জন্যে? সে যাই হোক, শুকুরা কি কিছু মনে নিয়েছে এত কথা শুনে? তার রতনী কখনো অন্য মরদ করবে? কোনোকালে নয়। রতনীর ওপর ওর কত স্নেহ। কত ভালোবাসা, কেমনতর বিশ্বাস!

হ্যাঁ, নীল দিয়েছিল। সে কি মানছে না দেয়নি বলে? সেও কি কিছু দেয়নি তার বদলে? তুমি তাকে না হয় দয়া করেছিলে। এই রতনীকে। ওর যৌবন দেখে কি জিভে জল আসেনি? তোমাকে সে কী না দিয়েছে? মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি তোমারই হাতে সঁপে দেয়নি? তোমার ওই দয়াটুকুর জন্যে? সে দয়া কত সামান্য একটা জিনিস। তার জন্যে তুমি অসম্ভব দামই না চাইলে? রতনী মানা করেনি। তোমার ছিল, তুমি দিলে। তোমার যদি না থাকত দেখতাম পেটে না খেয়ে কি করে দিতে। এতই কি মহৎ লোক তুমি? রতনীর কাছে কি ছিল তোমার সেই দয়ার দাম দেবার জন্যে? ছিল দেহের বল আর বয়েস। এই দুটো জিনিস ছাড়া আর কি ছিল? বল দিয়ে সে খেটেছে। তাতে তোমার মন ভরল না। তুমি চেয়ে বসলে তার বয়েসকে। শুধু শুধুই কি তুমি দয়া দেখিয়েছিলে? এমন অনেক দেখেছে সে।

"রতনী চলে গেল"। একথা শোনামাত্র তোমার বুকে ছ্যাঁকা লাগল না, খুনতি আগুনে তাতিয়ে দেগে দিলে যেমন লাগে? লাগত যদি সত্যি ভালোবাসতে। কই উঠে এলে না তো শোয়ার জায়গা থেকে? রতনী কোথায় গেল বলতে বলতে। একবার জিজ্ঞেসও করলে না রতনী কি করে গেল, কি সঙ্গে নিল, সেখানে কেমন করে চলবে? তাকে কি কিছু দিলে না খালি হাতে গেল? কিছু কি ফুরিয়ে যেত তোমার এই কথাদুটো বললে? সত্যিই সে যেন পেঁটরা-পোঁটলায় ভরে কত কি বয়ে নিয়ে গেছে। কত বছরের মায়া-মমতা। কত কথা, কত কাহিনী। কত মনের কথা বলাবলি। কত ব্যথা দেওয়া-নেওয়া। পরকে আপনার করার জন্যে কত মাপাজোখা এই বুকের নীচের দরদকে। সব কোথায়, উবে গেল, মিথ্যে হয়ে গেল? যদি একটুও ভালোবাসা থাকত বুক থেকে গভীর নিঃশ্বাস একটা অন্তত উঠে আসত। তা নয়, শুধু কিনা "আচ্ছা বেশ"! ওহো রে আমার সোহাগ। সোহাগ তো নয়, বিষ। নিজের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে যে সোহাগ সেটা সোহাগ নয়, বিষ। এতই যদি ভালোবাসা ছিল তবে রতনীকে নিয়ে ঘর করলে না কেন? আর একটা শহর থেকে জুটিয়ে আনতে গেলে যে? ও হো— সে বুঝি ছিল ঘরের মেয়ে, কুলের বউ। শহরে বাজারে খালি কুলের বউ-ঝিরা থাকে। তাদের জাত-কুল সব বাজারে বুঝি বিক্রি হয়। কিন্তু সব ভেজাল। পুরোনো জিনিসকে এমন নতুন করে ছেড়ে দেয় যে চোখ ঝলসে যাবে। কোন সতীসাবিত্রীই বা পেলে? তোমার কোলে ওঠার আগে আর কারো কোলে সে শোয়নি, সত্যি? আহা, লুকিয়েছে বটে, তবে পা দুটো যে দেখা যায় গো!

বড় লোকেদের যে দুটো মন থাকে তা কি আর রতনী বোঝেনি? দু-দুটো মন। একটা দরকারী, আর একটা সখের। প্রথমটা খালি যত্নে রাখার জন্যে। সাফসুতরো করে যেতে আসতে দেখতে পাবে, নিজের কাজ সারবে তাকে দিয়ে। তার খুব হেপাজত। অন্যটা পান বিড়ি সিগারেটের মতো। ভাত ডাল তরকারি নয়। পান খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দেয় পিচ পিচ

করে থুতুর সঙ্গে। বিড়ি সিগারেট খেয়ে ধুঁয়ো ছাড়ে, ছাই ঝেড়ে ফেলে। পয়লা মনটা ঈষৎ গরম থাকে। ঠাণ্ডা হলে, সর্দিগরমি হলেই পেটখারাপ, দাস্ত, অন্য মনটা সবসময় তাতল। টগবগ করে ফুটতে থাকে। নদীর বানের মতো বাড়িঘর ভেঙে ভাসিয়ে একাকার করে দেয়। সে মনের খোরাক হয় এই রতনীর মতো নেহাত নিরীহ, নিশক্ত, অরক্ষিত, বেওয়ারিস মেয়েরা। নাহলে একেবারে মুঠো মুঠো টাকাপয়সা, শাড়ি গয়না ইত্যাদি দাম নিয়ে সারা যৌবন বিক্রি করে সেই বেশ্যা, খানকী, বাজারী রাঁড়দের তাদের মনের সখ মেটায়।

রতনী সোজা গিয়ে হাজির হল দুঃখী দাসের বাড়ি। একধ্যানে। এদিক-ওদিক কোথাও তাকায়নি, ছুটে গেছে একটানা। বুকটা ওঠাপড়া করতে থাকে। পা টলমল। সে জানে না গাঁয়ের এ মাথা থেকে ও মাথায় গিয়ে কি করে কখন দুঃখী দাসের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকার। ছেয়ে আসার সময় বেরিয়েছিল। এখন মুখ দেখা যায় না। শুধু একটা ছায়া। দুঃখীর দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল।

"কে?" জিজ্ঞেস করল দুখী। বারান্দায় বসেছিল।

কোনো জবাব নেই। কিছুই উত্তর পাওয়া গেল না।

"কে ওখানে দাঁড়িয়ে?" আবার জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

এবার মুখ খুলল রতনী— "আমি।"

"আমি কে?"

"আমি রতনী।"

"রতনী? রতনী এসেছিস? আয় আয়, বারান্দায় উঠে আয়। চালার নীচে দাঁড়াসনি সন্ধ্যাবেলা। ওরে শুকুরা, ও শুক্রসেন বারিক। এই যে দেখ কে এসেছে।"

শুকুরা ঘরের ভিতরে লণ্ঠন সাফ করছিল বোধহয়, কেরোসিন হাতে উঠে এল— "কে? কই?"

"এই যে তোর সামনে রতনী আস্ত দাঁড়িয়ে।"

"রতনী?"

জিজ্ঞেস করল শুকুরা। রতনীর মনে হল যেন সে নাম ধরে ডাকল। যেমন করে ডাকত পঁচিশ বছর আগে। চিরকাল শুকুরার তেমনি ডাক। বাজ পড়ার মতো। তবুও মিষ্টি। বড় মিষ্টি। যেন মাখন দিয়ে গড়া একটা বাজ কেউ ফেলে দিল। বুক কাঁপে বটে, চোখও ঝলসে যায় সেই বিজলির চমকে। তবে ভয় করে না। সে বাজ পড়লে মানুষ মরে না। উল্টে জেগে ওঠে মরা মানুষ। বেঁচে ওঠে।

রতনী কাঁদছিল আস্তে আস্তে।

"ছি রতনী তুই কাঁদছিস?" দুঃখী বলল। শুকুরা কিছু বলছিল না। রতনী চুপ করবে কি, উল্টে জোরে কেঁদে উঠল বাচ্চাদের মতো।

একদিন আর একজনও কাঁদছিল। আর একজন। মনে পড়ে গেল দুঃখীর। মন থেকে সে কথা ঝেড়ে ফেলে সে রতনীকে বোঝাতে লাগল। "ছি এ কি কথা। কান্নার কি আছে?

তোর কিসের চিন্তা? কেউ না থাকলেও তোর দুখীদা তো আছে। আমি তো বলে দিয়েছি শুকুরাকে, এখানেই থাকবে। দুজনেই। আমারই বা কোন বউ ছেলেপিলের সংসার যে। আব্রু হাটেবাটে খুলে যাবে তোমরা থাকলে?''

রতনীর কান্না বন্ধ হয় না বোঝালেও। সে কেন শুনতে যাবে? রতনী কি সেজন্য কাঁদছে? দুঃখীও যে বোঝে না সে কথা তা নয়। কি বলে রতনীকে সে শান্ত করবে? কাঁদাই যে কাঁদার সান্ত্বনা। অদরকারী হলেও কর্তব্যের খাতিরে সে বলতে থাকে, বোঝাতে থাকে তবুও।

এই রকমই কর্তব্যের খাতিরে সে বোঝাচ্ছিল আর একজনকে। আর একদিন। সেরকম কান্না সে আগে দেখেনি। গত ষোল বছরের মধ্যে। আজ এই রতনী তেমনি কাঁদছে। তারই মতো। অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন। কান্নার কারণ ভিন্ন। বরং বিপরীতই হবে।

সে কাঁদছিল। অনেক দিনের কথা। দুঃখী বোঝাতে থাকে ''এতে কান্নার কি আছে? কেন কাঁদছ ছেলেমানুষের মতো? বাবা তোমাদের বাড়িতে আমার আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেবেন, এই তো? দিন। আমি তো কোথায় চলে যাচ্ছি না। মরে যাচ্ছি না। এই ওড়িশাতে আমারই দেশে আমি থাকব। নিজের ব্যবস্থা নিজে করব। সেটুকু আত্মবিশ্বাস আমার আছে। তোমার দায়িত্বও সম্পূর্ণ আমার। তোমার চিন্তা করার কিছু নেই। কেবল নিষ্পত্তি নেওয়ার কথা। আমার মনে হয় তুমি এখনও বাবা-মাকে তোমার কথা জানিয়ে দিতে পারনি। সোজা মুখের ওপর বলতে লজ্জা করতে পারে, কিন্তু জানিয়ে দিতে অসুবিধা কিসের? আমার আশঙ্কা তুমি ভয় পাচ্ছ। পাছে তাঁরা মানা করে দেন। তাই তোমার সামনে দুটো রাস্তা। হয় বাবা-মার কথা মেনে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, নয়ত আমাকে বিয়ে করবে বলে যদি ঠিক কর তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। দ্বিতীয় পথটি বিপদসঙ্কুল। তাতে প্রেমের পরীক্ষা হয়। তবে সে পরীক্ষায় পাস করলে বেকার হতে হয়। কাজ বা চাকরি মেলে না। প্রথমটি নিরাপদ। এখন তোমার ইচ্ছা। আমার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রেখো না। আমি তোমাকে ধর্মত গ্রহণ করে নিয়েছি তোমার প্রণয়কে সম্মান দিয়ে। তুমি ফিরিয়ে না দিলে আমার আর ফিরে যাবার উপায় নেই। তবে, পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে আমি রাজি নই। প্রণয়ের পরিণাম পরিণয়, পালানো নয়। বাস্তবের মোকাবিলা করার সাহস আমার আছে। আমি পালানোর রাস্তা পছন্দ করি না। এখান থেকে না-হয় পালিয়ে যাব, জীবনের কাছ থেকে তো পালাতে পারব না, জীবনকে ছেড়ে প্রেমের পিছনে ছুটলে প্রেম ধরাছোঁয়া দেয় না। প্রেমের জন্যে জীবন দিতে পার। সে এক কথা। কিন্তু প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলা ঠিক নয়। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।''

রঞ্জনা ফিরে গেল ফণাতোলা কেউটের মতো একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে। যেতে যেতে দোরের কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ''আপনি আমায় অপমান করলে দুঃখ করতাম না। করেছেন অনেকবার। কিন্তু আপনি আজ আমার প্রণয়কে অপমান করলেন। এর জন্যে অনুতাপ করবেন।''

''তার জন্যে ভয় নেই। আমার দুঃখ, আমাকে বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার নেই বলে

আমার আগেই জানা উচিত ছিল। সেটা না জেনে এগোনো ভুল হয়েছে। আমার সেই ভুলের জন্যে আমি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি। ক্ষমা কোরো।''

''আপনি ক্ষমার অযোগ্য।''

রঞ্জনা চলে গেল। হাসল দুঃখী। আমকে আমড়া বা আমড়াকে আম প্রমাণ করার কাজে দক্ষতা অর্জন করার উপায় উদ্ভাবনে প্রবীণা এরা। সে যা বলল, সেটা কি রঞ্জনার প্রণয়ের প্রতি অপমান? কিম্বা তার প্রতি, তার চপলতার প্রতি, সংসার অনভিজ্ঞতা ও ভাবপ্রবণতার প্রতি দয়া, ক্ষমা?

রঞ্জনা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল ওর কাছে কাউকে কিছু না বলে। সে খুঁজছিল জীবনে একটা রোমান্স। রোমান্সের আনন্দ, অনুভূতি, বাঁধাধরা গাড়ির চাকার দাগের ওপরে চলার একঘেয়ে বিরক্তির বিরুদ্ধে তার অভিযান। সমাজের শৃঙ্খলার মধ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাতে তার আনন্দ। সেটাই তার কাছে একটা বড় রোমান্স।

দুঃখী আর সে দুজনে বিয়ে করত প্রজাপতির নিয়মে নয়, গান্ধর্ব মতে। তাও নয়। গন্ধর্ব নামটা পুরোনো, পৌরাণিক। সে ধরতে চায় না মুখে সে শব্দ। সে চাইছিল পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় রেজিস্ট্রি ম্যারেজ আর 'হনিমুন'। হাতে দরকার মতো টাকাও এনেছিল সে। কি তার অভাব! বাবার প্রচুর টাকা। আদুরে মেয়ে।

বলেছিল, ''আমার কি মন করছে জান? আমরা দুজনে উড়ে যাব এ আকাশের অন্য এক দিগন্তে— অন্তহীন দিগন্তে। চক্রবালের সীমা পার হয়ে।''

দুঃখী শুনতে থাকে। মজা লাগছিল শুনতে। ঠোঁটের নীচে লুকোনো হাসির ফোয়ারা। মনে হচ্ছিল যেন কোনো চলচ্চিত্রের ছবি দেখছে। আধুনিক কোনো প্রেমের উপন্যাসের পাতার পর পাতা রঞ্জনা মুখস্থ করে এসেছে। বলতে থাকে। বলে চলে।

''যেখানে কেবল তুমি আর আমি। কপোত-কপোতী। আর কেউ থাকবে না। তোমার বুকের ধুকধুকানি বাজতে থাকবে আমার কানের গিরিতল গুহার মধ্যে। ঘূর্ণী হয়ে। আর আমি অনুভব করব আমার আশ্লেষ-বিশৃঙ্খল কেশের গন্ধ-মাধুরীতে তুমি ভুলে গেছ তোমার অস্তিত্ব। তুমি যেন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধহীন একটা বিন্দুর অবস্থিতি মাত্র। আমার প্রেমের পরিধিতে তুমি মধ্যবিন্দু। তার মধ্যে অন্য কারো প্রবেশ বারণ। কেবল আমরা। স্বয়ং-সম্পূর্ণ। জীবনে অন্য কোনো প্রয়োজনকে স্বীকার করার প্রবৃত্তি খসে পড়তে থাকবে। সঞ্চালিত ডানা থেকে খসে পড়া পালকের মতো একটি একটি করে জীবন সঞ্চালনের পালক আমরা এই কঠিন মাটির ধরার উপরে খসিয়ে দিতে দিতে চলে যাব। দুজনে এক হয়ে যাব আবার দূরে সরে যাব আকর্ষণকে আরো গভীরতর করার জন্যে উপভোগ আরো নিবিড় করার জন্যে। পরস্পরকে আরো নিকটতর করতে। আরো কাছাকাছি হয়ে জানতে। কেবল ভোগের বিনিময়ের জন্য ভেদ, নচেৎ এক।''

''জীবাত্মা আর পরমাত্মার মতো।'' যোগ করে দুঃখী হাসল।

''আমি সে সব বুঝি না। ওগুলো কল্পনা-বিলাস। সংসারের বাস্তবতা হল নারী-পুরুষের

আকর্ষণ আর আকর্ষণজনিত সৃষ্টি। অন্য কোনো সৃষ্টিকে সংশয়িত করাতে সৃষ্টিশীল মানবের পৌরুষ আহত হওয়ার অনুভব হয় না কেন?"

দুঃখীকে লক্ষ্য করে এটা এক প্রেমাত্মক ছলক্রোধ নয়তো রঞ্জনার?

রঞ্জু চলে যাওয়ার পর দুঃখী বার বার ভাবতে থাকে — রঞ্জনার জীবনের লক্ষ্য কি? বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি? রঞ্জনার কথা কি ওর নিজের? কখনো নয়। রঞ্জনা সরল। সরলতার কারণ সে জটিলতার সম্মুখীন হয়নি জীবনে। সব কেবল দেখাদেখি। অনুকরণপ্রবণতা। আধুনিক সাহিত্য-পাতার সাম্প্রতিক জীবনের ছবিকে সে অনুকরণ করে চলেছে নির্বিবাদে, অবাধে। তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার স্পৃহা নেই। মনোবৃত্তি নেই। সেটার বিরোধও যে এক বিপ্লবাভিমুখী মনোভাব হতে পারে, সে কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। কেবল পরম্পরাকে হত্যা করলেই বিপ্লব ও বিদ্রোহের সার্থকতা,— রঞ্জনার ধারণা।

আধুনিক মানব নিজেকে আধুনিক বলে জাহির করতে আভিজাত্যকেই আশ্রয় করেছে, সমাজের পুরোনো আভিমুখ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে বাস্তববাদীর আকাশকুসুম চয়নে নিয়োজিত করাতেই তার গৌরব। মানবিকতার নিষ্পেষণের মাঝখানে কল্পনাই একমাত্র আধুনিক বিলাস। নিজের যাতে বিশ্বাস নেই, সে শুধু তারই জয়গান করে পলায়নপন্থাকে প্রশ্রয় দেয়।

চাঁদ একটি মৃত গ্রহ, চাঁদ শিলায় পরিপূর্ণ। অগ্নি-উদ্‌গীরণকারী পর্বতমালায় আরও। তবুও চন্দ্রলোকে তার মধুচন্দ্রিকা যাপনের জন্য সে আশান্বিত। চন্দ্রলোকেই তার বিলাস। সেজন্য আধুনিক সাহিত্যে, কলায় তার অবসর বিনোদন। পুরুষার্থপ্রাপ্তির দিকে আয়াসের সেটা সহায়ক নয়। অথচ সেটাই তার আভিজাত্য। একটা বিরাট আত্মপ্রতারণাকে প্রদর্শনী করে সে গৌরববোধ করে অথচ ভগবান তার কাছে নেহাত এক আত্মপ্রবঞ্চনা!

রঞ্জনাও আত্মপ্রতারণার আড়ালে আত্মরক্ষা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে সে তার নিজের বিড়ম্বিত প্রণয়কে বুঝতে অসমর্থ। তাই কেউ যদি তার ভুল দেখিয়ে দিতে চায় তাকে অপমানিত হতে হয়।

এই পরিস্থিতির জন্যে সে কি দায়ী নয়? অনেক আগেই সে সতর্ক হতে পারত। কিন্তু হয়নি। সেটাও তার দুর্বলতা। সে দুর্বলতা অহেতুক। স্বভাবজাত একটা খেয়ালও হতে পারে।

আর একদিনও সে কেঁদেছিল। তবে নারীর অশ্রু বড় বিচিত্র। তার টীকা স্থলবিশেষে বিভিন্ন।

আর একদিনের কথা। প্রথম প্রণয় তার সলজ্জ ভয়াতুর শীতল স্পর্শে একটা আনন্দের আমেজ সৃষ্টি করেছিল গাড়ির ভিতরে। সেদিন সে চাইলে বলতে পারত যে দুঃখীর আচরণে ওর প্রণয় অপমানিত হল। কিন্তু তা সে বলেনি। বলার যথেষ্ট ও যথার্থ অবকাশ থাকা সত্ত্বেও।

খুব কাছাকাছি ছিল তারা। দুজনে পাশাপাশি বসেছিল। একটুও সংকোচ ছিল না কারো। কেন কে জানে। বোধহয় একটা স্বতঃসিদ্ধ নির্বিবাদ সত্যের সম্ভাবনা সমস্ত সঙ্কোচকে গাড়ির চাকার তলায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

আরো কাছে ঘেঁসে বসল রঞ্জনা। মোটরের একটা ঝাঁকানির সুযোগে। প্রায় অর্ধেক কোলের ওপরে পড়ে গিয়েছিল বলা চলে।

"সরি, দুঃখিত। রাস্তাটা এত খারাপ।"

উপলক্ষ রঞ্জনার জন্মদিন। রঞ্জু যাচ্ছিল ওর বান্ধবীদের নেমন্তন্ন করতে। ওর বাবা-মা পাঠালেন দুঃখীকে, সঙ্গে অগাধ বিশ্বাস দুঃখীর উপরে, তার চরিত্রে উভয়ের।

তবুও মোটরে বসার সময় রঞ্জুর মা বার বার বলছিলেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। সন্ধ্যার আগে।" কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল। দুঃখী একটু বিব্রত হল কারণ সন্দেহ করার অবকাশ সে দিতে চায় না রঞ্জুর বাপ-মায়ের মনে। উপায় নেই। এতগুলো নিমন্ত্রণ পত্র। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করার ত্রুটি মার্জনা করতে লেখা থাকলেও রঞ্জু সে ত্রুটি কোথাও রাখতে চায় না। প্রত্যেক বান্ধবীর কাছে নিজে গিয়ে অনুরোধ করে আসছিল যেমন করে হোক আসতে। একটা-দুটো কথাও না বললে নয়। শুধু নমস্কার বা সম্ভাষণ করে হুট করে কি চলে আসা যায়? দেরি হল সেই কারণেই। সে ইচ্ছা করে দেরি করছিল বলা ঠিক হবে না। কিন্তু মা তো বুঝবেন না। হয়তো সন্দেহ করবেন। সন্দেহ করা স্বাভাবিক। এক এক জায়গায় রঞ্জু কিন্তু বড় দেরি করেছে। ইচ্ছে করে না করলেও ইচ্ছে করে তাড়াতাড়ি সারেনি।

"অনেক দেরি হয়ে গেল।"— সব নিমন্ত্রণপত্র বিলি করে ফেরার পথে দুঃখী বলল।

"গেল তো কী হল?"

"মা কী বলবেন?"

"কী বলবেন? আপনি বড় ইয়ে।"

"কী?"

"মানে বড় ভীরু।"

"আমায় কি বলবেন সেজন্য কি ভাবছি? ভাবছি তোমার জন্যে। তোমায় বকলে?"

"আমায় বকলে আপনার কি এসে গেল?"

"বাহ্! তোমায় বকলে আমায় বাধবে না?" কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কি করে যেন। সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিল দুঃখী— "মানে আমি যখন তোমার সঙ্গে এসেছি, তোমাকে বকার অর্থ আমাকেও বকা।"

"ইস, খালি বললেই হল? আপনি বড় ইয়ে।"

"এই ইয়ের মানে? ভীরু?"

"না, মানে চালাক।" বলে একটু ঠেলে দিল দুঃখীকে। অতি আপনার লোকের মতো। যে আপনার বলে দাবি করে সে তো এখন করতেই পারে। সে ঠেলায় এমন শক্তি থাকে যে মানুষ দেহটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রাণটাকে কাছে টেনে নেয়।

"আহ্", যেন লাগল তেমন শব্দ করল দুঃখী।

"কি? লাগল? ইস্ লেগেছে বই কি। আপনি ভারি মানে ভারি—"

"বল, বল, কি? ভারি শয়তান, পাজি, বদমাস?"

"না, না, ভারি মিথ্যুক।"

"হবে।" তারপরে চুপ— উভয়ে। কিন্তু চুপ হয়ে থাকতে পারল না রঞ্জু। জিজ্ঞেস করল, "আপনি রাগ করলেন?"

"হুঁ"। ছোট একটা হুঁ।

"ইস্, সত্যি রাগ করেছেন? খালি মিছে কথা।"

আবার নীরব উভয়ে।

জানুর ওপর হাত রেখে নড়িয়ে দিয়ে রঞ্জু ডাকল, "কি, চুপ করে আছেন যে?"

"আর কি বলার আছে কিছু?"

"কিছু নেই? ঢের আছে। আপনি বলছেন না।"

"তুমি তো তাহলে জান। আর বলব কেন?"

"আমি জানলেও আপনি জানেন না আমি জানি বলে। আপনি বললে নিজেই বুঝতে পারবেন আমি আপনার কথা জানি কি না।"

"তুমি যদি মিথ্যে বলি না।"

"আজ কিন্তু মায়ের কাছে মিথ্যে বলবে।"

"মিথ্যে কেন বলব? চিঠি বিলি করতে দেরি হয়ে গেল। এটা কি মিথ্যে নাকি?"

"নয়?"

"কি করে?"

"নিজেকে জিজ্ঞেস কর।"

"আপনি তাহলে আমার মনের কথা জানতে পারেন?"

"পারি।"

"বলুন তবে আমার মনের কথা। যেটা মা'র কাছে লুকিয়ে আমি মিথ্যে বলব।"

"মানে তুমি ইচ্ছে করে দেরি করলে।"

"মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। আপনি কিছু জানেন না। আমার মনের কিচ্ছু টের পাবেন না আপনি। আমি কিন্তু আপনার মনের কথা জানি।"

"আমার মনের কথা?"

"আপনি ভাবছেন— রঞ্জুটা ভারি বদমাশ।"

"তারপর?"

"সব সময় আমাকে বিরক্ত করে।"

"তারপর?"

"এটার মরণ হয় না কেন?"

হঠাৎ হাতটা উঠে গেল দুঃখীর রঞ্জুর মুখের কাছে। রঞ্জুর মুখে হাত দিয়ে দুঃখী বললে, "ছি, এমন কথা মুখে আনতে নেই।"

রঞ্জুর মুখে দুঃখীর হাত। ওর কত কি মন করছিল। রঞ্জনার। কিন্তু ভয় হল। দুঃখী বড় বেয়াড়া। সে শুধু তার দুহাতে দুঃখীর হাতটা ধরে ধীরে ধীরে ওর মুখ থেকে টেনে নিচ্ছিল। যত আস্তে পারে। মনে হচ্ছিল মুখে এমন এক আঠা থাকলে হত যাতে দুঃখীর হাত ছাড়ানো যেত না আর। কি করতেন তিনি? খুব ফ্যাসাদে পড়তেন। হেসে ফেলল রঞ্জনা।

তারপরে, তারপরে—

হাতটা দুহাতে ধরে নিজের কোলের উপরে রেখে জিজ্ঞেস করল— "তুমি রাগ করলে দুখীদা?"

"না"— দুঃখীর স্বর গম্ভীর।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কর।" দুঃখী তেমনি গম্ভীর।

"তুমি রাগ করবে না তো?"

"না"— আরো গম্ভীর হল দুঃখী।

"তুমি— তুমি - - -"

"বল, আটকে গেলে কেন?"

"মানে তুমি, মানে - - - তুমি - - -"

"আমি তোমায় ভালোবাসি কি না। এই তো?"

রঞ্জু নিরুত্তর।

"বাসি"— দুঃখী বলল। হেলে পড়ল দুঃখীর বুকের ওপর রঞ্জনা। বাড়ি এখনো দূরে। ড্রাইভার সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনেও গাড়ি নেই, সামনেও না। মোটরের ভিতরটা অন্ধকার। রঞ্জু তাকিয়েছিল দুঃখীর মুখের দিখে। দুঃখী তার দুহাতে ধরল রঞ্জনার মাথাটাকে। খুব হালকা, যেন নেতিয়ে পড়বে। রঞ্জুর প্রাণে প্রবল আশা ঝলসে উঠছিল। অতি আগ্রহে সে তাকিয়েছিল কখন দুঃখীর মুখটা নুয়ে আসবে ওর মুখের ওপর। তারপরে—

কিন্তু এ কি হল? দুঃখী ধীরে ধীরে রঞ্জুর মাথাটা তুলে সোজা করে দিয়ে বলল—"ছি রঞ্জু, বিয়ের আগে নয়। এটা অন্যায়। পাপ কি পুণ্য বলতে পারব না। তবে অন্যায়। তোমার মা-বাবার বিশ্বাসে আমি বিষ দিতে পারি না। হয়তো তাঁরা রাজি নাও হতে পারেন।"

"বাবা-মা'র মন জানা না থাকলে আমি তোমার সঙ্গে মোটে বেরোতামই না তুমি কি ভাবলে আমায় দুখীদা? চরিত্রহীনা?"

হাসল দুঃখী। বলল, "ছি, কি বলছ তুমি? ওটা আমার কল্পনার বাইরে। তেমন বিশেষণ তোমার শত্রুও তোমার ওই আবেগ কিন্তু আমার বড় ভালো লাগে। আমার জীবনটা কেটেছে বড় আবেগহীনভাবে। সেই অভাবের অনেকটা পূরণ হয়ে যায় তোমার সান্নিধ্যে। হয়তো সেইজন্যে তুমি আমার চোখে এত সুন্দর। তোমার সে সুন্দর সরলতাকে আমি যথেষ্ট সম্মান দিতে চাই। পুজো দিতে চাই। পবিত্রভাবে— বিয়ের বেদীতে।"

সেদিন সেই প্রত্যাখ্যানকে তো কই সে অপমান বলে মনে করেনি। অবশ্য অনেক পরে

বলেছিল, "আমি চেয়েছিলাম প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতির নিদর্শন মাত্র। প্রতিশ্রুতিটা কি অন্যায় হতে পারে দুখীদা?"

"আশ্লেষই কি প্রতিশ্রুতির একমাত্র নিদর্শন? তুমি আমার প্রতিশ্রুতি চাও? আমার আশিসই সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্কেত দিক।" বলে রঞ্জুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল দুঃখী। রঞ্জু দুঃখীর পা ছুঁয়ে মাথায় লাগিয়ে তার কোলে মাথা গুঁজে দিয়ে তারই কাপড় ভিজিয়ে দিল চোখের জলে। কিন্তু সেদিনের চোখের জল আর এখনকার চোখের জলের মধ্যে কত তফাত।

এর আগে কতগুলো দিন কেটে গিয়েছিল একটা দিবাস্বপ্নের ছায়াবিলাসে যেন। মনে পড়ে এক এক সময়। আজও।

দুঃখী তখন জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে। অস্থায়ী সরকার গড়া হল কয়েকদিন বাদে। বছরখানেক হবে। মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লালবাতি জ্বালানো আমার দ্বারা সম্ভব নয় বলে যিনি আস্ফালন করেছিলেন তিনি গদিচ্যুত হয়েছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া প্রায় সুনিশ্চিত।

ইংরেজ সত্যি সত্যি ভারত ছেড়ে চলে যাবে? 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সফল হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে। দিল্লীতে কংগ্রেস মুসলিম লিগের মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল। এপক্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সেদিকের লিয়াকৎ আলি খাঁ সরকার গঠন করলেন। বাইরে থাকলেন গান্ধী আর জিন্না।

কংগ্রেসের তখন বোলবোলাও। কংগ্রেসকর্মীরা গর্বে ফেটে পড়েছে। তাদেরই জন্যে দেশ স্বাধীন হল। চারিদিকে সভাসমিতি। আদর অভ্যর্থনা। ফুলের মালা, বন্দনা-প্রশস্তি। ব্রিটিশ-কেশরীর লেজ ধরে হটিয়ে দিল যার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হত না সে ভারত ছেড়ে পালাল কার জন্যে? আমাদের কংগ্রেসের জন্যে। কংগ্রেসওলারা খালি থেকে থেকে জটলা করে যেখানে সেখানে। কেউ গোঁফে তা দিচ্ছে তো কেউ চুলে চিরুণী চালাচ্ছে।

কোথায় গেল সে দিন। গান্ধীওলা বলে কংগ্রেসের লোকদের সে কি খাতির। যেখানে দুঃখী বসে যেত সেখানেই তার ঘর। এখন সময় পালটেছে, যুগ বদলেছে। যে গাণ্ডীব হাতে সেই গাণ্ডীব মাথে, আর গান্ধীর নাম বিকোয় না। গান্ধী টুপি দেখলে ঠাট্টা করে লোকে।

এই তো সেদিনের কথা। দারুণ রোদ ছিল। ঝাঁজ আর গরমের চোট থেকে বাঁচার জন্যে সে গান্ধীটুপিটা মাথায় দিয়ে ছুটে চলেছিল সাইকেলে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ি। পিঠ নুয়ে পড়েছে, হারিয়ে যাওয়া বয়েসটাকে খুঁজতে খুঁজতে এক পা বাড়িয়ে। ঘন্টি বাজালেও শোনে না। নেমে পড়ল দুখিয়া।

"মাসি, ঘন্টি শুনতে পাচ্ছ না? এক পাশে সরে যাও।"

বুড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "কি বললি? কি বললি রে আবাগীর বেটা? আমি তোর বাপের শালী? ও রে আমার, গান্ধীটুপি পরেছে বলে দেমাক দেখ! কোথাও আশ্রম টাশ্রম করে আছিস বুঝি? উপরি হয় তো, উপরি?"

দুঃখী কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

কয়টা বছর পরে— দশ বারো বছর হবে— সেই কংগ্রেসের এই অবস্থা। তারপরে

কংগ্রেসের নাম শুনলে লোকে মুখ বাঁকায়। শাসনে থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীরা যা করল, তারই ফল।

রঞ্জুর বাবাও মন্ত্রী ছিলেন। দুঃখী তখন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। সেই জন্যে বোধহয় রঞ্জুর বাবা খুব আদর করতেন। রঞ্জুর মা তো আরো বেশি। অধিকাংশ দিন সে তাদেরই বাড়িতে থাকত। তাঁরা ডাকতেন। স্বরাজ আশ্রমে পাঁচমিশেলী চাল। "তুমি কি খেতে পারবে ওসব?" রঞ্জুর মা বলেন দুঃখীকে। "এখানে খেয়ে সেখানে গিয়ে কাজ করলে হয় না?" রঞ্জুর বাবার কানেও গেল। বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুখীকে বল এখান থেকে খেয়ে যেতে।" তবুও সে আসত না বিনা নিমন্ত্রণে, শেষে রঞ্জুর বাবা বুঝতে পেরে বললেন, "তোমার আত্মাভিমান রয়েছে। দেশসেবকের পক্ষে অভিমান ভালো নয়। আমি তো বলেছি, সবদিন এখানে খাবে। এটা তোমার বাড়ি বলে মনে করবে। কিন্তু তুমি না ডাকলে আস না।"

একথা শুনে রঞ্জুর মা আরো এক ধাপ বাড়িয়ে রঞ্জুকে বললেন, "না হয় না ডাকলে যদি আসতে না চায়, তুই ডেকে এনে খাওয়ালে কি মান খোয়া যেত?"

সেদিন রঞ্জু নিজে ডেকে এনে পরিবেশন করে খাওয়াল। রঞ্জুর মা সামনে বসে এটা দে সেটা দে বরাত করছিলেন আর তাকে এটা খাও সেটা খাও বলছিলেন। মা মারা গেছে অনেকদিন হল। আজ তারই স্মৃতিটা দুঃখীকে পীড়া দিচ্ছিল। সেইজন্যে বোধহয় সে বুঝতে পারছিল না এত আপনার ভাব তাকে কেন বাধো বাধো লাগছে।

একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেন রঞ্জুর মা— "কংগ্রেস কমিটি কিছু দিচ্ছে তো?"

"কি দেবে? আমরা তো স্বেচ্ছাসেবক।"

"আ-হা! সবাই শুধু স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আছে। মন্ত্রীরা তবে মাইনে নিচ্ছে কেন? আমি তাঁকে বলছি, তোমাদের তিনি মাইনে দিন। কেন দেবেন না? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর দিন কি আর আছে? এখন তো লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলছে। সব কি ভোটের জন্যে তুলে রাখছে? তোমরা খেয়েদেয়ে সুস্থ না রইলে ভোট কি স্বর্গে নেবে?"

দুঃখীর মনে হল রঞ্জুর মা এক অসাধারণ মহিলা। লেখাপড়া না করলেও তিনি একজন সমঝদার ব্যক্তি। সে একথার কিছু উত্তর দিল না। দেওয়া উচিত মনে করল না।

"শোন দুখী, আমি বলছি," রঞ্জুর মা আবার বললেন, "তুমি যা পাবে কিছু কিছু রেখে দেবে তার থেকে। কাছে রাখলে যদি খরচ হয়ে যায় তবে পোস্ট অফিসে রেখে দেবে। না হয় আমার কাছে। বুঝলে? কখন কি দরকার পড়ে, কেন কারো কাছে হাত পাতবে?"

"আমার কি দরকার পড়বে?"

"দরকার নেই? ছেলেমানুষ তুমি। কি বোঝ সংসারের হালচাল? খালি খালি কেউ কারুর কিছু করে না। শরীর খারাপ হলে কে দেখবে? পয়সা না দিলে কেউ একটু জলও এনে দেবে না। তাছাড়া এখন না হয় একলা আছ; দিন আসবে যখন বিয়ে থা করবে। ঘর সংসার হবে। দরকার নেই বললে হল!"

"আমার তো একবার বিয়ে হয়ে গেছে মাসীমা, আবার কিসের বিয়ে থা?"

"এ কি একটা কথা? সেটা কোন বিয়েতে গোনা? বউ তো শ্বশুরঘর করেইনি। কোন বা মেয়েছেলে হয়েছ যে—"

দুঃখী সেদিন এসে কত কি ভাবল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কবে সে বিয়ে করেছিল। সত্যি কি বিয়ে হয়েছিল তার? মনে তো পড়ে না কই। তার মনে পড়ুক আর নাই পড়ুক, যে তার হাত ধরেছিল সে কি জেনেছিল বিয়ে কাকে বলে? তার পুতুলখেলার মতো মনে হয়ে থাকবে। সে খেলাঘর ভেঙে গেছে। তাকে মনে রাখার কোনো মানে হয় না। নতুন ঘর, সত্যিকার ঘর বাঁধায় দোষ কোথায়?

তবুও তো সেটা বিয়ে। বিয়ে করেছিলাম বলে তো সধবার সাজে আলতা সিঁদুর পরে খই আর কড়ি ছিটিয়ে সে চিতায় গেল। দুঃখী যদি আগে যেত, সে তো তখন হাতের শাঁখা চুড়ি ভেঙে ফেলত, উপোস করত, একাদশী, হবিষ্যি, কত কি। বার ব্রত সব পালত। সে মরে গেল তো দুঃখীর জন্যে কেন তার তরে কিছু বারণ থাকবে না? নাহ, সে বিয়ে করবে না। ফাঁসিঘরের দেওয়ালে তার কথায় সকলে রক্ত দিয়ে লিখে এল। 'দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কেউ বিয়ে করবে না'। সে কিন্তু লেখেনি। কেননা তার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, স্ত্রী মরে গেলে কি হল ? তার মানে তার বিয়ে করার প্রশ্ন আর ওঠে না।

আবার ভাবে বিয়ে করবে নাই বা কেন? তারা সবাই বিয়ে করে ফেলেছে। দেশ স্বাধীন হল। আর বিয়ে করতে বাধা কোথায়?

হঠাৎ চোখের সামনে আবছা দাঁড়িয়ে থাকার মতো মনে হল— মন্ত্রীর মেয়ে রঞ্জু। জিজ্ঞেস করছে—'খিদে পেয়েছে? বেড়ে দি?' উত্তর পাওয়ার আগেই এসে পিঁড়ি পেতে জলের গেলাস রেখে দৌড়ে যাচ্ছে রান্নাঘরে ভাত আনতে। বলছে 'বিয়ে না করলে কে অত পাঁচ-সাত বাড়া থোওয়া করবে?'

না-না-না। সে বিয়ে করতে পারে তবে রঞ্জুকে নয়। রঞ্জুই বা তাকে বিয়ে করবে কেন? বড়লোকের মেয়ে। বাবার নামডাক আছে। অঢেল সম্পত্তি। কত লেখাপড়া করেছে। তার সঙ্গে গরিব, গেঁয়ো, অশিক্ষিত, আনাড়ি দুঃখী দাসের বিয়ে? অসম্ভব। তেল আর জল কখনো মেশে না-মিশতে পারে না।

"পারে— পারবে।" রঞ্জু যেন বলছে, "একটা যাদু আছে। সেই মন্ত্র পড়লে অসাধ্য সাধন হয়।"

দুঃখী সেই কল্পনাকে শুধোয়—"কি মন্ত্র?"

"প্রেম!" বলে সে হেসে হেসে পালিয়ে যায়।

দুঃখী চমকে ওঠে। তার ঘোর কেটে গেল। এ কার হাসি? এ হাসি তো সরলা রঞ্জনার নয়। এই হাসি যেন সে কোথা থেকে ধার করে এনেছে। অন্য কোথা থেকে নয়। ওরই বাবা-মায়ের কাছ থেকে। তাঁরা যে টোপ ফেলেছিলেন তাতে বড় একটা মাছ পড়েছে। ছিপে খেলিয়ে এখন মাছটাকে পারে তুলতে হবে। জবরদস্তি করলে মাছ সুতো ছিঁড়ে পালাতে পারে। দুঃখীর জন্যে যত দরদ এদের সে সবের মূলে আছে এক বিরাট ষড়যন্ত্র। দুঃখীর ভয় হল।

দুঃখী দাসের মনোবৃত্তি রঞ্জুর বাবার ভালোভাবে জানা ছিল। সে যতটা শৃঙ্খলিত— ততটাই বিশৃঙ্খল। ন্যায়, নীতি, ধর্ম পালনে সে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক। অন্যায়, অধর্ম, দুর্নীতির ক্ষেত্রে সে বিদ্রোহী, বিপ্লবী। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্যে ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত থাকার অপরাধে তার হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আটকবন্দীরা ছাড়া পাওয়ার পরেও সে জেলে ছিল। জাতীয় সরকার হওয়ার পরে সে খালাস হল জেল থেকে। তখন তারা গৌরবের চরম শিখরে। সে গৌরবে কিন্তু ভাগ বসাল আই.এন.এ.— আজাদ হিন্দ সেনা। লাল কেল্লায় বিচারের পর যারা খালাস পেয়েছিল তারা। অসীম ত্যাগ আর দঃসহ দুঃখের মধ্যে যারা ভারতের গৌরবকে নিজের অশ্রুশোণিতে রাঙিয়ে উজ্জ্বল করেছিল তারা। কিন্তু মুখ্যত তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোক ছিল বলে লোক সম্পর্কে আসেনি আগে। তাই তারা দু-এক বছরের মধ্যে জনমানস থেকে মুছে গিয়েছিল কোনখানে। উল্কার উজ্জ্বলতার মতো। কিন্তু দুঃখী ও তার সাথীরা সাধারণ মানুষের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। তাই রঞ্জুর বাবা সবসময় দুঃখীকে হাতে রাখতে চাইছিলেন নানা উপায়ে। কারণ কেবল দুঃখীই রয়ে গেছিল কংগ্রেস অনুষ্ঠানের একান্ত অনুগত কর্মী হিসাবে। অন্যেরা নানা কারণে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভিড়ল তার ঠিকঠিকানা রইল না। এরা সব যে কেবল নিষ্ঠাবান হয়ে নীতিভিত্তিক সংগঠনে থাকতে পছন্দ করল তা নয়। কংগ্রেস সংগঠনের ভিতরে উচ্চ স্থান, আসন বা শাসন— দায়িত্বের ভার না পাওয়াতে অনেকে অন্যান্য দলে চলে গেল। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও স্পর্ধাই এই মতভেদের প্রধান কারণ বলে মনে হয়। কিন্তু দুঃখী দাস সে গোষ্ঠীর নয়। অর্থাৎ তার উচ্চাভিলাষ ছিল না। তাই বড় নিরাপদ মনে করতেন রঞ্জুর বাবা। দুঃখীর সহায়তা ও বন্ধুত্বকে মূল্য দিতেন তিনি।

কিন্তু দুঃখী দাসের আচরণ তার অনেক বন্ধুরই ভালো লাগত না। বন্ধুদের সমালোচনা তাকে চারিদিকে ঘিরে থাকত। একটা অচল টাকা, কাউন্টারফিট, সেকেলে, আঠারশো বাষট্টি, রক্ষণশীল ইত্যাদি বললে দুঃখী দাসকেই বোঝাত। তার নাম ধরে চিনিয়ে দিতে হত না।

এই সমালোচক বন্ধুরা অধিকাংশ মার্কসবাদী। কেউ কংগ্রেসের সমাজবাদী গোষ্ঠী, কেউ সমাজবাদী, প্রজা-সমাজবাদী, কম্যুনিস্ট প্রভৃতি দলের সভ্য। দুঃখী তাদের সমালোচনার জবাবে জিজ্ঞেস করে—"পুরোনো কে? মার্কস না গান্ধী?"

তারা বলে গান্ধী আধুনিক কালের মানুষ হলেও চিন্তাধারা পুরোনো। ভারতের রক্ষণশীল সমাজে জন্ম নিয়ে প্রগতিশীল হওয়া অবশ্য তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না, যদিও বিপ্লবী। তবে প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর জন্ম ভারতে না হয়ে যদি রাশিয়ায় হত, তবে তিনি আজ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত মার্কসবাদী নেতা হতেন।

দুঃখীর প্রশ্ন—"গান্ধী কি অহিংসা ছেড়ে হিংসা প্রচার করতেন?"

"নিশ্চয়।" উত্তর আসে। "গান্ধীজীর অহিংসাটা কোনো নীতি নয়— পন্থা, উপায়, কৌশল। প্রিন্সিপ্‌ল নয় পলিসি। পরিস্থিতি দৃষ্টে ভারতীয়দের পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বলে তিনি অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নেতা। নেতা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে না।"

দুঃখী বলে,"আমি ওই যুক্তি স্বীকার করি না। রাজা কালস্য কারণম্। রাজা দেশের নিয়ামক, নেতা কালের কারণ। কালকে সৃষ্টি করেন রাজা, নেতা বা মন্ত্রী।"

দুঃখী তর্ক করে না। সে বিতর্ক ভালোবাসে না। তবু ভাবে, সুন্দর যুবক এরা। নির্মল মন। দেশের জন্যে প্রাণ এদের আবেগে ভরপুর। তবুও এরা এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ভুলে অন্য দেশের অভিজ্ঞতা প্রসূত একটা 'বাদ'-এর প্রতি আকৃষ্ট হল কেন?

তারা ভাবে, দুঃখীর মতো একজন শ্রেণীচ্যুত যুবক, জাতি-কুল-অভিমান-রহিত যুবকের রক্ষণশীল হওয়ার দুর্দশার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

দুঃখী দাস ভেবে পায় না নিজের পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এদের অন্যের সম্পত্তির জন্যে লোভাতুর হওয়ার কারণ কি হতে পারে।

দুঃখী দাসের বন্ধুরা মনে করে একজন শিক্ষিত যুবক ইংরেজি লিখতে পড়তে জানে অথচ মার্কসবাদের বিরোধী। কারণ কি হতে পারে? বোধহয় পড়াশোনার অভাব। স্টাডি নেই।

দুঃখী দাসের ধারণা— ভারতীয় বাঙ্ময় রূপের প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণ— ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দাসত্ব মনোভাবের এক রুচিকর অভিব্যক্তি।

কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যে দেখা গেল বহু মার্কসবাদী এসেছে কংগ্রেসের শিবিরে। অথচ দুঃখী দাস কংগ্রেসের বাইরে। তাদের মধ্যে কেউ মন্ত্রীপদাসীন, আবার কেউ আকাশ-কুসুম দেখায় মগ্ন। এদের বেশও বদলে গেছে। চোগা চাপকান, চিপা পায়জামা, নেহেরু জ্যাকেট, গান্ধীটুপি আর বোতাম-গর্ত মানে বুকে গোলাপফুল আঁটার জন্যে। ভারতীয় পরিচ্ছদের এক নবপ্রকরণ। ভারতবাসীরা যাদের যাদের গোলামী করেছিল অতীতে, তাদের সংস্কৃতি নয়, ফ্যাশানের স্মারক রূপে কিছু কিছু নিজস্ব করে নিয়েছে। মুসলমানী টুপি, মোগলাই পাজামা ও জামা, ব্রিটিশ বাটনহোল— ফুলের নিশান।

রঞ্জুর বাবা একদিন বললেন,—"আমরা সব ভাবছিলাম তোমাকে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান করলে কেমন হয়? তোমার কি মত?"

তিনি বোধহয় দুঃখীর চরিত্রের যথেষ্ট পরিচয় তখনো পাননি, ভেবেছিলেন অন্য অনেকে যেমন আসন-ব্যসনের আশা বা সুযোগ না দেখে কংগ্রেস ছেড়ে গেল, দুঃখীরও তেমনি ছেড়ে গেল, দুঃখীরও তেমনি ছেড়ে চলে যাবার আশঙ্কা আছে। তাই তাকে কোনোমতে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। বিশেষত মার্কসবাদীরা যখন কংগ্রেসে ঢুকে গদিতে চেপে বসেছে। কংগ্রেসবাদীরা কোথায় যাবে?

দুঃখী রাজি হল না।

"কারণ?"

"আমার সে যোগ্যতা নেই।"

"যোগ্যতা নেই? দুঃখী দাস চেয়ারম্যান হওয়ার অযোগ্য? কে বলবে একথা? সব থেকে বড় যোগ্যতা দুঃখী দাসের ত্যাগ। তার সততা। অবশ্য অভিমান হওয়ার কথা। আমি তোমার জায়গায় থাকলে আমারও হত। স্বীকার করছি। তোমার যোগ্য স্থান তোমাকে দেওয়া হয়নি।

দেওয়া সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। সত্যি দুঃখের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় শাসনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হওয়ার আগে প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা ভালো। জেলা বোর্ডে সে সুযোগ পাওয়া যাবে।"

"না, না, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আমার প্রকৃতি আমাকে বোধহয় শাসনক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ধৈর্য দেবে না।"

"সে কি?"

"আপনি নিজেই চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন যদি এখনও বুঝতে না পেরে থাকেন।"

"আমি ঠিক ধরতে পারছি না তুমি কি বলতে চাও।"

"আপনি যাদের নিয়ে শাসন চালাচ্ছেন তারা আপনার প্রতি — আপনার প্রতি না হোক দেশের প্রতি বিশ্বস্ত তো?

"তারা কি ভারতীয় নয়?"

"জয়চন্দ্র, মিরজাফরও ভারতীয় ছিল।"

"যারা আমাদের শাসনের মেরুদণ্ড তাদের বিরুদ্ধে এত বড় কঠোর মন্তব্য করা বোধ হয় ঠিক নয়। তুমি কি বলতে চাও তাদের দেশভক্তি নেই?"

"মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে কতজন কালো কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিল?"

"তারা কিন্তু বরাবর নিয়মিত কংগ্রেসকে চাঁদা দিত। আন্দোলনের প্রতি তাদের পুরো সহানুভূতি ছিল।"

"আপনি বলতে চান তারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল?"

"না, তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করত না।"

"আপনি যাই বলুন, যারা তখন নিজের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না বর্তমানে তারা কখনো আপনার প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারবে না।"

"চাণক্য তো আবার রাক্ষসকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন?"

"কিন্তু রাক্ষস নন্দরাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।"

"এরা আর ক-দিনের জন্যে। স্বাধীনতার পরে যারা সরকারি দপ্তরে আসছে তাদের তুমি বিশ্বাসঘাতক বলতে পারবে না।"

"তারা এ পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হতে পারবে না। জেলখানায় নাবালক বন্দী পরে 'দাগী' হয়ে যেত। সেজন্যে তাদের তরুণদের জন্যে উদ্দিষ্ট আলাদা বন্দীশালায় রাখা হত। স্বাধীনতার পরে নিযুক্ত কর্মচারীদের কি তেমনি আলাদা করে রাখা হয়েছে?"

"সরকারি অফিসগুলো জেলখানা নয়।"

"পার্থক্য এইটুকু যে জেলখানাটা শৃঙ্খলাপূর্ণ শৃঙ্খল, অফিসটা শৃঙ্খলহীন বিশৃঙ্খলা।"

"আমি একমত হতে পারছি না। দুঃখিত।"

"কিন্তু আপনি একটি বিষয়ে কখনো ভিন্নমত পোষণ করতে পারবেন না যে যারা নতুন

করে সরকারি দপ্তরে আসছে তারা কেবল অর্থলালসায় বা উদর পূর্তির জন্যে চাকরিতে ভর্তি হচ্ছে।"

"তা হতে পারে। তবে সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? সেটা যে আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রীতি তা সত্যি হতে পারে। দেশরক্ষা বা দেশপ্রীতির লক্ষ্য নিয়ে কেউ সরকারি চাকরিতে ঢোকে না।"

"যে-কারণে তারা বিদেশী সরকারের গোলামি করত, সেই কারণে তারা আপনারও গোলামি করবে। এবং যে-কারণে তারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুরক্ত ও অনুগত ছিল না সেই কারণে তারা আপনারও অনুরক্ত ও অনুগত হয়ে থাকতে পারবে না।"

মন্ত্রী চুপ করে রইলেন। রঞ্জুর বাবা। তিনি হয়ত ভাবলেন দুঃখীর বয়স হয়নি। সংসার করেনি। স্বপ্ন দেখছে। ভাবছে সংসারে কেবল ভালোরই থাকা উচিত। মন্দের স্থান নেই। ভালোমন্দ মিলিয়ে সংসার। অমৃত আর বিষ উভয়ের অধিকারী হতে হয় সংসার-সাগর মন্থন করলে। কিম্বা ভেবে থাকবেন যে দুঃখী বড় সিনিক হয়ে গেছে। অযথা আক্ষেপ সমালোচনা ভালো নয়। বিয়ে না করলে অনেকসময় মানুষ এমনি হয়ে থাকে। বিয়ে করা তার পক্ষে নিতান্ত দরকার। তবে রঞ্জুকে নয়। এমন জিদ্দী মানুষকে কে মেয়ে দেবে? নিজের মতের ওপরে বেখাপ্পা বিশ্বাস ভালো নয়। রঞ্জু কষ্ট পাবে। তাছাড়া যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তাকে মেয়ে দেবেন কেন?

দুঃখী বেরোল যাবার জন্যে। "আমি আসি", বললে দুঃখী।

"খাবে না?"

"খেয়েছি।"

হঠাৎ রঞ্জু ঢুকে এসে বলল, "না বাবা, মিথ্যে কথা। দুখীদা খাননি।"

"খাইনি?" দুঃখী আশ্চর্য হল।

"জলখাবার খেয়েছেন। ভাত খাবেন।" রঞ্জু বললে।

"আমি ওবেলা থাকব না। তুমি এসে খেয়ে যাবে। লজ্জা কোরো না। এখন খেয়ে যাবে।" মন্ত্রী বললেন।

"আজ্ঞে।" দুঃখী মানা করতে পারল না। রঞ্জুর বাবা উঠে গেলেন। রঞ্জু বসল একটা চেয়ারে। দুঃখী অন্যমনস্ক। ভাবছিল অতি চিন্তান্বিতভাবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা বিষয় নিয়ে তার ভাবনা। তার কি সে যোগ্যতা আছে? একটা কিছু পাস করা বোধহয় দরকার। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব। কিন্তু যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের সকলের কি উপাধি আছে? নেই তো। বরং আজকাল শোনা যায় যে ছেলে পড়াশুনা করল না, ফেল হল বারবার, তার মা-বাবার দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ সে নিশ্চয় মন্ত্রী হবে।

অথচ খুব উচ্চশিক্ষা পেয়েও অনেকে মন্ত্রী হতে পারেনি। ত্যাগ আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ধন জন মন দিয়ে যোগ দিয়েছে। য়ুনিভারসিটির উচ্চ-ডিগ্রীও আছে। তবুও মন্ত্রী হতে পারেনি। দৃষ্টান্ত অনেক। মনে পড়ল নির্মলবাবুর কথা।

নির্মলবাবু এম-এ এবং ল পাস করেছিলেন। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস। তবুও তিনি মন্ত্রী হতে পারলেন না। তাঁর তুলনায় রঞ্জুর বাবা তো বামন।

নির্মলবাবু ছিলেন দাশ মশায়ের* দলের লোক। সত্যবাদী জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইচ্ছে করলে চাওয়া মাত্র ডেপুটি হতে পারতেন। আবার ইংরেজিতে এম-এ। চাকরি করলেন না, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। তারপরে লবণ-সত্যাগ্রহ। পরে আগস্ট বিপ্লব। সবেতে জেলে গেছেন। ডেপুটি না হলে প্রফেসার হতে পারতেন। কমপক্ষে ওকালতী করতে পারতেন। সংসারে কেউ ছিল না। বিধবা মা ছাড়া। ধান ভেনে পড়িয়েছিল। ছেলে প্রাইমারি থেকে বি-এ পর্যন্ত বৃত্তি পেয়ে উপরে উঠেছিল। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। মায়ের চোখ থেকে জল শুকোল না। মারা গেল। ছেলে জেলে। মায়ের মুখে আগুন দিতই বা কি করে? আর একবার জেলে থাকতে স্ত্রী ও ছেলে সব শেষ।

তিনি আজ কোথায়? তাঁর ত্যাগ নেই? রঞ্জুর বাবারই শুধু ত্যাগ? ইনি মোটরে ধুলো উড়িয়ে যান। আর তিনি?

তিনি বাক্স চরকা একটা হাতে ঝুলিয়ে রোদ নেই বৃষ্টি নেই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মনে একমাত্র শান্তি তিনি দৈনিক সূত্রযজ্ঞ করেন। সূত্রযজ্ঞ পূরণ না হলে আহার করেন না। নিজের হাত-কাটা সুতোয় বোনা কাপড় পরেন। নিজের হাতে কাপড় কাচেন; আজও। এই বয়সে। প্রায় ষাটের ওপর। ঠাট নেই, আড়ম্বর নেই, রাগ নেই, অহঙ্কার নেই। মনে একটিমাত্র সান্ত্বনা— 'আমি রোজ সুতো কাটি'। সেইটুকু গৌরব নিজেকে দিয়ে অন্য সমস্ত উচ্চাশা অভিলাষকে তারই ভিতরে সমাধিস্থ করেছেন।

দেশ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয়নি। জনসাধারণ চায়নি তাঁকে। ভোটে তিনি হেরে গেছেন। কারণ, তিনি দালালদের পয়সা দিতে পারেননি। তাঁরই লোকেরা তাঁর পিছনে হাসাহাসি করে। তাঁরই কংগ্রেসের লোক। বলে, একটা জীর্ণ কঙ্কাল— ফসিল— যাদুঘরে থাকার যোগ্য। কংগ্রেসওলাদের হাসিতে সাধারণ লোকও হাসি মেলায়, কিন্তু নির্মলবাবু বুঝতে পারেন না। সরল হৃদয়। ভাবেন তারা তাঁকে দেখে খুশি হয়। মানুষের মনের পাপ তাঁকে ছোঁয়নি। তাঁর ধারণা সবাই এখনো গান্ধীকে ভালোবাসে, তাঁর কথা শোনে। তিনি যেমন সহজে সরলভাবে গান্ধীর মতবাদকে আপনার করে নিয়েছেন তেমনি। সেইজন্যে তিনি ভাবেন, প্রতিদিন নিয়মিত চরকায় সুতো কাটেন বলে শুনলে লোকে খুব সম্মান করবে। সেটা কিন্তু হাসির খোরাক জুগিয়ে থাকে।

তাঁর বাড়ি নেই শহরে। পাড়াগাঁয়ে ঘর। কুঁড়েঘর। সেখানে কোনো বড় নেতা আসেন না কিম্বা কংগ্রেস কর্মীদের পাত পড়ার জন্যে তার ঘরে বা খামারে মেলা ধান-চাল নেই। ভোটের প্রচার করবে কে? তাঁকে গান্ধীবাদী বলেও কেউ খাতির করে না। তেমন মানুষকে গান্ধীবাদী বলা যায় এমন ধরাণাও অনেকের নেই।

গান্ধীবাদী হলেন তাঁরাই মন্ত্রী আছেন যাঁরা। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী— ওঁরাই হলেন আসল গান্ধীওলা। কারণ তাঁরাই অক্টোবর দুই-তে গান্ধী-জয়ন্তী পালন করেন। আর জানুয়ারি তিরিশে

* পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশ

শ্রাদ্ধ দেন, বছরে দুবার সুতোও কাটেন। চরকা তাক থেকে নামে সেদিন, তাছাড়া রামধুনেও যোগ দেন। কিন্তু রামনাম মুখে সরে না। মান চলে যাবে। সাধারণ লোক জানে এঁরাই গান্ধীর শিষ্য। কারণ এঁদের হাতে খবরকাগজ আছে। ফোটো ছাপিয়ে জনতাকে জানিয়ে দেন যে তাঁরাই হলেন গান্ধীর ধর্মপুত্র।

আর একদল গান্ধীওলা আছে। তারা ক্ষমতা-রাজনীতির বাইরে। গান্ধীজী কংগ্রেসের সভ্য না থেকেও কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। কিন্তু এরা কংগ্রেসের নেতাও নয়, কর্মী বা সভ্যও নয়। এরা ক্ষমতায় থাকতে যেন নারাজ। ক্ষমতার বিরুদ্ধে আঙুল তুলতেও তেমনি কুণ্ঠিত। এরা কিন্তু বিপ্লবী। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরা সবসময় চেঁচামেচি করে। সংগঠিতভাবে কি সব কাজও করে।

রঞ্জু একখানা পত্রিকা পড়ছিল। কেউ কাউকে কিছু বলছে না। উভয়ে যেন উভয়ের ধৈর্য পরীক্ষা করছে। শেষে রঞ্জুই হার মানল।

"দেখলে ড্যাডির ফোটো?" রঞ্জু আরম্ভ করল।

"ফোটোটা যে কারণে নেওয়া হয়েছে সেটা না হয়ে তাতে ড্যাডিকে চিনিয়ে দেওয়ার চেয়ে না চেনানোর চেষ্টাটা বেশি থাকার মতো লাগছে।"

"আমি তো সেটাই বলতে চাইছি, সম্পাদকটা কায়স্থ বলে সে শুধু কায়স্থ মন্ত্রীদের ফোটো ভালো করে ছাপায়।"

দুঃখী হাসল। বললে, "আমি ঠিক উল্টোটা শুনেছিলাম, কায়স্থদের মুখে। তাদের আপত্তি যে ওড়িশার প্রায় সব দৈনিক খবর কাগজের সম্পাদক ব্রাহ্মণ। তারা ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের সংবাদ ভাল করে ছাপে। আর কায়স্থ-মন্ত্রীদের ব্ল্যাক আউট।"

"কেন, আমি তো দেখেছি অনেক কায়স্থ মন্ত্রীদের তারা প্রাধান্য দেয়।"

"দুটোই অসত্য। সত্য কি জান?"

"জানি আপনি যা বলবেন?"

"আচ্ছা বল দেখি— আমি কি বলতাম।"

"আপনি বলতেন, এগুলো খবরকাগজ নয়— 'কবর কাগজ'। যে মারা গেল তারি কথায় পাতার পর পাতা ভরায়। মরার সময় সেখানে কারা কারা ছিল, শ্মশানে কারা গিয়েছিল, মরার পর কে কি সব বললে, কি শোকবার্তা দিল, সম্পাদক কি শোক-মন্তব্য প্রকাশ করলেন এসব, বিপুল অন্তিম বিবরণীর ফর্দ, ঠিক কিনা? আপনি এটাই বলতে চেয়েছিলেন।"

"না।" গম্ভীর একটা 'না' বলে দুঃখী আরো গম্ভীর হল।

রঞ্জু হেরে গিয়ে একটু লজ্জা পেলেও মুখের টান বজায় রেখে বলল, "ইস, তাই বই কি? আপনি মিথ্যে বলছেন।"

রঞ্জুর ডাঁটটুকু কেন জানি ভালো লাগল দুঃখীর। এখনো তার মনে পড়ে। কত বছর হয়ে গেল। রঞ্জুর সেই লাজুক লাজুক ভাব। নীচের দিকে তাকিয়ে থাকা। ঠোঁটে হাসি। আঁচলের কোনাটা ধরে সে পাকাচ্ছিল। যেন তার হার মানার অপমানকে সে নিংড়ে দিচ্ছিল শুকনো মাটিতে।

কতক্ষণ পরে দুঃখী বললে, "আমি দেশের খবরকাগজ সম্পাদকদের রুচির কথা বলছিলাম। এ দেশের কাগজে প্রথম কথা হল প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের বার্তাবাণ। ইতিহাস পড়ার সময় দেশের প্রকৃত ইতিকথা তাতে পেতাম না। পাওয়া যেত কেবল রাজা ও শাসকদের চরিত্র ও তৎসম্পৃক্ত কিছু ঘটনা। কিন্তু আজকের এই সংবাদপত্রকে ভিত্তি করে কালকের ঐতিহাসিকগণ যা লিখবেন তার থেকে শাসকদের চরিত্রকেও বিচার করতে পারা যাবে না। আমরা পাব কেবল ইতিবিবৃতি, ইতিবার্তা। কারণ এঁদের চরিত্র, আচরণ ও কথার মধ্যে থাকে সুদীর্ঘ 'প্রণালী', বিস্তৃত ব্যবধান।"

"ড্যাডিও এই কথা বলেন," রঞ্জু বললে। "কথা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।"

"খালি শাসক নন। আমাদের সকলের এক দশা। আমরা মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক বলে তাঁর সমাধিতে ফুলের মালা রেখে তাঁকে শ্রদ্ধা দেখাই। কিন্তু মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পন্থার উপরে আমাদের তিলমাত্র বিশ্বাস নেই। গান্ধীজীর প্রতিকৃতির উপরে ফুলের মালা দেওয়ার সময় আমাদের ফোটো কাগজে বেরোয়। লোকে মনে করে আমরাই গান্ধীজীর প্রকৃত দায়াদ।

"আমরা কি সত্যি গান্ধীজীর দায়াদ নই? এতে সন্দেহ করার কি আছে?"

"যদি দায়াদ হয়ে থাকি তবে পিতৃহন্তা। আমরাই জাতির জনককে হত্যা করেছি। গড্‌সে একা নয়।"

"আমাদের প্রফেসর কি বলেন জান? বলেন, এটাই ভারতীয় চরিত্র। এখানে বৌদ্ধধর্ম টিকে থাকতে পারল না, প্রসার লাভ করল গিয়ে সুদূর চীন ও জাপানে।"

"যথার্থ বলেছেন তোমার প্রফেসর। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে যেমন সিংহাসনের জন্যে পুত্র পিতাকে হত্যা করতে দেখা যায়, আমাদের কালেও তাই হল। গান্ধীর দায়াদেরাই তাঁকে তিলে তিলে হত্যা করল। সেই হত্যার ক্রিয়া আজও চলছে।"

"আপনার কথার অর্থ, আমরা গান্ধীর বাক্যকে হত্যা করছি?" রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

"তা বলতে পার। তবে আমার মতে গান্ধীবাদ বলে কিছু নির্দিষ্ট সত্য বা তথ্য বা তত্ত্ব নেই। এ দেশে যা ছিল, যেটা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, গান্ধী তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র। গান্ধীকে ভুলে যাওয়ার অর্থ আমাদের পরম্পরাকে হত্যা করা। পরম্পরার হত্যা পিতৃহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। কারণ যে ঐতিহ্যকে হত্যা করে সে বর্ণসংকরের কারক বলে গীতায় বলেছে।"

চাপরাসী এসে বললে কে একজন ভদ্রমহিলা মিনিস্টারকে খুঁজছেন।

দুঃখী উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল। রঞ্জু গিয়ে তার ড্যাডিকে ডেকে দিল।

মন্ত্রী ও ভদ্রমহিলা একলা রইলেন। দুঃখীকে বাইরে চলে যেতে হল। রঞ্জু কিন্তু ঘরের ভিতরে থেকে সব শুনতে থাকে।

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর ড্রয়িং রুমে আবার আবির্ভাব দুজনের। দুঃখী ও রঞ্জু।
"ভদ্রমহিলাটি কে চিনলে?"

"চেহারা দেখে মনে হয় তিনি মিসেস করুণা খাঁ। তাই না?"

"কেমন করে চিনলে?"

"খবরকাগজে ফোটো দেখেছি। তিনি একজন বিপ্লবিনী। আগস্ট বিপ্লবে যারা হিংসাত্মক কাজকে গান্ধীজীর নির্দেশ বলে চালিয়ে সংগঠন করত, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী।"

"ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও তিনি গতানুগতিকতার ঘোর বিরোধী। তাই না?"

"হ্যাঁ জানি। তা না হলে ব্রাহ্মণের মেয়ে মুসলমান বিয়ে করতেন?"

"সেটা কি ভুল? অন্যায়?"

"অন্যায় কি ভুল বলা কঠিন। তবে তাঁর স্বামী রাজ্যপাল হওয়ার সময় দুজনকে একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য কারুর হয়নি। শপথ গ্রহণ উৎসবেও নয়।"

"তার মানে তুমি প্রকারান্তরে বলছ যে এরকম বিয়ে অন্যায়।"

"না। আমার কথার অর্থ প্রত্যেক দুর্বলতাকে বিপ্লবের নামে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।"

"অন্য জাতে বিয়ে করা কি দুর্বলতা?"

"তা আমি বলতে পারব না। তবে যৌবনের উদ্দামতাকে প্রণয় আখ্যা দিয়ে পরিণয় করা সুচরিত্রের পরিচয় দেয় না।"

"যৌবনের উদ্দামতা আর প্রণয়ের মধ্যে ব্যবধানের রেখা কোনখানে?"

"সে রেখা কেবল ভুক্তভোগীই জানে। তাকে কথায় প্রকাশ করা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য।"

"যদি কেউ পার্থক্য বুঝতে না পেরে সমাজের তথাকথিত শৃঙ্খলাকে অবহেলা করে সেটা কি তার সমাজবিরোধী কাজ হবে?"

"সমাজবিরোধী কাজ হবে কি না আমি তার উত্তর দিতে চাই না, কিন্তু সে ব্যক্তি যৌনলালসা ও প্রণয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না, তার পক্ষে বিয়ে না করাই শ্রেয়। কারণ যৌনলালসা প্রথম পাত্রের কাছে পরিতৃপ্ত হওয়ার পরে পাত্রটি অবহেলিত হয়।"

"পাত্র যদি শালপাতা না হয়ে সোনার হয় তবুও কি এঁটো পাতার মতো ছুঁড়ে ফেলা যাবে?"

"ফেলে নাও দিতে পারে। তবে সোনার প্রতি লোভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও পাত্রের প্রতি নয়।"

রঞ্জুর বাবা ঘরের মধ্যে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের তর্ক হচ্ছে?" রঞ্জু প্রথমে বলে উঠল— "ড্যাডি, দুঃখীবাবু বলছেন—"

রঞ্জুর মা পর্দা সরিয়ে বললেন— "মেয়ের কথার ছিরি দেখ! এত বড় হলি, কাকে কি বলতে হয় শিখলি না? দুখীবাবু আবার কি? দুখীদাদা বলতে পারিস না?" রঞ্জু একটু লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। মা বললেন—"ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে খেতে দেবে কি না।"

"দুখীদা বলছিলেন মামি, তিনি খেয়েছেন, আর খাবেন না। তাই না, দাদা?" দাদা ডাকার সুযোগ সৃষ্টি করে রঞ্জু রহস্যময়ী হয়ে ওঠে।

বাব বললেন, "খুব বকাটে হয়েছিস। দুখী, ওর কথা ধরো না, ওর কথার কিছু ঠিক ঠিকানা থাকে না। কখন কি যে বলে। সুজাতা, তুমি খেতে দিতে বল। হ্যাঁ, তারপর রঞ্জু,

তোমাদের কি নিয়ে তর্ক চলছিল?" রঞ্জুর মা চলে গিয়েছিলেন।

"এই মিসেস খাঁয়ের কথা। তিনি নাকি তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছেন?"

"না তো। কে বললে তোকে?"

"সবাই বলাবলি করছে, ড্যাডি।"

"কারো ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে জানতে চাওয়া ভালো নয়। তিনি একজন বিপ্লবিনী নারীনেত্রী। এটুকুই তোমার জানার কথা।"

"কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তার থেকে কি তাঁর বিপ্লবাত্মক মনোভাবের কোনো আভাস পাওয়া গেল?"

"তুই তবে সব শুনেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"অন্যের চিঠিপত্র পড়া, অন্যের কথাবার্তা কান পেতে শোনা অভদ্রতা।"

"দেওয়ালেরও কান আছে ড্যাডি? কানকে বন্ধ করতাম কি করে?"

"খুব কথা বলতে শিখেছিস। হ্যাঁ দুখী, তুমি জান মিসেস খানকে?"

"অনেক শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় আমরা তাঁকে ঝাঁসী-কী-রানী বলতাম। আত্মগোপনকালে এই বিপ্লবিনী ইংরেজ সরকারের জুজুর ভয়ের কারণ হয়েছিলেন।"

"এখন কেন এসেছিলেন জান?"

"না।"

"তোমাকে রঞ্জু বলেনি?"

"না।"

"তবে শোন। এখন তিনি কংগ্রেসকে রক্ষণশীলতা থেকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়েছেন।"

"তিনি একা না, তাঁর সঙ্গে আর কেউ আছেন?"

"কংগ্রেসের কয়েকজন তুঙ্গ নেতা তাঁর প্রেরণাদাতা।"

"তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন?"

"নাহ।"

"তিনি তো বামপন্থী নেত্রী ছিলেন। এখন কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দক্ষিণপন্থী হলেন। পুরস্কার হিসেবে তাঁর স্বামী উচ্চ আসন পেলেন। বর্তমান তিনি নিশ্চয়ই একজন গান্ধীবাদী এবং গান্ধী যে বিপ্লব এদেশে চেয়েছিলেন কংগ্রেস সেই পথ থেকে সরে যাওয়াতে তিনি বোধ হয় কংগ্রেসকে গান্ধীজীর মার্গে নিয়ে যেতে চান?"

হেসে উঠলেন রঞ্জুর বাবা। "গান্ধীর চিন্তাধারাকে কোন বিপ্লবী বিপ্লবের প্রতীক বলে ভাবে না। বরং সেটা বিপ্লবের পরিপন্থী বলে মনে করে।"

"তবে তিনি আর কোন প্রকার বিপ্লবের পরিকল্পনা করছেন?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"আমি একদিন তাদের মা বলেছিলাম, বইও লিখেছিলাম, এত দিনে এরা সেই সুর ধরেছেন।" বললেন রঞ্জুর বাবা।

"মানে, এক জাতি — এক নেতা?"

"এগজ্যাক্টলি— বিলকুল তাই।"

"আপনি বললেন? তিনি রাজি হলেন?"

"পাগল হলে? আমি তখন বলেছিলাম বলে কি আজ তাই বলব? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নীতি পরিবর্তন করা হল রাজনীতি। এখন কংগ্রেসের যে তুঙ্গ নেতা এ ধ্বনি তুলতে চান, তাঁকে যদি আমরা সর্বাধিনায়ক বা ডিকটেটর না করে অন্য একজনকে বসিয়ে দিই, তবে সেই নেতাই কংগ্রেস একচ্ছত্রবাদী হয়ে গেল বলে প্রচার করে অন্য দলে ঝাঁপ দেবেন বা নতুন দল গড়বেন। এঁদের চরিত্র কি আমার জানা নেই? বেশ ভালো করে জানি।"

"নীতি বয়ান করতে হয়— মানে এই রাজনীতিতে — কেবল স্বার্থের অনুকূল হলে। আজ্ঞে তাই না?" দুঃখী জিজ্ঞেস করে।

"অনুকূল নীতিটাই রাজনীতি — মানে শ্রেষ্ঠ নীতি।" বললেন মন্ত্রী। তোমরা যাকে নীতি বল,— নীতি নীতি বলে চিৎকার কর, তার বর্ণ কি? রূপ কি? রেখা কি? নীতির কোনো স্থায়ী মানদণ্ড সমাজ তৈরি করেনি। দেশ-কাল-পাত্রকে দেখে সে কত রূপ নেয়। আবার দেশ-কাল-পাত্রতেও যে-কোনো স্বার্থানুকূল নীতি বরণ করা তার ধর্ম। সেজন্যে পরস্পরবিরোধী নীতিবাক্য শাস্ত্রতে বয়ান করেছে। চোর চুরি করার সময় বলছে,— 'পেট পোষ নাই দোষ'। গত নির্বাচনে বলা হয়েছিল বছরের মধ্যেই ঘি-মধুর বর্ষা হবে। চার বছর হয়ে গেল ঘি নেই কি মধু নেই। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলছি, 'সবুরে মেওয়া ফলে। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বত লংঘনম।' যদি মনে হয় যে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, ভেবেচিন্তে করলে লাভের আশা ক্ষীণ হয়ে যাবে, তবে মনে করিয়ে দেওয়া হবে রাবণের রামচন্দ্রকে উপদেশ— 'স্বর্গে সিঁড়ি বাঁধতে হলে সঙ্গে সঙ্গে করা চাই।'

"অনেকে কিন্তু দুর্নাম করছে আপনার— আমি শুনেছি।"

"কি? কি দুর্নাম? কেন? কারণ?" ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মন্ত্রী।

"আপনি কোনো এক ব্যাপারে টেন্ডার না ডেকে কাজটা শিগগির করার অর্ডার দিয়েছেন। প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার কাজ। লোকে বলছে মন্ত্রী অন্তত একলাখ পকেটে পুরেছেন।"

"বলছে? হা, হা, হা। লোকে তবে একলাখ পর্যন্ত যেতে পেরেছে। পাঁচ লাখ কেন নয়? আরে বাবা সেটা কি পাপ? তোমরা ভোটের সময় আমাদের কাছে হাত পাতবে। নির্বাচন মণ্ডলীতে আমাদের এজেন্ট দালালদের বছর বছর ধরে পুষব। আনবো কোথা থেকে, অ্যাঁ? গত নির্বাচনে আমার পঞ্চাশ হাজার খরচ হল। রঞ্জুর মামারা আমায় দেবে, না দেশবাসীরা দেবে? তা ছাড়া পার্টি। পার্টির তো সবথেকে বড় পেট। তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে নিশ্চয়?"

"এখন তবে আপনি প্রকারান্তরে নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র শাসনের পক্ষপাতী?"

"কি করে? কি করে? পার্টিটাই তো গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।"

"একচ্ছত্র শাসনের মূলমন্ত্রও সেই পার্টি।"

"সেখানে নামে মাত্র পার্টি। একটা পার্টির অর্থ পার্টি নেই বললেই চলে। সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ম্!"

"আপনাদের ক্রিয়াকলাপের ফলে ভারতবর্ষে শেষে কোনো একটি পার্টিই থাকবে।"

"কেমন করে? কিসের জন্যে? আমরা কি অন্যান্য দলকে বেআইন করেছি?"

"হাতে না মেরে ভাতে মারছেন। যে-দল শাসনে থাকবে, শুধু সেই দলই ভোটের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করতে পারবে। আমরা ভোটার বা দালালদের টাকা দিয়ে নির্বাচন লড়াই এমন ব্যয়সাপেক্ষ করে তুলেছি যে শেষে আমাদের ছাড়া আর কেউ নির্বাচন লড়তে পারবে না। মূর্খতা-বশত যদি কেউ লড়তে যায় তবে সে নিশ্চয় হারবে।"

"তবুও তো লোকে লড়ছে, জিতছে।"

"ক্রমে সংখ্যা কমে যাবে।"

"না, না,— সেরকম ভাবা ভুল। ভারতে একচ্ছত্র শাসন অসম্ভব। আমাদের সংবিধানের আদর্শ গণতন্ত্র। এই সংবিধান বেঁচে থাকা পর্যন্ত ভারতবর্ষে একচ্ছত্রবাদ অসম্ভব।"

"লাঞ্চ রেডি সার"— বাবুর্চি এসে বললে। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু উঠে গেল। দুঃখী ও রঞ্জুর বাবার মধ্যে তর্ক তখনো শেষ হতে চায় না।

সেদিন দেশের নেতাদের সত্যিকার রূপ দেখতে পেল দুঃখী। তার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। ওর ঘৃণা হচ্ছিল এই মন্ত্রীর বাড়িতে খেতে। রঞ্জুর উপস্থিতিটাও যেন সে সহ্য করতে পারছিল না। একই রক্তে গড়া। এই আবহাওয়াতে বেড়ে উঠেছে। ঘৃণা নয়, দয়া হচ্ছিল। কিন্তু সে-প্রকার দয়া হেতু কোনো দান দেওয়ার সঙ্গে গ্রহীতার প্রতি ঘৃণা ও হেয় মনোভাবও আসে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। স্বাভাবিক। রঞ্জুর প্রতি সেরকম নীচত্ববোধ ওর ছিল না আগে। অনেক সময় দয়া হলেও দান করতে ইচ্ছে হয় না। তাও ঠিক নয় রঞ্জুর ক্ষেত্রে। রঞ্জু দানের অযোগ্য।

"ড্যাডি, এস। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে"— রঞ্জু ডাক দিল ডাইনিং হল থেকে।

"এই যে যাই।" ড্যাডি উত্তর দিয়ে দুঃখীকে বলতে থাকেন, "বুঝলে দুখী, তুমি এসব কথা কোথাও প্রকাশ কোরো না। শ্রীমতি খাঁয়ের প্রকৃত স্বরূপ আমি দেখে নিলাম। এক একটা বড় আদর্শবাদের ধুয়া তুলে এঁরা অতি নিম্নস্তরের স্বার্থ সিদ্ধ করেন, বুঝলে? সেজন্যে আমি মানা করেছিলাম। তিনি বলছিলেন ছলেবলেকৌশলে কংগ্রেস কমিটি সব ভেঙে দিয়ে অ্যাড্‌হক কমিটি গড়তে। তাতে শুধু আমাদের মতাবলম্বী, আমাদের পক্ষপাতী লোকেরা সভ্য, সভাপতি ইত্যাদি থাকবে। আমি কি করে সেটা করতাম, বল?"

দুঃখী মনে মনে হাসল। মন্ত্রীকে আর একটু পরিষ্কারভাবে দেখে নিতে সে বললে, "আপনি জানেন না, আমি বেশ অনুমান করতে পারছি এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আর এক কুৎসিত চিত্র। যে তুঙ্গ নেতার পরামর্শে নারীনেত্রী এখানে এসেছিলেন, তিনি কি কেবল তাঁরই নিরঙ্কুশ স্থিতি চান? সেটা তো তাঁর জীবিতাবস্থার স্বপ্ন। তিনি চান তাঁর পরে যেন আর কোনো

রাজ্যের ধীমান ব্যক্তি ভারতের শাসক হতে না পারে— কেবল উত্তরপ্রদেশ ছাড়া। ওড়িশার ভাগ্য তো চিরদিন পাথরের তলায়।"

"ঠিক বলেছ দুখী, ঠিক বলেছ।" বলে উঠে পড়লেন মন্ত্রী মহাশয় উত্তেজিতভাবে। "আমি দেখছি তোমার দূরদৃষ্টি আছে। কোনোখানে বোলো না এখন। এরা কংগ্রেস বৃক্ষকে কাটতে কুড়োলের হাতল তৈরি করতে চায় কংগ্রেসের কাঠ নিয়ে। এরা বর্তমান কংগ্রেসকে লোপ করে এক নাজী কংগ্রেস গড়বে। আমরা এখন চুপ করে থাকব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, এস, খেতে বসা যাক।"

মন্ত্রী এগোলেন। দুঃখী পিছনে যেতে যেতে বললে, "কংগ্রেসকে লোপ করতে কি কারো চেষ্টার দরকার আছে বলে মনে করেন? কংগ্রেসের এখন উনপঞ্চাশ বইছে। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা যেমন বৃথা, মারতে যাওয়াও তেমনি বিড়ম্বনা। মরা ঘোড়াকে গুলি করে গোলন্দাজ বনে যাওয়া যেমন হাস্যকর।"

খেতে বসে মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কি ভাবছ? এই ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হতে পারে?"

"গাছ তো আপনিই ভেঙে পড়ত। ভেঙে পড়ার সময় যার কুড়ুলে শেষ চোট বসবে সেই হবে নেতা— একচ্ছত্র নেতা।"

"না, না, আমি তা মনে করি না। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বকে সহ্য করা যায় না।"

"ভারত সব সহ্য করতে পারে। বিভীষণ, শকুনি, জয়চন্দ্র, মিরজাফর, রামচন্দ্র কাকে না সহ্য করেছে এ দেশ?"

"ভারত তবে কি আবার পরাধীন হবে বলতে চাও? অসম্ভব।"

"পরাধীনতা শব্দটা বহু পুরোনো। তাই ও শব্দের প্রয়োগ হয় না আজকাল। এটা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। পরাধীনতা, ঔপনিবেশিকতা অতি পুরোনো ঐতিহাসিক চিন্তাধারা। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের পরে এখন যে নতুন 'বাদ' শুরু হয়েছে, সেই পথের পথিকরা তার নতুন প্রতিশব্দ করেছেন— 'প্রভাব পরিসর'— ভৌতিক পরাধীনতা নয়, সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক দাসত্ব। কে বলতে পারে আমরা একদিন আমেরিকা, রাশিয়া বা চায়নার 'প্রভাব পরিসরের' মধ্যে থাকব না।"

"অন্যের চিন্তা নিয়ে নিজের মস্তিষ্ক কেন্দ্রের উপর প্রভুত্ব করতে দিয়ে পরান্নভোজী হওয়ার চেয়ে বেশি দুঃখদায়ক আর কি হতে পারে?"

"হে ভগবান, আমাদের দেশের জয়চন্দ্র মিরজাফরদের সে দুর্ভাগ্য বরণ করবার পথ পরিষ্কার করার জন্যে সুযোগ দাও।" দুখী বললে।

"আমরা কি নিরপেক্ষ নীতিতে দৃঢ় থাকতে পারব না বলে মনে কর? আমি কিন্তু সেরকম ভাবি না।"

দুঃখী আমিষ খায় না। সে নিয়ে রঞ্জু ও তার মা কৌতুক করছিলেন কিন্তু রঞ্জুর বাবা বড় গম্ভীর। তিনি বোধহয় ভেবে চলেছিলেন— ভারত কি তার নিরপেক্ষ নীতিতে দৃঢ় থাকতে পারবে না? শেষে বললেন, "শোনো দুখী, তোমার কথাটা খুব চিন্তা করে দেখলাম।

কিন্তু আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছি না যে ভারত পৃথিবীর দুটো শিবিরের কোনো একটাতে কখনো যোগ দিতে পারে। আমার বিশ্বাস সে তার নিরপেক্ষ নীতিতে অটল থাকবে।''

''দুর্বলের নিরপেক্ষতা মৃত্যুর আবাহক। সবল ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষতা শোভা পায়। ভারতের পক্ষে খোলাখুলি কোনো পক্ষ নেওয়া বরং শ্রেয়।'' দুঃখী ওর দৃঢ় মত জানাল।

''কোন পক্ষে আশ্রয় করবে? আমেরিকা? অসম্ভব!''

''যখন যেটা সুবিধা সে পক্ষ আশ্রয় করার চেয়ে নির্দিষ্ট একটা পক্ষ আশ্রয় করা বরং ভাল। এখন ভারত সুযোগ দেখে কখনো আমেরিকা, কখনো বা রাশিয়ার কাছে হাত পাতছে। ফলে উভয়ের প্রতি তার ভয়। কিন্তু একটা পক্ষ আশ্রয় করলে কেবল প্রতিপক্ষ আতঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।''

''উভয় পক্ষ থেকে বা একটা পক্ষ থেকে হোক, আতঙ্কটা আতঙ্ক। একটা পক্ষ থেকে হলে সেটা আতঙ্ক, দুপক্ষ থেকে এলে সেটা আতঙ্ক নয় এমন বলা যায় না। আতঙ্কের মাত্রার কম-বেশির কোনো পরিমাপক নেই। তাই বরং উভয় পক্ষ থেকে আতঙ্কের আশঙ্কাকে স্বাগত করে চালাকির সঙ্গে উভয় পক্ষ থেকে সুবিধা হাসিল করা বুদ্ধিমানের কাজ।''

''কে হাসিল করবে?'' দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

''কেন, আমাদের দেশ, আমাদের রাষ্ট্র ভারতবর্ষ।''

''ভারতবর্ষ? দেশ, রাষ্ট্র? তার সংজ্ঞা কি? বলুন দেশাধিপ, রাষ্ট্রনায়ক, জননেতা। এরা কি দেশের হিতে কোনো নীতি গ্রহণ করে? তা যদি হত তবে নীতিটা ধ্রুব হয়ে থাকত। দোদুল্যমান হত না। আপনি তো নিজেই স্বীকার করেছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নীতির পরিবর্তনই শ্রেষ্ঠ নীতি — রাজনীতি এদের কাছে।''

''তুমি কি বলছ যে আমাদের নেতারা যে নীতি ধরেছে তা দেশের অহিত সাধনের জন্যে?'' কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন মন্ত্রীমশায়।

''দেশের হিত হোক বা অহিত হোক, সেটা পরের কথা। প্রথম বিচার্য হল নিজের হিতসাধন।''

''দরকার হলে এরা নিজের স্বার্থের জন্যে দেশের স্বার্থকে বলি দিতে পারে? কখ্খনো নয়।''

''নিজের স্বার্থের জন্যে আজ যারা উভয় গোষ্ঠীর প্রতি সমভাবাপন্ন থাকার ছলনা করে আমেরিকার কাছ থেকে টাকা আনছে, আপনি যে ষড়যন্ত্রের সূচনা দিলেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তারাই একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ একদলীয় শাসনের সমর্থক কোনো একচ্ছত্র রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব বরণ করতে পারে।''

''অসম্ভব! অসম্ভব!! তাহলে দেশে বিপ্লব হয়ে যাবে। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে চারিদিকে।''

দুঃখী হাসল। বললে, ''আজ্ঞে সে ভয় আর নেই। বিপ্লব বিদ্রোহের সমস্ত সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। একচ্ছত্র শাসনের পথ পরিষ্কার।''

"কি বলছ দুখী?" মন্ত্রীর হাত থেকে কাঁটা চামচ খসে পড়ল।

"আমি যা বলছি তা এক নিরেট কঠোর নির্মম সত্য। গত দশ বারো বছর ধরে আমাদের একধিপত্য শাসনকালের মধ্যে আমরা বিরোধের সমস্ত শক্তিকে লোপ করে দিতে বহুলাংশে সক্ষম হয়েছি। হইনি কি? দেশবাসীকে আমরা প্রত্যেক কথার জন্যে সরকার মুখাপেক্ষী করে তুলেছি। লোকেদের নিজের উদ্যোগে কিছু করবার শক্তিকে অপহরণ করে নেওয়া হয়েছে। লোকদের বিশেষ করে যুবশক্তিকে যাদের অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকে তাদের সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর ভয় নেই। এবার দেশ নির্বিরোধে একচ্ছত্রবাদের দিকে এগিয়ে যাবে।"

"তুমি বড় নৈরাশ্যবাদী। আমি কিন্তু নিরাশ নই।" খেয়ে উঠতে উঠতে মন্ত্রীমশাই বলে উঠলেন। সকলে হাত ধুতে গেল।

শুতে গেলেন মন্ত্রী। দুঃখী বের হল বাসায় যেতে। পিছনে রঞ্জু, এগিয়ে দিতে। রঞ্জুর মা বললেন, 'বেশি রাত কোরো না দুখী, ওবেলা উনি তো টুরে যাবেন। আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব।'

"আজ্ঞে হ্যাঁ" বলে দুঃখী বেরিয়ে গেল। ড্রইংরুমের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দুহাতে পর্দা তুলে ধরেছিল রঞ্জু। দুঃখী ফিরে বলল "আমি যাচ্ছি।" রঞ্জু হাত দুটো গুছিয়ে নিয়ে নমস্কার করল।

রঞ্জুর চোখ দুটোয় কিরকম একটা নেশা জমে এসেছিল। সে নেশা মানুষের মনের দুর্বলতাকে নিয়ে খেলার নেশা নয়। না, সরল মানুষের স্নেহ, সহানুভূতি, দয়া, করুণা এমনকি প্রীতিও টেনে নেওয়ার জন্যে সেটা যেন খুব শক্তিশালী। কোনো ফলের নির্যাস থেকে তৈরি নয়। নিষ্কলতার রসায়নে মিষ্টি। গলা বুক জ্বালায় না। সরস করে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা দুজনে বসেছিল ড্রইংরুমে, খেতে যাবার আগে। রঞ্জু বললে, 'দাদা, একটা কথার উত্তর দেবে?"

"পারলে দেবো।" দুঃখী বলল।

"তুমি পারবে আমি জানি। না হলে জিজ্ঞেস করতাম না।"

"প্রশ্নটা আগে শুনি। আগে থাকতে এত গৌরচন্দ্রিকা কেন?"

"সত্যি বলতো দুখীদা, দেশে কি আবার একটা বিপ্লব হবে?"

"হওয়া উচিত তবে হওয়ার ভয় নেই।"

"যদি হয়?"

"হলে ভালো হয়!"

"তুমি আবার জেলে যাবে? লাঠির মার খাবে?"

রঞ্জু আর কলেজে পড়া ছাত্রী নয়। সে যেন একটা কচি বাচ্চার মতো কথা বলছে। চোখ ছল ছল। স্বর গদগদ। অস্পষ্ট।

সেইদিন দুঃখী প্রথম জানতে পারল রঞ্জু তাকে ভালোবাসে। এইটুকু পুঁচকে একটা মেয়ে।

টিপলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এই রঞ্জনা। তার এমন মনে হল? অভ্যাসের মতো সরল। নেশার মতো সরল। সংবেদনে সুশীল। অবসাদের মতো শান্ত। আশার মতো মধুর। স্বপ্নের আভাসমাত্র তার মনে। দুঃখীর ভালো লাগল রঞ্জনার সান্নিধ্য।

"হতে পারে।" বললে দুঃখী। অতি সহজ সুরে।

"না-না— হবে না, হবে না। ড্যাডি একদিন কি বলছিলেন জান? বলছিলেন— স্টুডেন্ট স্ট্রাইক হয়েছিল তখন— আর একজন মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন— বললেন, 'এই যুবকদের ভিতরে স্ফুলিঙ্গ আছে। সে স্ফুলিঙ্গ যাতে বিদ্রোহের আগুন না জ্বালিয়ে কার্যকরী কোনো শক্তি সঞ্চার করতে পারে সেরকম বিনিয়োগ করার দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।' বাবার কথা শুনে অন্য মন্ত্রীটি কি বললেন শুনবে? বললেন— 'সেটা আরো বিপদজনক। নেতৃত্ব আর আমাদের হাতে থাকবে না। যুবকদের হাতে চলে যাবে।' "

"বাবা কি উত্তর দিলেন?"

"বলবেন কি, এই সময় পিয়ন চিট বাড়িয়ে দিল আগন্তুকের— অপরূপ মিশ্র। যুবক সংঘের সম্পাদক, ছাত্র য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট। ড্যাডির সঙ্গে দেখা করবে।"

"বেশ নামটি তো! দেখতে কেমন?"

"কানা ছেলে পদ্মলোচনের মতন।"

"সে কি বললে তোমার বাবাকে?"

"বলবে কি? টাকা চাইল— টাকা। স্ট্রাইক বন্ধ করিয়ে দেবে।"

"কত?"

"ড্যাডি জানতে চাইলেন 'কত'। বললে দু-চার হাজার। ড্যাডি বললেন— 'দুই থেকে চার অনেক দূর'।"

হেসে ফেলে দুঃখী বললে, "তারপর?"

" 'কত দরকার তোমার ঠিক করে বল' ড্যাডি বললেন। অপরূপ বললে, 'আপনি যা পারেন দিন।' ড্যাডি বললেন, 'তুমি তো পয়সা কি করে খসাতে হয় শেখনি। ছাত্রনেতা কেমন করে হবে? কথা কেমনভাবে বলতে হয় আগে শেখ। দুই দরকার থাকলে চার বলবে। চার দরকার থাকলে আট বলবে।' ছেলেটা লজ্জা পেয়ে গেল।"

"বাবা দিলেন কত?"

"তিনি কেন দেবেন—?"

"কে দিল?"

"দিল চিরঞ্জিলাল।"

"চিরঞ্জিলাল আবার কে?"

"চেন না চিরঞ্জিলালকে? তবে আর কি রাজনীতি করবে তুমি? কোন রাজনৈতিক নেতা তার আশীর্বাদ ভিক্ষা না করে? আর একদিন আমারই সামনে একজন কম্যুনিস্ট নেতা এসে বললেন, তাঁর ছেলে রাশিয়ার কোন মেডিক্যাল কলেজে পড়তে যাবে। টাকা দেবে

রুশ সরকার। শুধু রাস্তা খরচটা দরকার। তাই চিরঞ্জিলালকে একটু ফোনে বলে দিতে যে তাঁর দু-হাজার টাকা দরকার।"

"ড্যাডি ফোন করলেন?"

"না। চিরঞ্জিলাল দৈবাত এসে গেল। সে যা দিল কম্যুনিস্ট নেতা মহা আনন্দে পকেটস্থ করে চলে গেলেন। এরাই না নিজেকে বিপ্লবী বলে থাকে? এই তো চরিত্র এদের। বিপ্লব করবে কে?"

"তুমি ভাবছ তোমার বাবার দয়াতে টাকা পেল বলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোথাও কিছু বলবে না? অ্যাসেমব্লিতে স্বর তুলবে না?"

"তুলবে?"

"সে সৎসাহস তাদের আছে।"

"তাহলে কৃতঘ্নতার নাম কি বিপ্লব?"

"না, এদের মতে বিপ্লবে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকে না।"

"প্রেমেও। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে না?"

হাসল দুজনেই। দুঃখী বললে, "আচ্ছা, সেই ছাত্রনেতাকে কত দিল চিরঞ্জিলাল?"

"আমি বলতে পারব না। চিরঞ্জিলাল মাথায় পাগড়ি এঁটে ভুঁড়ি দুলিয়ে এসে পৌঁছল। বললে, 'হুজুর, জয় রামজীকি।' ড্যাডি বললেন 'কি দরকার?' 'হুজুর, কছু নাই। সির্ফ দর্শন লাগি এলম।' ড্যাডি কি বললেন জান? ঠাট্টা করে বললেন, 'দর্শনী বিনা দর্শন? শাস্ত্রে মানা আছে জান?' সে ভাবল সত্যি ড্যাডি বুঝি দর্শনী চাইলেন। বললে, 'মালুম হুজুর। যো হুকুম হোবে।' ড্যাডি বললেন, 'আমার কিছু দরকার নেই। এই ছেলেটির কি দরকার একটু ব্যবস্থা কর।' এতে কে বলবে ড্যাডি অন্যায় করলেন। দুর্নীতি করলেন। চিরঞ্জি কত দিল, দিল কি না কোনো খবর রাখেননি।"

"তার পরে ছাত্র আন্দোলন বন্ধ হল ত?"

"হ্যাঁ, দু-তিন দিন পরে আপনি বন্ধ হয়ে গেল।"

"চিরঞ্জিলাল আর কিছু বলেনি?"

"না, কিছু না। শুধু যাওয়ার সময় বললে,'সাব, হামার লাইসেন্সটা অভিতক নহি মিলল।'"

"তারপর? তারপর?" দুঃখী খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"ড্যাডি বললেন, 'হোগা, হোগা, সবুর করো।' তারপর ড্যাডি তাকে বুঝিয়ে দিলেন, সে চলে গেল।"

"কি বোঝালেন?"

"অত জেরা কোরো না। আমি বলতে পারব না।" কাঁদো কাঁদো স্বরে একটু আদুরেভাবে রঞ্জু বলল।

"আমি বলতে পারি। তিনি বলে থাকবেন, লাইসেন্স দেওয়া ভারত সরকারের হাতে। আমরা শুধু সুপারিশ করব। সে কাজ সারা। এই তো?"

"তুমি কেমন করে জানলে দুখীদা? নিশ্চই তুমি কারো কাছ থেকে শুনেছ। সত্যি বল তো?"

"না, শুনিনি কারো কাছে। অনুমান করে বলছি।"

"জান দাদা, সেই যে লাইসেন্সের কথা বলছিল— সেই মাড়োয়ারি গো— সেটা নাকি অন্য রাজ্যে চলে যেত। ড্যাডি অনেক লড়ে ওড়িশাতে আনলেন। ড্যাডির কেন্দ্রে খুব প্রভাব।"

দুঃখী নীরব রইল।

"কি দাদা, চুপ করে বসে গেলে যে? চিরঞ্জিলালকে ধ্যান করছ নাকি? আমি ধ্যানের শ্লোক বলে দিচ্ছি শোন।—

স্তুপাকারং লোলুপনয়নং কৃপনাভং ধনেশং

কোষাধারং গদিষুশয়নং ছাগবর্ণং গবাঙ্গম্।"

"বাঃ চমৎকার। আরো দুলাইন বল দেখি," দুঃখী বললে। "কি, আর বানাওনি? আচ্ছা, আমি চেষ্টা করি;—" কিছু সময় ভেবে নিয়ে দুঃখী পাদপূরণ করল—

"মন্ত্রীনাথম্ অমলনয়নং নেতৃভিঃ ধ্যানগম্যং

(বন্দে) পুঁজিপতিৎ ভোটভয়হরং সর্বদলৈকনাথম্।"

হাততালি দিয়ে নেচে উঠল রঞ্জু। কি জানি কতক্ষণ, এমন চলত যদি না ভিতর থেকে রঞ্জুর মা ডাক দিতেন— "রঞ্জু, দুখী, চলে এস, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

খেতে বসে রঞ্জু বললে, "সত্যি বলতো দাদা, এটা কি দুর্নীতি, ঘুষখোরী? এই যে সমালোচনা হচ্ছে সেটা কি ঠিক?"

"আমরা লোককে বলার সুযোগ না দিলেই তো হয়।"

"তুমি ভালো হলেও লোকে বলবে। তাদের মুখে হাত দেবে কে?"

খাওয়ার পর দুঃখী বাসায় যাবার আগে রঞ্জুর মা একশো টাকা এনে দুঃখীর হাতে দিয়ে বললেন, "তিনি টুরে যাওয়ার সময় তোমাকে দিতে বলে গেলেন। আফিসে কি সব খরচপত্তর করবে।"

"এখন তো কংগ্রেস অফিসে কিছু খরচের দরকার নেই। পয়লা তারিখে নেব, রেখে দিন।"

"তিনি আমার ওপর রাগ করবেন।" রঞ্জুর মা বললেন।

"বেশ, তাহলে দিন।"

তার আগে ওরা দুজন আবার কিছক্ষণ বসে আলোচনা করেছিল। রঞ্জুর মনে একটা বড় দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের সমাধানের উপরে যেন তার সুখসৌধ দাঁড়াতে পারবে। অন্যথা অসম্ভব। সে খুব চিন্তাকুল দেখাচ্ছিল। মুখে ভয় আর অপমানবোধকে মিলিয়ে কে যেন সাদা পাউডারে লাল রং গুলে ছেপে দিয়েছে। ছোপ ছোপ দেখাচ্ছে দু-গালে।

"ড্যাডি হাতেও ধরেন না এসব পয়সা। বলেন, লুকিয়ে চুরিয়ে নেওয়াটা অন্যায়,

ঘুষখোরী। তিনি এর কাছ থেকে নিলেন তো তাকে দিলেন। যার আছে তার থেকে নিয়ে যার দরকার তাকে দেন। এতে অন্যায় কোথায়, পাপ কোনখানে? এটা কি ঘুষ?"

"সেটাও একরকম ধারণা।" দুঃখী বললে।

"আর পার্টির জন্যে চাঁদা নেওয়া, সেটাও কি অপরাধ? পার্টি তো সব গণতন্ত্রের ভিত। ড্যাডি বলেন— গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সুসংগঠিত পার্টি চাই। সুসংগঠিত পার্টির জন্যে টাকা চাই। টাকার জন্যে চাঁদা দরকার। তাই পার্টির জন্যে চাঁদা তোলা অন্যায় নয়, পাপ নয়, ঘুষখোরী নয়।"

ছোট বক্তৃতা একটা দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল রঞ্জু। দুঃখীর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। দুঃখী বুঝতে পারল, রঞ্জু যা বলছে সেটা তার নিজের কথা নয়। নিজের বক্তব্যের উপর ওর নিজের দৃঢ় বিশ্বাস নেই। কিছুক্ষণ পরে বলল, "আমার এ সম্পর্কে কি মত শুনতে চাও? শোন। যার অভাব আছে তাকে স্বচ্ছল লোকের টাকায় সাহায্য করা বা পার্টির নামে চাঁদা তোলা পাপ না হতে পারে। কিন্তু যার কাছ থেকে চাঁদা নেবে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাকে কোটা, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি পাইয়ে দেওয়ার আশা দিয়ে চাঁদা আদায় করা অন্যায়। ঘুষখোরী!"

রঞ্জু ওর আহত গর্ব নিয়ে বিমুখ হয়ে গেল দুঃখীর প্রতি। দুঃখী লক্ষ্য করল, রঞ্জুর সমস্ত আশার সৌধ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ক্ষণিকের মধ্যে। সে মিছেই সুবিন্যস্ত শাড়িকে আবার গোছাবার চেষ্টা করছিল। যেন ওর গা থেকে কাপড় সরে গিয়ে শরীরের অশ্লীলতা বের হয়ে পড়েছে। মনের চঞ্চলতা যেন শাড়ির পরত পরত ভাঁজের উপরে ইলেকট্রিক পাখার হাওয়া লেগে খসে পড়ছিল নীচে।

বেশ কিছু পরে বলল, "দেখ দুখীদা...."

শুধু 'দাদা' থেকে আবার 'দুখীদা'! দুঃখী লক্ষ্য করল সম্বোধনের অবনতিকে। রঞ্জু বলল, "দুখীদা, নৈতিকতার মূল্য ধ্রুব নয়। অস্থায়ী। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ড্যাডি বলেন, 'নৈতিকতার মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। দ্বাপর যুগে পঞ্চস্বামীবিশিষ্টা নারী সতী। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ একাধিক স্বামী থাকা কি সম্ভব? য়ুরোপে একাধিক স্বামী ভোগ করা নারী সম্মানিতা। কিন্তু ভারতবর্ষে তা অসম্ভব।"

"হ্যাঁ, অসম্ভব। কারণ অহল্যা, কুন্তী, মন্দোদরী, তারা এখন সে দেশে জন্ম নিয়েছে বলে এ দেশের নারীরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিতা। তাই না?" হেসে ফেলল দুঃখী। বলল, "রঞ্জু, নৈতিকতার মূল্যবোধ পরিবর্তন সম্ভব। তবে কেবল স্থান-কাল-পাত্র দৃষ্টিতে তার বিচার হয় না। 'যদ্ যদাচরতে শ্রেষ্ঠঃ মৎতদ্দেবেতরে জনাঃ। মহতে যাহা আচরিবে, ইতরে তাহাই করিবে।' আমাদের দেশে মহৎ লোকেদের স্খলন হয়েছে। তাই এ দুর্দশা।"

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। দুঃখী চলে গেল। রঞ্জু কি ভাবল সে জানে না। কিন্তু মনে হল রঞ্জুকে অবাঞ্ছিত না হলেও অনাবশ্যকভাবে উত্তেজিত করা তার উচিত হয়নি। রঞ্জু ও তার মধ্যে কোঁথাও মিল নেই। রঞ্জু তাকে ভালোবাসে বলে যে কল্পনা ওকে ওর মধ্যে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছিল, মোহ এনেছিল, সেটা বেশ দুর্বল মনে হল। রঞ্জু যদি তাকে ভালোবাসে

তবে সে ভালোবাসার কারণ কি হতে পারে? কিসের ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্ন সে দেখছে দুঃখীর মতো একটা অপাত্রকে জীবনের সঙ্গী করার আশা পোষণ করে? শুধু যদি দেহের মোহ হয়ে থাকে সেটা আপনি চলে যাবে, দেরি হবে না। কিন্তু রঞ্জুর প্রেম দেহের মোহ হতে পারে না। সে তার জীবন নিজের পিতার ধরনে আদর্শে গড়েছে। সেই আদর্শ অনুযায়ী দুঃখীও একই ধারায় মানুষ বলে সে হয়ত কল্পনা করেছিল। সে কল্পনার মিনার আজ এক অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এখন আর সে রঞ্জুর শ্রদ্ধার পাত্র নয়। রঞ্জুর প্রতি বরং দুঃখীর শ্রদ্ধা হল সামান্য। রঞ্জু নিজের নীতিতে অটল। তাই এ শ্রদ্ধা। নাকি সে কেবল পিতামাতার ইঙ্গিতে এতদিন তাকে ভালোবাসার অভিনয় করে এসেছে? সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জুর ওপরে ঘৃণা জন্মাল দুঃখীর মনে। রঞ্জুর প্রণয়কে যদি আবার প্রণয়ের কোনো সূচনা সে দেয়— প্রত্যাখ্যান করবে বলে ঠিক করল। তবে সে নিষ্পত্তিতে সে যেন আঘাত পেল ওর হৃদয়ের কেন্দ্রে। মানুষ তার মনের মানুষ কখনো পায় না। যা মেলে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চালিয়ে নেওয়াতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। হঠাৎ তার মনে হল, সে যদি কখনো বিয়ে করবে বলে স্থির করে তবে তার একমাত্র ভাবী পত্নী হচ্ছে রঞ্জু— সেই রঞ্জনা।

স্বপ্ন দেখল, রঞ্জু এসে বলছে— দাদা, আদর্শকে জাপটে ধরলে আদর্শ মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমার খুব ভয় করছে। পাছে তুমি পড়ে যাও। আমি যা যা বললাম তুমি কি তাতে রাগ করলে? রেগেছ নিশ্চয়ই। তুমি রাগ করলে খুব সুন্দর দেখায় তোমাকে। সেজন্যে তোমাকে চটিয়ে দিলাম। আমি বাবাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমাকে তাঁর চেয়ে আরো বেশি ভালবাসি।

সত্যি সত্যিই সেদিন দুঃখী বসে কথা বলছে মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে, রঞ্জনা এসে বলল, "ড্যাডি, কাউকে কোটা লাইসেন্স পারমিট দেওয়ার কথা বলে পার্টির জন্যে হোক বা কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য হোক তার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা বাস্তবিক অন্যায়। তুমি কি বল? আমি তোমাকে সেরকম চাঁদা আদায় করতে দেব না। যদি তোমার পার্টি তোমায় বাধ্য করে তবে বরং মন্ত্রীপদ ছেড়ে দেওয়া ভালো।"

রঞ্জনার বাবা রঞ্জনাকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "হঠাৎ তোর এরকম খেয়াল হল কেন?"

"দুখীদা বললেন....."

সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে চুপ হয়ে গেল রঞ্জু।

"কি বললেন?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"দাদা বললেন, ওরকম চাঁদা আদায় না করলে পার্টি চলবে কি করে? পৃথিবীর যত জায়গায় গণতন্ত্র আছে, সবখানে এমনি পার্টির জন্যে চাঁদা আদায় করে। বিহারী চোরও এমনি ডাকাতি করে গরিব লোকদের টাকা দিত। তাকে সবাই বাহবা দিত।"

"তুই কি বললি?"

"আমি বললাম সেটা অন্যায়, পাপ। ফড়িং মেরে ময়না পোষা অন্যায়। পাপ।"

দুঃখী বিচলিত হল। চেয়ে রইল এই রহস্যময়ী বালিকার দিকে অপলক। মনে হল রঞ্জু

যেন খুব নিকট থেকে নিকটতর, নিকটতম, নিবিড়তম হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। রঞ্জুকে ছেড়ে তাকে চলে আসতে হল শহর থেকে গ্রামে। সেইদিন। রঞ্জুর প্রণয়কে সে অপমান করেছিল। রঞ্জু দুঃখীর জীবন থেকে সরে গেল। আর শুকুরা বোধহয় শুধু রতনীকে অপমান করেছিল। রতনীর প্রণয়কে নয়। সেদিন রঞ্জনা পালিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে। চিরদিনের জন্যে দুঃখীর সঙ্গে ঘর বেঁধে থাকবে বলে। কিন্তু থাকতে পারেনি। আজ রতনী এসেছে রাউত-বাড়ি থেকে। শুকুরা তাকে ফিরিয়ে দেবে না তো? শুকুরা ডাকল, "আয়, আয় নারে! দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?" রতনী ধীরে ধীরে উঠে এল বারান্দার ওপর। আরো জোরে কাঁদতে কাঁদতে।

রঞ্জনা কাঁদছিল না। অশ্রু নয়— আগুন বেরোচ্ছিল তার চোখ থেকে। তার কথাগুলো কথা নয়, বাজের শব্দ। সে কি সত্যি রঞ্জনার প্রণয়কে অপমান করেছিল? কিন্তু সে কেন তার বাবাকে না বলে পালিয়ে এসেছিল সেদিন রাতে?

আজও তারাগুলো সেদিনের এই পুরোনো আকাশে মিটি মিটি দীপ জ্বালিয়ে তাকিয়ে আছে। আর একবার সে দৃশ্য দেখবে বলে বোধহয়। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাদের। রতনী ঘরের ভিতরে গিয়ে আলো জ্বালছে।

রঞ্জুর চলে আসা বোধহয় অন্যায় ছিল না। প্রণয়ের আবেগকে অশ্লীল বলে ভাববার কি অধিকার ছিল তার? সেদিন সকালের আলোচনা থেকে রঞ্জু বুঝতে পেরেছিল যে দুঃখী সম্ভবত আর কংগ্রেস অফিসে থাকবে না। হয়ত ইস্তফা দিতে পারে। খুব সম্ভব তাদের বাড়িতে আর আসবে না। আর খাওয়াদাওয়া করবে না। সে আর দাদা বলে ডাকার সুযোগ পাবে না। সেজন্যে তার জীবনে এক চরম নিষ্পত্তি সে নিয়েছিল। নিষ্পত্তি নয়, ত্যাগ। সেই ত্যাগকে দুঃখী অপমান করেছে। আজকে তার অনুতাপ হল। কত দৃঢ় ছিল রঞ্জুর সিদ্ধান্ত। সে বুঝতে পেরেছিল দুঃখীর মতো একজন দরিদ্র, অর্ধ-শিক্ষিত এবং প্রতিপত্তিহীন মানুষের সঙ্গে মন্ত্রীর কন্যার বিবাহ অসম্ভব। তার উপরে সেদিন সকালে তার বাবা ও দুঃখীর মধ্যে যুক্তিতর্ক থেকে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরে থাকবে যে দুটো সমান্তরাল রেখার মিলন হবার নয়।

সেদিন সকালে দুঃখী দাস ওর স্পষ্ট মত শুনিয়ে দিয়েছিল "কংগ্রেস সমাজকে ভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথ থেকে সে বহুদূরে চলে গেছে। এমন অবস্থায় আমার কংগ্রেসে থাকা মনে হয় বেশিদিন সম্ভব হবে না।"

"একটা-দুটো দুখী দাস চলে গেলে কংগ্রেসের সামান্য হানি হওয়ারও আশঙ্কা নেই। বরং কংগ্রেসে নতুন রক্তের সঞ্চার হবে।" মন্ত্রী বললেন ক্ষুব্ধভাবে।

"তা সত্যি। তবে যে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হবে তা অধিক দূষিত বলে প্রমাণিত হবে এটাও সত্যি।"

"দূষিত কে করল নব যুবকদের— আমাদের ছাত্রসমাজকে? আমরা? আমরা দূষিত করেছি?"

"কংগ্রেসের নেতারা করেছেন। অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করে আপন স্বার্থে বিনিয়োগ করেছেন এই ছাত্রসমাজকে - যুবসমাজকে।" দুঃখী জবাব দিল।

"যে প্রলুব্ধ হল সেটা তার দুর্বলতা। প্রলোভন বা প্রলোভনকারীর নয়।" মন্ত্রী বললেন।

"ছাত্ররা কোমলমতি যুবক। তাদের সামনে প্রলোভন রাখা অপরাধ।"

"হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি ভুল বুঝেছ দুখী দাস। তোমার সিদ্ধান্ত সব ভুল। কোমলমতি কি শুধু প্রলোভনপ্রবণ? যতটা প্রলোভনপ্রবণ ততটা বলিষ্ঠও বটে। এই অবস্থায় মানুষ তার দৃঢ় চরিত্র গঠন করে থাকে। এই চরিত্র গঠনের জন্যে উদ্যম কে করবে? রাজনৈতিক নেতা না শিক্ষক ও অভিভবক? মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান চরিত্র গঠন করতে না লগ্নী করেন ব্যবসাদারের মতো পরে ভবিষ্যতে সুদে-আসলে আদায় করতে? অভিভাবকরাই অর্থের ক্রীতদাস করে দিয়েছে তাদের সন্তানদের। তা না হলে তারা সহজে প্রলুব্ধ হবে কেন?"

"আপনি বরং বিরক্ত হতে পারেন কিন্তু ছাত্রদের অর্থ উৎকোচ দিয়ে ভ্রষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"আবার ভুল বললে দুখী দাস। ছাত্রদের ভ্রষ্ট করার জন্য আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি না। ছাত্রদের ভিতরে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে, ভারতের শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাতে তাদের আবশ্যকতা পূরণ করার জন্য তুমি এ টাকা খরচ করবে। এটা প্রলোভন নয়, প্রয়োজন। নাও, এ টাকা নিয়ে যাও। দেরি করলে সব বৃথা হবে। সব রাজনৈতিক দল এ কাজ করে। একা কংগ্রেস নয়। প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র ছাত্রসংঘ আছে। সেটা কি তুমি জান না? তারা কি নিজের নিজের অনুগত ছাত্রদের জন্য খরচ করে না? আমি জানি এই কলেজ য়ুনিয়ন নির্বাচনে কম্যুনিস্টরাই সবচেয়ে বেশি তৎপর। বিদেশের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের প্রতি, স্বদেশের প্রতি তাদের হৃদয়ে প্রীতি জাগাতে হবে। এতে অন্যায় কিছু নেই।"

"ছাত্রদের মধ্যে সে প্রেরণা আনবার জন্যে অর্থের দরকার নেই। আমি আপনার নির্দেশ মতো ছাত্রেরা যাতে কংগ্রেসের য়ুনিয়নকে ভোট দেয় তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যতটা হবে সেই যথেষ্ট। কিন্তু অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে আমি তা করতে রাজি নই।"

"হা-হা-হা, দুখী দাস! আবার ভুল করছ। শিখিয়ে বুঝিয়ে মাতানোর যুগ চলে গেছে। ত্যাগের দ্বারা দেশসেবা আর সম্ভব নয়। সে যুগ বদলে গেছে। মনে রেখো, এটা স্বাধীন ভারত। স্বাধীন ভারতে কি সৈন্যরা প্রাণবলি দেবে বিনা পারিশ্রমিকে? তাই দেশের জন্যে যে কাজ করবে তার পয়সা দরকার। আমরা যদি তাদের প্রয়োজন না মেটাতে পারি তবে দেশের সেবা করতে কেউ এগিয়ে আসবে না।"

"কিন্তু পয়সা দিয়ে ভোট কেনা কি দেশের সেবা?" দুঃখী দুঃখিত হয়ে বলল। "আমরা নির্বাচনকে এক প্রহসন করে তুলেছি।"

"নির্বাচনের অন্য নাম প্রহসন এ কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, দাস? নির্বাচনে কি প্রকৃত জনমত প্রকাশ পায়? লোকপ্রতিনিধি বলে আমাদের গর্ব করাটাই সার। লোকে ভোট দেয়

হুজুগে মেতে কিম্বা গাঁয়ে দালালদের কথায় পড়ে। নির্বাচনটা প্রহসন নয় তো আর কি?"

"তাহলে বলতে হবে আমাদের গণতন্ত্র শাসনও একটা ছদ্মনাম।"

"গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয়— গণ্ডতন্ত্র। শতকরা আশি জন ভোটদাতা নিরক্ষর, মূর্খ, গণ্ড। এদেশে গণতন্ত্র? গণতন্ত্র কেবল ধ্বনি। লোকদের ভোলানোর কৌশল। কিছুদিন গান্ধীর নামে ভোট পাওয়া গেল। কেউ পেল ধর্মের নামে, কেউ বা চাষী-মজদুরের সেবক হিসেবে। তারপরে এল গণতন্ত্র। একচ্ছত্রবাদী কম্যুনিস্টরাও বললে— গণতন্ত্র। তারপরে শুরু হল সমাজবাদী ধাঁচা। আস্ত নিরেট সমাজবাদ ধ্বনি তুলতে সাহস করে না। তাই এখনকার ধ্বনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। তারপরে পুরোপুরি সমাজবাদ। সব ধ্বনি,— শ্লোগান। সব লোকদের ভাঁওতা দেবার জন্যে।"

"লোককে ভুলিয়ে ঠকিয়ে ভোট নেওয়া কি মনুষ্যত্ব?"

"দুখী দাস, যাও, চলে যাও বনে তপস্যা করবে। রাজনীতি ছেড়ে দাও। রাজনীতিতে 'নীতি' হল সর্বপ্রথম বলি। তোমার দরকারটা কি? আদর্শ না বাস্তব? বাস্তব মানুষ হতে চাও ত যা বলছি তাই কর।"

"আজ্ঞে না। আমি তা পারব না। লোক চরিত্রকে ভ্রষ্ট করা মহা অপরাধ। আমার দ্বারা হবে না।"

"আমরা কি ভ্রষ্ট করছি লোকেদের, না লোকেরা, ভ্রষ্ট তাই আমাদের ভোট দেয়? জনসাধারণ যে রকম শাসনের যোগ্য তাদের তেমনি শাসক মেলে।"

"হয়তো দুটোই সত্য। বলা যায় না বীজ আগে না গাছ আগে। তবে দুটোর যে-কোনো একটি গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক।"

"গণতন্ত্র! হা-হা-হা। আর ওই শব্দ শুনতে পাবে না। নির্বাচন প্রথাও ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে। আর আট-দশটা নির্বাচনের পরে সব নির্বাসন।"

"মানে? আপনি বলতে চান দেশে একচ্ছত্রবাদ চলে আসবে?"

"আমরা না চাইলেও আসবে।"

"কিন্তু আপনি নিজে সেদিন বললেন—"

"বললে কি হবে? যা অনিবার্য তাকে স্বাগত জানানো বুদ্ধিমানের কাজ।"

"কিন্তু আপনি যে একচ্ছত্রবাদের বিরোধী? গণতন্ত্রের একান্ত পক্ষপাতী!"

"আহ! তুমি রাজনীতি করতে এসেছ না নীতিশাস্ত্র পড়তে এসেছ? তুমি যুবক। যুবকের পক্ষে কেবল কর্মই শ্লাঘ্য। যুক্তি কেবল নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর। কর বা মর। প্রশ্ন কোরো না। এটাই তোমার 'মটো'— আদর্শ বাক্য। যাও, কংগ্রেস ছাত্রসংঘের আমি বিজয় কামনা করছি।"

"তাহলে কংগ্রেস আর কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

"পার্থক্য? অনেক পার্থক্য। ভারত লাল নেহি হোগা। হরা নেহি পড়েগা। সব নারঙ্গী হো যায়েগা।"

"মানে?"

"আরে, এটুকু বুঝতে পার না? 'নোট নাও, ভোট দাও'— এর পরিণাম কি? টাকা কে দেবে? রাশিয়া দেবে, চায়না দেবে। লাল হবে না হলুদ হবে? লাল হলদে মিলে নারঙ্গী।"

"আর তারকা?"

"তারকা তো খোলাখুলি দিচ্ছে। এরা গোপনে। যেই দিক, লোকেদের পয়সা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। আর কি ছাড়তে পারবে? ভোটদাতা ভারতীয় নাগরিকের নৈতিকতা আর আছে? তুমি খালি নীতি নীতি করলে পিছনে পড়ে থাকবে। কেউ খোঁজ করবে না। নেতা বলে কেউ মানবে না। 'যো নেতা হ্যায় সো দেতা হ্যায়।' আমরা টাকা নেব ধনী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। দেব ভোটারদের। শেষে ভোটদাতাদেরও পট্টি মেরে দেব। আর ভোট হবে না টাকা পাবে।"

"শাসন থাকবে তো? সরকার থাকবে তো?"

"আরে, শাসন থাক আর নাই থাক, সরকার থাক বা না থাক, একটা কিছু তো থাকবে? বুঝলে দুখী, সরকার যেটাকে বলছ সেটা সবসময় অদৃশ্য থাকে। আমলা বল, মন্ত্রী বল, সরকার যেই চালাক, সরকারী তকমা আঁটা থাকে শুধু পিয়নের বুকের ওপর।"

দুঃখী হাসল। মন্ত্রীও হাসলেন। দুঃখী বললে, "আমি আসছি।"

"টাকা নিয়ে যাও।"

"না— টাকা আমার দরকার হবে না।"

"হবে— হবে। আমি বলছি হবে। নাও, টাকা ধর।"

"আজ্ঞে না— আমি টাকা নিতে পারব না।"

"তাহলে তুমি কংগ্রেসের ভিতরে থেকে কাজ করতে পারবে না।"

"আমি বরং কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র ভ্রষ্ট করতে পারব না। নমস্কার।"

দুঃখী চলে গেল। মন্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বসে রইলেন।

দুঃখী দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখল রঞ্জু সেখানে দাঁড়িয়ে। নমস্কার করল। আজ তার চোখ মেঘলা নয়। বরং উজ্জ্বল। মনে পড়ে গেল ওর দেবকীর কথা। সেদিন পুলিশের গুলির মুখে যাবার সময় দেবকীর চোখ এমনি দেখাচ্ছিল। রঞ্জনার চোখের তারা দুটো বেরিয়ে এসে যেন ওর আগে আগে চলেছে এমনি মনে হল দুঃখীর।

দুঃখী চলে গেল।

রঞ্জু ফিরে গিয়ে থাকবে ওর বাবার কাছে। ওর বাবা জিজ্ঞেস করে থাকবেন, 'দুখী চলে গেল?' রঞ্জু বলে থাকবে 'হ্যাঁ' আর মনে মনে বলতে চাইবে "রঞ্জুও চলে যাচ্ছে।"

রঞ্জু সত্যিই চলে গিয়েছিল বাবা-মা সবাইকে ছেড়ে। কিন্তু দুঃখী করল কি? সে কি সত্যিই রঞ্জুর প্রতি অন্যায় করেনি?

না, সে কিছু অন্যায় করেনি। রঞ্জুর প্রতি সে অন্যায় করতে পারে না। এখনো ওর শ্রদ্ধা

আছে সেই অসাধারণ মেয়েটির প্রতি। সে রঞ্জুর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেনি। অপমান করেনি। সে ঘৃণা করেছে— ঘৃণা ঠিক নয়— অস্বীকার করেছে। রাজি হয়নি রঞ্জুর প্রেমের অশ্লীলতাকে স্বীকার করে নিতে, মেনে নিতে।

হ্যাঁ, প্রেমের অশ্লীলতা, প্রেম যতই মহনীয় হোক, নির্মল হোক, নিজে নিজে সে প্রস্তাব তোলা অশ্লীলতা। ভিখ মেগে খাওয়ার মতো দরিদ্রতা।

জীবনের সে একটা পর্ব। দুঃখী ভাবছিল। ওর স্ত্রী, দেবকী আর রঞ্জনা। একজন সহধর্মিণী। আর একজন সহকর্মিণী। আর রঞ্জনা তার সহমর্মিণী।

সে-সব চলাপথের মাইল-খুঁটি। পথ চলতে চলতে পিছনে থেকে যায়। পিছনে পড়ে যায়। খালি খালি বুঝতে পারা যেত না কত রাস্তা এগিয়ে এসেছে মানুষ। পথচলা মানুষ। কেউ সঙ্গে আসে না। ধর্ম কর্ম কেবল নিজের। আর সব পর।

শুকুরা আর রতনী। তাদের জীবনকে পর্ব পর্ব করে ভাগ করা যাবে না। সব একটা কাণ্ড। এখন রাম ফিরে এসেছেন অযোধ্যায়। সীতা অশোকবন থেকে। দুঃখী মনে মনে হাসে।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যাবেলায় এসে জুটল এক দঙ্গল লোক। গাঁয়ের প্রায় অর্ধেক। মনে হল গোটা গাঁ টা যেন উঠে এসেছে। তার মধ্যে এক থোক ভাগু মহান্তির দলের। কয়েকজন হলধরের সপক্ষ। পঞ্চায়েতরাজের নগ্ন রূপ। উভয়ে কংগ্রেস দলের। এদের বাদ দিয়ে কম্যুনিস্ট সোস্যালিস্টও আছে জন কয়েক। দুঃখী কিন্তু কোনো দলের নয়।

কথা উঠল বি.ডি.ও. কি করে ট্রান্সফার হবে। বি.ডি.ও.-কে ট্রান্সফার করতেই হবে। বি.ডি.ও. এখান থেকে বদলি না হলে চলবে না। দুখীদা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখুক। একটা বজ্জাত, বেহায়া, লম্পট, ঘুষখোর কোথাকার এসেছে এই বি.ডি.ও.টা।

কেউ বলল— "মহিলা সমিতি হল নিকুঞ্জবন। শ্রীকৃষ্ণ তো সেখানে বসে বাঁশি ফুঁকছেন!"

দুঃখী বলল, "আমাদের মেয়েছেলেরা তো সেখানে না গেলেই হল।"

সকলে চুপ। এ ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল। কারো মুখে কথা নেই। নেহাত একজন শেষে বলেই ফেলল, "আমাদের মেয়েছেলেরা কেন যাবে? সেই বড়লোকেরা; কিশোর পটনায়েকের গুণের নাতনী। সোমত্ত মেয়ে। তুই কেন গিয়ে ঘুরবি বিডিওর জিপে?"

একজনের মুখ খুলতে সাহস বেড়ে গেল সকলের। আর একজন বলে উঠল— "সত্যি সত্যি চোখে পড়ার মতো!"

উত্তর এল— "সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে যাবে, আধরাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে। দেখবে কে?"

গর্জে উঠল শুকুরা— "হাঁ হে, তোমরা চোখে দেখেছ কেউ? তোমাদের কি বউ-ঝি নেই? পরের মেয়ের নামে বারো কথা বলতে মুখে আটকাচ্ছে না?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ— "খুব যে তেজ দেখাস? বেশি দেমাক দেখাসনি। ধম্মপুত্তুর এলেন আমার। আমাদের কলকাতার কুলি ঠাউরেছিস? যা যা, বাড়ির ভেতর আগে জিজ্ঞেস করে আয়, তারপর আমাদের ভুল ধরবি।"

আগুনে জল পড়ল। শুকুরা আর রাগবে কি? শরমে একেবারে মরমে মরে গেল। রতনী, রতনী! সে কি রতনীকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না! আবার গিয়ে রাউতদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসবে? নইলে কলজে শক্ত করে সইতে হবে। ঠাট্টা - বিদ্রুপ - লাঞ্ছনা সব সইতে হবে। উঃ!

দুঃখী তাকিয়ে থাকে সে লোকটার দিকে। গাঁ-টা কি হয়ে গেল! গাঁয়ের লোকেরা কি হয়ে গেল! গাঁ-টা যেন ফেটে হাঁ করে আছে। রসাতলে যায় না কেন এ গাঁ-টা!

ঠিক। ঠিক ধরেছে। লোকটার নাম হারু। বুক টান করে বলল দুঃখী দাসের মুখের ওপরে—"দুখীদার কাছে কিসের জন্যে এসেছ সব বলত আগে? সে কার কি করতে পারবে? চল চল, ওঠ।"

"একটা পরামর্শ করতে হবে না?" কে একজন বললে।

"পরামর্শ? কিসের পরামর্শ? ওতে কি চিঁড়ে ভেজে? বি.ডি.ও. বদলি আবেদন-নিবেদনে হবে না। তার উপায় আমার জানা আছে। আসুক দেখি সে আরেকবার এ গাঁয়ে। ছেলের বাপের নাম না ভুলিয়ে দিই তো আমার নাম হারু নয়।"

"কোন কথাতে কোন কথা। গাবের বেড়ায় গাবের বাতা!"

কে বললে, কে বললে? সবাই এদিক ওদিক তাকাল। আরে, আরে, এ তো বালুঙ্গাদা। কখন এসে চুপ করে বসে গেছে এক ধারে। কারো নজরে পড়েনি।

"এ সব মুতফরাক্কা কথায় মেতেছ কেন শুনি?" বালুঙ্গা বললে।

"বাজে কথা নয় বালুঙ্গাদা। এটা গাঁয়ের নিন্দা"— বললে হারু।

"আ-হা-হা, গাঁয়ের নিন্দা ছেলেটাকে বিঁধছে বড়। ঘরের কথা যাতে বাইরে না যায় সেজন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে পার? খালি আজে-বাজে কথায় কি লাভ? গাঁয়ের সুনাম কি করে হবে ভেবেছ কখনো? দুর্নাম ঢেকে ফেললে সুনাম হয় না। সুনামের নীচে দুর্নাম আপনি ঢাকা পড়ে যায়। এ গাঁ ধনীমাষ্টার নিধির মায়ের গাঁ। এখানে ইজ্জতের জন্যে মানুষের জান চলে যেত। এখন পেটের জন্যে ইজ্জত বিকোচ্ছে মানুষ, বুঝেছ সে কথা? খবর রাখ কিছু? যাও, গিয়ে খোঁজ নাও। যার ঘরে পুরি তরকারি হত, সেখানে শাক-ভাত জোটে না। যুগ বদলে যাচ্ছে। মানুষও বদলে যাচ্ছে। বেঘোরে পড়ে।"

আর একজন বুড়ো লোক বললে, "ছাড় ছাড় যেতে দাও ওসব বাজে কথা। ওরে বাবা নিজের পেটে এত গু, আর কার পেটে কি আছে তার জন্যে অত কিসের মাথাব্যথা। বলত দুখী, এই যে ভোটের কথা শোনা যাচ্ছে, আমরা ভোট দেব কি না? দিলে কাকে দেব?"

"কবে ভোট হবে? কে কে দাঁড়িয়েছে? কোন পার্টি থেকে?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

"আরে, পার্টিকে দেখে কি কেউ দাঁড়ায়? দাঁড়ায় পেটের জন্যে।" একজন মাতব্বর গোছের লোক বললে। "পেটে খায়, পার্টির নামে যায়।"

হাসল সবাই। দুঃখী বললে, "ভোটের ব্যাপারে আমার কোনো মত নেই বা মতলব নেই। যার যাকে ইচ্ছে ভোট দিক। পার্টি হোক বা পেট হোক।"

ছোকরা একজন বললে, "আমরা ঠিক করেছি যুব কংগ্রেসকে দেব।"

"যুব কংগ্রেস আবার কে? কংগ্রেস ত একটা। তার জায়গায় ছোকরা বুড়ো এল কোথা থেকে?" দুঃখী বললে।

"জান না? একদল নতুন ছোকরা বেরিয়েছে।" বালুঙ্গা বললে— "হাতী নে ঘোড়া নে আমার ভেঁপু বাজিয়ে দে। ভেঁপু বাজানোই সার। হাতী নেই কি ঘোড়া নেই!"

আর একজন বললে, "যদি ভোট না দাও, তবে 'অমোঘ অস্ত্র'। সেটা আবার কি বালুঙ্গাদা? সে নাকি মহাভারতের মোহিনী অস্ত্রের মতো। আদিবাসী অঞ্চলে গিয়ে তার সুলুক পেয়েছে। একলব্য যে অস্ত্র দিয়ে সকলকে ঘায়েল করে দিয়েছিল। সেই যে, কুকুরটা চেঁচাতে পারছিল না। এ সেই অস্ত্র। একলব্যের নাতির নাতিরা সব নাকি জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।"

একজন একখানা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল দুঃখীর হাতে,—"এই যে দেখ। ছাপা কাগজে বার করেছে। এটা কি মিথ্যে?"

দুঃখী পড়ল। অবাক হয়ে গেল। দিনকাল হল কি? দেশ কোনদিকে চলেছে! নাকি জার্মানী হয়ে গেল ভারতবর্ষ!

একজন বললে, "আচ্ছা, সে কি করতে পারে করুক দেখি। অমোঘ অস্ত্র! ভারি অমোঘ অস্ত্র মারনেআলা! কি, ফাঁসি দেবে না শূলে দেবে? আমরা তাকে ভোট দেব না। ধমক দিয়ে ভোট নেবে নাকি?"

আর একজন বললে, "না রে বাবা, অমোঘ অস্ত্র সেরকম নয়। সেটা নাকি অব্যর্থ। এই যে দেখ, এই রকম, হ্যাঁ।" এই বলে মাঝের আঙুলে বুড়ো আঙুল ঠুকে দিয়ে দেখাল টাকা বাজানোর ঢঙে।" হেঁ হেঁ, এই মাল-মাল। বুঝলে? আমাকে একজন কংগ্রেসআলা যেচে দিতে চাইছিল। একশো টাকার নোট একখানা।"

"নিলি না কেন?" কেউ একজন বলল।

"ওরে বাবা, আমি ওই টাকা দেখে ঘাবড়ে গেলাম। এত টাকা পেল কোথায়? জাল নোট-ফোট হয় যদি? আগেই তো শুনেছিলাম এই পি-এস-পি দাদার কাছে যে কংগ্রেসওলারা নোট বাঁটছে। সেগুলো জাল নোট, দেখেশুনে নিও। নাহলে সোজা মামার বাড়ি। আমি বললাম— বাবা, এ নোটকে নমস্কার, তাতে তিন তিনটে সিংহ, আমার ভয় করে। উঁ হুঁ, টাকা-ফাকার দরকার নেই, তুমি যাও। আমি ভোট একা তোমাকেই দেব, আমাদের বাড়ি জোড়াবলদ আসবে তো?"

"তারপর— তারপর?" প্রশ্ন করল হারু।

"আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের যুবক সংঘ আছে? আমি সোজা দেখিয়ে দিলাম ঘনার বাড়ির দিকে। বললাম, ওটা আমাদের সেক্রেটারির বাড়ি।"

ঘনা বলল, "ও, তুই তবে পাঠিয়েছিলি ফকিরা, নয়? বুঝলাম। আমি ভাবলাম এ লোকটা আমার নাম জানল কি করে? যুবক সংঘের সেক্রেটারি বলে সন্ধান পেল কোথায়?"

"দিল না কি রে? কিছু গরমাগরম হাতে পড়ল?"

"না, না, একশো টাকা দিতে চাইছিল। আমি নিলাম না, জিজ্ঞেস করল কত? আমি দশটা আঙ্গুল দেখালাম। আমাদের গাঁয়ে পাঁচশ ভোটার— জনপিছু দুটাকা করে দিক।"

"যাহ, বাগে পড়েছিল, ছেড়ে দিলি। আর মাছ জালে পড়বে না। আরে, যা দিচ্ছিল নিয়ে নিতিস। বাকিটা দিলে দিত না দিলে নেই। ভোটের সময় তো আছে। এত তাড়া কিসের? তখন যার যেখানে খুশি।"

দুঃখী বললে, "ছি ছি, এরকম সর্বনেশে বুদ্ধি তোমাদের দিল কে? ভোটের জন্যে নোট নেওয়া পাপ। তারপরে টাকা নিয়ে কথা দিয়ে ভোট না দেওয়া আরো বড় পাপ।"

এমন সময় হলধরবাবু কোথায় ছিলেন এসে হাজির সেখানে। দুঃখীর শেষ কথাটা কানে গেছে। বললেন, "আমার মতও তাই। ভাগু মহান্তি আমাদের নির্বাচন অফিস থেকে হাজার টাকা এনেছে — এক হাজার। আমায় দিতে চাইছিল আমি মানা করলাম। দেখব ভাগু মহান্তি কি করে ভোট পাইয়ে দেয়।"

হারু বলল, "তুমি কি বল হলধরবাবু, কংগ্রেসকে ভোট দেব না তাহলে?"

"ওহ্ এতবড় নামটা— হ - ল - ধ - র — আমি শুধু ধরবাবু বলব। তা হ্যাঁ হে ধরবাবু তুমি কি কঙ্গরেস ছেড়ে দিলে নাকি?" বালুঙ্গা জিজ্ঞেস করল।

"ভাগু মহান্তি তোমায় টপকে গেল দেখছি, দুঃখী বলল। "তোমাকে তাড়িয়ে দিল নাকি?"

"আমাকে কংগ্রেস থেকে তাড়াবে এমন ব্যাটা জন্মায়নি আজও। দরকার হলে তোমার মতো আমি ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে পারি। সোজা পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। সাত জন্মেও ভাগু নেহেরুর কাছ ঘেঁসতে পারবে না। আমায় তাড়াবে?"

"এত কথা কি দরকার? তুমি বল না, আমরা ভাগু মহান্তির কথায় কংগ্রেসকে ভোট দেব কি না?" হারুর সোজা প্রশ্ন।

হলধর ইতস্তত করল। যাই হোক আর একজন তাকে বাঁচিয়ে দিল— বোধহয় ভাগু মহান্তির তরফের লোক। বলল, "যাই বল, সত্তর বছরের বুড়োটা খাটছে বটে। দিনরাত প্রচারে লেগে আছে। কংগ্রেসকে ভোট দাও, কংগ্রেসকে ভোট দাও ছাড়া আর কথা নেই মুখে।"

"যাই হোক না কেন সেই কংগ্রেসকেই দিতে হবে হে। দিয়ে এসেছি, এবারও দেব"— একজন তার মত দিতেই আর একজন তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললে, "নতুন সরায় বেশি তেল টানবে, আমাদের সেই পুরোনো সরাই ভাল।"

এবার হলধরের মুখ খুলল। বললে, "ওহে, কংগ্রেসকে না দিয়ে আর কাকে দেবে শুনি? কুকুরের লেজে কংগ্রেসের টিকিট লাগিয়ে ছেড়ে দিলে সেও ভোট পেয়ে যায়। আমরা দেব না?"

হারু কিন্তু মানতে রাজি নয়। বললে, "সে সময় আর নেই হলধরবাবু। কুকুরের লেজে টিকিট লাগালে ভোট আর মিলবে না।"

হলধরের দলের একজন বলে উঠল, "আমরা কংগ্রেসকে দিচ্ছি, দেব। তবে ভাগু মহান্তি কত টাকা এনেছে আগে তার হিসেব দিক। তারপরে যা করবার করব সে কুকুরই হোক আর বেড়ালই হোক।"

"কি বললে? কুকুর? বেড়াল?" ভাগু মহান্তির চর একজন বলে উঠল— "জান সে কে? কংগ্রেস যেমন তেমন লোক বাছেনি। জান শুকুরাদা? সে একজন কলকেতিয়া। তার কারখানা আছে। শিল্পপতি। খুব পয়সাওলা।"

"নাম কি?"

"হৃদয়রঞ্জন রায়।"

"পয়সাওলা আমাদের কি করবে হে? আমাদের চালা ঘরে কোঠাবাড়ি তুলে দেবে?" হারু বললে— "আমাদের সুখদুঃখে যে এসে পাশে দাঁড়াবে, ডাকলে শুনবে, আমরা তাকেই ভোট দেব। না হলে কি ছোট ছোট ওজর আপত্তির জন্যে, ভালোমন্দ সব কথায় কলকাতা দৌড়োতে যাব?"

"কলকাতা যেতে হবে কেন?" ভাগু মহান্তির দলের একজন বললে। "সে তো আমাদের এখানকার লোক। কলকাতায় তার কাজ কারবার। তা বলে যে কলকাতায় গেল সে পরদেশী হয়ে যাবে?"

এবার দুঃখী বলল— "আরে, ভাগু মহান্তি কাকে ভোট দিতে বলছে তাই আগে বোঝ। রায় তো খণ্ডায়ৎ। বিপক্ষ প্রার্থী কায়স্থ। এটা খণ্ডায়ৎবহুল অঞ্চল বলে কংগ্রেস খণ্ডায়ৎ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। ভাগু মহান্তি খণ্ডায়তের জন্যে বলছে কি কায়স্থের জন্যে ভিতরে ভিতরে প্রচার চালাচ্ছে সেটা বুঝেছ?"

হলধর প্রতিবাদ করল— "এটা কখনো হতে পারে না। রায় খণ্ডায়ৎ বলে কংগ্রেস তাকে প্রার্থী করবে? কংগ্রেসের নীতি তা নয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী।"

"নীতিটা যদি কাজে লাগানো হয় তবে দেশের পক্ষে মঙ্গল।" দুঃখী আর তর্কের মধ্যে গেল না।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হলধর বললে, "আমি শুনেছি ভাগু মহান্তি দু পক্ষ থেকেই মেরেছে।"

ভাগু মহান্তির দলের একজন মুখপাত্র খেপে উঠল— "কি বললে? কি বললে? প্রমাণ দিতে পার?"

"প্রমাণ কি দেব? এ সব দেওয়া-নেওয়া কি দেখাদেখিতে হয়?" হলধর বললে। "তোমরা কি জান না? জয়রামবাবু টাকা দিয়ে যাবার পরে হরিরামবাবু কেন এসেছিলেন ভাগু মহান্তির বাড়ি?"

"হরিরামবাবু পি-এস-পি নেতা না জনসংঘ নেতা? ভালো নেতা হয়েছ যাহোক! তোমার রাজনীতির ক অক্ষর জানা নেই। হ্যাঁ হে, আচ্ছা বল তো দুখীননা, দুজনেই তো কংগ্রেসের নেতা। ভাগুবাবুর বাড়িতে কংগ্রেস নির্বাচন আপিস। তাহলে বল তো শুনি দুজনেই যদি সেখানে গিয়ে থাকে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?" মুখপাত্রটি বললে।

"থাক থাক, আর বেশি বল না। আমার রাজনীতি জানা নেই, তোমার বেশি জানা? কে না জানে, এটা ডুবে ডুবে জল খাওয়া।"

হারু বলল, "আর জানতে বাকি আছে নাকি? ওড়িশা কংগ্রেস এখন দু ফাঁক। একটার নেতা জয়রাম আর অন্যটার হরিরাম। ছোকরার দল জয়রামের। বুড়োর দল হরিরামের। এখন কংগ্রেস ছোকরাদের হাতে। বুড়োরা শুধু হাত রগড়াচ্ছে।"

"শুনলে তো? ঘরের কথা বাইরে চাপা দিলে কি হবে, কারো জানতে আর বাকি নেই।" হলধর বললে।

দুঃখী বললে, "আমি শুনলাম হরিরাম নাকি চান কংগ্রেস যাতে হারে। তবে গিয়ে কংগ্রেসের ওপরওলারা জানবে যে হরিরাম ছাড়া ওড়িশাকে আর কেউ সামলাতে পারবে না। তখন তাঁকে এসে আবার ধরে পড়বে। তাঁকে নেতা বলে মানবে। একথা কি সত্যি?"

"না, না, ও-সব মিছে কথা," হলধর লুকোতে চাইলেন কথাটা। "হরিরামবাবু নীরব আছেন। তবুও ডাকলে যান সভাসমিতিতে। তবে তেমন তৎপর নন একথা সত্যি। বুড়ো মানুষ।"

হারু বললে, "ও হো, এবার বুঝলাম। দুখীদা যা বললে সত্যি। নাহলে ভাগু মহান্তির বাড়িতে কি হরিরামবাবু আসেন? সূর্য কি পশ্চিমে উঠল? আমরা সব ভাবছিলাম।"

ভিকারি বলল, "আমি তো ভাগু মহান্তির বাড়িতে বসেছিলাম। কে একজন বড় নেতা এলেন। কংগ্রেস নেতা। ওই যে যার নাম তোমরা বললে। ওরা দুজনে চুপি চুপি কথাবার্তা করছিল। নেতা বললেন, এ লোকটা কে বসে আছে? ভাগু মহান্তি বললে, ও একটা গবেট। কিছু বুঝবে না। আমি সব শুনতে থাকি। সব বুঝতেও পারি। বলব? বললে কংগ্রেসীওলাদের মুখে চুনকালি লাগবে।"

হলধরবাবু রাগতভাবে বললেন, "ওহো, ভারি চুনকালি লাগানেওলা। যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা!"

একজন পি-এস-পি সমর্থক বললে, "আহা, ওকে বলতে দাও। আপনি এত ব্যস্ত কেন হচ্ছেন হলধরবাবু?"

একজন কম্যুনিস্ট বলে উঠলেন, "ব্যস্ত হবেন না? হওয়ারই কথা। গুমর ফাঁস হয়ে যাবে যে! যাক গে, ভিকারি তো সেখানে ছিল। সেই বলুক কি ব্যাপার।"

"তার আগে বল তোমরা কি শুনেছ?" ভিকারি বলল।

"আমরা শুনেছি তিনি ভোটের জন্যে টাকা দেননি। টাকা দিয়েছেন মোকদ্দমার জন্যে।"

দুঃখী জানতে চাইল, "কিসের মোকদ্দমা?"

"আরে, তুমি জান না দুখীদা? কংগ্রেস নেতাদের একটা বড় প্যাঁচ আছে। শুধু কি নোট দিয়ে ভোট কেনা একটাই অস্ত্র? নেতা এসেছিলেন, কংগ্রেস প্রার্থী রায় যদি জিতে যায় তার বিরুদ্ধে নির্বাচন মোকদ্দমা করার জন্যে এখন থেকেই সাক্ষীসাবুদ প্রমাণপত্তর জোগাড় করে রাখতে।"

পি-এস-পির লোক বললে, "তাতে যদি কিছু না হয়, যদি হেরে যায় মোকদ্দমাতে, আরো তাবড় তাবড় অস্ত্র আছে।"

"কি অস্ত্র?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"তুমি কি সব ভুলে গেলে নাকি দুখীদা? আমাদের পি-এস-পি নেতা ভোটে জিতে যখন কংগ্রেসের গুমর অ্যাসেমব্লিতে ভেঙে দিল, কংগ্রেসওলারা রেগে গিয়ে একটা মিথ্যে মেয়েছেলে ঘটিত ছেঁদো কেস করে দিল। একটা বেশ্যাকে শিখিয়ে হাকিমের কাছে হাজির করালে। ভাগ্যিস জেরায় সে বেশ্যা বলে ধরা পড়ে গেল। না হলে তো আমাদের নেতার হয়ে গেছিল আর কি! তবুও আমাদের নেতার দলের মধ্যে কম দুর্নাম হয়নি ওই মিথ্যে মোকদ্দমার জন্যে।"

"ব্যস, এইটুকু? তোমার শেষ হল তো?" ভিকারি জিজ্ঞেস করল।

"আবার কি? করলে ওই পর্যন্ত করবে।"

"আরো ঢের আছে। হেঁ হেঁ, এসব হবে যদি কংগ্রেসের লোক জেতে তবে। কংগ্রেসের লোক কি করে হারবে তার জোগাড়ও করে গেছেন। হেঁ হেঁ, আমার কি গরজ বলতে যাব?"

বেকংগ্রেসী লোক যত ছিল সকলে বলে উঠল, "আরে বল না, বল, শোনা যাক।" হারু বলল, "হ্যাঁ, বল বল আমাদের সব জানা উচিত।"

"ছাপা কাগজ দিয়ে গেছে। ভাগু মহান্তির লোক নিয়ে গিয়ে সব বিলি করবে।"

"কিসের কাগজ রে, ভিকা?" হারু জিজ্ঞেস করল।

"কেন, কিছুই জানিস না? চোখ বুজে দুধ খাস? এই নে, পড়।" বলে ছুঁড়ে দিল একখানা ছাপা প্রচারপত্র। হারু পড়তে যাচ্ছিল। পি-এস-পির লোকটি তার থেকে টেনে নিয়ে পড়তে গেল। কম্যুনিস্টওলা বললে, "চেঁচিয়ে পড়। সবাই শুনবে। একা নিজে পড়লে চলবে কেন?"

এবার হারু পি-এস-পিওলার কাছ থেকে টান মেরে কাগজটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল— "এই যে শোন সবাই—

প্রার্থী মনোনয়ন একাঙ্কিকা

স্থান — কলিকাতা, ম্যাজেস্টি হোটেল। সময় — রাত দশটা

(জয়রাম নায়ক ড্রইং রুমে বসে আসেন। পাশে হুইস্কির বোতল। হৃদয়রঞ্জন রায়ের প্রবেশ।)

জয়রাম — কে?

হৃদয়রঞ্জন — আজ্ঞে, আমি হৃদয়রঞ্জন।

জয়রাম — হৃদয়রঞ্জন! কে হৃদয়রঞ্জন?

হৃদয় — সার, আমি হৃদয়রঞ্জন রায়।

জয়রাম — ও, বুঝেছি। তোমার জন্যে তো বহু নেতা, বহু মন্ত্রী আমায় বলেছেন।

হৃদয় — আমি তো আর কারো কাছে যাইনি সার। আমি আর কাউকে চিনি না সার। আমি শুধু আপনাকে জানি।

জয়রাম — অ্যাঁ, আমাকে ছাড়া আর কাউকে চেন না? এমন করে কি মিথ্যে বলে? মূর্খ! বল, আমি আর কাউকে দিনেরবেলা চিনি না, রাতে চিনি। ঝুটা আদমি, তুমকো মালুম নেহি, তুম কিসকে সামনে বাত্ করতে হো। ইডিয়ট।

হৃদয় — ইয়েস সার, ইয়েস সার।

জয়রাম — তুম্ মনীন্দ্র কো নেহি জানতা?

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — আমার জন্যে ভাল মাল জোগাড় করেছ?

হৃদয় — আজ্ঞে!

জয়রাম — আরে, জোগাড় করেছিস কিনা বল। আজ্ঞে আজ্ঞে করচে এখানে।

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — ভেরি গুড। তুমকো টিকেট মিলেগা।

হৃদয় — অ্যাজ ইউ প্লিজ সার।

জয়রাম — (মদের বোতল তুলে) চলে?

হৃদয় — নো সার।

জয়রাম — (পা ঠুকে) ননসেন্স। বল ইয়েস সার।

হৃদয় — ইয়েস সার! ইয়েস সার।

জয়রাম — সিট্ ডাউন। হ্যাব্ এ পেগ্।

(হৃদয়রঞ্জন বসলেন। ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন।)

বুঝলে হৃদয়বাবু, এই দোস্তিটা পারমানেন্ট হোক। বট্‌ল ফ্রেন্ড। বাকি সব ঝুটা। সংসারে আর কেউ আপনার নয়। সব আপনা বাস্তে। কেবল বোতলবন্ধু ছাড়া। ইস্‌সে জ্যাদা য়ার নেহি, ঔর কিসিসে প্যার নেহি।

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — আচ্ছা হৃদয়রঞ্জন। আমার মনে হয় তুমি একটা বোকা।

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — তুমি কলকাতায় ওড়িয়াদের নেতৃত্ব না নিয়ে ওড়িশায় যেতে মন করেছ কেন?

হৃদয় — আজ্ঞে, আমি আমার জন্মভূমির সেবা করতে চাই।

জয়রাম — ফুল। আরে জন্মভূমির কি চোখ কান হাত পা আছে যে তার সেবা করবে? বাড়িতে আগে মা, তারপরে ভাই। দেশ সেবাতে আগে ভাই তারপরে মা, বুঝলে?

হৃদয় — আজ্ঞে সেখানে মা ভাই উভয়ের সেবা হবে, এখানে শুধু ভাইয়ের।

জয়রাম — হা-হা-হা, বোনেরা কোথায় যাবে? আমরা এখানে এলে বোনেদের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। সেখানে পাওয়া যাবে?

হৃদয় — যাবে সার। আরো ভালোভাবে তাদের সেবা করতে পারা যাবে। আমায় শুধু দয়া করে একটা মন্ত্রী....

জয়রাম — (রেগে গিয়ে) ফুল।

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — কলকাতার কুকুর গাধাও মন্ত্রী হবে মনে করেছ? তুমি যদি মন্ত্রী হবে, আমরা কোথায় যাব? গঙ্গায়? বামন হয়ে চাঁদ?

(প্রাইভেট সেক্রেটারির প্রবেশ)

প্রা. সে. — আজ্ঞে, মিস্টার রায় আজ আমাদের লিঙ্গরাজ ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্ট করছেন।

জয়রাম — হোয়াট? কন্ট্রাক্ট? হোয়াট কন্ট্রাক্ট?

প্রা. সে. — দশহাজার টিন সব এক দফায় কিনে নেবেন।

জয়রাম — হোয়াট টিন?

প্রা. সে. — আজ্ঞে জনসন নিকলসন পেইন্টের নকলি টিন।

জয়রাম — ও ইয়েস ইয়েস। সেই নকলি মালের দশহাজার টিন তো?

প্রা. সে. — ইয়েস সার।

জয়রাম — সব টিন তুমি নিয়ে নেবে হৃদয়রঞ্জন?

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — ইয়েস সার ইয়েস সার করছ। পুলিশে যদি ধরে কি করবে? বোনাই বলে ডেকে খালাস হতে পারবে?

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — তোমার তো খুব বুকের পাটা দেখচি।

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — তাহলে তুমিই 'ইয়েস সার' মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য।

হৃদয় — ইয়েস সার।

জয়রাম — যাও হৃদয়রঞ্জন, আমার হৃদয় রঞ্জন কর। দেশের সেবা পরে হবে। আগে তোমার বোনদের সেবা হোক। সেক্রেটারি, হৃদয়বাবুকে ফাইভ হান্ড্রেড। না বেশি?

হৃদয় — একটু নিরেস হবে সার।

জয়রাম — থাউজ্যান্ড। যাও।

পড়া শেষ হল। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কেউ বুঝল কেউ বুঝল না, সকলে গুম মেরে বসে রইল।

দুঃখী বললে, "কি বুঝলে বালুঙ্গাদা?"

খালি একটা 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল বালুঙ্গা।

একজন একজন করে উঠতে আরম্ভ করল।

হলধরবাবু ভাবতে থাকেন— এই হৃদয়রঞ্জন কংগ্রেস প্রার্থী! কি লজ্জার কথা। মুখ দেখানো যায় না। অথচ তাঁর মতো একজন পড়াশোনা করা লোক যে এতদিন লোকসেবা করল, লোকের সম্পর্কে এসেছে, সবরকম সমাজ সংস্কার জনমঙ্গল কাজে, সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগ করে এসেছে, সে টিকিট পেতে পারল না। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। এদের সঙ্গে বসতেও ঘৃণা হয়।

তবু বিশ্বাস হয় না। এসব বিরোধী লোকদের অপপ্রচার। এর ওপর মোকদ্দমা হওয়া উচিত। কারণ ওড়িশা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আর বুড়ো-হাবড়াদের হাতে নেই। যুবশক্তির অভ্যুদয় হয়েছে। বুড়োরা সইতে পারছে না। অপপ্রচার চালিয়েছে। ওড়িশার নেতা, ওড়িশা কংগ্রেসের সভাপতি জয়রাম মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহেরুর উপযুক্ত দায়াদ। তিনি এ দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করে গ্রামাঞ্চলকে শহরে পরিণত করে দেবেন। লক্ষপতি তিনি। ছোট মন তাঁর নয়। এক কথা। হলধরকে কথা দিয়েছেন প্রথমে ব্লকের চেয়ারম্যান, তারপর এম-এল-এ, তারপরে মন্ত্রী। নেতা বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞতা হাসিল না করে হঠাৎ যারা শাসনের গদিতে বসে তারা আমলাদের কবলে পড়ে যায়। আমলারা ওঠ-বস করায়। তার চাইতে সিঁড়ির পর সিঁড়িতে ওঠা বরং ভাল।

বালুঙ্গা ভাবছিল— পুরোনো গিয়ে নতুন আসছে। পুরোনোতে বাসি গন্ধ কিন্তু নতুনটায় এমন ভেজাল! হরেক মালে ভেজাল। তবুও লোকে তাকেই আগ্রহে ব্যবহার করছে। খারাপটাকে ভাল, নকলকে আসল বলে বিশ্বাস করছে। তেলে তৈরি বনস্পতিতে ঘিয়ের নামে জগন্নাথের আরতি হচ্ছে। ওদিকে বাজারে সব ভেজাল। বাজে তেলে রং আর গন্ধ দিয়ে আমরা সরষের তেল বলে চালাই। ঘিয়ের আলু চটকে মিশিয়ে, সাপ ও গরুর চর্বি মিশিয়ে আমরা যজ্ঞ করি। আহুতি দিই। তার সঙ্গে মানুষগুলোও ভেজাল হয়ে গেল। যে যেমন দেখায় সে কিন্তু তেমন নয়। তার বাইরে একটা রূপ ভেতরে আর একটা।

যে যতটা নিজেকে ঢাকতে পারবে, বহুরূপী হতে পারবে, সমাজে তার তত বেশি কাটতি। তারাই আমাদের দেশের নেতা, মন্ত্রী। আমরা সবাই চোর। চোরের সর্দার চোর না হয়ে ভাল কোত্থেকে হবে? তারপরে? দেশের কি অবস্থা হবে? কত বড় বিপদ এই মানুষের মাথার ওপরে? মানুষ চোখ বুজে দিনরাত নিজেকে বোঝাচ্ছে— আমার কিছু হয়নি, কিছু হবে না। এত বেহায়া এই মানুষ। সে আবার এত বদলায়! বালুঙ্গার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। একটা মিথ্যে কথা বলেছিল বলে তার বাপ তাকে যত ইচ্ছে মার মেরে ছিল তো বটেই, তার ওপর দুদিন উপোস রেখে দিল। বলেছিল— তোর হাতে পিতৃপুরুষ জল পাবে তো? আর একদিন গালে পান পুরে বসেছিল বালুঙ্গা। চোখ পড়ে গেল বাপের। দৌড়ে এসে এমন একটা থাবড়া দিল যে এ গালের পান সে গাল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আজ কিন্তু মিথ্যেটা বাহ্যে পেচ্ছাবের মতো সহজ সরল অভ্যাসে পড়ে গেছে লোকেদের। পান বিড়ি বাদে মদ গাঁজার নেশাও চালু হয়ে গেছে। এটা কেমন করে হল? সেই চন্দ্র সূর্য তো আসা-যাওয়া করছে আজও। খরা-বর্ষা, শীত-গ্রীষ্ম ফি বছর আসে যায় ঠিক আগের মতো। কিছু এদিক ওদিক হয়নি। মানুষ বদলাল কেন? কেমন করে?

দুঃখী দাস ভাবে— পুরোনো গিয়ে নতুন আসছে। তবু চাকা ঘোরে না। এক মাঘে শীত চলে যাচ্ছে। নতুন মূল্যবোধ জন্ম নিতে আরো দেরি আছে। এই মাঝের সময়টাতে মানুষ পথহারা, দিশেহারা। একটা মহাশূন্যের মধ্যে ভারতীয় সমাজ গতি করছে। এই শূন্য, এই অভাব, এই ভাবশূন্যতার মাঝে এসে ঢুকছে আবর্জনা; এটা স্বাভাবিক। মন শূন্য থাকলে মন্দটাই আগে ঢোকার পথ পায়। দোষ কাউকে দেওয়া যায় না। দোষ এই নতুনের। নতুনটা নিজেই শূন্য। অথচ সেটাই মানুষের মনের শূন্যতার ভিতরে আসন জমিয়ে বসেছে। মানুষ ভাবছে সে পরিপূর্ণ। ভিতরের শূন্যতা সম্বন্ধে সে মোটেই অবহিত নয়। তাই যাবতীয় ভ্রষ্টাচার, দুরাচার, অত্যাচারকে সে স্বাভাবিক আচার বলে মেনে নিচ্ছে। এর শেষ কোথায়? এর পরিণাম কি? মানুষ যে পশু হয়ে যাচ্ছে। বিবর্তনের বিপরীত গতি! তারপর....? দুঃখী নিশ্বাস ফেলে।

শুকুরা ভাবছিল। ভাবছিল না, মনে পড়ছিল তার কলকাতার হৃদয়রঞ্জনকে — তিনি হবেন এই গাঁয়ের প্রতিনিধি। জননেতা। সে চেনে ওই হৃদয়রঞ্জনকে। খালাস হয়ে যে-কটা বছর কলকাতায় ছিল, অনেক ওড়িয়ার মুখে এই নামটা শুনেছে। স্বাধীনতার পরে তারা খালাস পেল, যারা আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিল সকলে। তারা সকলে আত্মসমর্পণ করার পর ব্রিটিশ সরকার তাদের বন্দী করে রেখেছিল। বিচার হল। শাস্তি পেল। স্বাধীনতার পর স্বাধীন সরকারের আমলে তারা ছাড়া পেল। ছাড়া পাওয়া মাত্র সোজা টিকিট কাটল হাওড়া-কলকাতা। কংগ্রেসের চারদিকে জয় জয়কার। কলকাতায় একদল মুসলমান মাথা তুলল। মুসলিম লীগ। জিন্না লিয়াকৎ-এর নাম শোনা যেত। কলকাতায় সুরাবর্দী। হিন্দু-মুসলমান গণ্ডগোল। যখন অবস্থা ঠাণ্ডা হয়ে এল, তখন কি দেখবে ওড়িয়া নেতাদের বাহাদুরি। কলকাতাটা হয়ে গেল তাদের চরাভুঁই। ওড়িশার রাজনীতির কলকাঠি নাড়ার ক্ষেত্র কলকাতা।

এই কলকাতা থেকে একদিন দাশমশায়* নাকি রোগাক্রান্ত দেহে ওড়িশায় ফিরেছিলেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে। তিনি চলে গেলেন অকালে। ওড়িয়া জাতি অনাথ হয়ে গেল। যাকে বলে মুরুব্বিহীন। কেউ কাউকে আর মানল না। সকলের পোয়া বারো। দাশমশায়ের নিজের হাতে গড়া ওড়িয়া সমাজ দু-ফাঁক হয়ে গেল। একটা ওড়িয়া সমাজ তো আর একটা উৎকল সমাজ। সব ভাগ ভাগ। কে নেতা হবে? লাগল কোঁদল। দেশ স্বাধীন হল। সকলে মিলেমিশে ওড়িয়াদের জন্যে কাজ করার কথা। সেটা হল না। নিজের নিজের ভিতর গণ্ডগোল, মারপিট। এ নেতার একটা দল তো সে নেতার আর একটা। কটক, পুরী, বালেশ্বর, গঞ্জাম-এর রাজনীতির খেলা এই কলকাতায়। সেখানকার ভোটের আসল কারবার এখানে, এই কলকাতায়। কলকাতা মাতলে ওড়িশার গাঁ মাতে। ওড়িয়াদের জন্যে দশ-বিশ রকমের চাঁদা খয়রাত সব দেয় কলকাতার ওড়িয়ারা, কোন গাঁয়ে ইস্কুল হবে দাও চাঁদা। ডাক্তারখানা হবে আনো চাঁদা। নতুন কাগজ বেরোবে, দিয়ে ফেল আগাম বার্ষিক মূল্য। কোথাও বস্তি পুড়ে গেল আগুন লেগে, কোথাও বন্যায় ভেসে গেল, চাঁদা না দেওয়ার জো নেই। যুবক সংঘ, লাইব্রেরি, দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা— গাঁয়ে হবে। সেখানে না গেলেও চাঁদা দিতে

---

* পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশ

হবে। সবার ওপর নির্বাচনী চাঁদা। সবকিছুর চাপ পড়ে এই কলকাতার প্রবাসী ওড়িয়ার ওপরে।

এটা তো চলেছিল, চলছে। স্বাধীনতার পরে শুকুরা এসে একটা কথা দেখল— বাঙালি আর 'বেটা উড়ে' বলে গালাগাল দেয় না অত বেশি। তবে হাতে না মেরে ভাতে মারাটা চলেছে বেশ জোরসোর। ওড়িয়াদের আর চাকরি মেলে না আগের মতো। চাকরিতে থাকা লোকেদের বরখাস্ত করে দেওয়া হচ্ছে। ওজর-আপত্তি শুনছে কে? নেতারা আসেন, ওড়িয়াদের সভায় লম্বা লম্বা ভাষণ দিয়ে চলে যান। মন্ত্রীরা এলে বাঙালি মন্ত্রীদের সঙ্গে ভোজ খেয়ে খোস মেজাজে ফিরে যান। ওড়িয়াদের দুঃখ কেউ বোঝেন না। যা-কিছু শুধু মুখের কথা— বড় বড় কথা।

ওড়িয়া প্রীতি আমাদের কলকেতিয়া সকলের এত বেশি যে বলার নয়। বিদেশে থাকলে সেরকম হয় বোধহয়। দেশে থাকাকালে তো কই এত ওড়িয়া ওড়িয়া করে না কলকাতার ওড়িয়ারা। কলকাতায় একজন যেমন তেমন ছোটখাট ওড়িয়া নেতাকে পেলেই বুক ফুলে ওঠে তাদের। খালি ফুলের মালার পরে মালা। কলকাতায় পঁচিশ-তিরিশটা মতো ওড়িয়া প্রতিষ্ঠান আছে, সকলের আলাদা মালা হওয়া চাই। বেচারা নেতা দেশের চিন্তার ভারে অত কাবু হয় না ফুলের মালার বোঝায় যতটা হয়। কি দেখবে নেতাদের গুণপনা। আমাদের যত ওড়িয়া প্রেম বয়ে যাক না কেন, এই নেতারা বাঙালিদের সভায় বেসামাল হয়ে দৌড়োয় আর সেখানে বেশ জমিয়ে বাংলায় বক্তৃতা দেয়। তালির ওপর তালি পড়ে। নেতা ভাবেন, বাহ্ আমার বক্তৃতা নিশ্চয় বেড়ে হয়েছে, সকলে শুনে ভারি খুশ। নাহলে এত তালি পড়ে! নেতার মগজে এটুকু ঢোকে না যে তাঁর ওড়িশী বাংলা শুনে হাসছিল বাঙালিরা। কোনো বাঙালি নেতা বা বাঙালি মন্ত্রী তো একদিনও ওড়িয়া সভাতে ওড়িয়া ভাষায় বলেন না। কিন্তু আমাদের ওড়িয়া নেতাদের গর্ব কহতব্য নয়— ওড়িয়াদের নেমন্তন্নে ওড়িয়াদের খরচে এসে, তাদেরই খেয়েদেয়ে বাঙালিদের সামনে নিজের বড়াই আর পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যায়।

কোথায় গেল, কোথায় গেল আমাদের নেতারা? তারের ওপর তার, টেলিফোন— কলকাতা থেকে কটক, কটক থেকে কলকাতা। কিন্তু কেউ কি শুনতে পেল? কই, কারুরই দেখা নেই! লোকগুলো মশা মাছির মতো মরে গেল। রক্তনদী বয়ে গেল মেটেবুরুজে— শুনেছে শুকুরা। সব শুনেছে শুকুরা — এই সব ওড়িয়া নেতাদের কাণ্ড। সে সময়ে কেউ এল না, কাছেই ঘেঁসল না।

মাটিয়াবুরুজ। সেদিন মাটিয়াবুরুজের ওপরে কৃষ্ণ চতুর্থীর চাঁদ উঠে থাকবে, মানুষের জীবনের সকল দুঃখে সাক্ষী থাকতে। লালচে মুখে চেয়ে দেখে থাকবে। খালি মড়ার পর মড়া। যে-কোনো হিন্দু নয় কেবল ওড়িয়া হিন্দু। কলকাতার মাটি। কেবল হিন্দুর রক্ত পান করে সে মাটির তেষ্টা মেটেনি। শত শত ওড়িয়া হিন্দুর রক্ত খেতে পেয়ে চোঁ চোঁ করে পান করছিল।

আহা! বেচারী লাবণী! খালাস হওয়ার পর এসে শুনল শুকুরা। কাঁচা বয়স পরশুর। লাবণীর বড় ছেলে। বাপ তো গিয়েছিল আগেই। সেও চলে গেল। কাবার করে দিল মুসলমান

গুণ্ডারা। লাবণীরও কি রক্ষা ছিল! সে উর্ধ্বশ্বাসে ঢুকে গেল পড়শী মুসলমানের বাড়ির মধ্যে। সঙ্গে ছোট ছেলেটা। নেহাত বাচ্চা। চোখে পড়ে গেল এক গুণ্ডার। সে বাড়িওয়ালিকে গিয়ে বলল— হিন্দু ঔরৎকো তুমনে ছুপায়া? নিকালো। ওই বাড়িওয়ালি একা ছিল, ওর স্বামী বাড়িতে ছিল না। কি করবে? বলে ফেলল— খোদা কসম, ওহ্ রিস্তেদার হৈ। ছেড়ে দিল গুণ্ডাটা। হাতে ছুরি। হঠাৎ সামনে এসে পড়ল লাবণীর বাচ্চা ছেলেটা। সে কি জানে কি ব্যাপার চলছে? ধরে ফেলল তাকে। ইয়ে শালা হিন্দু হৈ। ইসকা জান লেকে ছোড়ুঙ্গা। তবে ওই মুসলমান স্ত্রীলোকটির কম সাহস নয়। ধরে ফেলল সে গুণ্ডার হাত। তু মেরে লড়কে কো খুন করোগে? তুম কাফের হো, মুসলমান নহি। হাত থেকে খসে পড়ল ছুরিটা। 'সুন্নৎ' হুয়া হৈ? উত্তর দিল — নহি। তো মৈঁ উসকো সুন্নৎ করুঙ্গা। অগর ওহ্ হিন্দু রহা হোগা তো আজ মুসলমান বন্ যায়গা। বলে সেই গুণ্ডা তাকে সুন্নৎ করে দিল সত্যি সত্যি।

সব ঠাণ্ডা হল। দৌড়ে এল বীর ওড়িয়া নেতার দল। মড়া দেখলে যেমন শকুনের পাল। সেখানে যত না রক্ত গড়িয়েছিল তার অনেক বেশি লোতক বয়ে গেল নেতাদের। সরকারের টাকা দেখে লালাও ঝরছিল জিভ থেকে। ওড়িয়াদের জীবনের মূল্য একশো, পাঁচশো। মাটিয়াবুরুজে যে ওড়িয়ারা কাটা পড়ল তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল একশো থেকে পাঁচশো টাকা। এককালীন। এতগুলো টাকা কি করবে উদ্বাস্তান? যারা মরেছে, মরেছে। সরকার টাকা দিলে আর কি মরা মানুষ ফিরে আসবে? দিয়ে ফেল, দিয়ে ফেল সে টাকা থেকে অর্ধেক করে। দেশ সেবাতে লাগবে।

দিল সকলে। যত বিধবা, আঁটকুড়ি সবাই। তাই দিয়ে হল শ্রাদ্ধ। দেশসেবার বাড়া পুণ্য নেই। সে টাকায় উৎকল ভবন হবে। কলিকাতায় ওড়িয়াদের কীর্তি থাকবে। ওড়িয়াদের রক্তে গড়া হবে 'উৎকল ভবন'। হাজার হাজার টাকা জমা করা হল নেতাদের কাছে। কেউ বলল চল্লিশ হাজার, কেউ বলল পঞ্চাশ হাজার। নেতা বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু চেলা-নেতাও। সেই চেলা-নেতাদের মধ্যে এক যুবক কলকাতাবাসী ওড়িয়া শিল্পপতি। কি এক কারখানা বসাবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন তখন। তিনি হলেন এই হৃদিবাবু বা হৃদয়রঞ্জন।

জিজ্ঞেস করল শুকুরা—"দেখতে কেমন বল তো তোমাদের এই হৃদয়রঞ্জনবাবু?"

কেউ একজন উত্তর দিল, "কালো বেঁটে মতো। ঠিক বেঁটে নয়। মাথায় একটু খাটো। গোলগাল মানুষটি। পুচকো গাল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই তিনিই হিরদিবাবু। কলকাতায় থাকেন, আমি চিনি।" বললে শুকুরা।

"তুমি দেখেছ?" আরেকজন জিজ্ঞেস করল।

"দেখেছি মনে হচ্ছে। অন্তত শুনেছি ঢের। তিনি একবার না জানি কেমন করে প্রবাসী ওড়িয়া সম্মিলনী করবেন বলে মেটেবুরুজে চাঁদা তুলতে এসেছিলেন। লোকেরা কি বললে শুনবে? পয়সা তো দিল। পয়সার সঙ্গে গালাগালও দিল। বললে, "আচ্ছা, এসেছ তো নিয়ে যাও। তবে কলকাতার ওড়িয়াদের পয়সা মনে রেখ। ওর বড় গুণ। এই পয়সা যদি হজম করতে পার তবে তুমি ওড়িশার একটা বড় নেতা বনে যাবে। তা তাদের কথামতো হয়ে তো গেল। দেখে রাখ, ইনি ভোটে জিতলে মন্ত্রী হবেন।"

হলধরবাবু বললেন, "এগুলো সব ডাহা মিথ্যে। দাও ওই ছাপা কাগজ, ইলেকসান কেস হবে?"

ভাগু মহান্তির দলের একজন বলে উঠল— "কেস কেন হবে? আমরা কি হেরে গেছি যে কেস করব? যে হারে সে না কেস করে! আমাদের বিপক্ষে যত মিথ্যে প্রচার হলেও আমরা জিতব। আমরা একরকম জিতে গিয়েছি বল। লোকেরা বুঝে ফেলেছে যে কংগ্রেস ছাড়া আর সব দল নতুন ডাইনি। গু খায়— ছেলে খাওয়া শিখল কোথায়?"

পি-এস-পির একজন বললে, "রুটি সেঁকবে তো পিঠ বদলাতে হবে। রীতিমতো দুধারে না সেঁকলে কি রুটি ফোলে? তেমনি দল বদলে না দিলে ভাল শাসন হবে না, বুঝলে? লোকেরা বুঝে গেছে। দেখ ফল কি হয়।"

হলধরবাবু বললেন— "দল আর কই যে ওড়িশাতে লোকে দল বদলাবে? একটিমাত্র দল তো কংগ্রেস। আর সব ফালতু।"

পি-এস-পিওলা বললে— "ফালতু বললেই হল? তোমার মুখের কথায়?"

হলধর জবাব দিল— "সাত জন্মে মন্ত্রীমণ্ডল গড়তে পারবে? একশো চল্লিশ সভ্য থেকে কখনো একাত্তর জনকে আনতে পেরেছ? কেমন করে আশা কর ক্ষমতায় আসবে?

আর একজন বলল— "কেন, স্বতন্ত্র দল কি নেই? তারা তো একাত্তরের বেশি দিচ্ছে।"

"সেটা তো রাজা-রাজড়ার দল"— হলধর বললে।

একজন নিরপেক্ষ লোক চুপচাপ বসেছিল, বাড়ি যাবার জন্যে উঠতে উঠতে বললে, "হ্যাঁ গো, সেটা রাজা-রাজড়ার দল আর কংগ্রেস খালি আমাদের চাষীমজুরদের দল হয়ে বসে আছে। চালুনি বলছে ছুঁচকে! গুণে এস তো। কতগুলো রাজা কংগ্রেসের ভিতরে? যাক গে, আমাদের তাতে কি?" বলে চলে গেল বাড়ি।

পি-এস-পির লোক টিপ্পনী করল—"সে রাজাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার কংগ্রেস মিলিত সরকার গড়েছিল তো?"

"আমরা ওর সপক্ষে ছিলাম না। তোমাদের বুড়ো বুড়ো কংগ্রেস নেতারা ওইরকম করেছিল। আমরা ভেঙে দিলাম মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল।" হলধর বললে।

"আর বোলো না, বোলো না সে-কথা। বাহাদুরি দেখিও না অত। তোমাদের ছোকরা নেতারা বুড়োদের মাতিয়ে মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গড়েছিল। গড়ে আবার ভেঙে দিল। থলে ভর্তি হল না বলে ভাঙলে।"

হলধর হাসতে হাসতে লজ্জা ঢাকতে বলে ফেলল, "সেটা রাজনীতিতে হয়ে থাকে। সে একটা চাল। রাজনৈতিক কৌশল। সামন্তবাদকে লোপ করতে সামন্তবাদী শিবিরে প্রবেশ। বুঝলে? তোমরা তো একটা পরম সুবিধাবাদী পার্টি — পি-এস-পি। তোমরা ওর মর্ম কি বুঝবে?"

"ও হো, কংগ্রেস তাহলে কম্যুনিস্টদের গুরু করল, নয়? তোমাদের শিবিরে কে ঢুকেছে আগে দেখ। অপরের চোখে আঙুল দেবে পরে।"

"ভুল, ভুল কথা। আমাদের শিবিরে অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকতে পারবে না। সব সমাজবাদী শক্তি একজোট হয়ে সামন্তবাদকে লোপ করে দেব আমরা।"

বালুঙ্গা এবার মুখ খুলল—"ওহে ধরবাবু। আর কতদিন সামন্তবাদ সামন্তবাদ করতে থাকবে? কতদিন আর ওই জুজুর ভয় দেখিয়ে ভোলাবে? দেখ গিয়ে— গাঁয়ে তো আছ, একটু ভেতরে ঢোক। দূরে যেতে হবে না। আমাদের কর্তা ছিলেন কিশোর পটনায়েক। এই তো তোমার আসার একটু আগে সে কথা হচ্ছিল। এখন তাঁর কি অবস্থা? যুগ আর জমিদার কর্তাদের নেই। যুগটা হল আমলাদের। ওপরে কত বড় আমলা আছে— নিসপেকটর, কলেকটর, ডিরেকটর, আরো আরো কত 'টর'। আমাদের এখানেও বি-ডি-ও, এস-ডি-ও। কে নয়? এরাই তো রাজা। তার সঙ্গে আমাদের মন্ত্রী। মন্ত্রীরা হল ইন্দ্র। কত ইন্দ্র চলে গেছে, আরো যাবে। শচী বসে আছেন। শাসনের সুতো ধরে রেখে।"

দুঃখী হেসে ফেলে বলল, "সেই জন্যে সরকারি হেড অফিস সেক্রেটেরিয়েটের নাম হয়েছে বোধ হয় সচিবালয়।

"কে জানে হবে হয়ত। আমি কি জানি? আমার চোখে শুধু দেখা যায় এই আমলাগুলো। আর মন্ত্রী। বাদ বাকি কীচকের বাহুবলে বিরাটরাজা'র মতো যাদের টাকার জোরে মন্ত্রী হয় সেই কলের মালিক ধনপতি কুবেররা দুনিয়াতে এরা ছাড়া আর কেউ আছে বলে ত মনে হয় না।"

হলধরবাবু হাসেন মূর্খ বালুঙ্গার কথায়। বলেন, "বালুঙ্গাদা, তোমার পুরাণের কথা শুনতে খুব ভাল লাগে। তুমি কিন্তু এ রাজনীতি-টিতিতে মাথা গলিও না। তুমি তো কখনো এর মধ্যে ঢোকনি। মিছে কেন অনধিকার চর্চা কর?"

বালুঙ্গা বললে,— "ধরবাবু, পুরাণ শুনবে? এখানে এরকা বন সৃষ্টি হয়ে গেছে। কেমন জান? 'শাম্বকে নারীবেশ করি, উদরে লৌহ পাত্র ভরি।'.... গুরু-গৌরব ভুলতে বসেছ। কিন্তু ব্রহ্ম অভিশাপ লেগে যাবে। যদুবংশ ধ্বংস হবে।"

"আর একা উদ্ধব থাকবে— এই বালুঙ্গা। চল হে, এ বাজে কথায় কি পেট ভরবে?" হলধরবাবুর দলের একজন মুরুব্বি গোছের লোক এই বলে উঠে পড়ল। সে চলে যেতে বাকি সকলেও উঠে পড়ল।

'দুখীদা নমস্কার, দুখীদাঠাকুর দণ্ডবৎ, দুখীঠাকুর পেন্নাম'-কে কতপ্রকার ভাষায় দুঃখীর কাছ থেকে বিদায় নিল। দুঃখী হাত তুলে সবাইকে প্রতিনমস্কার করল। মুখ কিন্তু খোলেনি। গুম মেরে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে উঠে সকলকে বিদায় দিল।

বাকি রইল দুঃখী আর বালুঙ্গা। আর সেদিকে একধারে বসে শুকুরা। বালুঙ্গা জিজ্ঞেস করল— "হাঁ গো দুখীঠাকুর, এর কি উপায় বলত?"

"কোন কথা বলছ? ভোটের কথা?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"চুলোঁয় যাক ভোট। কে রাজা হবে, কে মন্ত্রী হবে, কে সাধক হবে কি কোতোয়াল হবে তাতে আমাদের কি যায় আসে? আমাদের খুন দেওয়ার কথা, দিই। তারা আমাদের খুন চুষে এঁটেলপোকার মতো হয়েছে। মন্ত্রী হবে ত হোক। তারা খাবে। অন্য লোক আছে। তারা

তাদের অত্যাচারের মোকাবিলা করবে। করলে করুক, না করলে না করুক। আমি সে কথা বলছি না। আমরা ত ছোট জীব। আদার ব্যাপার করে জাহাজের খবর নেব কিসের জন্যে? তবে রাজা আমরা করেছি ঠিক। মন্ত্রী ত আমরাই বানিয়েছি। গদিতে বসিয়েছি। তা হলেও তারা আমাদের আয়ত্তে নেই। পাঁচ বছরই হোক বা একশ বিশ বছর হোক।

"আমরা অপারগ বলে একজন সমর্থ মানুষকে এনে আমাদের মাথার ওপরে বসিয়েছি। এরাই ত রাজা, এরাই ত মন্ত্রী? না অন্য কেউ? স্বর্গ থেকে ত আর খসে পড়েনি! আমরা বলছি তুমি আমাদের শাসন কর। তারা করছে। আমরা যদি নিজে নিজেকে শাসন করতে পারতাম তবে রাজা তার থানে, আমরা আমাদের থানে। আমাদের রাজাতে কি কাজ? আমি সে কথা বলিনি, বলছিলাম সেই পুরুষোত্তম পটনায়েকের বাড়ির কথা। হাটেবাজারে বাজনা বাজিয়ে কি তার সমাধান হবে? এ ছেলে-ছোকরার দল বিছের মন্ত্র জানে না, সাপের গর্তে হাত ঢোকাতে চায়। শিব গড়তে বাঁদর হবে। আইবুড়ো মেয়েটার আর বিয়ে হবে না। বাছপড়া হয়ে যাবে। চল্লিশটা চাঁদের পরে আগেকালে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যেত। না হলে পাপ লাগে বলে একটা কথা ছিল। শাস্ত্রকারেরা মিছেই কি এসব বিধিবিধান তৈরি করেছিল? সে যা হোক, তোমাকে একটা প্রতিকার করতে হবে। যত লুকোলে কি হবে এটা যে কোমরে গোঁজা আগুন।"

"বালুঙ্গাদা, আমি অনেক ভেবেছি," দুঃখী বলল। "কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। এত বড় পটনায়েক বংশ, এখন খেতে পায় না। গাঁয়ের লোক সবাই জানে। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। সকলে শুধু নিন্দা করতে লেগেছে। পেট পোষ নাহি দোষ! উপায় কি? সরকার সব নিয়ে নিল। নিক। দেওয়ার দায়িত্বও ত নেওয়া উচিত। চোরের কাছ থেকে চোরাই ধন বের করে নিলে চুরি বন্ধ হয় না। চোরকে ধান্দা জুগিয়ে দিলে তবে না সে পেট পুষবে চুরি করবে না।"

"তা বলে চুরিটাকে কি ভাল বলবে?"

"না, চুরি করা পাপ সত্যি, তবে চোরকে নীতিবাক্য শোনালে কি সে চুরি করা ছেড়ে দেবে? পেটের জ্বালা সইতে না পেরে সে চুরি করে। লাউচোর, মুরগিচোর হতে হতে মহাচোর। অভ্যাস পড়ে যায়। এখন তুমি খেতে দিলেও সে অভ্যাস তাকে কাবু করে রাখবে। সে চুরি করবে। তুমি তাকে আটকাতে পারবে না। না হয় নাই পারলে। তুমি তাকে জেলে পুরে দাও। তারপরে? আর কেউ যেন চোর না হয় তার ব্যবস্থা কর।"

হঠাৎ ওপরে তাকিয়ে চোখ মট মট করে দুঃখী বলল এগুলো। এক মনে চেয়ে থাকে ওই আকাশের দেওয়ালের দিকে। সেখানে ঘন অন্ধকার। আবার বলে ওঠে—"ওই যে দেখ, দেখ বালুঙ্গাদা, তাকিয়ে দেখ, জ্বলজ্বল করছে দেখতে পাচ্ছ না? একটা বিরাট বিকট রূপ। চোখের পলকে মায়ামৃগ হয়ে নাচল। সোনার হরিণ। রাক্ষস একটা। মারীচের মতো। এ গাঁ সে গাঁ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে সে যাচ্ছে সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। বালুঙ্গ দা, আর কিছু থাকবে না। কি করব? আমরা নেহাতই অক্ষম, নেহাত অপারগ। ডাকলে কেউ শুনছে না। মানা করলে মানছে না। সবাই দৌড়াচ্ছে তাকে ধরার জন্যে। তার জালে

পড়ে সকলে ছটফট করছে। মরবার জন্যে। আঃ কি উপায়, উপায় কি বালুঙ্গাদা?"

বালুঙ্গা ততক্ষণে দুঃখীর কাছে সরে এসে বসেছে। "তুমি এমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন দুখী ঠাকুর?" বালুঙ্গা বললে। "পাগল হলে নাকি? এ-ই, দুখীঠাকুর" বলে ডাক দিল তার হুঁশ ফেরাতে।

"আমি পাগল হইনি বালুঙ্গাদা। জ্বলজ্বল করে দেখা যাচ্ছে। রামচন্দ্র ভুলে গেলেন ওই মায়ামৃগ দেখে। সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল রাবণ। আহা রে, নিয়ে গে....ল! কোন জটায়ু তাকে রুখবে?"

"দুখীঠাকুর! দুখীঠাকুর! তুমি কি আবোল-তাবোল বকছ? ঠাণ্ডা হও শোন।"

দুঃখীর মুখ বন্ধ হল। চোখ কিন্তু বাগ মানে না। ঝর ঝর করে বয়ে গেল জল। চোখে জলের ধারা। বললে, "বালুঙ্গাদা, আমি ছেলেবেলা থেকে ঘরছাড়া। মা-হারা। শেষে সবাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আমার চোখে কখনো জল দেখেছ? এখন বুক ফেটে যাচ্ছে। কি হয়ে গেল? গাঁ-টা কি এমনি উচ্ছন্নে যাবে?"

দুঃখী বলল, এবার স্বাভাবিক স্বরে। বুঝতে পারল সে ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছে। একটু লজ্জাও বোধ করল।

"তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না দুখীঠাকুর। আমি কোন কথা বলছি আর তুমি কি বকে চলেছ?"

শুকুরা বলে ওঠে—"দুখীদা তোমারই কথা বলছে বালুঙ্গাদা। রোগের বীজ। তুমি রোগ বললে। সে নিদান দিল। সব মাথা গিয়ে ঘাড়ে বাঁধা। কলকাতা! দুখীদা কলকাতার কথা বলছে।"

বালুঙ্গা বলে—"কলকাতা কিরে? আমি কি কলকাতার কথা বলছিলাম? তুই-ও এক পাগল জুটেছিস।"

"তুমি তবে অন্য কি কথা বলছিলে?"

"তুই আজকাল কোনো কথা শুনিস না শুকুরা, নাকি মন গিয়ে পড়েছে অন্য কোনোখানে? আমি কিশোর পটনায়েকের নাতনীর কথা বলছিলাম, আমাদের কি করা উচিত। আজ পটনায়েকের ঘরে ঢুকল, কাল আমার বাড়িতে সেঁধোবে। এর প্রতিকার কি? আমরা মুখ্খু লোক। সরল মানুষ। তুমি বড় লোক, হাকিম, ডিপটি আর কাউকে পেলে না, আমাদেরই ধরলে? গরিবের বউ সকলে শালী? এর প্রতিকার কি? উপায় কি? আমরা কি চোখ বন্ধ করে বসে থাকব?— আমি বলছি এই। আর তুই বলছিস— কলকাতা, কলকাতা! তোকে কলকাতা জুজুর ভয় ধরিয়েছে দেখছি।"

দুঃখী বললে, "শুকুরা যা বলছে ঠিক। একটা পটনায়েক বাড়ির বউ বা মেয়ে কিম্বা একটা বি.ডি.ও.-কে বাগে আনলে কি সব শুধরে যাবে?"

শুকুরা উৎসাহিত হয়ে বলে, "শুনবে দুখীদা? কি বলব! নিজের চোখে দেখা কথা। পেরতয় যাবে না। এই শহরগুলোতে এক একটা দালাল থাকে। ছেলেধরা নয়, মেয়েধরা

দালাল। সোমত্ত মেয়ে এক একটা মফস্বল পাড়াগাঁ থেকে ফুসলে ফাসলে ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করে কলকাতায়— সোনাগাছি বা হাড়কাটা গলিতে, চোখের দিব্যি। আমাদের এই কটকে মসজিদ গলি, তেলেঙ্গা বাজার—সে কার জন্যে? ওই শহরের বাবুভায়াদের জন্যে। শহরে বাবু নয় কে? যে কোটিপতি তিনতলা দশতলায় থাকে সে যেমন বাবু তো যে কুলি মজদুর শহরতলির গলিতে নোংরা বস্তিতে থাকে সেও বাবু। সেও একটু আতর লাগিয়ে তার মাফিক খুঁজে নিচ্ছে আমাদেরই মেয়ে-বউ যাদের সব দালাল নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে হাড়কাটায়, সোনাগাছিতে।"

বালুঙ্গা বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি রে শুকুরা। একথা সত্যি?"

"শুধু কি এই?" শুকুরা আরো উৎসাহে বলে চলে,"আমারই চোখের সামনে এল যুদ্ধ। এসে ঢুকল ওই শহরে আর এক রকমের বাবুর দল। বাবু নয়— সাহেব। ইংরেজ মার্কিন সৈন্য। পয়সা খালি আকাশে উড়ল। পাটনাপাড়ার সেই ছেলেটা— নাম মনে পড়ছে না— পানের দোকান দিয়ে বসেছিল রাস্তার ধারে কলকাতায়। এক মার্কিন সৈন্য চাইল এক খিলি পান। কত দিল জান? ফেলে দিল একখানা দশটাকার নোট। সে ছোকরা খুচরো খুঁজছে বাকি ফেরত দিতে। যে নেবে সে কোথায়? অনেক টাকা এদের জন্যে আছে। এই ফালতু পয়সা কি করল জান? বিনা অর্জনের পয়সা, পয়সা না বালুঙ্গাদা, অসুর— অসুর। মারীচ নয়, দশশির রাবণ। শুধু কি সীতা হরণ করল? দুঃশাসনের মতো কুরুসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করে ছেড়ে দিল। কলকাতা শহরের ইজ্জত রইল এই পয়সাওলা লোকদের হাতের মুঠোয়। হাড়কাটা, সোনাগাছিতে কেবল গোরা পল্টনের ভিড়— ইয়াঙ্কি টমির দল, মানে মার্কিন আর ইংরেজ সৈন্য। তখন তো ইংরেজ সরকার। বেশ্যারা গোরা সৈন্যদের খারাপ করে দেবে বলে সোনাগাছি হাড়কাটা থেকে তুলে দিল বেশ্যাদের আড্ডা। তারপরে— তারপরে যা হল আর কি বলব?"

"গোরা পল্টনের ভাল ছিল, তাদের খারাপ করল এ দেশের বেশ্যা? হা-হা-হা।" হাসল বালুঙ্গা।

"হ্যাঁ গো, বেশ্যাপাড়া সব খালি হয়ে গেল। হলেও তাদের বৃত্তি কি লোপ করে দেবে সরকার? সেটাই বলছি।"

"সেটা তো মনের বৃত্তি।" বললে দুঃখী।

"মনের মূলে এ জগৎ, মনেরে কে বা সমরথ।" পদ উদ্ধার করল বালুঙ্গা।

"মন নয় দুখীদা, ধন, ধন! শুনবে? আমি এখান থেকে গিয়ে কলকাতায় যে বামুনদাদার কাছে ছিলাম সে দু-তিনটে বাবুর বাড়িতে কাজ করত। রান্নার কাজ। তারই মুখে শোনা। আমি চোখে দেখিনি। মিথ্যে কেন বলব। বলছিল। একটা বাবুর বাড়িতে দু-দুটো দিদিমণি। ইস্কুল কলেজে পড়ে। বড় বড় ছেলেও দু-তিনটে। কেউ সরকারি কেউ বা কোম্পানির আপিসে কাজ করে। বুড়ো-বুড়ি দুজনেই অথর্ব। তেমন সচ্ছল সংসার নয়। ছেলে দুটো কেরানী। এক ছেলে কলেজে। বুড়োর পেনসান দিয়ে কত সামলাবে? আমাদের বামুনদা রাঁধে। ঠিকা। রান্না করে চলে আসে। খায় না কোনোখানে। শেষে তারা ঠাকুরকে জবাব

দিয়ে দিল। আর মাইনে দিতে পারবে না। হঠাৎ একদিন খবর এল ঠাকুরের কাছে। বাড়িতে নাকি ফিষ্টি, যেতে হবে।"

"ছেলেরা কেউ বিয়ে করেনি?" বালুঙ্গা জিজ্ঞেস করল।

"হাঁ, হাঁ, বলতে ভুলে গেছি। বড় ছেলে কেবল বিয়ে করেছিল। তার ছোটটার বয়েস তিরিশ-বত্রিশ। মেয়ে দুটো ছোট। একটা কলেজে, অন্যটি ইস্কুলে। বড়টির বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। ছোটটির ষোল-সতের। ফিষ্টির জিনিসপত্তর দেখে বামুনদা অবাক। কি ব্যাপার! আঁধার ঘরে চাঁদের আলো। সব সাহেবী খানা তৈরি করল ঠাকুর। সেইরকম বরাত। তারপরে খেতে এল দুটো সাহেব। খাওয়াদাওয়া হল। জল খেল না, জলের বদলে বিয়ার মানে মদ। তারপরে বোন দুটোকে নিয়ে হাওয়া।"

"কোথায়?" বালুঙ্গা জানতে চায়।

"কোথায় আর যাবে? পার্কে, সিনেমায়। তার পর থেকে বুড়োর বাড়িতে আর অন্ধকার রাত রইল না। বামুনদাকে বললে দশ বাড়ি না গিয়ে সেখানেই থেকে যেতে। তিন জায়গা থেকে যা পেত একাই তারা ততটা দেবে। বামুনদা রাজি হল না।"

"তারপরে?" বালুঙ্গার কৌতূহল ফুরোয় না।

"তারপরে আর কি হবে? যুদ্ধ শেষ হল। ইয়াঙ্কি টমি সব যার যার দেশে ফিরে গেল। তখন ঘোড়ার গাড়ি এক একদিন আসে। দিদিমণিরা বেরিয়ে যায় হাওয়া খেতে। একবার এক সাহেব তো সেই বউটাকেও নিয়ে পালাল। বামুনদা বলছিল। শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-দেওর সবার চোখের সামনে। টাকার কি কেরামতি বাব্বা। কাকে কি বলবে বল?"

"শহরেরও এই অবস্থা?" বালুঙ্গা বললে।

"হবে না? আমাদের বউ-ঝিদের টেনে নিয়ে গিয়ে যে শহরের লোকেরা ভোগ করছে তাদের বউ-ঝিদের ইজ্জত কতটুকু?"

"শুকুরা যা বলছে সেটা একটু ভেবে দেখ বালুঙ্গাদা" দুঃখী বলল। "এই দেখলে তো, সারা গাঁয়ের যত মাতব্বর সব তেড়ে এসেছিল। কিনা কি সব মন্ত্রণা করবে, সমাধান করবে। কিশোর পটনায়েকের নাতনীর বি.ডি.ও.-র সঙ্গে ঢলাঢলি। কিন্তু হলটা কি?"

"হাতী ফুস করে দিল।" হাসল বালুঙ্গা।

"সে কথা উবে গেল কোথায়। খোলের তাল পড়ল ভোটের ওপরে। ভোটও ভুটভাট হয়ে কাবার। কোনো কথায় গুরুত্ব নেই— কেমন করে বেঁচে থাকব সেটাই আসল। কেন বাঁচব সে-কথা কেউ ভাবে না। মানুষ কি শুধু নিজের জন্যে বাঁচে বালুঙ্গাদা? তোমরা সবাই যদি বল দুখী মরেছে— এই শরীরটা মানুষ নয়, মড়া— আমি বেঁচে থাকলেই বা কি, না বাঁচলেই বা কি? বাঁচা-মরা সমান। সেই জন্যেই তো আমরা গাঁ বসিয়ে ঘর বেঁধে থাকি। সকালে উঠে মুখ দেখাদেখি; অসুখবিসুখ, ভালোমন্দ, লাভক্ষতিতে সকলে সকলের গায়ে লাগোয়া। এখন আর সে কথা আছে? গাঁ ভেঙে শতখান। গুঁড়ো হয়ে গেছে মানুষ। কাঁচের বাসনের মতো। জুড়ে দেওয়া যায় না। শুকুরার ঘর নেই সকলে দেখছে। সবাই কাঁদছে। কিন্তু কারো চোখে জল নেই।"

দুঃখীর কথায় সায় না দিয়ে বলল বালুঙ্গা—"তা না হয় হল কিন্তু এই গাঁ ভাঙল কেন? ভাঙল কে? তোমাদের গান্ধী— গান্ধী; গান্ধী মহাত্মা। তোমাদের গান্ধী গোল না করত ত গাঁও ভাঙত না।"

"ছি, বালুঙ্গাদা, কার নামে কি বলছ? মহাত্মাজীই না এই গাঁগুলোকে এক করতে এত কাজ করলেন? শেষে প্রাণও দিলেন আমাদের জন্যে। তিনি জানতেন শহর গাঁয়ের ওপর আক্রমণ করবে, আক্রমণ করেছে। গাঁ ছারখার হয়ে যাবে। শহরের কাছে শরণ নেবে। শহরের গোলাম হবে। তার জন্যে তিনি আগে থেকেই সাবধান করেছিলেন। গাঁ যাতে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, স্বাবলম্বী হয়, শহরের ওপরে নির্ভর না করে সেজন্যে কত উপায় বাতলেছিলেন। আমরা করলাম কি? কুটে খেলাম না কেটে পরলাম? গ্রামোদ্যোগ গ্রাম-সংগঠন আর রইল?" দুঃখী বোঝায়।

"মানছি, গান্ধী সব করেছেন। আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছেন। তবু আজ যে অধর্ম বেড়েছে সেটা কার জন্যে? 'মহতে যাহা আচরিবে, ইতরে তাহাই করিবে' বলেছে না ভাগবতে? তুমি বল ত দুখীঠাকুর, আমরা তোমায় মহাত্মা বলে মানলাম। পুজো করলাম। তুমি যদি জাতপাত ছোঁয়া-আছোঁয়া সব তুলে দিলে, বাছবিচার কিছু রাখলে না, ধর্ম আর থাকে? লোকেরা কুপথে যাবে না? বল না?"

"বালুঙ্গাদা, তুমিও সেই কথা বললে? ছোঁয়াছুঁয়ি জাত-অজাতের ভেদটা কি ধর্ম? ধর্ম কি এই সবেতে থাকে? ঘরের মধ্যে নোংরা আবর্জনা ভর্তি। ঘরের ভিতরে ঢুকেছে বলে আমরা কি তাকে ঘর বলে ভাবব? মহাত্মাজী সে কথাই বলতেন। বড় ধর্মাত্মাপুরুষ তিনি। খুব ভগবৎ-বিশ্বাসী। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন। রামনাম কীর্তন করতেন। যাবার বেলায় 'রাম রাম' বলে প্রাণ বেরোল। এত পুঁথি পুরাণ ঘেঁটে তুমি এক এক সময় এমন সেকেলে কথা বল না, আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।" হাসল দুঃখী।

"সেই কথা ত রামবাবুও বলছে। তুমি আর বেশি কি বললে? হাঁ, বলবে না কেন? তুমি আর কোথা থেকে এসেছ যে? সেই ইংজিরি পড়া থেকে ত গজিয়েছ দুজনেই। আলদা হবে কি করে? আমি যা বলছি কথাটা একটু মাথায় ঢোকাও, পরে খেয়াল কোরো বালুঙ্গা একথা বলেছিল বটে। আমার চুল পেকে গেল, কাল পুরল বলে। আমার কথা গেরো দিয়ে রাখ। জাত-অজাত ছোঁয়াছুঁয়ির জন্যে গাঁ ছারখার হয়নি। রোগের বীজ কোথায়, বৈদ্য চিকিচ্ছে কি করছে? আগে রোগটাকে চেন। তারপর ব্যবস্থা দিও। জাত-অজাত পুরুষের ট্যাঁকে। বাড়লে কায়স্থ, কমলে চাষা। শহরে কি জাতপাত আছে? যে হোটেলে খায় সে কি জাতপাত বারণ করে? ছুৎ-অচ্ছুৎ জিজ্ঞেস করে কি হোটেলওলা খেতে দেয়? তা বলে শহরটা কি এক? সেখানে কেউ কারো দিকে তাকিয়ে দেখে? পাশের বাড়িতে কে থাকে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতে পারে না। আসলে ধন। ধন থাকলে জাত, ধন না থাকলে অজাত। গাঁ-টা গরিব। তারই জন্যে জাত-অজাত, ছোঁয়া-আছোঁয়া। ভাগ্য নিয়ে ধনী-গরিব। আর গরব গরিমা নিয়ে জাত-অজাত। আগে মন থেকে ধনের গরব ছাড়। তারপরে ছোঁয়া-আছোঁয়ার কথা বোলো। সেই জন্যে ভেদ। সেই জন্যেই তোমার-আমার।"

বালুঙ্গার একটা ছোট্ট ভাষণ। দুঃখী শুনছিল মন দিয়ে, তার কৌতূহল হচ্ছিল। ব্যাপারটা আরো খোলসা করার জন্যে জিজ্ঞেস করল— "বালুঙ্গাদা, তুমি কি বলতে চাও এই ছোঁয়াছুঁয়িটা থাকা উচিত? গাঁয়েতে সবর্ণ-হরিজন বিবাদে তুমি যে হরিজনদের পক্ষ নাও?"

"আমি তাদের পক্ষ নিই বলে কি আমি ছোঁয়াছুঁয়ি মানি না প্রমাণ হয়ে গেল? জগতে কেউ ছুৎ নয়, কেউ অচ্ছুৎ নয়। আবার সকলে ছুৎ, সকলে অচ্ছুৎ। ছোঁয়া কিম্বা আছোঁয়া বলে যে-কথা সেটা কি তুমি পুঁথি থেকে মুছে দেবে?"

"তবে কোন বিচারে তুমি অস্পৃশ্যদের পক্ষ নাও?"

"অস্পৃশ্যদের পক্ষ নয়— ন্যায়ের পক্ষ। ধর্মের পক্ষ। ন্যায় অস্পৃশ্যদের পক্ষে। তাই আমি তাদের দিকে। ন্যায় ধর্ম কি ছোঁয়াছুঁয়ির বারণ করে? ছোঁয়ারা যেমন অন্যায় করে, আছোঁয়ারাও তেমনি অন্যায় করে। যখন যে পক্ষে ন্যায় থাকে আমি তাদের তরফে চলে যাই। যখন হরিজনরা সবর্ণদের ওপরে অত্যাচার করে তখন ত আমি সবর্ণদের পক্ষে। অন্যায় করলে বালুঙ্গা তার বাপেরও নয় এটা জেনো।"

"মানুষকে মানুষ না ছোঁয়াটা কি ন্যায়?"

বালুঙ্গা একটু চাঙ্গা হয়ে বসল। জলন্ত সলতে উসকে দিলে যেমন হয় তেমনিভাবে বলল, "তবে কি ছোঁয়াটা ন্যায়? কেন মানুষ মানুষকে ছোঁবে? তার কি দরকার? ছোঁয়াছুঁয়ির বারণ তুলে দেবে বলে কি খালি পেছনে তাড়া করে করে ছুঁতে থাকবে? যাকে পার তাকে? আমি চান টান করে পুজোয় বসেছি। তুমি বারো জায়গায় গু কাদায় শ্মশানে মশানে ঘুরে এসে আমায় ছুঁয়ে দেবে? কেউ মড়া কেটে এল, মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে এল, সেও এসে আমায় ছোঁবে? কেন, কিসের জন্যে? আমি তোমার কি অপরাধ করেছি? আমার বাড়িতে আমি। তোমার বাড়িতে তুমি। আমি পুজো-আহ্নিকে বসেছি। তুমি এসে বলবে আমি তোমায় ছোঁব— মানা করলে জেল! এটা কি ন্যায়? আমার বউ-ছেলেরা আমায় ছোঁয় না, তুমি গান্ধীর ধম্মপুত্তুর হরিজন হয়েছ বলে আমার পুজো অশুদ্ধ করবে? কোন অধিকারে? তোমার ধারি না খাই হে? কি? না আইন হয়েছে। এই তোমার আইন, এই তোমার শাসন?"

"সে ছোঁয়াছুঁয়ির কথা আমি বলিনি বালুঙ্গাদা—"

দুঃখীর কথা শেষ হবার আগে বালুঙ্গা চাপা দিয়ে বলল—"আর কোন ছোঁয়া-আছোঁয়ার কথা বলছ হে? তোমাদের শহরে পড়া মেয়েরা কি মানছে আর ওগুলো? তাদের কি আর শৌচ-অশৌচ জ্ঞান আছে? অলপ্পেয়ে হবে, অলপ্পেয়ে হয়ে যাবে মানুষ!"

দুঃখী হাসল, "আজকাল সরকারি হিসাবে জানা গেছে মানুষের হারাহারি আয়ু আগের চেয়ে ঢের বেড়ে গেছে।"

"কত বাড়ল? কলিতে পরমায়ু একশ বিশ বছর। জ্যোতিষীরা হয় বিংশোত্তরী নয় অষ্টোত্তরী হিসেব করে। কই, কে কোথায় একশ আট কি একশ কুড়ি বছর বাঁচছে?"

"আমি কি ওই ছোঁয়া-আছোঁয়াদের কথা বলছি? আমাদের দেশে যারা সমাজের সেবা করে তাদের ছুঁলে আমাদের পাপ হয়। এটা কি ন্যায়? ধর্ম?"

"সমাজের সেবা কে না করছে? 'চাষী লক্ষ পোষী'। কোটি কোটি মানুষের মুখে আমরা

খাদ্য যোগাই। আমাদের কেউ অচ্ছুৎ করুক ত দেখি। যে অত্যাচার করছে, পাপ করছে, তাকে অচ্ছুৎ কর। তোমার বইতে কি সে কথা আছে? যার পয়সা আছে সে মদ খাক, বেশ্যাবাড়ি যাক, মিথ্যে বলুক, চুরি চামারি করুক, সে তবু ছোঁয়া। সে বাবু, সে সায়েব। বাবুসাহেবরা যে জাতেরই হোক তাদের কাছে কি আছোঁয়া ঘেঁষতে পারে? আছোঁয়া লাগে এই ধুলোমাথাদের গায়ে। তাদের ছুঁলে পাপ। তাদের ছায়ার গন্ধ বাবুভায়াদের সহ্য হয় না। কেননা লোকগুলো গরিব। তাদের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। সাবান দিয়ে তারা পাপগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করেনি। ভাগো, হঠো! হেঁ, তোমরা আবার ছোঁয়াছুঁয়ি তুলে দেবে! তোমাদের শিরাপ্রশিরায় হাড় মাসে আছোঁয়ায় ভর্তি। শুধু বাইরে দেখাও— আমরা ছোঁয়াছুঁয়ি তুলে দেব, অস্পৃশ্যতা দূর করব। কোন কালে করতে পেরেছ?"

"বালুঙ্গাদা," দুঃখী বাধা দিয়ে বলল, "তোমার ভাগবতে না লেখা আছে— 'সকল ঘটে নারায়ণ, বসেন অনাদি কারণ'। নারায়ণ কি অস্পৃশ্য?"

"খুব ভাল কথা একটা বলেছ। সেখানেই আছে বিচার। ভগবান ত সবখানেই আছেন। আমরা মন্দিরে কেন চানটান করে যাই? ভগবান ত যাচ্ছেন ভগবানকে দেখতে। আরো, চাঙা মন নিয়ে পচা ডোবায় ডুব দিতে না গিয়ে গঙ্গাস্নানে যাই কেন? সকল ঘটে নারায়ণ আছেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে? খালি কথায় বলি। সে কি সহজ কথা? দেহ মন সব পবিত্র হলে গিয়ে সব ঘটে নারায়ণ দেখবে। তখন আর ছোঁয়া-আছোঁয়া পবিত্র-অপবিত্র কিছু থাকে না গো বাপু। যত আচার-বিচার সব তারই জন্যে। তাকেই সব ঘটে দেখার জন্যে। দেখতে পেয়ে গেলে কাজ শেষ। আরতি পুরো। ন্যায় হোক অন্যায় হোক, আমাদের সমাজে অচ্ছুৎ বলে যাদের বলছ তাদের ছুঁলে যদি নারায়ণ মেলেন, তবে আমাদের গাঁয়ে কেন দশখানা গাঁয়ে যতদূর আমার সাধ্য হবে যেতে, গিয়ে সব আছোঁয়াদের পায়ের গোড়ায় একশবার মাথা ঠেকাব। আরে বাবা, গান্ধী মহাত্মা বলে গেছেন বলে কি সব আছোঁয়া জাতের লোকেরা হরিজন হয়ে যাবে? 'বালুঙ্গা' 'বালুঙ্গা' বলতে থাকলেই আসল ধান যেটা সে ত বালুঙ্গা (বুনো ধান) বনে যাবে না। দুখী - দুখী ডাকলেই কি তোমার মতো সুখী লোক দুঃখ পেয়ে যাবে? ছোঁয়া কে, আছোঁয়া কে শাস্তর কি বলে শুনবে?—

'হরি বিমুখ প্রাণী যত
সে থাকে পশুর সহিত।'

— কুকুর শেয়ালের সঙ্গে সমান। তাদেরই ছুঁতে নেই। আর যে হরি-ভজন করে তাকে কি ছোঁয়া-আছোঁয়া দোষ লাগে? কথায় বলে— 'বারো জাতি তেরো গোলা, বৈষ্ণব হলে সব ভালা', আর জাত থাকে কোথায়? হরিভজন করলে ভগবান ত তার পেছনে ধাওয়া করবেন। তার পায়ের ধুলো পেতে তার পথ চেয়ে বসে থাকবেন। বলেছেন সে— শ্রীমুখের বাণী—

মোর ভকত মোর মিত্র। সে করে জগত পবিত্র॥
তার চরণ-রেণু আশে। আবরি রহি তার পাশে॥

দাসিয়া বাউরী কি বাউরী? সালবেগ কি মুসলমান? বল? ছোট কুলে জন্ম হলেও যে হরিভক্ত সে ছোঁয়া। আর বড় জাতকুলীন ঘরে জন্ম নিলেও হরিবিমুখ জন যারা তারা পশু,

আছোঁয়া অমানুষ। আমাদের কি সে বিচার আছে? সে চোখ আছে? যার টাকা আছে সে বরং চোর ডাকাত লম্পট ঘুষখোর হোক, ঠক জালিয়াত ধাপ্পাবাজ কালোবাজারী হোক। সে বাবুসাহেবদের আমরা সবসময় আসুন বসুন বলে কোটি সম্মান দিই। আর যার ধন নেই সে যতই হরিভজন হরিভক্তি করুক না কেন, তাকে দূর দূর মার মার। নোংরা হাভাতেদের মার, ঠ্যাঙাও, তাড়িয়ে দাও এমনি ব্যাভার। দাদা, হরিভক্তি না হলে কি উঁচু-নিচু ছোঁয়া-আছোঁয়া ভেদ মানুষের মন থেকে সহজে যাবে? সমদর্শী হতে হলে হরিভজন কর। হরিভজন করলে মানুষ সমদর্শী হয়। 'সমদর্শী সেবা নর। সে পদে কোটি নমো কর।।"— বলে বালুঙ্গা হাত তুলে নমস্কার করল।

দুঃখী তাকিয়ে থাকে হাঁ করে। যেন গিলে ফেলছে বালুঙ্গার কথাগুলো। কথা নয়, ভাষণ নয়, প্রবচন। সিদ্ধান্ত। লোকটা মূর্খ। এই বালুঙ্গা। 'একটা বালুঙ্গা' অর্থাৎ বুনো ধান বলে গাঁয়ে অনেকে বলে। বুড়ো ছোকরা কেউ বাদ নয়। লেখাপড়া করেনি বালুঙ্গা, পাঠশালায় বসিয়েছিল তার বাপ। ভাগবত পড়তে শিখল যেদিন, তার বাপ সেইদিন গোটা গাঁ ডেকে খাইয়েছিল। মোচ্ছব করেছিল। বললে, আমার ছেলের পড়া সাঙ্গ হল। পণ্ডিতরা বলল, কথাটা ঠিক, ভুল নয়। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। সেইদিন থেকে রোজ সন্ধ্যাবেলা বুড়ো বাপের সামনে বালুঙ্গা ভাগবত পড়ে। এখনো পড়ে। বাপ কোনকালে গেছে। অভ্যাসে পড়ে গেছে বালুঙ্গার। চান শেষ করে এক অধ্যায় আর সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ-দশ যা পারে, যেমন বাপের সামনে আগে পড়ত ঠিক তেমনি, তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে বাপ যে ঘরে শুত সেইখানে বসে পড়ে। দণ্ডবৎ করে বসে, দণ্ডবৎ করে ওঠে ভাগবতকে দণ্ডবৎ করে কি তার বাপকে সেই জানে।

বালুঙ্গা এই গাঁয়ে থাকে। থেকে না থাকার মতো। বাড়িতে থাকে বটে। তবে যেন বাড়ির কেউ নয়। কালী গাইয়ের ভিন গোঠের মতো তার চিরদিন এমনি না-শোনা না-দেখা কথা। লোকে বলে গোঁয়ার্তুমি। বাপ মরার পর খুড়ো বলল— সব সম্পত্তি আমার। তোর বাপ আমার কাছে দেনা করেছিল। সে বাবদ আমি এ সম্পত্তি নেব। তোকে থাকার জন্যে বাড়ির দুটি কুঠরি ছেড়ে দিচ্ছি। ব্যস ওইটুকু। ওজর আপত্তি কিছু নেই— কেন দেনা করেছিল, কত দেনা নিয়েছিল, কোন চিরকুট বা হাতনোট কিছু আছে কি না কিছুই প্রশ্ন না করে উঠে এল সেদিন। ভাগ্যিস বিয়ে থা কিছু হয়নি তখনো। এসে ঘর বানালো গাঁয়ের সে মাথায়। পিছনে আর তাকায়নি। এমনি একরোখা মানুষ এই বালুঙ্গা। এমনিতে কারো কাছে যায় না কিন্তু আপদে-বিপদে আপনি গিয়ে হাজির হয়। না ডাকলে নিজে থেকে সেঁধোয় না কোথাও। কেবল এই দুঃখী দাস ছাড়া। দুঃখী তার কথা শোনে। সেইজন্যে। আর সবাই তাকে ভয় করে। বকর বকর করে বলে। কার এত সময় আছে ধৈর্য ধরে শুনবে? সকলের চোখে সে যেমন মূর্খ, তার কাছে তেমনি সকলে— সে যে কেউ হোক না কেন— অমানুষ।

খুব রাত হয়ে গিয়েছিল। তারাগুলো ঝিঙে ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। দিককুমারী পুজো শেষ করে আকাশবেদীর ওপরে ঠিক যেন ছুঁড়ে দিয়েছিল মুঠো মুঠো ঝিঙেফুলগুলো। আঁধার রাত।

অন্ধকারের ভিতরে হারিকেনটিকে জ্বেলে নিয়ে চলে গেল বালুঙ্গা। আসার সময় নিবিয়ে রেখে দিয়েছিল। কোমরে গোঁজা দেশলাই। হাত পাততে হয় না আগুনের জন্যে কারো কাছে হারিকেন জ্বালাতে। সেই হারিকেনের হুড়কো তুলে ধরে শালপাতায় মোড়া ইয়া বড় এক পিকায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বললে, "শুনে রাখ শুকুরা, দুখীদা ত পণ্ডিত লোক — তাঁকে কি বলব? তুই শুনে রাখ। আমরা দুজনেই ত মুখ্খু। তুই বলবি আমি শুনব, আমি বলব তুই শুনবি, না কি বলিস রে?"

পা বাড়িয়ে বারান্দা থেকে নীচে নামতে নামতে বললে, "মনে রাখিস—

হরি বিনা হরিজন
মহত্ব বিনা মহাজন
কার্য বিনা ষণ্ডা
বিচার বিনা ডাণ্ডা
লজ্জা বিনা নারী
চুল বিনা টেরি
নীতি বিনা রাজা
ভীতি বিনা প্রজা! — সই গো বড় মন্দ এ!"

রান্না হয়ে গিয়েছিল দুঃখীর আশ্রমে। হ্যাঁ, আশ্রম বই কি। বাড়ি নয়, আশ্রম। শ্রম সেরে একটু বিশ্রামের জন্য আশ্রম। বাড়ির মায়া নেই মমতা নেই, একটা শুকনো খুঁটি সেই ঘর। সেই দুঃখী দাস। এক গোছা অভ্যাস। এক ঝুড়ি নিয়ম। অভ্যাসে গেরো পড়ে গেছে। সেটাকে কেউ খোলে না। দিনরাত নিয়মগুলো শুধু কুড়োতে থাকে। আবার ছড়িয়ে পড়ে। আবার ঝাঁট দিয়ে তুলে ঝুড়িতে ভরে। যেন আর কোনো কাজ নেই লোকটার।

প্রকাণ্ড একটা রাক্ষস। রাক্ষস না বেতাল, কত না জানি শক্তি। রাজা ডেকে বলেন, আমার কাছে খাট। রাক্ষস রাজি হল, একটা শর্তে। যদি কাজ দিতে না পারে তবে সবংশে গিলে খাবে রাজাকে। রাজা তাতে রাজি। তিনি কি জানতেন যে তাকে তিনি কাজ দিতে পারবেন না! সত্যি দেখলেন বলা মাত্র সে সব কাজ করে দিল। তারপর রাজাকে এসে বললে, 'রাজা, তোমায় আগে খাব। আমায় ত কাজ দিতে পারলে না।' রাজার কানে মন্ত্রী কি সব বলে দিলেন। তখন রাজা হুকুম দিলেন, 'কাজ আছে। যাও, কুকুরের লেজ সোজা কর।' বেতাল সোজা করতে লেগেই আছে।

তেমনি এই দুঃখী দাস। কুকুরের লাঙুল সোজা করছে। দুনিয়া থেকে দুর্নীতি চলে যাবে। মাছের গায়ে জল লাগবে না। গান্ধীমহাত্মার দ্বিতীয় অবতার। গান্ধী যা বলেছেন সব অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বাপ শ্রাদ্ধ দেওয়ার সময় একটা বেড়াল বসেছিল বলে এও এক বেড়াল বেঁধে রেখে শ্রাদ্ধ দেওয়ার লোক। ভাবতে ভাবতে যায় বালুঙ্গা। হলে কি হয়। একটা মানুষের মতো মানুষ বটে।

রান্না শেষ হয়ে গেছে কখন। ভাত ডাল সব ঠাণ্ডা হয়ে জল। দুঃখী শুকুরা খেতে বসল একসঙ্গে। রতনী পিঁড়ে পেতে দিয়েছিল। জল দু-গেলাস রেখে দিয়েছিল। .... রান্না করতে

চায়নি রতনী। সে কি কথা? রতনী রান্না করলে জাত চলে যেত নাকি দুঃখী দাসের। দুঃখী দুঃখ করেছিল। হেসেছিল রতনীর কথায়— বামুনের হেঁসেলে শূদ্র হয়ে ঢুকতে পারে নাকি রতনী।

আজ কি ব্রাহ্মণ আছে ভারতবর্ষে? দুঃখী ভাবছিল। কই, কোথায় ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ জজ আছেন, হাকিম আছেন, প্রফেসার ডাক্তার আই-এ-এস থেকে শুরু করে আমলা পিয়ন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ আছেন। মন্ত্রী, নেতা, কর্মীদের ভিতরে ব্রাহ্মণ, মুসলমান খ্রীষ্টানদের হোটেলে ব্রাহ্মণ। মুরগি ডিম মাংস কালিয়া কোর্মা সব করছে এই ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্মণ সবখানে। ঠাকুর দেবতাও পুজো করছেন কত না জানি আজও। এক পুরুষ বাদে হয়ত আর তাদের পাত্তা থাকবে না। তবে এখনো আছেন। এখনো কিছু পুরোহিত ব্রাহ্মণ হোম করার সময় ঘি কিছু বাঁচিয়ে মেরে দেওয়ার তালে থাকেন। আসলে কিন্তু ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না কোথাও একজন। চারিদিকে জলময়। জলময় পৃথিবী। পান করার জন্য একফোঁটা নেই। সবখানে ব্রাহ্মণ, তবু ব্রাহ্মণ একজনও নেই।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজরুচ্যতে
বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ। — কই, কোথায়?

ভারত তো কেবল দুশো বছর ধরে ইংরেজের অধীন হয়ে ছিল না। গ্রীক, পাঠান, মোগল কত না কত বিদেশী শক্তি ভারতের উপরে শত শত বছর আধিপত্য করে গেছে। কিন্তু এমন অবস্থা কখনো হয়নি। মুসলমানদের রাজত্বকালে চৈতন্য, নানক, কবীর, রামানুজ, মাধবাচার্য, বিষ্ণুস্বামী এমন কত শত মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পাদেও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, রামমোহনের মতো প্রকৃত ব্রাহ্মণ— তাঁরা যে জাতে যে কুলেই জন্ম নিয়ে থাকুন না কেন— দেখা দিয়েছিলেন এই দেশে এই মাটিতে। আজ স্বাধীনতার পরে একটা যুগ কাটল মাত্র। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণরা সব কোথায় উবে গেল কেউ মন্ত্র ফোঁকার মতো। গেল কোথায় তারা? গান্ধী গোপবন্ধুর মতো একটি ব্রাহ্মণও খুঁজে পাওয়া কষ্ট। পরের জন্য জীবন দিত যে ব্রাহ্মণ, যজমানের হিত করার জন্য সব ত্যাগ করতে পারত যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তেমন কি আর আছে দেশে? স্বপ্ন! স্বপ্ন হয়ে গেছে সব। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হলেও ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রেরও বাড়া। না করে সন্ধ্যা, না করে গায়ত্রী। চাকরি করেই যে শুধু শূদ্রের চেয়ে হীন হল তাই নয়, ডিম মাংস খাওয়ার মদ খাওয়ার ধুম এখন শিক্ষিত ধনী ব্রাহ্মণ-সন্তানদের মাঝে। দুঃখীরও তেমনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম। জন্ম হয়েছে বলে কি সে ব্রাহ্মণ? গায়ে পৈতেও নেই। কেন তাকে রতনী ব্রাহ্মণ ভাবে? 'এবার তুই রোজ রাঁধবি'— শুনিয়ে দিয়েছিল দুঃখী।

শুকুরা মহা খুশি। রতনীর রান্না সে কতদিন খায়নি। রতনীর রান্না ভারি স্বাদের। সে রান্নার কায়দা জানে। ভাল হয়েছে বলে দিলে আর রতনী কোথায় থাকে! সবটুকু তরকারি এনে ঢেলে দেয়। সেই রতনী কি বদলে গেছে? হয়ত গেছে। তখন কাঁচা বয়েস রতনীর। সব গোলগাল। এখন তো কানের গোড়ায় পাকা চুলের গোছা গালের দিকে নুয়ে এসেছে।

সরু সরু পাতলা। সেই পুরু কালো কুচকুচে খোঁপা বাঁধা চুল কই? মুখখানা ফোলা ফোলা— ঘুম ভেঙে ওঠার মতো। ঢলঢলে। বয়েসটা যেন আলগা হয়ে পড়েছে। বেজার লাগলে মনটা যেমন অবশ হয়ে পড়ে, বয়েস গড়িয়ে গেলে দেহটাও তেমনি কিরকম একটা দেখায়— অশক্ত নির্বল হয়ে যাওয়ার মতো।

রতনীও ভাবছিল হয়তো শুকুরার দিকে তাকিয়ে। শুকুরা বুড়ো হল কি করে? সে নিজের দিকে চেয়ে দেখে। খালি দেখতে থাকে। শুকুরা কি বুড়ো হত, ওর কাছে থাকলে? কখনো না। সে নিত্যি তাকে দেখত। বুড়ো হওয়ার বিষ ঢুকত কোন পথে? সে ঢুকতে দিত না। ওর অজান্তে কখনো যদি ঢুকে যেত তবুও সে বুঝতে পারত না শুকুরা বুড়ো হয়েছে বলে। এতদিনের পরে সে দেখছে বলে শুকুরাকে বুড়ো বুড়ো লাগছে। লাগলেও বুড়ো হয়নি— কখনো নয়।

শুকুরা কিন্তু আপনার দিকে তাকিয়ে দেখল— সে সত্যি সত্যি বুড়ো হয়েছে। রতনী যত না বুড়ি হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি বুড়ো হয়েছে। রতনীর কাছে থাকলে সে এত বুড়ো হত না। কত যতনে রাখত রতনী তাকে, কাঙালের ধনের মতো আঁচলে বেঁধে। সে বুড়ো হল কেবল বিদেশে গিয়ে। বুড়ো করে দিল তাকে কলকাতা ও রেঙ্গুন। বুড়িয়ে দিল তাকে কলকাতার চটকল, কাপড়ের কল। বুড়িয়ে দিল তাকে জাপানী জেলখানা। বুড়িয়ে দিল তাকে ইরাবতী, কানাজন নদীর জল। আর ব্রিটিশ সরকারের কয়েদখানা।

সে রাতে সে ঘুমোয়নি। রতনীও। ঘুম চোখ ছেড়ে পালিয়েছে রতনী এসেছে বলে। রতনীর দিকে চেয়ে আছে বলে চোখদুটো বোধহয় আর ঘুমকে খুঁজে খুঁজে পাচ্ছে না।

গরমের দিন। বাইরে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে দুঃখী দাস গভীর ঘুমে। দুঃখী-কাঙালদের দাস সে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। পৃথিবীটা ঘুরে চলছে তার অজান্তে। তার হুঁশ নেই। মাথাব্যথা নেই।

সংসারটা সোজা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, রবারকে টানলে যেমন লম্বা হয়, দুঃখী দাস সে খবর হয়ত রাখে না। নিতান্ত সরল, নেহাত সাধারণ। শুকুরা এক এক সময় তাকিয়ে দেখছে দুঃখীর দিকে। কত বড় মানুষটা এখানে পড়ে আছে। কত বড় বুক। কত ওজনদার। পৃথিবীর যেন ভাল লাগছে ওর ভার বইতে, দশমাসের ছেলেকে গর্ভে ধরার মতো।

সে বলে চলেছে। কত কথা। রতনী শুধু শুনছে। আর কাঁদছে। বাইয়া যদি থাকত! কত বড় হয়ে গিয়ে থাকত। শাশুড়ি হয়ে পা মেলে বসে থাকত সে। এরকম বকর বকর করলে শুকুরা টুকে দিত। চুপ কর। কেমন বেয়াক্কেল। ও ঘরে ছেলে-বউমা শুয়ে আছে না? উঠে পড়বে। কিন্তু কই? বায়া কোথায়? বায়া কি আর ফিরবে? রতনীর কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সে ককিয়ে কাঁদে। শুকুরা বোঝাতে থাকে। কাঁদলে কি মরা ছেলে ফিরে আসবে?

বায়া খেতে না পেয়ে মরল। রতনী তাকে বাঁচাতে পারেনি। কি করে বাঁচাত? নিজে তো খেতে পায়নি। বুকে দুধ ছিল না খাওয়াতে। যার কাছে হাত পাতল সে দোর দিল। দুর্ভিক্ষ। অনটন। তবু সে ভাবে সময় সময়, বাঁচাতে সে পারত বুঝি। রাউতের পো নীল তো ছিল। যেটা সে অনেক পরে করল সেটা আগেই করল না কেন? কি করে করত? কি

ছিল তার দেহে? আরো আগে থেকে মন্বন্তর আসার আগেই সে গিয়ে রাউতের বাড়ি উঠল না কেন? বায়া বাঁচত ঠিক — হ্যাঁ বেঁচে যেত। তবে সে কি বলতে পারত লোকে যখন জিজ্ঞেস করত কে তোর বাপ? সে কি বলত শুক্রসেন বারিক! তোর মা কি করে? নীলমণি রাউত তোর কে হয়? এর জবাব সে কি দিত? দড়ি দিত না গলায়? না - না— যা হবার হয়েছে। যে যাবার সে গেছে। সব দোষ এই শুকুরার। সে চাইলে বায়া বেঁচে থাকত। মাসে মাসে যদি টাকা মনি অর্ডার করে দিত তার নামে, বায়া কি না খেতে পেয়ে মারা যেত?

শুকুরাও ভাবছিল— হ্যাঁ, বাঁচালে বাঁচাতে পারত একা সে-ই। শুকুরা। সে-ই তো আবার বাঁচিয়ে রেখেছিল কালিয়ার ছেলেপিলেদের। নিজের বলে একটিমাত্র সন্তান— সে না খেতে পেয়ে মরল। আর শুকুরা বসেছিল কলকাতায় পায়ের ওপর পা রেখে। এত বড় পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তবু, রতনীর কি দোষ নেই? সে একবার লিখে পাঠাতে পারত না? চিঠি দিয়েছিল শুকুরা। উত্তর পায়নি। টাকা পাঠাল— পেয়েছি বলে ফেরত জবাব নেই।

রতনী ভাবছিল— এত বড় আকাল গেল, সে যদি এক পদ লিখত শুকুরাকে! লিখবে কে? ধনী মাষ্টার তো পুলিসের গুলিতে মলো। আর ভাগু মহান্তি? রাম বল! যত টাকা পাঠিয়েছিল শুকুরা সব খেয়েছে সে। পরের রক্ত জল করা টাকা। তার সইল। ধর্ম দেবতা গেলেন কোথায়? ধর্ম নেই — ধর্ম নেই — দেবতা মিথ্যে। এটা যে কলিকাল! নাহলে ভাগু মহান্তি বুক ফুলিয়ে হাঁটছে সকলের সামনে? তার বুক ফেটে যেত না? ধর্মে তো সইল! রতনী তো মানুষ। তায় মেয়েছেলে। যাক গে, যা হবার হয়েছে। পিছনের কথা ঘেঁটে কি লাভ! কেমন করে ঘর একখানা হবে। দুটিপ্রাণী বাসা বেঁধে থাকবে। কে জানে বায়া আবার হয়তো ফিরে আসবে! হাসি পেল রতনীর। শুকুরা বলবে বালুঙ্গার বলার ঢঙে— 'আর কি বয়েস আছে!'

শুকুরার হাতটা লাগল রতনীর গায়ে, রতনীর মুখেও। বন্দুক ধরে ধরে কড়া পড়ে গেছে হাতে। রতনী ভাবল, যে সে লোক নয় শুকুরা। একজন সেপাই। ফৌজে ছিল। ইস্, কেমন মানিয়ে থাকবে। দুম দুম করে হাঁটত যখন কাঁধে বন্দুক ফেলে, দেখার জিনিস। কে আর দেখেছে? আবার গোঁফও নাকি রেখেছিল তখন। এখন কেন যে কামিয়ে ফেলল! কি, মানাত না? খুব মানাত। জোয়ান দেখাত। ওর গোল মুখের চওড়া গালে জুলফি আর বাঘা দুফালি গোঁফ, মোটা মোটা ছুঁচলো কানের কাছে। দেখলে ছুঁড়িরা তাকিয়ে থাকত দু-দণ্ড। ওহ্ ভারি আমার দেখনবালি সব! কেন, ওর মরদকে কেন সবাই নজর দেবে? মরুক গে, দিলেই বা। সবাই ত বলবে 'এ রতনীর বর। কেমন বীরের মতো দেখায়। রতনীর কপাল ভাল। কেমন বর পেয়েছে।' রতনীর কানে গেলে ওর বুক ফুলে উঠত।

সকলে বলে একটা মেয়েমানুষ নাকি রেখেছিল । আবার নাকি মদ খেত। শুকুরা বলল —"চোখের দিব্যি লো রতনী, আমি পরদারী করিনি।" শুকুরা কখনো মিছে কথা বলবে না রতনীর কাছে। সে মেয়েমানুষ রাখেনি। মদ খেয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। ফৌজে ছিল, মদ খায়নি কি? তা খাক। পুরুষমানুষ। মদ খেল তো কি এমন ভেসে গেল! রাউতের পো নীলও তো মদ খায়। অমন একটা কুড়ি বছরের জোয়ান ছোকরা কাঁচা বয়সে বিয়ে করা বউয়ের কাছ

থেকে এত দূরে রইল, কখনো সখনো পা পিছলে গিয়ে থাকবে— বলাবলি করে গাঁয়ের মেয়েরা। গেল তো হল কি? ওর ভাতার কোথায় মাগী রেখেছিল তো তোমরা বলবার কে? তোমরা যত সব কোন ভাল গো?

তা যেন হল— সব ভাল শুকুরার। কিন্তু সে মিলিটারিতে ঢুকল কেন? কিছু একটা হয়ে যেত যদি? কে পিঠে পড়ত? ভারি আমার পলটন হতে যাওয়ার সাধ! রতনীর কথা একটুও কি মনে পড়ল না? রতনীর মাথার সিঁদুর মুছে দিতে পল্টন সাজতে গেলি তুই? এতবড় আহাম্মক এমন নির্দয় লোকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। খালি রতনী রতনী করছে তখন থেকে। কত আদুরেপনা দেখাচ্ছে গো মানুষটা। রতনী চুলোয় গেছে, মরেছে। যা চলে যা। যেখানে যাবি যা। কেন, সেপাই তো হলি, পয়সা কামালি। কি করলি সে পয়সা? ছেলে মরল। বউ গিয়ে পরের বাড়িতে ঢুকল। পয়সা কামিয়ে কাকে দিচ্ছিলি? কে খাচ্ছিল তোর কামাই?

তা না হয় হল। সব শুনল সে। শুকুরার সব কথা। কত ভোলাচ্ছে গো এই বউ-সোহাগী লোকটা? শোন ওর কথা! সব হয়েছে মানছি। ইংরেজ সরকার তোকে বর্মা মুলুক থেকে ধরে আনল। তোর কাছে যা ছিল সব কেড়ে নিল। তোকে জেলে পুরল। মাস মাস ধরে বিচার চলল। সাজাও দিল। তবে দেশ স্বাধীন হতেই তো ছেড়ে দিয়েছে। কত বছর হল? কোথা ছিলি আজতক? কাকে পুষছিলি? কার কুঞ্জে কৃষ্ণের রাত কাটছিল? সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত একটা যুগ। একদিনও তোর মনে পড়েনি— রতনী কি করছে? যুবতী বয়সের মেয়েছেলেটাকে বাড়িতে ফেলে এসেছি— যে মেঘ ডাকলে ভয় পেত। বিজলি চমকালে চমকে উঠত, কাছে থাকলে জাপটে আঁকড়ে ধরত! একা সে থাকে কি করে। তুই তাকে এত হেনস্থা করলি। তাতে সে গিয়ে রাউতের পো-এর কাছে রইল তো কি খারাপ করল? তারও তো বয়স আছে যৈবন আছে! মন আছে সাধ আছে। নাকি একা তোরই আছে সব, মেয়েছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছে বলে কিছু নেই তার? হল এখন, দেখলি তো রতনীর মন? সে পেটের জন্যে তার যৈবন দিয়েছিল বলে কি মন দিয়েছে? মন দিলে কি কুড়ি বছর পরে তুই যেমনি বিদেশ থেকে ফিরেছিস, তোর পিছন পিছন উঠে পালিয়ে আসত? সে কি রাউতের পোকে আঁকড়ে সারাজীবন রয়ে গেল? ভ্যালারে রাউতের পো! সে কেন এত সোহাগ করতে যাবে? তার স্ত্রী আছে ছেলেপুলে আছে। কি সুন্দর বউ। কত লেখাপড়া জানে। কত ফেশান করে। তাকে ছেড়ে এই কেলে বিচ্ছিরি মেয়েছেলেটাতে সে কেনই বা মজবে?

চমকে উঠল রতনী। রাউতের পো কি মজেনি? সে মিছে কথা বলছে শুকুরাকে। রাউতের পো তাকে বুকের উপর ফেলে চোখ কান ঠোঁট মুখ গলার চারদিকে হাজারবার চুমো খাওয়ার সময় তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠেনি? তার বুক আহ্লাদে দুলে ওঠেনি? সে কি তখন রাউতের পোকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে তার দেহের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে— সে সাধ মেটার নয় জেনেও— প্রাণ বরং চলে যাক, বারবার চেষ্টা করেনি? রাউতের পো রাগ করলে, অভিমান করলে সে কি তাকে কোনোদিন আদর করেনি? তার কোলের ওপর ঢলে পড়ে হাতদুটো নিয়ে নিজের গালে বুলিয়ে দেয়নি— বুকের মধ্যে চেপে ধরেনি? তার গলার চারদিকে বাহু

দুটো হাল্কা করে ফেলে দিতে দিতে শক্ত ফাঁসে বেঁধে ফেলার মতো তাকে বশ করে ফেলেনি? তখন কি তার শুকুরার কথা মনে পড়ত কখনো? একদিনও? রাউতের পোয়ের কাছে আপনার মান-সম্ভ্রম সব দেওয়ার সময় সে কি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিল যে এটা যা তুই দিচ্ছিস সে তোর নয়, শুকুরার? তুই কি আর শুকুরার মান ইজ্জত রেখেছিস? শুকুরা কি আর তোকে বিশ্বাস করবে? তবু শুকুরার বিশ্বাস জেগে আছে। এখনো আশা করে চেয়ে রয়েছে। হা হা করে উঠল রতনীর বুক। কি আর আছে ওর? এত বড় বুকের কলজে নিয়ে যে লোকটি ওর পাশে শুয়ে আছে তাকে দেবার মতো কি আর রেখেছে সে? শুকুরা একদিন আবার ফিরবে, তার যে ধন সে রেখে গেছিল রতনীর কাছে যতন করে বাঁচিয়ে রাখতে তাকে কেমন করে সামলাবে সে কি ভেবেছে কখনো? ভাবত। ভাবতে দিল না তাকে রাবণের ছায়ার মতো একটা নোংরা বিচ্ছিরি আশা। রাউতের পো তাকেই নিয়ে ঘর করবে। সে হবে রাউতের ঘরনী। গিন্নি। কালবোশেখীর মতো সেটা কোথায় উবে গেল বটে। নাহলে সে নীলের ছেলেমেয়ের মা হয়ে বসে থাকত। শুকুরা এলে সে কি করত— কি বলত?

না - না শুকুরা তার থেকে ঢের ভাল। শুকুরা যা ইচ্ছে তাই হোক, সে আগে এসেছে রতনীর কাছে। দৌড়ে এসেছে। সে কি জানে না, শোনেনি কি যে রাউতের বাড়িতে সে থাকে? দশ লোকে দশ কথা বাড়িয়ে কুড়িয়ে তাকে কি আর বলেনি? তবু সে কি শুনল? কত বড় ছাতি এই শুকুরার। তার ভিতরে রতনীর সমস্ত মেলেচ্ছিপনা কোথায় হারিয়ে গেছে। বড় পুকুরে এঁটো বাসন ধুলে জল কি অপবিত্র হয়?

আর রতনী? এতটুকু বুক তার। চড়ুই পাখির মতো। রাউত পো-এর আদর সোহাগের আঁচ লাগা মাত্র শুকুরার যা ছিল সব উপচে উথলে গড়িয়ে পড়ল কোথায়। কোথায় গেল? শুকুরা এত ভরসা করে ওর জিম্মায় যে অমূল্য রতন রেখে গিয়েছিল তাকে যদি সে ধরে রাখতে ইচ্ছে করত তবে তার বুক ফেটে যেত না রাউতের পো তার গা ছোঁয়া মাত্র? ওর কিছু হল না। সে বেঁচে রইল। এখনো বেঁচে আছে। নিলাজী পোড়ারমুখী। ওর মরণ হল না!

কেন, মরবে কেন? আজ বেঁচে আছে বলেই তো শুকুরা পিছু পিছু ধেয়ে আসতে পারল। শুকুরা গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছে। কত বছর, কত যুগ, কত হারিয়ে যাওয়া বয়েসের গায়ে মাখা কাহিনী যেন লম্বা হতে হতে হঠাৎ এক রাতের মধ্যে কে যেন তাকে গুছিয়ে পাট করে এতটুকু একটা ঝাঁপির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। লম্বা কাপড়খানা এত ছোট হয়ে গেছে যে কোনোদিকে কুলোচ্ছে না। গা যত ঢাকছে, একদিক ঢাকতে অন্য দিকে ফাঁকা পড়ে থাকছে। তবু ভাল লাগছে। এমন অলজ্জ জীবনও ভাল লাগে-— এক এক সময় মানুষের।

সীতাকে নিয়ে রাবণ রাখল অশোকবনে। বছর বছর কেটে গেছিল। তিনি তো আবার ফিরে এসেছিলেন অযোধ্যায়!

ও মা গো। হে ঠাকুর, হে মা বনদুর্গা, তুমি রক্ষা কর। আবার যদি সীতা বনবাসে যান! গেলে যান বরং। লবকুশকে তো পেলেন।

ভোর হয়। এমন কত সকাল গিয়ে সূর্য মাথার উপর উঠে চলে যান। লাল লাল হোরি খেলা রঙ-মাখা মুখে সাঁঝের প্রহরকে ডেকে দিয়ে। নিশি পোহানোর পরে ভোরের লালিমা মেখে আবার ফরসা সকাল হতে। রাত থাকতে থাকতে দুঃখী দাস উঠে প্রার্থনা গান করে। প্রথম প্রথম শুকুরা উঠত না। রতনী ঠেলে তুলে পাঠিয়ে দেয় দুঃখীর সঙ্গে প্রার্থনা করতে। দুঃখী একদিন বলল, "তুই একা কেন, রতনীকে বল সেও বসুক।"

তিনজনে বসে প্রার্থনা করে রোজ। শুকুরা আশ্রম প্রার্থনাবলী বই ধরে পড়ে। শুকুরা পড়তে জানে। ওড়িয়া বই পড়তে পারে। কলকাতায় একদিন সে ত্রিনাথ গোঁসাইয়ের পাঁচালি পড়ত। আজাদ হিন্দ ফৌজে ঢোকার পর গীতা পড়ল। পকেট-গীতা একখানা তার কাছে থাকে। এখনো আছে। আজাদ হিন্দের অনেক সভ্যের কাছে গীতা থাকত। মুসলমান সৈন্যদের কাছে কোরান। নেতাজী নিজে পকেটে গীতা রাখতেন। সেটাই ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। তবে কেন তাঁর উড়োজাহাজ পুড়ে গেল! কেন তিনি অকালে মারা গেলেন! তিনি কি সত্যিই মারা গেছেন? অসম্ভব। নেতাজী কখনো মরতে পারেন না। নিজের কাছে গীতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মারা যাবেন? গীতা কি মিথ্যে? ভগবানের কথা মিথ্যে হয়ে যাবে?

"তুই গীতা পড়িস?"— শুকুরার কাছে গীতাখানা দেখতে পেয়ে দুঃখী একদিন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ পড়ি।"

"রোজ পড়িস?"

"কমপক্ষে এক অধ্যায় করে পড়ি প্রতিদিন। কবে হয়তো কাজের ঝামেলায় বাদ পড়ে যায়, নয়তো দৈনিক পড়ি।" শুকুরা বললে।

"বুঝতে পারিস?"

হাসল শুকুরা। "আমি কি সমস্কৃত জানি যে বুঝবো। বোঝার কি দরকার? গীতা মাহাত্ম্যতে তো লিখেছে, না-বুঝে পড়লেও ফল পাওয়া যায়।"

"বইতে ওড়িয়া টীকা নেই?"

"আছে তো। অত মেহনত কে করে। ভগবানের নিজের মুখের কথা দুবার পড়ে দিলে হয়ে গেল। মনে শান্তি। মানে কে বুঝতে যাচ্ছে?" শুকুরা বলল।

"একটু কিছুও বুঝতে পারিস না?"

"না। কেবল গোড়ার শ্লোক আর শেষের শ্লোক এই দুটোর মানে আমাদের এক বড় অফিসার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেটুকু মনে আছে। তিনি বলেছিলেন গীতা বোঝা ভারী কষ্ট। কত মুনি ঋষি অর্থ করেছেন। তুমি কোনটাকে নেবে?"

"প্রথম আর শেষ শ্লোকের মানে তিনি কি বলেছিলেন?"

"তুমি পণ্ডিত মানুষ, তোমাকে আমি গীতা বোঝাব? কি যে বল। তুমি কি বোঝনি?"

"বুঝেছি, তবে তোমার অফিসার কি মানে বলে দিয়েছেন জানি না তো। যদি নতুন কিছু বলে থাকেন।"

"নতুন আর কি? সেই ধর্মক্ষেত্র কথা তো। বললেন যেদিন আদৌ সময় না হবে সেদিন এই প্রথম আর শেষ শ্লোক মনে করলে অনেক ফল পাওয়া যাবে। গীতা প্রথম পড়ার সময় তিনি যা বলেছিলেন আমি এখনো তাই করি।"

"কি বলেছিলেন?" দুখী আবার জিজ্ঞেস করল।

'তিনি বলেছিলেন, পড়ার আগে প্রথমে যিনি গ্রন্থ লিখেছেন তাঁকে প্রণাম করে বলবে গীতা আমায় বুঝিয়ে দাও। তারপরে মনে করবে একটা যুদ্ধভূমি রয়েছে। দুদিকে সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে যেমন ওদিকে ইংরেজ আর এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ। মাঝখানে একটা রথের উপর অর্জুন বসে আছেন। তীর ধনুক রেখে দিয়েছেন নীচে। পিঠে অক্ষয়তৃণীর ঝোলানো। এক হাঁটু নীচে ফেলে অন্য হাঁটু তুলে বসেছেন। তাঁর সামনে ঘোড়ার লাগাম ধরে চতুর্ধা মুরতিতে চৌকির ওপরে বসার মতো শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন সারথী হয়ে। এক হাতে লাগাম অন্য হাতে পাঞ্চজন্য শাঁখ। অর্জুন শরণ নিয়েছেন কৃষ্ণের চরণতলে। এই মতো মনে ভেবে নিয়ে গীতা পড়ে যাবে। ব্যস, আমি তাই করি।"

"গীতা আপনার থেকে কিছু বুঝতে পারিস না?"

"রামশ্চন্দ্র। বুঝবো কখন? আমায় তো জ্বল জ্বল করে দেখা যায় শুধু কৃষ্ণ আর অর্জুন। পড়া সেরে ছুট না দেওয়া তক পথ পাই না।"

"কেন রে?"

"ওরে বাপ রে! আমার ভয় করে।" বলল শুকুরা।

"আর সেই প্রথম শ্লোকের মানে? তোর অফিসার তোকে যা বুঝিয়েছিলেন?" আবার জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"শ্লোক সঠিক বলতে পারব না। মানে মনে আছে, শোন। প্রথম শ্লোকে দুটোই তো কথা। ধর্মক্ষেত্র আর কুরুক্ষেত্র। তিনি বললেন সেটুকু বুঝলেই হল। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করলেন সঞ্জয়কে — আমার ছেলেরা আর পাণ্ডুর ছেলেরা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে কি করল? এই তো?"

"হ্যাঁ"— দুঃখী বলল।

"মানে মন জিজ্ঞেস করছে চৈতন্যকে। হে চৈতন্য, আমার এই যে চোখকান নাকমুখ সব ছেলে আছে, এরা হল কুরু বংশ। সংসারটা তারা তাদেরই বলে ভাবে, তাই এই সংসারকে কুরুক্ষেত্র বলা হয়। বিবেক বুদ্ধি এসব হল পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব। এরা বলে, সংসারটা কুরুক্ষেত্র নয় কিম্বা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যে হয়নি। হলেও এখানে এসেছি ধর্ম করতে। ধর্ম করে যাও।" শুকুরা বোঝাল।

"বাহ্, তোমার অফিসার তো একজন বোদ্ধা লোক ছিলেন।"

"তা আর বলতে? এমন ধর্মাত্মা মেলা ভার।"

"আচ্ছা তারপর? শেষ শ্লোকের অর্থ কি বল।"

"শেষ শ্লোকের মানে হল, যে এ সংসারকে ধর্মক্ষেত্র বলে মনে করে চলে সে এক

সোজা লক্ষ্যে চলতে থাকে। যেমন শিকারী তার শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের নীতি-নিয়ম ঠিক রাখলে সে সংসার যুদ্ধে জয়লাভ করবে, পরে আরো উন্নতিও হবে। আর তার পাশে এসব জোগান দেওয়ার কর্তা কৃষ্ণ সব সময় থাকবেন।"

"শাবাশ শুকুরা শাবাশ। তোকে তোর অফিসার সুন্দর বুঝিয়েছেন।" বলে শুকুরার পিঠ থাবড়ে দিল দুঃখী। আর সাহস দিল— "তোর আর ভয় কি রে? তোর কাছে তো গীতা আছেন।"

তাই ওর ভয় কিসের? এত বড় যুদ্ধের মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। এই গীতার জোরে। নেতাজীর কাছেও এই গীতা ছিল। তিনি কি করে বিজয় হাসিল না করে মরবেন? তাঁকে মারতে পারে এমন বাপের বেটার জন্ম হয়নি পৃথিবীতে।

তিনি নিজে বলেছিলেন। সেদিন সে নেতাজীর বডিগার্ড ছিল। সে ছবি তার সামনে এখনো জীবন্ত ফুটে ওঠে।

চাঁদনী রাত। শালুক ফুলের মতো জ্যোৎস্না পড়েছে। দূরে কালো কুচকুচে রাক্ষস একটা দাঁড়িয়ে যেন— পোপা পাহাড় দেখা যায়। আজও তার মনে আছে সেই পাহাড়ের রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি, চাতাল গহ্বর সবকিছু। বাঘ ভাল্লুক গাদা গাদা। তবে বন্দুক কাছে থাকলে ভয় করে না। ভয় কেবল সেই সরসরে হড়হড়ে চিকন জীবটাকে। ছোট থেকে বড় পর্যন্ত। লাউডগা থেকে গোখরো অহিরাজ অজগর তক। গীতা কাছে থাকলে তারাই বা কি করবে? সেই পাহাড়ের মধ্যে ছিপে ছিপে সে কত ইংরেজ সৈন্যের বুক ফুটো করে দিয়েছে গুলির চোটে— কলাগাছ কাটার মতো ঢলে পড়ত এক গুলিতে। তার সহায় হত সেই পাহাড়টা। পথ পেত না শত্রুপক্ষ।..... জাপানীরা তঞ্চকতা করল আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। কথা রাখল না। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ দূরে থাক, রসদ খোরাকও পাঠাল না। ইম্ফল - রেঙ্গুন রাস্তা কেটে দিল মাঝে মাঝে খাই করে দিয়ে। আরাকান পর্বতে যুদ্ধ চলেছে। ব্রিটিশ সেনারা পিছু হটছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এসে মাতৃভূমিতে ভারতের মাটিতে পৌঁছে গেছে। ঠিক সেই সময় জাপান দাগা দিয়ে গেল। জাপানী সৈন্যরা ছাউনি ছেড়ে পালাল। আজাদ হিন্দ সেনারা কিন্তু শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়বে বলে পণ করেছিল।

পালেল এরোড্রাম আবার দখল করে নিতে ব্রিটিশ সৈন্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। উপর থেকে উড়োজাহাজ বোমা ফেলছিল, ব্রিটিশ আকাশবাহিনী ছেয়ে দিচ্ছিল বোমায়। পশ্চিম দিক থেকে কামানের গোলা। কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। পাহাড়ের মাথায় ভূতের মুখোশটা পলকমাত্র খসে পড়ে আবার সেঁটে যাচ্ছিল যেখানকার সেখানে। যুদ্ধ বেশ জমে উঠেছে। একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে যেন চেয়ে রয়েছে। খালি মরণের ডাক ছাড়ছে। মরণও হাঁক দিচ্ছে কে কোথায় আছ দৌড়ে এসো। এই সমস্ত লড়াই, হানাহানি, কাটাকাটি থেকে ত্রাহি পেতে চাও তো আমার কাছে শরণ নাও। সে ডাকে পাগলা হয়ে ছুটে চলেছে আজাদ হিন্দ সেনা। মাহেন্দ্রবেলা, বারুনী যোগ এসেছে। দেশসেবার জন্যে। মহাপুণ্য অর্জন করার জন্যে।

নেতাজী কি আর সামলে থাকতে পারেন? বেরিয়ে এলেন ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে।

ভারতবাসী ভারতবাসীর বুক লক্ষ্য করে কেমন গুলি চালাতে পারে, তা দেখার জন্য কিম্বা শিক্ষা দেবার জন্যে, কে জানে। নিরাপদ জায়গা থেকে বিপদের মধ্যিখানে চলে এলেন। দাঁত তাঁর কড়মড় করছিল। ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে যে ভারতীয়রা কামান চালাচ্ছিল তাদের দিকে চেয়ে। পাগল ওরা— ভাইয়ের রক্ত পান করতে চায়। তারা জানত। তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের মুক্তিবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের দ্বারদেশে— এস, চলে এস। দেশের পরম শত্রু ব্রিটিশের সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে এস। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্দুকের মুখ ওদিকে ঘুরিয়ে দাও। সারেণ্ডার করে দাও। কারো ভয় করার কিছু নেই।

তবু শুনল না ভারতীয় ব্রিটিশ সেনা। মায়ের পেটে শত্রু থাকে কথাটা কত সত্যি! ভেবে থাকবেন নেতাজী। আত্মসমর্পণ করার বদলে উল্টে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে দিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ যে নিবেদন করেছিল তা ঘটল না বরং উল্টো হল।

শাহ নওয়াজ খাঁ ফৌজের কমাণ্ডার। তাঁর চোখ পড়ল নেতাজীর ওপরে। ছুটে এলেন নেতাজীর কাছে। "নেতাজী! ক্যা কর রহে হেঁ আপ?" রাগে থমথম। কথাগুলো রোখ-ঠোক হলেও খাঁয়ের ভিতরে নেতাজীর প্রতি ভক্তি তাকে মোলায়েম করে দিয়েছিল। নেতাজী চুপ। ঠোঁটে একটু হাসি। নেতাজীর পাশে পাশে আগুপিছু চলছে শুকুরা এবং আরো কয়েকজন সেপাই। গুলি লাগলে আগে তাদেরই লাগবে। শুকুরাকে খুব ভালোবাসতেন নেতাজী। ওড়িয়াদের দেখলে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আবার ছলছল করত। তাঁর মা-বাবার কথা মনে পড়ে যেত বুঝি। ওড়িয়াদের উপর ভারি বিশ্বাস। বলতেন ওড়িয়া ভারতের এক মহান জাতি যারা শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কাছে মাথা নোয়ায়নি। বুক ফুলিয়ে আবার বলতেন— আমার গর্ব আমি সেই মাটিতে জন্মেছি।

শাহ নওয়াজ নেতাজীকে চুপ থাকতে দেখে আবার বললেন জোর গলায়— "নিজে নিজেকে এ বিপদের ভিতরে ঠেলে দেবার অধিকার কে দিল আপনাকে? আপ্‌নে আপ্‌কো ইস খতরেমে ডালনেকা কোই হক নহি আপ্‌কো — আপকী য়হ জান আপকী নহি হায়, য়হি সমঝ্‌না চাহিয়ে আপ্‌কো। সারা জহাঁ সে আচ্ছা হমারে হিন্দুস্তানকী অনমোল দৌলৎ হৈঁ আপ। আপ উসে বরবাদ করনে ক্যোঁ লগে রহে হে। য়ু বাহাদুর বননা আপকী খুদ্‌গর্জ্‌ হায়।"

নেতাজী শাহ নওয়াজের মুখের দিকে তাকালেন। সকলে ভাবল এমন কড়া কথায় তিনি নিশ্চয় রেগে যাবেন। কিন্তু নেতাজীর মুখে সেই হাসি। সরল শিশুর মতো হাসলেন নেতাজী। চারিধারে যখন গুলিগোলার আওয়াজ সেই সময় নেতাজীর মুখের ওই হাসি যে কত মূল্যবান তা কেবল ওরাই বুঝবে যাদের মনে দেশের মুক্তির জন্যে মরা আর মারা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

তারপর বললেন— গলা গম্ভীর, গমগমে। বাজের মতো শুকুরার বুক দুলে উঠল তা শুনে। বাক্য নয় মন্ত্র। বললেন— "আমাকে মেরে ফেলার বোমা ইংরেজরা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি।"

সে কি বাণী! সে কি চেহারা! সেই নেতাজী কি কখনো মরতে পারেন? জাপানের উড়োজাহাজ কি তাঁকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে? ইংরেজদের কামানের গোলা উড়োজাহাজের বোমা যাঁকে মারতে পারল না! অসম্ভব! অসম্ভব! সব মিথ্যে প্রচার।

আজও সে-কথা মনে পড়লে শুকুরার চোখে জল এসে যায়। বয়ে যায়— রুখতে পারে না। সে কাঁদে। বাচ্চা ছেলের মতো। একদিন রতনী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল— "কাঁদছ যে?"

শুকুরার হুঁশ হল। কথা ঘুরিয়ে বলল— "তুই কেন কাঁদছিলি?"

"অলাজুক, বেহায়া!" বলে রতনী চলে গেল ঘর নিকাতে। গোবর-গোলা জলে ন্যাতা ডুবিয়ে সে কত পিছনের কথাগুলোকে যেন নিকিয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিদিন সকালে সে মাটি গোবর দিয়ে ঘর নিকোয়। যেন গতদিনের গতরাতের যত কিছু জঞ্জাল বাইরে ফেলে দিয়ে এসে সে নিকিয়ে দিয়ে যায় খুব সাফসুতরো করে, আগামীদিনের পা ফেলার জন্যে।

এমনি কত পুরোনো মুছে যাওয়া কথার ওপরে কত পোঁচ যে পড়েছে তার হিসেব নেই। পিছনের সব কথা মুছে ফেলেছে রতনী। পিছনে ফেলে দিয়েছে শুকুরা।

দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। এপাশে ওঠা সূর্য ওপাশে ডুবে যায়। কুমারী পৃথিবী বল খেলে সূর্য চন্দ্র দুটো গোলাকে নাচিয়ে নাচিয়ে। দিন ওঠে নামে।

দিনের পর দিন গড়িয়ে চলে। শুকুরা কবে তার নিজের ঘর করে বাসা বাঁধবে কে জানে? সেটা তো মনের কথা। মনের সাধ। মনের মধ্যে মরে মরে যাচ্ছে। যাক। সে তো জন্মেছে খেটে খাবার জন্যে। দেহ কথা শোনা পর্যন্ত গতর চলা পর্যন্ত সে খাটবে, খাবে। তারপরে শেষ। ঘরটা শুধু মাথা গোঁজার জন্যে। যেখানে হোক মাথা গুঁজলে হল। ঘর তো সে সঙ্গে নিয়ে যাবে না।

সে দিনরাত খাটে। দুঃখীর সঙ্গে তাল দিয়ে। আপন-পর ভুলে যায়। দুঃখী কোদাল দিয়ে মাটি কোপায়। তার সঙ্গে যোগ দেয় শুকুরা। বেরোয় লাঙলখানা কাঁধে ফেলে।

সেধারে মধুর বাক্স। তার ভিতরে মৌচাক। চার-পাঁচ মাসে একবার মধু বার করে। আমের বকুল, করমচা ফুলের মধু খুব গাঢ়, ভারি মিষ্টি। লোকজন অতিথি যে অভ্যাগত যে আসুক পান নয়, বিড়ি নয়, সেই মধু দিয়ে এক গেলাস শরবত বাড়িয়ে দেয় দুঃখীঠাকুর।

দুঃখীর বাড়িতে চায়ের পাট নেই। তার চুলোতে জল গরম করা হয় না চায়ের জন্যে। সেটা শুকুরার পক্ষে কষ্টকর। নয়ত অন্য কোনো ব্যাপারে কমতি নেই দুঃখীর ঘরে। তাছাড়া, রতনীর পান। দুঃখী পান খায় না কিম্বা তার বাড়িতে পানের সরঞ্জাম থাকে না।

দিনের মধ্যে চারবার চা খাওয়া শুকুরার অভ্যাস। কমপক্ষে সকালে সন্ধ্যায় দুবার না হলে নয়। গা হাত-পা ঝিমঝিম করে। চোখের পাতা ভারি ভারি লাগে। হাইয়ের ওপর হাই।

এ নেশা ওর ছিল না। চা, পান কিছু খেত না। অল্প অল্প খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেল। পরশুর মায়ের কথা এড়াতে না পেরে এ হয়রানি। একেবারে অভ্যাসে পড়ে গেল মিলিটারীতে ঢুকে। মিলিটারীতে না ঢুকলে বা পরশুর মায়ের হাতে খেতে না পেলেই যে তার এ নেশা হত না একথাও বলা যায় না। সে যখন কলকাতা যায়, গাঁয়ে ক্বচিৎ কেউ চা খেত। কারো বাড়িতে চায়ের জল চাপানো হত না। চায়ের কেটলি ছিল স্বপ্ন। যে খেত, হাঁড়িতে জল গরম করে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে খেত। স্ট্রেনার বা ছাঁকনি কে দেখেছিল? কাপ প্লেটও শহরে ব্যাপার। গাঁয়ে সেটা স্বপ্ন। পটনায়েকের ঠাকুরমা চা খেতেন। সারা গাঁয়ে সেই একটি লোক চা খেত বলে নামডাক ছিল। তিনি চা খেতেন কাঁসার জামবাটিতে এক বাটি। সেরেফ লিকার। লাল লাল জল, দুধ চিনি কিছু নেই। সময় সময় লেবুর রস নুন মেশাতেন। বুড়ির নাকি হাঁপানি ছিল। হাঁপ ধরত তাই খেতেন। তা ছাড়া দু-একজন আফিংখোর চা খেত। চা-খেকোরা গাঁয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারত না। এখন তো গাঁয়ের মধ্যে দু-দুটো চায়ের দোকান।

শুকুরা তখন ছোট। কালকের মতো মনে হয়। ভাসানের মাঠে সাদা পর্দা টাঙিয়ে সরকারের চা-সম্প্রসারণ বিভাগ সচল ছবি— সিনেমা দেখাত। তখনকার কালে ছবিগুলো কথা বলত না আজকালের 'টকির' ধরনে। কেবল হাত-পা নাড়ত।

দেবসভায় ইন্দ্র বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন— মর্ত্যপুরীর খবর কি? নারদ বললেন— মর্ত্যের লোক বড় কষ্টে আছে। কারণ? খেতে পায় না। লোকজন বহুত বেড়ে গেছে। অসুখে পচছে। ইন্দ্র তখন ধন্বন্তরীকে ডেকে বললেন— এমন জড়িবুটির ব্যবস্থা কর যা একসঙ্গে খাদ্য আর ওষুধের গুণ করবে। ধন্বন্তরী তখন একটা চায়ের পাতা এনে দিলেন। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। ইন্দ্রদেব সেটিকে মর্ত্যভুবনে পাঠিয়ে দিলেন। কার্তিক ঠাকুর ময়ূরে চেপে উড়ে চলে গেলেন। তারপর কি দেখবে। মর্ত্যমণ্ডলে চা ছড়িয়ে গেল। হিমালয় হতে হরপার্বতী এসে আগে চা খেলেন। তারপর তো সকলে ছুটল চা-পান করতে।

বোধহয় এতসব করেও বিশেষ কেউ চায়ের দিকে চাইল না। তখন মোটরগাড়ি থেকে চায়ের প্যাকেট রাস্তায় রাস্তায় বিলি করল— ছুঁড়ে দিল। তবুও লোকে ভুলল না। তারপর কি হল কে জানে, এখন তো ঘরে ঘরে চা।

বন্ধুবান্ধব প্রিয় যে এল দাও চা। দুঃখী দাস বলে, দেশে এক নতুন সভ্যতা শুরু হয়েছে তার নাম চা-সভ্যতা। সব ইংরেজদের দেখে শেখা। এখন তো বিছানায় শুয়ে কালা সাহেবরা দাঁত না মেজেই চোঁ চোঁ করে চা খায়। বলে কিনা সাহেবরা যখন খায় আমরা কেন খাব না? আমি তো তারই জন্যে বাড়িতে চা ঢুকতে দিই না। আমরা না দিতে পারি দুধ, না দি-ই জল। একটা শস্তা নেশা আমরা চা দিয়ে যুগিয়ে দি। 'ট্যানিন' বিষ আছে চায়ে। আমরা এমন উপকারী বন্ধু যে বন্ধুবান্ধব যে আগে তাকে বিষ দিয়ে আপ্যায়ন করি। আমার মতে চায়ের বদলে যদি সবাই মৌয়ের শরবত করে দিত পারত, সকলে যদি মধু চাষ করত তাতে একটা সভ্যতার নিজস্বতা ফুটে উঠত।

শুকুরা বললে, "বলেছ ভালো দাদা, কিন্তু আমরা যারা নেশা করে ফেলেছি সব মরলে

তবে না তুমি গিয়ে নতুন সভ্যতা বানাবে। তোমার নতুন সভ্যতার আগে আমাদের পৈতৃক প্রাণটা যে বেরিয়ে যাবে!"

শুকুরার জন্যে আলাদা চায়ের ব্যবস্থা করে দিল দুঃখী। শুকুরা বড় লজ্জা পেল। তার জন্যে চা, রতনী জন্যে পান দোক্তা দুঃখী দাসের বাড়িতে ঢুকল। সে চা ছেড়ে দিল শেষে। রতনী কিন্তু পান ছাড়তে পারল না।

দিনের পর দিন কেবল গড়িয়ে চলে। কোথায় পালিয়ে যায় গড় গড় করে চাকা গড়িয়ে যাওয়ার মতো। ওই আকাশপথে, ছায়াপথ দিয়ে। বোঝা যায় না। শুকুরার ভার ভার লাগে। কতদিন আর এখানে বসে বসে খাবে? দুজনে দুঃখীর গলগ্রহ হয়ে পড়ে রয়েছে। দুঃখী শুনল সে কথা। কার কাছে যেন বলছিল শুকুরা। দুঃখী ডেকে বলল, "হ্যাঁ রে শুকুরা, তুই কেন আমার গলগ্রহ হতে যাবি? খাটছিস, খাচ্ছিস। আমি কি তোকে মজুরি দিই? রতনী রান্নাবান্না করে সে কি মাইনে নেয়? নিজের রোজগার তোমরা নিজে খাও। বরঞ্চ তোমাদের মেহনতে আমি খাই।"

দুঃখীঠাকুর। কেবল ভাল মানুষ নয়, দেবতা। সে কিই বা আর বলত? তবে ওরও তো একটা আক্কেল আছে। শুকুরার। কতদিন আর সে দুখীদার বাড়িতে থাকবে? ভাগু মহান্তি জমি দেবে, সে ঘর বানাবে, ভিত গড়বে, দেওয়াল তুলবে, ছাপর করবে, ঘর প্রতিষ্ঠা করবে, পাড়াপড়শীদের খেতে দেবে, তবে গিয়ে নিজের বাড়িতে থাকবে। এত স্বপ্নের জন্যে রাত কই? রতনী বলে।

মণিয়া রেজিস্ট্রিখানায় খোঁজ নিয়ে এসে বললে— "ভাগু মহান্তি কি আর তোর ভিটেখানা রেখেছে? যেদিন বললে সে ব্যাপার হাতের বাইরে চলে গেছে সেদিনই গিয়ে দলিল করে দিয়ে এসেছে। কিনেছে কে জানিস? চিরঞ্জিলাল মারোয়াড়ি। তোর ভিটের লাগোয়া ভাগু মহান্তির কিছু জমি আছে। সব একসাথে বিক্রি করে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। তোমার ঘরতলির জমিটা আর কি সে ফেরত দেবে? মনেও ভেব না। কত মায়াবী এ লোকটা সত্যি! মোকদ্দমা করবে? কর না। ভাগু মহান্তি পার। সে আর ধরা পড়ছে না। মোকদ্দমা করলে পক্ষ হবে মারোয়াড়ি। জমির মালিক সে। ভাগু কেউ নয়। লড়বি তো লাখপতি মারোয়াড়ির সঙ্গে? যাও এখন কাঠযুড়ি নদীর জল খেয়ে হাইকোর্ট দেখগে কটকে। তার পরে দিল্লীতে সুপ্রিম কোর্ট। কত এগোবে এগোও। মারোয়াড়ির বেটা সহজে ছাড়বে নাকি? ওর ভাগ্য দেখ। এমন জমি সে আর কোথাও পেতে পারত নাকি? রাস্তার ধারে, স্টেশনের কাছাকাছি। ধানকলের জন্যে মোক্ষম জায়গা। দিলু মারোয়াড়ি ওখানে ধানকল বসাবে।"

"ধানকল?" দুঃখী চমকে উঠল।

"ধানের মিল। এ গাঁ শহর হয়ে যাবে, মোটরগাড়ি পোঁ পোঁ করে ছুটবে। চিমনি থেকে ভক ভক ধোঁয়া বেরোবে। শয়ে শয়ে কুলিমজুর কাজ পাবে।" মণিয়া বললে।

"ও, ধানকল বসবে!" একটা নিঃশ্বাস ফেলল শুকুরা। কাপড়ের কল নয়, পাটকল নয়, একটা ধানকল!

দুঃখী বলল— "কত লোক কাজ পাবে! কত লোক বেকার হবে হিসেব করে দেখেছ?

দুঃখী গরিব বুড়ি বেওয়া যারা কুটত খেত, তাদের দানা মারা গেল।"

একদণ্ড বসে রইল মণিয়া। ভাবল সত্যি তো। ধানকুটুনীরা যাবে কোথায়? না খেতে পেয়ে মারা যাবে? জনে জনে ভিক্ষা করবে। ভিখ না পেলে?

"এর উপায় কি দুখীঠাকুর?" মণিয়া আগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"কোন পথ দেখা যাচ্ছে না এখন। পথ ছিল। গান্ধীপন্থা। লোকেরা সে পথ ভুলেছে। লোকে কেন ভুলবে? তাদের পথ ভুলিয়েছি আমরা, যারা নেতা সেজে তাদের সরলপনার সওদা করি।" বললে দুঃখী।

"পিছনের কথা ভেবে লাভ কি? এখন কি করা যায় বল। গান্ধীনীতি আর কাজ দেবে না।"

"দেবে না কেন? দেবে। কিন্তু আমার সাহসে কুলোয় না। নাগাল পাই না। গাঁকে গাঁ একজোট হয়ে ধান বিক্রি না করলে মারোয়াড়ি জব্দ হত। কলকাঠি নিয়ে পথ দেখত। কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে আর কি একজোট হবে? এক গাঁয়ের লোক একজোট হতে পারে না, এক এক করে দশটা-বিশটা গাঁ একজোট হবে কি করে? হত। কিন্তু গাঁ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল আমাদের নেতারা। আর কি গাঁ আছে যে এক হবে? ইংরেজ সরকার চিরদিন ভারত শাসন করবে বলে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের শহুরে নেতারা গাঁকে চিরদিন চুষে খাবার জন্যে গাঁয়ে ঘরে ঘরে কোঁদল লাগিয়ে দিয়েছে। দলে দলে ঝগড়া। চাষায় সদগোপে ঝগড়া, সবর্ণে অসবর্ণে ঝগড়া, ডোম বাউরিতে ঝগড়া, ব্রাহ্মণ কায়স্থে ঝগড়া, জমিদার প্রজায় ঝগড়া, চাষী বর্গাদারে ঝগড়া, সরপঞ্চ ওয়াড়-মেম্বারে ঝগড়া। কত রকমের ভেদ তৈরি করেছি আমরা আমাদেরই স্বার্থের জন্যে। বুঝতে পার?"

"কিন্তু ঠাকুর, রামবাবু তো খুব বিদ্বান লোক। তিনি তো একথা বললেন না। উল্টে বললেন— খুব ভাল কথা। মিল বসুক লোকেরা কাজ পাবে। ধান ভেঙে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে চাল পেয়ে যাবে। আরো কত কি বললেন।" মণি বলল।

দুঃখী বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরো অনেক কথা বলে থাকবেন। বলে থাকবেন— ফ্যাকট্রি হবে, ট্রেড য়ুনিয়ন হবে। শ্রমিকরা একজোট হবে। শোষক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান হবে। সরকার ফ্যাকট্রি হাতে নেবে। জাতীয়করণ হবে। তারপর এই শোষিত কুলিমজুরদের একছত্রবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। তাদের স্বার্থরক্ষা করতে সমগ্র রাষ্ট্রের উৎপাদনশক্তি বিনিয়োগ করা হবে।"

"ঠিক, ঠিক — তাই তো বললেন। আমি কিছু বুঝলাম না। সত্যি, বললেন যে শোষিত দলিতদের একচ্ছত্রবাদ হবে। কি করে হবে? অনেক লোকের একচ্ছত্র শাসন কেমন করে সম্ভব? একচ্ছত্র শাসন তো একজনের মামলা। যেমন ছিল হিটলার।"

শুকুরা বলল— "বাংলায় এরকম একটা কথা আছে। বলে সোনার পাথরবাটি — সোনায় তৈরি পাথরের বাসন।"

মণি বলল— "শুনেছ 'ভাইনা'। রামবাবুর সঙ্গে জুটেছে সেই বিট্‌লে বুড়ো ভাগু মহান্তি। কি করে জুটল? দুজনের তো সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এখন দেখি ক্ষীর-নীর।"

দুঃখী বলল— "সেটা মস্ত বড় রাজনীতি। ওসব ওপরমহলের বিচার। তাকে নীচের স্তরে পরীক্ষা করে দেখছেন রামবাবু। উনি একজন মার্কসবাদী— জান তো?"

"শুনেছি। রামবাবু কথায় কথায় বলেন— মার্কস্। মার্কস্ এটা বলেছেন, মার্কস্ ওটা বলেছেন। মার্কসের শিষ্য এটা বলেছেন এমনি সব। যেমন ভাগু মহান্তি কথায় কথায় বলে 'রাধামাধব তোমার ইচ্ছা' তেমনি।"

হাসল দুঃখী। বলল, "হ্যাঁ, সেই মার্কস্ হলেন রামবাবুর গুরু। রামবাবু বলেন— নতুন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে আয়ত্ত করতে হলে পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো দরকার।"

শুকুরা — "নতুন কে পুরোনো কে?"

দুঃখী — "নতুন হল পুঁজিপতিরা আর পুরোনো হল সামন্তবাদীরা।"

মণি — "ভাইনা, এসব সত্যি বড় বড় রাজনীতির কথা। আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি দেখছি, দেশে এখন তিন রকমের গোষ্ঠী, যারা আমাদের খেয়ে বাঁচে। মুনাফাবাজ, ধাপ্পাবাজ আর ফন্দিবাজ। ব্যবসায়ীরা মুনাফাবাজ। আগে রাজা জমিদার ছিল, এখন সরকারি আমলারা হল ফন্দিবাজ। আর এই রাজনৈতিক নেতারা হল ধাপ্পাবাজ। এই তিনে একত্র হলে দেশ আর কি টিকে থাকবে? সব উচ্ছন্নে যাবে।"

দুঃখী — "কিছু হবে না। আমরা যদি এক মন হতে পারি, এই মফস্বলের লোক, গাঁ মাটির মানুষ আমরা যদি শহরের দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি তবে স্বার্থপর মুনাফাখোরেরা আমাদের কিছু করতে পারবে না।"

একটু গরম স্বরে শুকুরা বলল— "ওসব তোমার গান্ধী-ফান্ধি কথা বলবে না। গাঁয়ের মানুষ সবাই কখনো না একজোট হবে, না আমরা এই ধাপ্পাবাজদের কবল থেকে রেহাই পাব। বুঝলি মণি, দুখীদা এখন বলবে সত্যাগ্রহ করব, অনশন করব। আমি বাবা উপোস-টুপোস করতে পারব না। চল সবাইকে লাঠির এক এক ঘা দিয়ে সাবাড় করি। বাপ বাপ বলে যদি সবাই পথে না আসে তো আমার নামে কুত্তা রেখো। নেতাজী বার বার বলেছেন— মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন পয়লা সিঁড়ি। শেষতক ওর রূপ সেরকম থাকবে না। একেবারে বদলে যাবে। হাতা-হাতিয়ার নিয়ে ভারতবাসীদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবেই। তা না হলে স্বাধীনতা মিলবে না। সেজন্যে আমি বলি গো-বেড়েন করে দেব। মায়ের ভয়ে দেবতারাও কাবু হন।"

ঢাকি ঢেঁড়া পিটে শুনিয়ে গেল। তিনজনে কান পেতে শুনল। সেদিন সন্ধ্যায় সভা হবে। কংগ্রেসপ্রার্থী হৃদয়রঞ্জন রায় আর কংগ্রেসের যুব-সভাপতি জয়রাম নায়ক ভাষণ দেবেন।

ঢাকি চলে যাওয়ার পর মাইকেও গাঁক গাঁক করে বলে গেল জয়রাম ও হৃদয়রঞ্জন ভাষণ দেবেন।

ওড়িশা কংগ্রেসের যুব-সভাপতি! দুঃখীর হাসি পেল।

শুকুরা জিজ্ঞেস করল— "হাসলে কেন ভাইনা? "

"সে এক বিরাট ইতিহাস।" দুঃখী বললে— "মনে পড়ে যেতে হাসি পেল।" মণি ও

শুকুরার ভারি আগ্রহ শুনতে কি সে ইতিহাস। খুব মজার হবে নিশ্চয়ই। দুঃখী বললে অল্প কথায়— একটু একটু।

"ইতিহাস নয়, পুরাণ। এখন তো জয়রামের নাম হয়েছে ভস্মাসুর। হরিরামের বর পেয়ে নেতা হলেন, পয়সাও করলেন। এখন ধাওয়া করছেন হরিরামের মাথায় হাত দিয়ে ভস্ম করে দিতে। হরিরাম পালাতে চান, জয়রাম পিছনে তাড়া করছেন। এই পালা চলছে কংগ্রেসের ভিতরে। ওপরে বড় বড় নেতা এর পিছনে থেকে খেলা খেলছেন। সকলের ইচ্ছে পুরোনো কর্মী, নেতা প্রতিভাশালী হরিরামবাবু কি করে একেবারে বিদেয় হন। সেজন্যে জয়রামকে উসকে দিয়েছেন হরিরামের বিরুদ্ধে।"

"কেন, ওপরের বড় বড় নেতাদের পাকা ধানে কি মই দিয়েছিলেন হরিরামবাবু?" শুকুরা জানতে চাইল।

আরে, যারা হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করে, বিপ্লব সফল হওয়ার পরে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কুকুরের মতো। কুকুরগুলো এঁটোপাতা চাটার সময় যেরকম করে তেমনি। হরিরামবাবু তো একজন ওপরওয়ালা। তাঁকে খসিয়ে দিলে রাজ্য নিষ্কণ্টক। এমনি কত নেতাকে কত কায়দায় খসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্যাটেল বেচারা মরে গিয়ে তরে গেলেন। রাজাজী, কৃপালিনী, জয়প্রকাশ, শঙ্কর রাও, প্রফুল্ল ঘোষ— কে যে কোথায় গেলেন কোনো ঠিকানা নেই।"

" আচ্ছা দুখী ভাইনা, কংগ্রেস নেতারা নাকি অহিংস সংগ্রাম করেছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে? তুমি যে বললে হিংসাত্মক আন্দোলন?" মণি জিজ্ঞেস করে।

"আরে মহাত্মা গান্ধীই শুধু অহিংস আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর চেলাদের কি তাতে বিশ্বাস ছিল? তারা গান্ধীজীর লোকপ্রিয়তা থেকে ফায়দা তোলার জন্যেই কিনা তাঁর চোখে ঠুলি বেঁধে তাঁকে বারো দুয়োর করাচ্ছিল।"

"যেখানে হিংসা হয়েছিল সেই আন্দোলনের শেষে কি এমনি আপনার আপনার মধ্যে হানাহানি করেছিল?" শুকুরা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, রাশিয়াতে কি হল? স্টালিন রাজা হলেন। একচ্ছত্র শাসক বা ডিক্টেটার একচ্ছত্র সম্রাটও তাই। একই কথা। বেচারা ট্রটস্কি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল বিদেশে। সেখানেও কি রক্ষা? সেখানে তাকে হত্যা করা হল। এমনি কত ট্রটস্কি কত বেরিয়া মরে থাকবে কে জানে! ভারতেও সেই লীলার অভিনয়।"

শুকুরা শুনছিল। আর ওর চোখের সামনে নেচে উঠছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই দুর্ভাগ্য দুর্দশা। ভারতবর্ষে এ যুদ্ধ কতকাল থেকে চলেছে। মহাভারত কেন, রামায়ণ যুগ থেকে। এর কি শেষ নেই?

শত্রু থাকে মায়ের পেটে। এ কথাটা কেবল এই ভারতভুঁইয়ের লোকদের মুখেই শোনা যায়। আমাদের দেশের লোক এই লীলা কত দেখেছে, গায়ে মেখেছে। আমাদের রক্তে যদি ভাইয়ের গলায় ভাই ছুরি দেবার আদত না থাকত তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের এ দুর্গতি হত কেন? আমরা কেন আত্মসমর্পণ করতাম ইংরেজের কাছে? জাপানীরা ভারি চালাক। আমাদের

ইংরেজ কামানের আহার করে দিয়ে পিছনে রয়ে গেল। তারপরে পিছনে হটা। পলায়ন। বীরত্বের সঙ্গে পিছু হটে গেল। ধরা পড়লাম আমরা। বর্মা, মালয়, আন্দামান নিকোবর যে যেখানে জাপানের হাতে বন্দী হয়ে থাকার পরে নেতাজীর কৌশলে আজাদ হিন্দে যোগ দিয়েছিল— হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য। ধরা পড়ল ইংরেজদের হাতে।

ভারতীয় সৈন্য লড়ছিল ইংরেজদের পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে। জাপানীরা দখল করে নিল বর্মা, মালয়, আন্দামান নিকোবর। ধরা পড়ে গেল যত ভারতীয় সৈন্য। কালা আদমী। গোরা নয় কিম্বা হলদে নয়। ইংরেজ হোক বা জাপানী হোক কেউ এ কালা আদমীদের দেখতে পারে না। জাপানের বন্দীশালায় সে কি দুঃখ! সে কি যন্ত্রণা! বলা যায় না।

ওদিকে চলছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। দেশের জন্যে বহু দুঃখ কষ্ট সয়ে চলেছিল ভারতবাসী। কত বীরের শির লুটিয়ে পড়ছিল পুজোর ফুলের মতো দেশমাতার পায়ের তলায় দেহ থেকে আলগা হয়ে। মহাত্মাজীর ডাক। তাঁর নাম, তাঁর মন্ত্র। যাতে গায়ের লোম খাড়া হত।

শোনা গেল জাপানীরা ভারতীয় সৈন্যদের খালাস করে দেবে। এশিয়া মহাদেশ থেকে সাহেবদের হটিয়ে মুক্ত স্বাধীন এশিয়া নতুন করে গড়ার জন্যে জাপান সরকার ঘোষণা করেছে। সর্দার মোহন সিং জাপান সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক স্বতন্ত্র বাহিনী গড়বেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়বার জন্যে।

কিন্তু কি হল কে জানে সে প্রস্তাব ভেস্তে গেল। তারপর পূর্ব দিকে উঠে এলেন নতুন সূর্য। সেই মহাপুরুষ দেবতাত্মা হিমালয়ের মতো বড়। ভারত মহাসাগরের মতো গভীর। সে নাম মনে করলে এখনো শুকুরার গা উলসে ওঠে। চোখে জল জমাট বাঁধে।

জার্মানী থেকে ডুবোজাহাজে এলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। ওড়িশাতে জন্ম। ওড়িশার জলহাওয়াতে মানুষ। ওড়িশার গর্ব নেতাজী সুভাষ। দিন কয়েকের মধ্যে গড়ে তুললেন এক বিরাট সেনাবাহিনী— আজাদ হিন্দ ফৌজ। এক স্বাধীন ভারত সরকার— 'আরজে হুকুমতে আজাদ হিন্দ্।'

সেদিন কি আনন্দ। তুঙ্গ গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের মতো সে কি বিরাট আশা— বিপুল কল্পনা! ভারত স্বাধীন হবে। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য ভারতবাসী শত্রুর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম লড়তে প্রস্তুত। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন— যে ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে এরকম যুদ্ধ করার সুযোগ মেলে সে সুখী।

সেই আশা আজ আর তুচ্ছ কল্পনা নয়। স্বপ্ন নয়— সত্য। বাস্তব। আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরদর্পে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছে। মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। সে কি আনন্দ! কল্পনার অতীত। বর্ণনার অতীত। শুধু আনন্দ নয়— উন্মাদনা, সকলে উন্মত্ত।

কিন্তু হায়! ভারতের ভাগ্যে বিধি যেন চিরদিনের জন্য লিখে দিয়েছে— ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হিংস্র তৃপ্তি। ভারতীয়ই ভারতবাসীর পরম শত্রু। সেদিন যদি ভারতীয়রা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করত তবে ভারতমাতার মাথায় সর্বপ্রথম স্বাধীনতার অম্লান মুকুট পরিয়ে দিত আজাদ হিন্দ ফৌজ, পরিয়ে দিতেন নেতাজী।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি ভারতকে করায়ত্ত করতে পারত সেদিন, তবে নেতাজীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে ভারত আজ নামমাত্র স্বাধীন হয়ে আমেরিকা ও রুশের কাছে মাথা বিকিয়ে দিত না— ভিক্ষাং দেহির থালা নিয়ে বৈদেশিক শক্তির দোরে দোরে যাবার দুর্ভাগ্য বরণ করত না।

দাঁত কড়মড় করে উঠল শুকুরার। দেশদ্রোহী 'গোয়ালিয়র ল্যানসর'। সেদিন যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করত নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে পথ ছেড়ে দিত — দেশের নামে, দেশবাসীর নামে, মহাত্মা গান্ধীর নামে, নেতাজী সুভাষের নামে, তবে ভারতের ছবি আজ ভিন্নরূপ নিত। নেতাজীর মৃত্যুর সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা প্রহসন করতে ভারত-সরকারের সাহস হত না। দরকার হত না।

"জানো ভাইনা", শুকুরা ঘুম থেকে ওঠার মতো বলে উঠল— "আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের কতক 'ইরেগুলার' ভারতভুঁয়ে যখন পা দিলাম সে কি আনন্দ! কি জয়ধ্বনি! কি বিজয় উল্লাস? ইম্ফলের পতন আর দেরি নেই। কালকের মতো মনে হয়। এটা তো মে মাস, একষট্টি সাল? সেটা ছিল মার্চ উনিশ শ চুয়াল্লিশ। বসন্ত বাতাস বইছিল। শীত চলে গিয়েও যায়নি। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টির জন্যে যা একটু আধটু ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু হায়! এত সুখ সইতে পারল না বিধাতা। গোয়ালিয়র ল্যাঙ্গারদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আমাদের হল ঘোর বিপর্যয়। ভারতীয়ের এ চরিত্র চিরদিনের জন্যে কলঙ্ক হয়ে রইল।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল শুকুরা।

"আমার মনে হয় আজাদ হিন্দ ফৌজই ভারতকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।" ভাবালু মন্তব্য করল দুঃখী। "অবশ্য গান্ধীজীর প্রেরণা কাজ করেছে সব জায়গায়। গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক প্রভাবের মূল্য সবথেকে বেশি। তবুও ভারত, বর্মা ও সিংহলকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়ার পিছনে আজাদ হিন্দ ফৌজের গড়ে ওঠা ও বিরোধ থেকে পাওয়া শিক্ষা যে উদ্দিষ্ট ফল দেয়নি তা নয়। ভারতীয় সৈন্যদের ওপরে ইংরেজরা আস্থা হারিয়েছিল। এই বিরাট ভূখণ্ডকে কয়েকজন মাত্র ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে রক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন ভারতে ব্রিটিশের বড়লাট ছিলেন একজন মিলিটারী লোক — লর্ড ওয়াভেল। তোদের সেখানে যেটা বললি মার্চ মাসের ঘটনা— মার্চ এপ্রিল দুটো মাস যাওয়ার পরে, বড়লাট গান্ধীজীকে ছেড়ে দিলেন। তারপরে অনেক পর্ব। ভারত ছেড়ে ব্রিটিশেরা চলে গেল শেষে।"

শুকুরার বুক ফুলে উঠছিল। চোখের তারা দুটো জ্বল জ্বল করছিল। সে বলতে থাকে — "নেতাজী। নেতাজীর জন্যে সবকিছু।" নমস্কার করল নেতাজীর উদ্দেশে। আবার বলল, "কিন্তু লাভ কি হল? ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গেল অন্যকিছুর জন্যে নয়, আমাদের একতার জন্যে। আজাদ হিন্দে আমরা সবাই ছিলাম এক — এক মন, এক আত্মা। ব্রিটিশ সরকার এখানে স্বার্থপর নেতাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের স্বাদু চাখিয়ে দিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে দিল। আজাদ হিন্দে সে বিষ কাজ করেনি। গোয়েন্দা লাগিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিল। ফল হয়নি। কি করে হত? আমাদের সামনে কি ক্ষমতার লোভ ছিল তোমার নেতাদের মতো? হ্যাঁ, একটা লোভ ছিল। মরবার

লোভ। সে লোভ কার না হবে? নেতাজী যখন সামনে খাড়া হয়ে যান মনে হয় সত্যি যেন মরণটাকে একটা লাল টকটকে বলের মতো হাতে করে নাচাচ্ছেন। আমরা সব ছেলেমেয়েরা মা-বাবার কাছে আবদার করার মতো পেতে চাইছি সেই মরণকে। চরম ত্যাগের পরম প্রতিমূর্তি নেতাজী। আমরা নেতাজীর দিকে তাকিয়ে শপথ করেছিলাম, আমরা সবাই ভারতীয়। কেউ মুসলমান বা হিন্দু নই— জাতিধর্মের কোনো ভেদ থাকবে না। খালি কথায় নয় কাজে— যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখিয়ে দিয়েছিলাম, প্রমাণ করে দিয়েছিলাম। হিন্দু রক্তের সঙ্গে মুসলমান রক্ত খ্রীষ্টান রক্ত একসঙ্গে এক জায়গায় ঢেলে দিয়ে, এক মাটিতে এক শেজে সেই যুদ্ধভুঁইতে একসঙ্গে আল্লা হো আকবর রামকৃষ্ণকী জয় গেয়ে শত শত প্রাণ মরণের খোরাক করে ছুঁড়ে দিয়েছিল— সেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা।

"কিন্তু কি করলে তোমার নেতারা? আমরা রক্ত দিয়ে যে একতা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, একটি রাত্রের মধ্যে, পনেরো আগষ্ট রাতে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। ক্ষমতার লালসা এমন পাগল করে দিল যে আপন স্বার্থের জন্যে মাতৃভূমিকে, সারে জহাঁসে আচ্ছা আমাদের এই হিন্দুস্থানকে হিন্দু-ভারত মুসলমান-ভারত করে দুখানা করে দিয়ে দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা হয়ে বসে গেল। তুমি জান ভাইনা, আমরা আজাদ হিন্দের সভ্যরা আগষ্ট পনেরোকে পরাধীনতা দিবসরূপে পালন করেছিলাম। হাতে কালো কাপড় বেঁধেছিলাম। যে ভারতে করাচী নেই, লাহোর নেই, যে ভারতে ঢাকা নেই, মৈমনসিং নেই, সে ভারত ভারত নয়। আজকের এ ভারত নেতাজীর স্বপ্নের ভারত নয়। একজন আজাদ হিন্দ ফৌজের সভ্যের পক্ষে পাকিস্তান যেমন বিদেশ, ইন্ডিয়াও তেমনি বিদেশ।

"আমার কি মনে হয় জানো ভাইনা? ক্ষমতার জন্যে, আসনের জন্যে আমাদের এ নেতারা কোনো দুষ্কর্ম না করতে পারে এমন নেই। এ দেশে ভায়ের রক্তে ভাই হোরি খেলতে পারে। ওহ্, বুক ফেটে যায় না এদের? মুসলমানেরা বিদেশ থেকে এসেছিল সত্যি। এ দেশ আক্রমণ করে ফতে হাসিল করেছিল সত্যি। তবে পাঠান হোক, মোগল হোক, যারা এল তারা এই দেশের এই মাটির মানুষ হয়ে গেল। এদেশের জন্যে এ দেশের বাসিন্দাদের চেয়ে তাদের কম মোহ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ? সেই গোরা চামড়ারা কি মিশল এ কালা আদমীদের সঙ্গে? আমরা চাইলাম মেশাতে। মিশতে তো পারলাম না। তাদের এঁটো চাটতে পেলে আজও আমরা কৃতার্থ হই। আর তারা? তারা ভারতকে করল চরাভুঁই। এখানে চরে বেড়িয়ে ফিরে যাচ্ছিল আপনার গোয়ালে। এ দেশকে আপনার করতে তারা কোনোদিন চেষ্টাও করেনি।

"ইংরেজ গেল। এ দেশের কতক কালো চামড়ার নেতা যারা শাসন করল ভারতকে, তারা বাইরে দেখতে ভারতীয় কিন্তু ভিতরে ইংরেজ। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের শেষ ব্রিটিশ শাসক নন। এ দেশের শেষ ব্রিটিশ শাসক কে খোলা চোখে ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। এরা দেশ শাসন করল। দেশকে আপনার মনে করল কেবল নিজের ফায়দা তোলার জন্যে কিন্তু দেশবাসীকে আপনার করতে পারল না। তা করার যদি চিন্তাও থাকত, তবে নিজের নিজের মধ্যে ঝগড়া করে দেশকে এমন দুর্বল করে দিত না। নিজের আসন স্থায়ী

করার জন্যে দেশবাসীর নৈতিকতাকে ভোটের নামে এত নীচে নামিয়ে দেওয়ার কারিগর হত না। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আমেরিকা রাশিয়ার তোষামোদ করত না।"

দুঃখী শুধু শুনে যাচ্ছিল। শুকুরা আজকে আর এই গাঁয়ের খেটেখাওয়া রুজিমজুর শুকুরা নয়। শুকুরার এ অদ্ভুত রূপ। এ ভাষা সে পেল কোথায়? ওর মনে এ ভাব এল কি করে? নেতাজী কি কোনো যাদুকাঠি রাখতেন! মূর্খ শুকুরার সঙ্গে আজকের কোনো শিক্ষিত যুবক সমান হবে না।

শুকুরা জিজ্ঞেস করল— "শুনছ তো দুখীদা, নাকি ঝিমুচ্ছ?"

"সব শুনছি। খুঁটিনাটি সমস্ত।"

"কিছু বলছ না যে?"

"বলার কিছু নেই। কেবল শোনার কথা।"

শুকুরার কথার স্রোত তখনো শেষ হয়নি, শুকিয়ে যায়নি। বললে, "শুনবে দাদা? তোমার নেতাদের মতো আমরা ডরাকু বা ভীরু ছিলাম না। আজ আমেরিকার পেছনে, কাল রুশের পেছনে, পরশু চীনের পেছনে ছুটতাম না। অবশ্য ভগবান গরজের বেলায় গাধার পা-ও ধরেছিলেন। আমরা জাপানের সাহায্যে নিয়েছিলাম। কিন্তু জাপানের তাঁবেদার হইনি। নেতাজী জাপানের সঙ্গে এক সমকক্ষ শক্তির অধিনায়কভাবে ব্যবহার করতেন। তুমি ভাবলে বুঝি আরাকান থেকে সরে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে গেল বা হিম্মত হারিয়ে ফেলল। তা নয়। আমরা আরাকান পর্বতমালা থেকে পিছিয়ে এলাম অগত্যা। কিন্তু মনের বল হারাইনি। আমরা চলে এলাম রেঙ্গুনে। সেখান থেকে তাজা আরেক দল ফৌজ আবার অভিযান করল ইম্ফলের দিকে। যারা থেকে গেলাম, তাদের নিয়ে শহীদ দিবসে কুচকাওয়াজ করালেন নেতাজী। কোথায় জান?"

শুকুরা ডান হাত মাথায় ঠেকিয়ে সেলাম করল। বলল, "সেই মহান আত্মা ভারতের শেষ সম্রাট মোগল রাজবংশের শেষ উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহের পুণ্য কবরপীঠের সামনে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মিলিটারী রীতিতে সম্মান জানালাম। কি হিন্দু কি মুসলমান। সকলের মুখ লাল। গা গরম। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শেষ সম্রাটের প্রতি যে অমানুষের মতো বর্বর ব্যবহার করেছিল তার প্রতিশোধ নিতে সকলে যেন পণ করেছে। সেই প্রতিজ্ঞার শক্তি এমন যে সকলের চোখ জ্বলছিল।

"ভাইনা, আজ যে ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কথা বলে কৃতকৃত্য হয়ে যায়। ঠিক ইংরেজদের মত ইংরিজি ভাষা বলতে দাঁত চেপে গাল ফুলিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়াকে গৌরবের মনে করে। বিলেত আমেরিকা গিয়ে লেখাপড়া করে এলে নিজেকে দেবতা জ্ঞান করে আর যে গোলামের বাচ্চা গোলামেরা এদের সেলাম ঠোকে তারা কি বাহাদুর শাহের করুণ-কাহিনী পড়েছে? পড়লে তারা কি কখনো ইংরিজি ভাষায় কথা বলত? ইংরিজি পোশাক পরত? লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট বেডটি খেত? ইতিহাস পড়েও যে ইংরেজ বনতে চায় সে ইংরেজদের জারজ সন্তান।

"কি না করেচে এই পশু ইংরেজরা! কি কষ্ট কি অপমান না দিয়েছে মোগল সম্রাট

বাহাদুর শাহকে! অমানুষ পশু অসভ্য বর্বর ওই জাত। তুমি পড়েছ নিশ্চয়?"

"পড়েছি। অনেকদিন আগে। তুই বল। তোর মুখ থেকে শুনতে খুব ভাল লাগছে।" বলল দুঃখী।

"শোন ভাইনা, তুমি তো জান বাহাদুর শাহকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিল বর্মায়— রেঙ্গুনে। ভারতের মাটি ছুঁয়ে রইলে পাছে আবার কখন কারা জেগে ওঠে। আবার যদি সিপাহী বিদ্রোহ হয়! তাই একেবারে কালাপানি পার। নির্জন কারাবাস। কেউ জানল না কি করছেন তিনি সেখানে। কেবল জ্যান্ত থাকাকালেই নয়। মরা শবটাকেও এত ভয় ওই গোরাজাতের, ওঁর ভূতটাকে। পাছে চেপে বসে। পাছে ওঁর শবের কোনো অংশ পবিত্র মনে করে ভারতবাসী বাহাদুর শাহের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। তারই জন্যে সে শবকে নিয়ে এমন জায়গায় এমনভাবে কবর দিল যাতে কেউ জানতে না পারে। যেখানে বাহাদুর শাহকে কবর দেওয়া হয়েছে, ' দফন' করে দিয়ে মাটিকে সমান করে ঘাস লাগিয়ে দিল তার ওপরে। যেন কেউ জানতে না পারে কাউকে কবর দেওয়া হয়েছে সেখানে। এত বড় বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা বলে কথা আছে। তোমরা এত বড় সভ্য জাতি বলে গর্ব কর, তোমাদেরও রাজা আছে রানী আছে। তোমরা কোটি কোটি ভারতবাসীর অতি প্রিয় এই সম্রাটের শবকে সামান্য বিধিমতো সম্মান দিতে পারলে না? মরার সময়, শবকে কররের ভিতরের ফেলে দেবার সময় কাকপক্ষী একটাকেও দেখতে দিলে না! ফুলের তোড়া না দিক একগোছা ঘাস এক চিলতে খড়ও তো কেউ ফেলত। মারা যাবার আগে তিনি নিজে শায়েরী লিখে গেলেন—

কোই আকে ফুল চড়ায়ে ক্যোঁ
কোই আকে সমা জলায়ে ক্যোঁ
কোই বাহর ফতেহা আয়ে ক্যোঁ
ম্ব বেকসী কা মগর হুঁ।"

দুঃখী জিজ্ঞেস করল, "এর মানে কি?"

"এর মানে হল— আমার সমাধিতে কেনই বা কেউ এসে ফুল দেবে, কেন কেউ দীপ জ্বালাবে, কেনই বা কেউ এসে ফতেহা পড়বে? আমার মরণ পাত্রটি শুধু এমনি বিষাদে ভরা।"

"আহা"— দুঃখী দুঃখ করল।

"ব্রিটিশ পল্টনরা আগেই খাত খুঁড়ে রেখেছিল। মরে যেতেই এনে সেই গর্তে চুপচাপ ফেলে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিল, কেউ জানতে পারল না।"

দাঁত কড়মড় করল দুঃখী— "সেই ইংরেজ সেই ব্রিটিশদের সঙ্গে আজ ভারতের প্রীতি। আমরা স্বাধীন হয়েও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সভ্য। নির্লজ্জ গোলাম। ইংরেজের কুত্তা।"

এই সময় এসে রসভঙ্গ করলেন রামবাবু। বললেন— "কি গো দুখীঠাকুর, তুমি এখানে বসে যে? ওদিকে তোমার কংগ্রেসের সভা হচ্ছে, যাবে না?"

"কংগ্রেসটা আমার বলে তোমাকে কে বলল?"

"তুমি না কংগ্রেসের সেক্রেটারি?"

"অনেকদিন হল সে পদ থেকে বিদায় নিয়েছি।"

"বিদায় নিয়েছ না তাড়া খেয়েছ?"

"তাড়া খায় কম্যুনিস্টরা, নয় কি? সেটা পার্টির একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। কংগ্রেসওলারা ক্বচিত। একটা-আধটা দৈবাৎ।"

"সেটা হবার কথা। আমরা একটা ডিসিপ্লিন্ড্ পার্টি। আমাদের শৃঙ্খলার খুব কড়াকড়ি। কংগ্রেসে তো শৃঙ্খলা নেই। সেখানে যারা তাড়া খায় শৃঙ্খলাভঙ্গ করল বলে তারা শাস্তি পায় না। তাদের তাড়ানোর পিছনে বিষম ষড়যন্ত্রের ইতিহাস থাকে। আমাদের সেরকম চিন্তা কেউ করে না।"

শুকুরা বলল— "সেরকম তো হবেই। কাপড় পরার সময় দেখবে কখন কষি খুলে গেছে তো কষি আঁটতে আঁটতে ওদিকে কখন কোঁচা নয়ত কাছা খুলে নীচে লুটোচ্ছে। প্যান্ট কোট পর— সবসময় ফিটফাট টাইট।"

"শুকুরা বেশ মজার মজার কথা বলছে।" বললে দুঃখী। "এ আর সেই আগের শুকুরা নেই। রোজ খবরের কাগজ পড়ে। ওর কথা সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কথাটা তলিয়ে দেখলে মনে হবে সত্যি। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, আমরা ওড়িয়াতে লেখার সময় যত বানান ভুল করি ইংরেজি লিখতে তত করি না। এই যে রাস্তাঘাটে সরকারি নির্দেশনামা সব বসিয়েছে কিম্বা কোম্পানিরা বিজ্ঞাপন মেরেছে সেটা যদি ইংরেজিতে হয় তবে বিশেষ ভুল পাবে না কিন্তু ওড়িয়াতে হলে তাবৎ ভুল। ভাষা ভুল, বানান ভুল, সব ভুল। সেদিকে কারো নজর থাকে না।"

"হুঁ, বুঝলাম।" রামবাবু গম্ভীর হলেন। "কিন্তু আমাদের পার্টির শৃঙ্খলার সঙ্গে এ কথার কি সম্পর্ক?"

"রামবাবু, আমি কিন্তু ঠাট্টা করে বলেছি। কিছু মনে কোরো না। বলছিলাম কি, নতুন মুসলমান দিনে চোদ্দবার নামাজ পড়ে। নিজে জবাই করে গোরু খায়।"

দুঃখী হো হো করে হেসে উঠল। রামবাবুও বাধ্য হয়ে হাসলেন। কিন্তু আর বসলেন না। বললেন— "ওই যে ভাষণ শোনা যাচ্ছে। আমি যাই, দেখি কে কি বলে।"

দুঃখী বললে— "আমরাও যাই চল। দূর থেকে শুনব। মাইকে তো শোনা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত।"

"বারো বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। আপনারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। স্বাধীনতার পরে যারা শাসনের দায়িত্বে রইলেন তাঁরা বয়োবৃদ্ধ। উত্তম শাসনের জন্য যুবরক্ত দরকার। তাই কংগ্রেসের ভিতরে নতুন রক্তসঞ্চার করতে হবে। তার জন্যে ওড়িয়া কংগ্রেস যুবশক্তিকে আহ্বান করেছে। আমাদের সভাপতি একজন যুবক। আপনারা তাঁর ভাষণ শুনুন।"

একজন উঠে পড়ে বললে— "আজ্ঞে, বুড়ো কে ছোকরা কে আমরা চিনব কি করে? সবাই তো বলছে 'আমরা যুবক'— ষাট বছরের প্রধানমন্ত্রীও যুবক।"

"চুপ কর, চুপ কর "। একদল ছোকরা চেঁচামেচি করে সেই লোকটিকে বসিয়ে দিল।

শুকুরা বলল— "ওই যে ভাষণ দিয়ে বসে পড়ল— ঠিক ঠিক এই তো সেই কলকেতিয়া নেতা। ঠিক মনে পড়েছে— হৃদয়রঞ্জন রায়। এখানকার প্রার্থী হবে বোধহয়।"

"চুপ, কথা বোলো না। সভাপতির ভাষণ শোন।" দুঃখী দাস বললে। ভাষণ শোনা গেল।

"প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ফেন্ডস্। আই অ্যাম সরি। আমি ইংরেজিতে বলে ফেলেছি। অনেকদিন বিলেতে থেকে ইংরেজি বলা হ্যাবিট হয়ে গেছে।"

তালি পড়ল। দুঃখী টিপে দিল শুকুরার হাত।

"আমার ওড়িয়াতে ভুল থেকে যেতে পারে। সেজন্য এক্সকিউজ্ করবেন। আমি ইংরেজি বললে অ্যাট অল মিস্টেক হবে না।"

আবার তালি। দুঃখী বললে "দেখলি তো শুকুরা আমাদের লোকদের মতিগতি?"

ভাষণ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"আমি আপনাদের সার্ভিস— মানে — মানে", হৃদয়রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে— "মানে কি — মানে কি — ফুলিস"—

হৃদয় প্রম্পটিং করলেন— "সেবা"—

"ইয়েস সেবা— মানে আমি আপনাদের সেবা করতে চাই। আমার বিশ্বাস আপনারা আমায় ডিপ্রাইভ — মানে— মানে...."

(প্রম্পটিং— 'বঞ্চনা')

"আপনারা আমাকে তার থেকে বঞ্চনা করবেন না। আমাকে আপনাদের সেবা করবার অপারচুনিটি — মানে— মানে...."

(প্রম্পটিং— 'সুযোগ')

"মানে সুযোগ দেবেন। আমি আপনাদের কাছে অপারচুনিটি মানে সুযোগ ভিক্ষা করছি। আমি সুযোগ পেলে আপনারাও সুযোগ পাবেন। সকলে সুযোগ পেলে ইমিডিয়েট ডেভলাপমেন্ট হবে — মানে— মানে—"

(প্রম্পটিং— 'অভিবৃদ্ধি'.... 'অভিবৃদ্ধ')

"মানে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সব অভিবৃদ্ধ হয়ে যাবেন।"

খুব জোরে তালি পড়ল। নেতা ভাবলেন লোকে খুব পছন্দ করছে। তিনি আরো জোরে গর্জন করে বক্তৃতা দিলেন— "আপনারা আমার ওড়িয়া লেকচারে মুগ্ধ। আমি তার জন্য আপনাদের কাছে ওবলাইজড্ মানে—"

(প্রম্পটিং— 'কৃতজ্ঞ' কিন্তু নেতাকে 'কৃতঘ্ন' শোনালো)

নেতা বললেন— "আমি আপনাদের কাছে কৃতঘ্ন!"

শুকুরা বললে— "ভাইনা, লোকেরা কৃতজ্ঞ আর কৃতঘ্নের মধ্যে প্রভেদটা বোঝেনি—"

নেতা ওদিকে বলছিলেন— "কিন্তু আমি যদি ইংরেজিতে বলি, আপনারা আরো তালি দেবেন। ইংরেজিতে বলছি, হৃদয়রঞ্জনবাবু ওড়িয়াতে অনুবাদ করে দেবেন। বলব ইংলিশে?"

"বলুন, বলুন" বলে চিৎকার হল। নেতা ইংরেজিতে বলতে থাকেন, হৃদয়রঞ্জন অনুবাদ করে যান।

"আমার জন্ম ইংল্যান্ডে কিন্তু আমি ওড়িয়া।"

তালির ওপর তালি।

"আমার পিতা ইংল্যান্ডে বিবাহ করার দরুণ আমার পিতৃভাষা ওড়িয়া কিন্তু মাতৃভাষা ইংরেজি।"

তালি।

"ইংরেজ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করার বছরে আমার জন্ম। সেজন্য আমার পিতা আমার নাম জয়রাম রাখলেন। আমি জয় ছাড়া পরাজয় জানিনি জীবনে।"

আবার তালি।

"আমায় যদি আপনারা আপনাদের সেবক করে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসান তবে আর কারো খড়ের চাল থাকতে দেব না। কারো হাঁড়িতে ঝুলকালি লাগবে না। সব পাকাঘর টাইল ছাপর হয়ে যাবে। ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জ-এ রান্না হবে। মা মাসী বোনেরা আর পুকুরে গা ধুতে যাবে না। ঘরে ঘরে জলের কল লেগে যাবে।"

তালির পর তালি। অপর্যাপ্ত তালি। ঢেউ উঠেছে। বন্ধ হবে না বুঝি। যা হোক কিছুক্ষণ বাদে বন্ধ হল। সভা ভাঙল। মহাত্মা গান্ধীকি জয়, স্বাধীন ভারত কি জয়, পণ্ডিত নেহেরু কি জয়, জয়রাম নায়ক কি জয়ধ্বনি দিয়ে সকলে বাড়ি ফিরে গেল।

সভার শেষে, সবার শেষে হৃদয়রঞ্জনবাবু রামবাবুকে নিয়ে জয়রামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "ইনি হলেন আমাদের কম্যুনিস্ট নেতা রামবাবু বি.এ.এল্ এল্ বি— অনেক ট্রেড য়ুনিয়নের সভাপতি।"

জয়রামবাবু রামবাবুকে করমর্দন করে বললেন— "আই নো, আই নো, কম্যুনিস্ট পার্টি দি ওনলি ডিসিপ্লিন্‌ড্ পার্টি অব্ ইন্ডিয়া।"

দুঃখী আর শুকুরা বাড়ি ফিরে এল। পথে দেখা হল রামবাবুর সঙ্গে। "রামবাবু, কেমন লাগল?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"একটা চাঞ্চল্যকর ভাষণ, তাই না?" রামবাবু উত্তর দিলেন।

"কেন ইংরেজিতে বললেন বলে?"

"না - না— তা নয়। তবে কি চমৎকার ইংরেজি বললেন জয়রামবাবু। তুমি নিশ্চয় একমত দুঃখীদা?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" শুকুরা বলল। "মনে হল সত্যি যেন লন্ডন থেকে উড়ে এলেন।

কোন ওড়িয়া এমন ইংরেজি বলতে পারবে। বলছেন না তো, খালি উগরে ফেলছেন ইংরেজি!''

''এগ্‌জ্যাক্টলি'', রামবাবু বললেন।

শুকুরা বললে, ''সেরকম না হলে ভারতবর্ষে কেউ কি নেতা হতে পারে? আমাদের দেশে গেঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না। ওড়িয়া বললে লোকেরা বুঝেও বোঝে না। ইংরেজি বললে আমরা কিছু না বুঝেও বুঝি। শুনেছি আমাদের ওড়িয়াদের নাড়ি টিপে রোগ চিনেছিলেন বলে ওড়িয়া আন্দোলনের নেতারা তেমন ওড়িয়া বলতেন না, বলতেন ইংরেজি কিম্বা বাংলা। গান্ধী ইংরেজি না পড়ে থাকলে ইংরেজিতে না লিখলে কি এতবড় নেতা হতে পারতেন? ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে আমার কেমন ভাল ইংরেজি জানা লোকেদের খুঁজে কি নেতা বানাইনি? জিন্না পাকিস্তানের আদি কর্তা। কিন্তু সবগুলো অ-মুসলমান কাজ তিনিই করতেন। কেবল সাহেবি পোশাক সাহেবি কথার জন্যে তাঁকে মুসলমানেরা নেতা বলে মেনেছিল। আমি কি ভুল বলছি?''

দুঃখী বললে ''রামবাবু, ওর কথা বাদ দাও। এরকম কথা বলা ও শিখে এসেছে আজাদ হিন্দ ফৌজে থেকে। বল তো তোমার পার্টি কাকে সমর্থন করছে?''

''তুমি দেখনি? কাগজে আমাদের সেক্রেটারি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যেখানে আমাদের প্রার্থী থাকবে না সেখানে আমরা কংগ্রেসকে সমর্থন করব।''

''বেশ, তা যদি হয় বিধানসভাতে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল হলে আপনারা ট্রেজারি বেঞ্চে বসবেন তো?''

''না, আমরা অপোজিশানে বসব।''

''এ কেমন কথা? নির্বাচনে সমর্থন আবার....''— দুঃখী আশ্চর্য হল।

''কেন?'' বললেন রামবাবু। ''ভুলটা কোথায়? বর্তমান কম্যুনিস্ট বাদে যত দল দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে লেসার ইভিল হল কংগ্রেস, তাই আমরা তাদের সমর্থন করব। তা বলে কি আমরা কংগ্রেসী বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মেলাব? অসম্ভব।''

''লেসার ইভিল কি দুখীদা?'' জিজ্ঞেস করল শুকুরা। ছাত্র শিক্ষককে জিজ্ঞেস করার মতো।

''মানে 'কম খারাপ'।'' বলল দুঃখী দাস। ''কিন্তু রামবাবু, তোমরা কংগ্রেসের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে তাদের সাহায্য করেছ বলে বলবে না লোকে?''

''বলুক। কংগ্রেসের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আমরা যদি আরো কয়েকটা জায়গা থেকে আসতে পারি তবে মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো হবে। ক্ষতি কি? শুধু কি মাছের তেলে মাছ ভাজবো? এবার আমাদের পার্টির লোক কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে মন্ত্রীও হবে। কি ভাবছ? বোলো না যেন কোথাও।''

''শেষে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট পার্টিকে হজম করে ফেলবে, সাবধান।'' দুঃখী বললে।

রামবাবু চলে যেতে যেতে বললেন, '' অসম্ভব। যে পর্যন্ত ভারতে দরিদ্র থাকবে, শোষিত

থাকবে, কম্যুনিস্ট পার্টি থাকবেই। তাকে কেউ হজম করতে পারবে না। সব লাল হো জায়েগা।"

রাস্তা ধরে চলে গেলেন রামবাবু। দুঃখী আর শুকুরা ফিরে এল বাসায়।

রাম আর দুঃখী। রামবাবু আর দুঃখী দাস। দুটো সমান্তরাল সরলরেখা। শুকুরা সে দুটোকে যেন ছেদ করেছে। ফলে তৎসম্ভূত অনুরূপ কোণ দুটি সমান। আবার তাতে উদ্ভূত একান্তর ও প্রতীপ কোণগুলিও সমান। তবুও শুকুরা যেন প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই রেখা দুটি পরস্পর মিলিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

বারান্দায় বসে দুঃখী একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। শুকুরাকে ডেকে বলল, "শুকুরা, চিনলি এদের? এরা ভারতের গণ আন্দোলনের পিছন থেকে ছুরি মেরেছিল। অথচ আমাদের এরা উল্টে আখ্যা দিয়েছিল— আমরা যত স্বাধীনতা সংগ্রামী জেলে ছিলাম সবাইকে — যে আমরা বুর্জোয়া, ন্যস্তস্বার্থ শোষক, কুলিমজুরদের শত্রু।"

"আজাদ হিন্দ ফৌজেও ঢুকেছিল তারা।" শুকুরা বলল। "মাঝে মাঝে আমাদের শিবিরের খবর নিয়ে পালিয়ে আসত ভারতে। গুপ্তশত্রু এরা। ইংরেজদের গুপ্তচরের কাজ করত আমাদের ভেতরে ঢুকে। আবার এরাই সেসময় আমাদের ফ্যাসিস্ট বলে দিনের পর দিন ভারতীয় রেডিও থেকে, অন্যান্য রেডিও থেকে আমাদের বিরুদ্ধে অতি বিচ্ছিরি অসভ্য ভাষায় গাল দিত। কেবল রুশ নয়, আমেরিকা ইংল্যান্ডও তখন এদেরই প্রচারে হয়ে গেল সর্বহারার দেশ। আর জাপান হল ফ্যাসিস্ট।"

হাসল শুকুরা। দুঃখী দাসও। শুকুরা বলে যায়— "আবার এরাই আজাদ হিন্দ ফৌজের ভেতরে সাম্প্রদায়িক ভাব পয়দা করার জন্যে যত সব অসভ্য মিথ্যে প্রচার করেছিল। এরা কম নয়, ভাইনা! কিন্তু ফল কিছু হল না। আমরা সকলে কি হিন্দু কি মুসলমান বাহাদুর শাহের কবরের পাশে শপথ করেছিলাম। আমরা কেউ হিন্দু নই, কেউ মুসলমান নই, শিখ নই, সবাই আমরা ভারতবাসী— হিন্দুস্থানী। একই মায়ের সন্তান। দেশের স্বার্থের কাছে আমরা সকলে এক।"

সেলাম করল শুকুরা। দুঃখী বলল, "কার উদ্দেশে হাত মাথায় ঠেকালি?" "সেই, সেই" উত্তর দিল শুকুরা, "সেই মহাত্মা, সেই পীর যিনি একদিন এই ভারতের মাটিতে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে এক করে একটি পূজাবেদীতে দাঁড় করিয়ে সিপাহীবিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাঁর হাতে আমার মাথা কেটে রেখে দিতাম। বলতাম— নে, মাকে পুজো দে। মা যে বলছে 'ম্যঁয় ভুখা হুঁ'।"

দুঃখী হাসল মনে মনে। শুকুরার ভাবপ্রবণতা দেখে। নিজের মাথা নিজে কেটে ফেলে কথা বলা অসম্ভব। হলেও শুকুরার ভিতরে যে আগুন জ্বলছে, দুঃখী দেখল তার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী। কজন মানুষ এমন পাওয়া যায়!

•

সারারাত দুঃখী দাস শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। এরকম আর কটা লোক যদি জুটত তবে কিছু কাজ করা যেত। কত স্বপ্ন যে দেখেছে গত ক'বছর ধরে। বছরের পর বছর। একটাও স্বপ্ন

তার সত্য হয়নি। তবু সে নিরাশ হয়নি। তার ধারণা সে যদি আপন নীতিতে দৃঢ় থাকে তবে জীবনে সুযোগ একদিন না একদিন ওর স্বপ্নকে সত্য করে তুলবে। সে ধারণা ওর একান্ত মিথ্যে নয়। শুকুরাই তাকে ভরসা দিয়েছে।

শুকুরাও গড়িয়ে পড়েছিল বিছানায়। রতনী এসে কখন পাশে শুয়েছে সে জানে না। শুকুরার চোখে ঘুম নেই। সে ভাবছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সময়কার কথা। রতনী শুধোচ্ছে, ঘুম আসছে না নাকি? কি বলছে রতনী শুকুরা শুনতে পাচ্ছে না। কি একটা বললে সে এইটুকু জানে। উত্তর দিল শুধু একটা হুঁ দিয়ে।

"হুঁ কি? বলি শরীর ভাল আছে তো?" রতনী জিজ্ঞেস করল। উত্তর আবার সেই একটা 'হুঁ'।

"কি হল, জ্বর-টর হয়নি তো" হাত দিয়ে দেখল রতনী। গা ঠাণ্ডা, তবু ঘুম নেই। সে থেকে থেকে খালি পাশ ফিরছে। ঘুমোতে পারছে না। আলতো ঘুম আসতে না আসতে চমকে উঠছে, রতনী ভয় পেয়ে গেল। সেও ঘুমোতে পারল না। কোথাও ভয় পেল নাকি? সভা থেকে ফেরার সময় সেই ফাঁসি দেওয়া বটগাছটার নীচে ভয় খেয়েছে নিশ্চয়ই। মানুষ দেখলে সেই গাছের পাতাগুলো সব নড়ে। যেন কেউ দুড়দাড় করে লাফায়। এ ডাল থেকে সে ডালে।

"কোথাও ভয় পেলে নাকি?"

"হুঁ"— রতনীর প্রশ্নের জবাব।

"তোমাকে ভূতে ধরেছে নিশ্চয়ই।" একদিন এমনি রাউত-বাড়ির চাকরটাকে তো ভূতে ডেকেছিল মাঝরাতে। নিশুতি রাত। মাগো সে ছেলেটার এত সাহস! সন্ধ্যাবেলাতেই ঠিক করেছিল খেতের জল কেটে মাছ ধরবে, ঘুনি খালুই খুঁজে রেখেছিল। ঘুমোচ্ছে, কেউ এসে নাম ধরে ডাকল। সে তো উঠেপড়ে দৌড়ল তার পিছু পিছু। কোথায় খেতের দিকে যাবে— সে চলল মশানের দিকে। ছেলেটা জিজ্ঞেস করল 'খেত-এ যাবি না?' সে বলল "হুঁ"। আবার জিজ্ঞেস করল 'এ রাস্তায় কোথায় যাবি?' খালি "হুঁ"— "হুঁ"। খালুই এনেছিস?— হুঁ। তারপরে নাকি ছেলেটা জানতে পারল যে ওটা ভূত। পিছিয়ে পিছিয়ে খানিকটা দূর এসে সে দৌড়। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ভূ - ভূ - ভূ করে পড়ে গেল। সিঁড়ির পাথরে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি। রতনীর ঘুম ভেঙে গেল। গিয়ে দেখে কিনা ছেলেটার ঐ অবস্থা। ওর নাম চিমা। সেই ছেলেটার নাম। যে ভূত চিমাকে ডেকে নিয়েছিল সেই ভূত শুকুরাকেও ধরেছে, তাই খালি হুঁ হুঁ করছে!

শুকুরাকে সত্যি ভূত ধরেছিল, সে ভয় পায়নি। চমকায়নি। কিন্তু ভূত তাকে চেপে বসেছে। দেহটাকে নয়, মনটাকে। ভূত নয়। খবিশ্‌। কেফায়েতুল্লার আত্মা। অমর আত্মা— পুণ্যাত্মা!

কেফায়েতুল্লা আর সে। দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল। সে টলে পড়ল। ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে নয়, জাপানী সৈন্যের সঙ্গীন বিঁধে। ইম্ফল অভিযান থেকে ফেরার সময়। সে কি করুণ দৃশ্য। বুক ফেটে যায়। আজও কান্না পায় শুকুরার সে কথা মনে পড়লে।

খাওয়া নেই দাওয়া নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে ফিরছিল রেঙ্গুনের দিকে। গুলির চোটে মরা বরং ভাল ছিল। খেতে না পেয়ে রোগে অসুখে পড়ে পথে মারা গেল হাজার হাজার আজাদ হিন্দ সৈনিক। আগে আগে পালিয়ে যাচ্ছিল জাপানী সেনা। তাদের কিন্তু খাবার দাবার জিনিসের অভাব ছিল না। বিশ্বাসঘাতক জাত। রসদ না দিয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মেরে ফেলল ভারতীয় সৈন্যদের। তেতে উঠেছিল কজন ভারতীয় সৈন্য। দৌড়ে গিয়ে ধরল জাপানীদের। দাও আমাদের রসদ। কেড়ে নিল তাদের বাড়া প্লেট থেকে কয়েকজন খিদেয় আতুর হয়ে।

জাপানীরা ভীষণ খাপ্পা। 'ট্রেটার ইন্ডিয়ান' বলে অকস্মাৎ সঙ্গীন বিঁধিয়ে দিল কয়েকজনের গায়ে। তাদের মধ্যে একজন কেফায়েতুল্লা।

"আমি ভয় পায়নি"— শুকুরা কতক্ষণ পরে সাড়া দিল। বললে আপনা থেকে — "শুকুরা ডরায় না। ভয় ডর আমার চলে গেছে রতনী, সব ছাড়িয়ে দিয়েছেন নেতাজী। মানুষের ভয়টা কি জানিস? ভূতের ভয়, ডাইনির ভয়, চোরডাকাতের ভয়, সাপের ভয়, বাঘের ভয়— সব সেই একটি ভয়ের আলাদা আলাদা রূপ। ছায়া। মরণের ভয়। সেই ভয় যেদিন থেকে হরণ করে নিলেন নেতাজী আর কোন ভয়ে আমার তরাস নেই। সেও ডরত না— আমার সাথী কেফায়েতুল্লা। সে নেই, আমি আছি।"

"কোথায় গেল সে?" রতনী জিজ্ঞেস করল।

"সে শহীদ হয়ে গেছে। আর আমি আজ বেঁচে আছি তারই জন্যে। ইংরেজদের গুলির চোটে একবার এমন ঘায়েল হলাম— রক্তে ভেসে গেলাম।"

রতনী হাঁ হয়ে শুনছিল। ঘরের সেই অন্ধকারে। ওর বুক কাঁপছিল।

"এই যে দেখ।" রতনীর হাতটা টেনে নিয়ে ওর বাঁ জানুতে লাগিয়ে দেখিয়ে দিল। বড় গর্ত একটা। রতনী চমকে উঠল।

"একটু ওপরে লাগলে খতম্ হয়ে যেতাম। তুই কি আর শুকুরাকে আজ তোর পাশে মুখ ঘেঁষে শুয়ে থাকতে দেখতিস? মরে গিয়ে থাকলে কিন্তু আমার ভূতটা নিশ্চয় এসে এমনি তোর পাশে শুয়ে থাকত, জানিস?"

"কি সব অলক্ষুণে কথা মুখে আনছ, ছি!"

হেসে ফেলল শুকুরা। "হ্যাঁ রে, আমি ভূত হয়ে এলে তুই ভয় পেতিস?"

রতনী শুকুরাকে ঠেলে দিয়ে ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুল।

"না রে না, আর বলব না— শোন।" রতনী শুনল না। "আমি তো মরে গিয়েছিলাম। রাতে গিয়ে কেফায়েতুল্লাকে আমার ভূতটা নাকি ডাকল— 'এই ওঠ। রক্ত দে'।" রতনী 'অ্যাঁ' বলে আবার শুকুরার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

"না লো রতনী। মরে যাইনি, তবে মর মর হয়েছিলাম, এত রক্ত বেরিয়েছিল যে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। কাছে পিঠে রক্তভাণ্ডার তো ছিল না। রক্ত কে দেবে? কেফায়েতুল্লা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিল ওর হাত। ভাগ্যিস ওর রক্ত খাপ খেয়ে গেল। হিন্দু রক্ত মুসলমান রক্তও মিল খায় রে রতনী! মুসলমান কেফায়েতুল্লার রক্তে হিন্দু শুকুরা বেঁচে রয়েছে। তাই আমি ওকে স্বপ্ন দেখি রে রতনী। স্বপ্ন দেখি। ঘুমিয়ে নয়, জেগে।

"কেফায়েতুল্লা অনেক পড়েছিল। আমার মতো মূর্খ ছিল না, অনেক এলেম ছিল উর্দু, ফার্সি, নাগরী সব বিদ্যেতে। সেই কেফায়েতুল্লার মুখে শুনতাম বাহাদুর শাহের কথা, দিল্লীর বাদশা, জানিস? ইংরেজরা ধরে নিয়ে রেঙ্গুনে কয়েদ করে রেখেছিল।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল রতনী।

"তাদেরও ভূত চেপেছিল। পয়সার ভূত। এদেশের মানুষের খুন চুষতে। বাহাদুর শাহ ছিলেন খুব গুণী। তিনি থাকলে ইংরেজদের ভূত ছাড়িয়ে দিতেন। তাই তাঁকে ধরে নিয়ে পালাল।"

"তিনি হিন্দু না মোছলমান?"

"মা হিন্দু বাপ মুসলমান। ছেলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রাণের পুতলি। নেতা। এই বাহাদুর শাহ। তবে শোন সেই বাহাদুর শাহের কথা। কেফায়েতুল্লা বলত আর চোখ দিয়ে জল গড়াত ওর।"

"কেন?" রতনী জিজ্ঞেস করল।

"তুই কেন শুকুরার কাছে আসার সময় কাঁদছিলি?"

"খালি খালি। এমনি এমনি। কান্না পাচ্ছিল তাই কাঁদছিলাম।" রতনী বললে।

এই সময় কে একজন বাইরে ডাকল— "দুখীঠাকুর, দুখীঠাকুর।"

"কে?" সাড়া দিল দুঃখী দাস। এক ডাকে। এত সজাগ ঘুম।

' আমি বিশু।"

"বিশু? এত রাতে?"

"আজ্ঞে আমার মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। হঠাৎ কিরকম করছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কেমন যেন করছে। সবাই বলছে ভূত চেপেছে।"

"ধ্যাৎ, ভূত-ফুত আবার কি?" বেরিয়ে এল দুঃখী দাস। "কি হয়েছে বলতো শুনি।"

"আজ্ঞে, কাল রাতের বেলা বাহ্যে গিয়েছিল। খিড়কির পেছনের বাগানে। সেই ফাঁসিওলা বটগাছের ওপরে কেউ একটা ধস্ করে নামল যে চমকে গেল মেয়েটা। ঘটিবাটি ফেলে পালিয়ে এল ঘরের মধ্যে। ওর মাকে বলল গা-টা কেমন করছে। বুক ধড়ধড়, আজ সন্ধে থেকে তো খালি ছটপট করছে। দু-গালের ভিতর থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। চোখ উল্টে দিচ্ছে সময় সময়। কত শুণিন টুনিন সেঁকাফোঁকা করলাম, কিছু শোনে না। গুণিনরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। খালি হিন্দি বকছে মেয়েটা। বলছে— 'মেরা বালম কাঁহা গইন্ রে'!"

দুঃখী হাসল, ওষুধ দিল চারপান। ঘন্টায় একবার। শুকুরা উঠে এসে দাঁড়াল।

"ঘুমিয়ে পড়লে আর দিসনি। পেটে পাঁক চাপিয়ে দিবি। শরবত, ডাবের জল ছাড়া আর কিছু দিসনি খেতে। কাল সকালে আর ভূত থাকবে না। তার পরে যা ইচ্ছে খাবে।"

বিশু চলে যেতে রতনী এসে দাঁড়াল শুকুরার কাছ ঘেঁসে। বললে— "খুব ভয় করছে ঠাকুর। সত্যি সেই ফাঁসিওলা গাছের মগডালে একটা খবিশ্ আছে। মোছলমানী। ওর বাড়ি মেদনীপুর। সে বছর আকাল পড়েছিল সেদিকে। মানুষ পালিয়ে আসছিল এধারে। মেগে

যেচে কিছু বেঁচেবর্তে গেল। আমাদেরও সে বছর অনটন, কে কাকে দেয়? তুমি ছিলে জেলে। সেই মেয়েছেলেটাকে আমি দেখেছি। ওর ভাতার মারা গিয়েছিল। ছেলেপুলে কিছু ছিল না। জোয়ান মেয়েটা। গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল। পরদিন সকালবেলা দেখা গেল সে ঝুলছে। সে চেপে না বসলে এ ওড়িয়ানী মেয়েটা কি হিন্দী বলত?"

"চুপ কর! সবজান্তার মতো গায়ে পড়ে কথা বলে।" শুকুরা ধমকে উঠল "একটু মান শরম নেই?"

রতনী চুপ মেরে গেল। দুঃখী হেসে হেসে বলল, "রতনী ঠিক বলছে। যে ভূতে ধরে সেই ভূতের ভাষা মানুষ এমনি আবেশে বলে। শুধু কি মানুষের ভূত থাকে? এক একটা জাতিরও ভূত থাকে। এই ইংরেজ জাত এখানে ছিল। এখান থেকে চলে গেল মানে ভূত হয়ে গেল। ভূতের মানে কি জিনিস? ভূত মানে অতীত। ইংরেজরা অতীতের কথা হয়ে গেল। কিন্তু তাদের ভূতটা আমাদের চেপে বসেছে। দেখিস না আমরা কিরকম করি? আমাদের কথাবার্তা চালচলন রহা-সহা নাম-ধাম সব ইংরেজি।"

রতনী চমকে উঠল। "ও মাগো, সাহেব ভূত!" বুকে থুতু ছিটাল। "বড় বিষম ভূত ওটা। সবচেয়ে বেশি জোরদার। আর সব ভূতের জো আছে। সে ভূতে গ্রাস করলে আর রক্ষে নেই।"

"ফের গায়ে পড়ে কথা বলে!" বললে শুকুরা। "রতনী এবার খুব সেয়ানী হয়ে গেছে।" রতনীর দিকে চেয়ে বললে, "তুই কত রকমের ভূত দেখেছিস বল দেখি? সব থেকে জোরদার সাহেব ভূত বলে বলে দিলি!"

রতনী বলল দুঃখীর দিকে তাকিয়ে— "ঠাকুর, তুমি কি জান না কত রকমের ভূত পেত্নী সব আছে? ও....ই— একটা তো ডাইনি। মেয়ে ভূত। আর একটা পিচাশিনী। যেটা আঁতুড়ে মরে থাকে, সে শুধু 'জল' 'জল' করে পাখির রূপ ধরে ওড়ে, কোথাও তাকে ঠাঁই মেলে না। যে ডালে বসে, যার চালে বসে সেটা ভেঙে পড়ে। আর একটা কাঁচা ডাইনি। সেগুলো জ্যান্ত। মেয়েছেলে। তাদের ডাইনি গেরাস করে থাকে। রাতের বেলা উঠে করে কি — না চুপি চুপি মাঠে বাদাড়ে গিয়ে মাথা নীচে পা ওপর দিকে করে খালি গু করে যেতে থাকে। কচি বাচ্চা দেখলে হয়ে গেল। যার বাচ্চা তার কপাল ভাঙল। সে ছেলে আর বাঁচে না। মশানে মরা বাচ্চাটাকে ফেলে দিয়ে আসার পর মাঝরাতে ওই ডাইনি একটা বঁটি হাতে যায়। ওর সঙ্গী-সাথীদেরও ডেকে নেয় আর মরা বাচ্চাটাকে টুকরো করে কেটে কাঁচা খেয়ে ফেলে।

হো হো করে হেসে উঠল শুকুরা আর দুঃখী।

"মিছে কথা বলে ভাবছ ঠাকুর? তুমি গিয়ে খবর নাও। আমি খুব ভাল লোকের মুখে শুনেছি ময়ূরভঞ্জ 'মা রাজা' এরকম কত ডাইনিকে নিয়ে জেলে রেখেছে।"

"আর আছে না এইটুকু?" শুকুরা ঠাট্টা করে বলল।

"এইটুকু কি? এ তো গেল মেয়ে ভূত। পুরুষ ভূতের কথা শোন। বলব?"

দুঃখী বলল, "আচ্ছা বলুক। তুই চুপ করে থাক শুকুরা।"

রতনী সাহস পেয়ে বললে— "পুরুষ ভূতের মধ্যে সব থেকে পাজি হল বেম্মোরাক্ষস। এর সব ঠুঁটো গাছের খোঁড়লের ভিতরে লুকিয়ে থাকে। মাঝরাতে বেরোয়। যে সামনে পড়ে তাকে আর ফিরতে হয় না। যদি কেউ বামুন হয়, গায়েত্রী সাবিত্রী পড়তে জানে সে রক্ষে পেয়ে যায়। বেম্মোরাক্ষস কে হয় জানো? পৈতে হয়েছে বিয়ে হয়নি এমন বামুন যদি কাঁচা বয়েসে মারা গেল তো হল বেম্মোরাক্ষস।

"তারপর 'মাদল'। এ ভূতের পা আর মুণ্ডু থাকে না। রাস্তায় এমনি গড়াতে থাকে। মাঝরাতে অকালে সকালে একলা কেউ গেল তো হয়ে গেল। এছাড়া আর একটা ভূত— পুষ্করা। শনিবার মঙ্গলবার মলে পুষ্করা হয়। মেয়ে-মরদ সব।"

"ফুরোলো না আরো আছে?" শুকুরা বলল।

দুঃখী বলল, "থাম তুই, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?"

রতনী বললে, "ভূত ছাড়া খবিশ্‌ও আছে। মোছলমান মরলে খবিশ্‌ হয়। ভারি তুখোড় ভূত। মন্ত্রতন্ত্র কিছু শোনে না। যে কলমা পড়ে দেয় সে পার পায়। শুধু বিস্‌মিল্লা বললেও ছেড়ে দেয়। তার বাদে তুমি যে সায়ের পাদরি ভূতের কথা বললে তার নাম 'জিন'— সকলের থেকে তার 'পাওয়ার' বেশি।"

হো হো করে হেসে ফেলল দুঃখী। লজ্জা পেয়ে গেল রতনী। "রতনীকেও ওই জিন ভূতে ধরেছে। কেমন ইংরেজি বলছে শোনরে শুকুরা। ওর 'পাওয়ার' বেড়ে গেল এবার।"

"আচ্ছা, আচ্ছা সে তো এত তুখোড়। ওর হাত থেকে কি করে নিস্তার পাব বল তো?" শুকুরা বলে।

"আমি কি জানি? সেই পাদরিটা বলছিল। কত বই, ছবির বই কাগজ দিয়ে গেল। বললে, 'পোড়্‌বু ঈশু আপনাকো প্রাই কড়িবে।' সায়েবের ওড়িয়া কথা ভাল আসে না। কত সায়েরি মেঠাই দিল সব ছেলেমেয়েদের। তাকে সবাই জিজ্ঞেস করল এই জিন ভূতের কথা। সে বললে— ভূত এলে শূন্যে একটা ঢেরা কাটবে এমনিভাবে আঙুল দিয়ে— একটা দাঁড়ির ওপরে আর একটা দাঁড়ি দিয়ে। আর সে থাকবে না। 'আমে' বলে পালাবে।" রতনী আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন কেটে দেখায়।

"তোর হল তো এবার? এখন যা লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পড়্‌গে। রাত ভোরে উঠে ধান সেদ্ধ করবি বলছিলি যে?"

রতনী চুপ করে চলে গেল।

দুঃখী বললে, "এই ভূতপ্রেত গুণীটুনি তুই মানিস?"

"মানে? মানব না কেন?" শুকুরা একটু আশ্চর্য হয়।

"দেখেছিস কবে কোথায়?"

"না দেখলে কি মানতে নেই? ঈশ্বরকে কি আমরা দেখি?"

"অনেকে বলে এসব অন্ধবিশ্বাস।"

"তারা ঈশ্বরকেও অন্ধবিশ্বাস বলে হয়ত। বলুক। তারা অমন বলে অথচ 'ওই রে

ভূত' বলে চেঁচালে হেগেমুতে কেলেঙ্কারি করে। আমি ওসব আছে বলে মানি তবে ভয় করি না। তুমি কি বল? ভূত ডাইনি আছে না নেই?"

"আমি কখনো ওসবে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু গুণ বা তুকতাকে যে গুণ আছে আমি তার প্রমাণ চোখের সামনে পেয়েছি। সাপে কাটলে তো মানুষ আবার গুণ বা মন্ত্রের দ্বারা ভাল হয়। কিন্তু ও বিদ্যা লোপ পেয়েছে।"

"কি করে পেল?" শুকুরা জানতে চায়।

"যারা সব জানত তারা কাউকে দিয়ে গেল না।"

"কেন দিল না? দিলে কি লোকসান হত?"

"ঈর্ষা, অহঙ্কার! আমার বিদ্যা আর কেউ কেন জানবে। জানলে দশজনে মান্য করবে। আদর করবে।"

"ছোট বুদ্ধি। ধনে গরিব হলে রক্ষা। তারা কৃপণ হয়। জমানো টাকা অপরে ভোগ করে। কিন্তু মন গরিব হলে সব গেল। কেউ ভোগ করতে পারে না।"

"সত্যি বলেছিস। এটা আমাদের জাতের দোষ। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। আমাদের নেতাদেরও এই দোষ। যে নেতা হল সে ভাবে সেটা ওর একচেটিয়া হয়ে যেন থাকে। ওর মতো যেন আর কেউ না হতে পারে। তাই যার একটু গুণ দেখতে পায় তার সর্বনাশ করে ছাড়ে যাতে আর সে উঠতে না পারে।"

"ঈর্ষা, ঈর্ষা, ঈর্ষার জন্যে এ দেশটা উচ্ছন্নে গেল। বলছিলাম না বাহাদুর শাহের কথা? উনি কি হারতেন? সিপাহী বিদ্রোহ কি বিফল হত? এ সব দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী বাহাদুর শাহের দুজন অতি আপনার লোক — ইসমাইল আর জীবনলাল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা। একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। এই দুজন বিদ্রোহের সব খবর নিয়ে ইংরেজদের না দিলে আরো এই একশ বছর তারা ভারতবর্ষ শাসন করতে পারত না, আর আমাদের গোলাম করে রেখে মান ইজ্জৎ আব্রু ধর্ম কর্ম সব নষ্ট ভ্রষ্ট করবার সুযোগ পেত না।

"আমার কি ইচ্ছে হয় এক এক সময় জান? মন করে, আমাদের দেশে এই যে হিংসুটে বিশ্বাসঘাতকের দল— ইংরেজরা যেমন করে বাহাদুর শা'র ছেলে নাতির মাথা কেটে নিয়ে তাঁর ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিল— আমিও তেমনি এই নেতাদের ছেলে নাতির মুণ্ডু কেটে তাদের ওপর ছুঁড়ে দিতাম। ভারতবর্ষে বিশ্বাসঘাতকের বংশ লোপ করে দিতাম।" গর্জে উঠল শুকুরা।

"চুপ কর। এই যে আগুন, এই যে শক্তি তার বহুত দাম। তাকে এমন তাতানো কথা বলে নষ্ট করিস না। জমিয়ে রাখ। বাহাদুর শাহের কথা তো এত জানিস। তাঁর দুটো খুব বড় প্রিয় জিনিস ছিল। কি জানিস?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"না" শুকুরা সত্যি জানত না।

"তাঁর অতিপ্রিয় ছিল— দেশ আর কবিতা। তিনি কবিতার মধ্যে দেশকে দেখতেন আর কবিতা দিয়ে দেশবাসীকে মাতাতেন। তাঁর কবিতা মন্ত্রের মতো কাজ করত সিপাহীদের প্রাণে, বুঝলি?"

"বুঝলাম তো, তবে এত করে কি হল? সব পণ্ড করেছিল ঈর্ষাতুর বিশ্বাসঘাতকেরা। যদি নিজাম আর পাতিয়ালা তলে-তলে ইংরেজদের পক্ষ না নিয়ে খোলাখুলি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতেন তবে একশো বছর আগে ভারত স্বাধীন হয়ে যেত। সেজন্যেই বলছিলাম এদেশে আজ যত-জয়চন্দ্র, মিরজাফর, রামচন্দ্র, নিজাম, পাতিয়ালা সব আছে সবংশে সকলের মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেলে না দিলে দেশ আবার পরাধীন হয়ে যাবে। আমেরিকা রাশিয়া খালি তাকিয়ে আছে শকুনের মতো।"

"ভগবান ভরসা!" দুঃখী বললে, "তোর ভিতরে এত আগুন দিল কে? সেই ভগবান। বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহীদের লিখে দিয়েছিলেন—

আল্লা হি হমারি তরফ হৈ এয় জাফর
কোই অগর নহি হো হামারি তরফ ন হো।

ব্যস, ওইটুকু মনে রাখিস। দরকারে কাজে লাগবে।"

"আর কবে দরকার হবে দাদা? কংগ্রেস তো পনেরো বছর ধরে রাজত্ব করছে। বিদ্রোহ হচ্ছে কই কোথায়? লোকগুলো ঘুমিয়ে আছে।"

"জাগাবে কে? কে জাগাবে তাদের, শুকুরা? এই আগুন জ্বালিয়ে রাখ! এ আগুন ঘরে ঘরে লাগিয়ে দিতে হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষকে জাগাতে হবে। কংগ্রেস সরকারকে গদি থেকে হটাতে হবে। শহরের শোষণ থেকে গাঁগুলোকে রক্ষা করতে হবে।"

মোরগ ডেকে উঠল— কোঁকর কোঁ।

চমকে উঠল দুজনে। দুজনে নয় তিনজনে। রতনী ঘুমোয়নি। উঠে চলে গেল ধান সেদ্ধ করতে।

ভোরবেলা বাতাস দিচ্ছিল। এমন কত ভোর সকলের পাতলা হাওয়া আছড়ে পড়ে চলে যায়। রতনী শুকুরা দুঃখী কেউ খেয়াল করে না। কেউ শোনে না সে ডাক। যে যার কাজে লেগে যায়— ভোর সকাল থেকেই। সকালটা চোখ খুলে তাকায় নিশ্বাস নেয়। ফর্সা হয়।

দুঃখী একটা দাঁতন মুখে গুঁজে ঘুরে আসে বাড়ির চারধারে। সামনে গোরুর গোয়াল। দণ্ডবৎ করে। তার পাশে গোবর গ্যাস যন্ত্র। এখানে ওখানে মৌয়ের বাক্স দুটো চারটে— সারা বাগানে। সেধারে কাগজ তৈরির কল। বাড়ির ভিতরে ঢেঁকিশালে নতুন ঢেঁকি। কেবল ঘুরিয়ে দিলে চাল বেরোয়। ধান আর ভানা হয় না। ভাঙা হয়। রতনী বাসন মাজে। তাকায়। দুঃখী তদারক করছে। একটু ঘোমটা টেনে দেয়। ভাবে, দুখীঠাকুরকে কি এক ভূত চেপেছে। সেই, যে ভূতটা রাউতবাড়ির চাকরকে মাঝরাতে ডেকে নিয়েছিল জল বেয়ে মাছ ধরতে। সে যেমন ভূতের পিছনে দৌড়েছিল জল কেটে মাছ ধরবে বলে, এও তেমনি দিন নেই রাত নেই। কাজের নামগন্ধ নেই, ছায়ার পিছনে ধাওয়া করছে। চরখা, গ্যাস, কাগজ, মধুবাক্স, ঘোড়া হাতি। এ সব নিস্তার করবে!

দুঃখী এক একসময় ভাবে তাই। তাকে ভূতে ধরেছে। স্বপ্নভূত। সে একটা স্বপ্নের পিছনে

ধাওয়া করছে। স্বপ্ন তাকে ডাকছে। সে চলেছে। স্বপ্ন কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। সেটা কি তবে মিথ্যে! ভূতের মতো মিথ্যে? সে একলা। একদম একা। সারা গাঁয়ে কেউ তার সঙ্গে নেই। সকলকে ডেকেছে। সবাইকে একজোট করতে যত চেষ্টা করছে কোনো কিছুতে ফল হয়নি। বরং তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তার পিছনে। হয়তো রামবাবুর কথা ঠিক। রামবাবু বলে চাকা আর পিছনের দিকে ঘুরবে না। কেউ শুনবে না। সুতি কাপড় কেউ তো পরবে না। নাইলন। তুমি সুতো কাটতে থাক। ঢেঁকি কুটতে থাক। লোকেও তাই বলছে। সকলে দৌড়চ্ছে সোনার হরিণের পিছনে। সোনার লঙ্কা হয়ে যাবে গাঁ কে গাঁ। গাঁয়ের লক্ষ্মী গিয়ে থাকবে শহরের পার্কের মধ্যে। সীতার অশোকবনে থাকার মতো।

কেউ শুনল না। ঘাম-ঝরানো রোজগারের টাকায় বাপ করেছিল জমি ক'বিঘা। তার থেকে অর্ধেক বেচে ফেলেছে। এইসব নতুন নতুন উদ্যোগ করে। কিছু ভূ-দানে দিয়েছে। যাকে দিল বা যে সে জমি পেল সেই বা তা রাখল কোথায়? দশবার হাত বদল হয়ে গেছে।

কেউ শুনছে না। সামান্য কথা একটা। এই যে গর্ভবতী মেয়েটাকে ডাইনি চেপে বসেছে বলে তার বাপ দৌড়ে এল অর্ধেক রাতে। অথচ মেয়েটার হুকওয়ার্ম হয়ে এতদূর ব্যাপার গড়িয়েছে। একটু বোঝার জানার ইচ্ছে নেই। কেন এ রোগ। আজ একে কাল ওকে কেউ ভাবেও না। গাঁয়ের সকলে রাস্তার ধারে বাহ্যে বসে। তাই মাড়িয়ে অঙ্কুশ কৃমি হয়। তার জন্যে বলেছিল— সকলে বাগানে গর্ত খুঁড়ে বাহ্যে বস। মাটি ঢাকা দাও। সার হবে। কেউ শুনল না। সে তখন করল কি — সকালে গিয়ে রাস্তার ধারে যত ঘটি থাকে সে সব থেকে জল ঢেলে ফেলে দিয়ে এল। লোকেরা পথের ধারে জলের ঘটি রেখে দিয়ে একটু দূরে ঝোপের আড়ালে বসে যায়। দিনকতক এরকম করাতে লোকেরা আর বাহ্যে করতে রাস্তার ধারে এল না। এক-আধ বছর পার হল। আবার যে কে সেই। সে নিরাশ হয়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে।

একদিন ভজন গাইছিল—

শুনো রে মন নিরবল কে বল রাম—

শুকুরা বললে, "দাদা, গানটা খুব ভাল লেগেছে। ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমার ডাক শুনেছেন।"

"তোর ভিতরে যে ঠাকুর আছেন তিনি তো শুনেছেন।" দুঃখী বললে।

সকালে বিশু এসে জানিয়ে গেল ওর মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুজনে বেরোল খেতের দিকে। আগে চলছে শুকুরা। পিছনে দুঃখী। শুকুরা হাঁকাচ্ছিল বলদ জোড়াকে। দুঃখীর কাঁধে লাঙল।

এমনিভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। সুয্যি ঠাকুর মাথার ওপর উঠলে রতনী পান্তা বেড়ে রেখে দেয়। আর শাক ভাজা। কচি আম ছেঁচা বড়ি দিয়ে। কাঁচা পেঁয়াজ, নুন লঙ্কা। সঙ্গে আচার। গরমের দিন।

একদিন গড়ানে বেলায় খেত থেকে ফেরার সময় দেখল বাইরে বারান্দায় বসে আছেন মহাদেববাবু। মহাদেব নায়ক। জিপ একটা দাঁড়িয়ে।

মাদুর পেতে দিয়েছে রতনী। রতনীর আক্কেল আছে। ভাবল মনে মনে দুঃখী। খুশি হল।

"এ যে অপূর্ব! নমস্কার। কি ব্যাপার? কোন দিকে?" দুঃখী নমস্কার করল। .... "খাওয়া হয়নি নিশ্চয়। দাঁড়ান একসঙ্গে খাব। হাত-পা ধুয়ে আসি। ইনি হলেন শুক্রসেন বারিক, আই. এন. এ.।"

"নমস্কার, নমস্কার"— মহাদেববাবু বললেন— "আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজের?"

"নমস্কার আজ্ঞে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলাম। "

"মহাদেববাবুকে চিনিস না শুক্র?" বললে দুঃখী।

"নাম শুনেছি"— শুকুরা বলল।

"আরে আমাদের মহাদেববাবু। গড়জাত অঞ্চলের (দেশীয় রাজ্য) নেতা।" শুক্রসেন আজাদ হিন্দ ফৌজে প্রচলিত কায়দায় নমস্তে করল।

"আপনারা আমাদের জাতির গর্ব।"

"আমি একটু হাত-পা ধুয়ে আসছি। কিছু মনে করবেন না।"

"না, না, আসুন।"

কিছু সময় পরে দুঃখী এসে বললে— "আসুন খেতে বসা যাক।"

"না দুখীবাবু। আমি খেয়েছি। আর খাব না।"

"আপনি লজ্জা করছেন না তো?"

"(সম্বলপুর অঞ্চলের ভাষায়) মুইঁ খাইবার থিঁ নাইঁ লজাঁয়। পেটে ভোক মুহেঁ লাজ! ইটা মুইঁ পসন্দ নাইঁ করেঁ।"

মহাদেববাবুকে মৌয়ের শরবত এক গেলাস এনে দিল দুঃখী।

"ইটা কাণা আয় (কি বটে) দুখীবাবু?"

"মৌ শরবত।"

"মধু দিয়ে শরবত করেছে?" মহাদেববাবু বললেন। "এটা গান্ধীর সভ্যতা।"

"না, এটা চা-সভ্যতার অ্যান্টিসিসিস— প্রত্যন্বয়।"

"সমন্বয়-সিন্থেসিসটা কি?"

"কিছু একটা বেরোবে। আগে চা-সভ্যতাটা যাক।"

"আপনি একা এই ধর্মে আছেন, না আর কোনো কোনো লোকেও এই ধর্ম নিয়েছেন?" মহাদেব বললেন।

"গাঁয়ের সকলেই প্রায় এই ধর্ম নিয়েছিল। সবার বাড়িতে মৌয়ের বাক্স। অতিথি সুজন সকলকে মৌ শরবত দিয়ে অভ্যার্থনা করত। কিন্তু কি হল কে জানে, ক্রমে লোকেদের ইচ্ছে কমে গেল। মৌ-বাক্স এখন খুব কম বাড়িতে পাবেন। আবার চায়ের বন্যা ছুটছে।" দুঃখী বললে।

"এর কারণ কি মনে করেন?"

"চায়ের প্রতি আকর্ষণটা ইংরেজি বিদ্যা ও সভ্যতার মোহ থেকে জাত বলে মনে হয়।

দুটো চারটে গাঁয়ের তফাতে একটা করে হাইস্কুল। এক একটা মহকুমায় এক একটা কলেজ। ইংরেজি লেখাপড়া যত বাড়ছে, ইংরেজ হওয়ার সখটাও তত বাড়ছে।"

"মধু চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি হতে পারে?"

"আলস্য। সেটা এ জাতের মজ্জাগত। তাছাড়া নেতারা তো ভোটের সময় সব করে দেবেন বলে বলে গেলেন। লোকেরা আর কেন কিছু করবে?"

মহাদেব হাসলেন। দুঃখী শুকুরাও।

শুকুরা বললে— "রামবাবু বলেন মধু বাক্স শোষণ আর পরগাছা সভ্যতার প্রতীক।"

"পরগাছা সভ্যতা!" জিজ্ঞাসু মহাদেববাবু।

হেসে হেসে দুঃখী বললে— "প্যারাসাইট সিভিলিজেসান। নিমুলী লতা পরগাছা হয়। অন্য গাছের রস খেয়ে বাঁচে।"

"ও হো হো"— হাসলেন মহাদেব।

"রামবাবুর যুক্তি হল, মধু যারা খায় তারা মৌমাছির শ্রমকে অপহরণ করে।" বুঝিয়ে দিল দুঃখী। বললে, "হ্যাঁরে শুকুরা, তুই বললি না কেন মৌমাছিরা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে বিশ্বাস করে। ফুল থেকে মৌ অপহরণ করে জমিয়ে রাখে। আমরা সেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ধ্বংস চাই।" সকলে আরো জোরে হাসল।

"তা বেশ, বেশ। আপনারা খাওয়াদাওয়া সারুন, পরে এ কথা বিচার করা যাবে।"

শুকুরা আর দুঃখী খেতে গেল। দুঃখী বলল— "দেখলি মহাদেববাবুকে? সহজ লোক নয়। একজন বড় বিপ্লবী ছিলেন। প্রজামণ্ডলের নেতা। দেশীয় রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ করে তুমুল কাণ্ড লাগিয়ে দিয়েছিলেন। রাজার দারুণ ভয় এঁকে। এঁর মাথা যে কেউ জ্যান্ত বা মরা এনে দেবে, পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে বলে ঘোষণা করেছিল রাজারা। মহাদেব ফেরার হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। স্বাধীনতার পরে আত্মপ্রকাশ করলেন।"

"প্রজামণ্ডলের লোকেরা যে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল বলছিলে? মহাদেববাবু তবে কি কংগ্রেসওলা?"

"হ্যাঁ, তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এখন আর নেই।"

"কেন? সুবিধাবাদী বোধ হয়।" বললে শুকুরা।

"না, কংগ্রেস নেতারা তাঁকে সইতে পারল না। 'গড়জাতিয়াটার' এত প্রতিপত্তি? কারো চোখে সইল না। তাঁর জীবনেও বিপদ ঘনিয়ে এল।"

"বাহ্, এটা কেমন অহিংসা কংগ্রেসওলাদের?"

"আরে শোন না, এর নাম অহিংসা-মার।"

"মারাটা আবার অহিংসা কি করে হয়?"

"হয় না? ছেলেকে মা-বাবারা মাস্টাররা মারেন। সেটা কি হিংসা?" দুঃখী বললে।

"তাহলে আমাদের কেন বল, আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজেরা হিংসা দ্বারা স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলাম বলে? আমরা ব্রিটিশকে তাদেরই ভালর জন্যে গুলি করতাম।"

দুজনেই হাসল। দুঃখী বললে— "আর একজন নেতা তো শুধু কথায় নয় কাজেও দেখিয়ে দিলেন। চাখিয়ে দিলেন অহিংস মার কেমনধারা। কিল চড় ধাক্কা কানমলা নাকঘষা কাপড়জামা ছেঁড়া। সব রকমের অহিংস মার যেদিন হয়ে গেল সেদিন মহাদেববাবু কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পথ পুছিয়া পিতার বাড়ি যাব, অযোধ্যা মুখ আর না দেখিব'। তারপরে যে গড়জাতী রাজার সঙ্গে লড়েছিলেন গিয়ে তাঁরই দলে জুড়ে গেলেন।"

শুকুরা জানতে চাইল— "এখানে কি রাজাদের একটা দল আছে? বাংলাদেশে রাজা-জমিদারদের জমানা আর নেই। রাজা-জমিদার জানলে লোকে বুড়ো আঙুল দেখায়।"

আমাদের লোকেদের একটু রাজভক্তি আছে। কি রাজা কি জমিদার, এরাই ভোটে জেতে বেশি। গড়জাতে রাজা, এখানে জমিদার। ওড়িশাতে আজ পর্যন্ত চারটে মুখ্যমন্ত্রী গেছেন। তাঁদের মধ্যে ছোট-বড় হয়ে সবাই রাজা বা জমিদার আর একজন বড় জমিমালিক। ওই জমিদারই বলতে গেলে।"

"এটা চিরদিন থাকবে না দাদা।" শুকুরা শোনায় ওর নিজের মতো। "রাজা জমিদারদের যুগ গেছে। এটা খেটে খাওয়ার যুগ। বুঝলে? বালুঙ্গাদা সেদিন বলছিল শাস্ত্রে নাকি আছে— সত্যযুগটা ব্রাহ্মণদের, ত্রেতা ক্ষত্রিয়দের, দ্বাপর বৈশ্যদের আর কলিটা শূদ্রদের। শূদ্র মানে খেটেখাওয়া লোক।"

"তা সত্যি, কিন্তু আমার কেন ভয় হয় আমাদের বিপ্লবের পরিণতি ফরাসী বিপ্লবের মতো না হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকারের ডানহাত এই যে সব রাজা-রাজড়াদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি শেষে তাদেরকেই শাসনের গদি না তুলে দিয়ে বসি।"

"আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে পড়লে তোমার এরকম ভয় মনে আসত না। নেতাজী তাদের বড় ঘৃণা করতেন।"

মহাদেব তেমনি মাদুরের ওপর বসে আছেন। খদ্দরের প্যান্ট, খদ্দর হাওয়াইন। বসে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছেন। "অনেক দেরি হয়ে গেল, না?"

"নাইঁ, নাইঁ, দেরি নাইঁ হেই।" মহাদেব বলেন।

"তারপর, কোথায় আসা হয়েছিল? হঠাৎ কি করে মনে পড়ল?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"গুটে কথা মোর মুঁড়ে ঢুকিছে। খরাপ ভাবব ত মুঁই নাইঁ কহেঁ।"

"না, না, কিছু ভাবব না। বলুন।"

মহাদেববাবু শুকুরার দিকে তাকালেন। বুঝতে পারল দুঃখী। বললে— "ও আমার অতি বিশ্বস্ত। আমরা দুজনে এক বাড়িতে দু-ভাইয়ের মতো থাকি। আপনি নির্ভয়ে বলুন। তাছাড়া আমার কাছে কোনো গোপনীয় কথার গুরুত্ব কম। সে হিসেবে আপনি যা বলার বলতে পারেন।"

হঠাৎ মহাদেববাবুর চেহারা বদলে গেল। বললেন— "না, কথাটা তেমন লুকোবার কথা নয় তবে অনেক ভারি।"

"ওহ্ বুঝলাম, আপনি বোধহয় আমাকে গণতন্ত্র দলে যোগ দিতে বলবেন?" দুঃখী বলল।

"আজ্ঞে না। গণতন্ত্র দল কি আর অছে?"

"আমার ভুল হল। বলার কথা স্বতন্ত্র দল। গণতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। যা হোক তন্ত্র তো একটা আছে।" দুঃখী হাসল।

"তফাত বহুত। স্বতন্ত্রের নেতা রাজ গোপালাচারী গান্ধী মহাত্মার বেয়াই। বুঝলেন কিনা। আপনি তো নিজে এক বড় গান্ধীবাদী। নয় কি?"

"মহাদেববাবু, ক্ষমা করবেন। আপনি আমায় যে বাদী বলুন না কেন গান্ধীবাদী বলবেন না। গান্ধীবাদী বলিয়ে এক থোক লোক যেমন গান্ধীজীর সব লোপ করে দিল, তেমনি স্বতন্ত্রবাদীরা স্বতন্ত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা রাজাজীকেও শেষ করে দেবে।"

"দেখুন দুখীবাবু, আমি কিসের জন্যে কংগ্রেস ছেড়েছি আপনি জানেন। আমরা সব প্রজামন্ডলের লোকদের দাবি ছিল— দায়িত্বমূলক শাসন। কিন্তু কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা বললেন— 'চোরসে লেকে ক্যা ডাকুওঁকো দেঙ্গে?' আমরা সব গড়জাতের লোকেরা হলাম ডাকু আর যে রাজার সঙ্গে লড়েছিলাম তাদের সব দায় জিম্মাদারি থেকে মুক্তি দিয়ে মান-সম্মান-পদমর্যাদা ধনদৌলত সব দিয়ে দেওয়া হল। আর একটা বসে-খাওয়া গুষ্টি তৈরি হল।"

"সেটা ঠিক কথা।"

"সেই কারণে আমি কংগ্রেস ছাড়লাম। আপনি তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। বলুন তো, ভদ্রলোক কংগ্রেসে থাকতে পারে? কংগ্রেসের কোনো নীতি আছে?"

"কংগ্রেসের কোনো নীতি নেই। কোনো নির্দিষ্ট 'বাদে' তার বিশ্বাস নেই। একটি 'বাদে' সে বিশ্বাস করে— সেটা হল সুবিধাবাজ। সোশ্যালিস্ট কম্যুনিস্টরা লোকদের অসন্তোষকে পুঁজি করে যেমনি একটা ধ্বনি তুলল, কংগ্রেস তখুনি তার নীতি বদলে নিজে সংবিধান তৈরি করার সময় যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেছিল তাকে ধুয়েমুছে সমাজবাদের ধুয়ো ধরেছে। যে সমবায় সর্বসাধারণ সম্পত্তির ওপর কংগ্রেস আস্থা রেখেছিল, সে এখন সমাজবাদী ধাঁচার পরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলে লোকদের ভাঁওতা দিচ্ছে।" দুঃখী বলল।

মহাদেববাবু বললেন— "প্রথম প্রথম তো আমরা হলাম 'ইয়েসম্যান'। কংগ্রেসওলারা ইয়েস ইয়েস করত। ইংরেজ বলল, ভারতকে ভাগ কর— পাকিস্তান হিন্দুস্থান— ইয়েস স্যার। তারপরে এল আমেরিকা। বললে— রূপেয়া লেগা— মানি, মানি? কংগ্রেস সরকার বলল 'য়া স্যার'। ইয়েসকে 'য়া' বলে মার্কিনরা। আমেরিকা বরদান দিল— পি. এল. ৪৮০। তাতেও পেট ভরল না। রাশিয়ার দোরে গিয়ে হাজির। 'ক্যা মাংতা হায়? ট্যাঙ্ক, মিগ্?' কংগ্রেস সরকার বলল— 'দা' 'দা' মানে হ্যাঁ হ্যাঁ। ইয়েস থেকে য়া, য়া থেকে দা। আমরা এখন দা— ম্যান।"

"সেটাকেই আমি বলি সুবিধাবাদ।" দুঃখী বললে।

"কেবল ওইটুকু নয়। নিজের সুবিধা হাসিল করতে এরা সব করতে পারে। দুর্নীতি, অনীতি দুরাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার— নারী দারী চুরি বাটপাড়ি সব।"

"আপনার কথার প্রতিবাদ করার মতো যুক্তি আমার নেই।"

"আর যুক্তিটুক্তির সময় নেই আজ্ঞে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিতরে এমন ট্রেটর ডেজারটারদের গুলি করে দিতে নেতাজীর আদেশ ছিল।" শুকুরার সক্রোধ উক্তি।

সকলে চুপ। একটা আতঙ্কের যেন সূত্রপাত করেদিল শুকুরা। কিছু সময় পরে দুঃখী বলল— "আপনি কংগ্রেস ছাড়ার কারণ আমি শুনেছি। কিন্তু আপনি গণতন্ত্র পার্টিতে মিশলেন শুনে আমার কেন যেন, আমায় ক্ষমা করবেন আপনি, আপনার আঘাত লাগতে পারে— আমি খোলা মানুষ— আমার কেন মনে হল, আপনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার যেন অনেকটা কমে গেছে।"

মহাদেব ক্ষুণ্ণ হলেন। হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পাকা রাজনীতিজ্ঞের মতো নিজের ভাবকে সামলে নিয়ে বললেন, "আমার কংগ্রেস না ছাড়ার আর উপায় ছিল না। আমি বুঝতে পারলাম ওড়িশার নেতারা গড়জাতকে খণ্ড খণ্ড করে ছোট ছোট জমিদারী করে রাখতে ষড়যন্ত্র করছে। আবার বললে কি? ওড়িশা বিধানসভায় আপার হাউস করে বিলেতের পার্লিমেন্টের হাউস অব্ লর্ডসের মতো এখানেও 'হাউস অব্ ফিউডেটারি চিফস' করবে। আমি আর অন্য সব প্রজামন্ডলের নেতারা এ প্রস্তাবে রাজি হলাম না। হরিরামবাবু, আমাকে ডেকে বললেন— তোমরা আমাদের সব প্রস্তাব মেনে নাও নাহলে তোমাদের মুণ্ডুকাট হয়ে যাবে। আমি বললাম রাজারা তো আমার মুণ্ডু কাটতে পারেনি, আপনি যদি পারেন তো ইতিহাসে আপনার নাম অমরাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। সেইদিন আমি কংগ্রেস ছাড়লাম। আর যেদিন বড় বড় কংগ্রেস নেতারা বললেন 'রাজারা স্বাভাবিক নেতা, ভগবান তাদের নেতা করে জন্ম দিয়েছেন'। আমি সেদিন ভাবলাম রাজারা যে দলে আছেন আমি কেন না তাদের সেই দলে যোগ দিই। যোগ দিলাম। আর কংগ্রেস গণতন্ত্রের মধ্যে গাঁটছাড়া বাঁধলাম। মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল করলাম। .... এখন আমরা একটা অল ইন্ডিয়া দলে মিশে গিয়ে 'স্বতন্ত্র' হয়েছি। আপনি তো ভালোই বোঝেন আমাদের নীতি।"

দুঃখী বললে— "ক্ষমা করবেন। আমি সত্যি আপনার দলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। আপনার দলের সংবিধানের ওপর দৃষ্টি দেবার সুযোগ আমার হয়নি।"

"আপনি আমায় ঠকাচ্ছেন। এক্ষুনি আপনি আমাদের দলের নীতি বললেন কি না?"

"কই না তো।" দুঃখী আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

"বাহ, মৌমাছি-বাসার কথা এখন বললেন না? আমাদের নীতি মৌমাছি-বিরোধী নীতি। আমরা রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিরোধী। আপনি সব জানেন। আপনি বুদ্ধিমান। আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে দল মজবুত হত আর আমরা মিলে কিস্তিমাত করতে পারতাম।"

দুঃখী আর শুকুরা হাসল। দুঃখী বললে— "মহাদেববাবু, আপনার মতো নেতা, যাঁর নির্দেশে হাজার হাজার লোক একজোট হয়ে মরণপণ করত, তাঁকে পেয়ে যে দল দৃঢ় হতে পারল না, আমার মতো সামান্য একজন কর্মী সে দলকে কি তুলে ধরতে পারবে? অসম্ভব। আপনার সেটা দুরাশা মাত্র। বরং আমার মনে হয় আপনি যদি অন্য কোনো প্রগতিশীল দলে যোগ দিতেন তবে সে দল দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও রাজনীতি ক্ষেত্রে বেশি প্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন।"

'হা হা হা'— খুব জোরে হাসলেন মহাদেববাবু। বললেন "তেমন একটা প্রগতিশীল দলের নাম করুন তো? ভারতে প্রগতিশীল দল আছে? যার প্রগতিশীল নীতি থাকে সেই তো প্রগতিশীল। এদেশে কোন দলের নীতি নেই। মাথাই নেই তার মাথাব্যথা! সব রাজনৈতিক দল ব্যক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত — নীতিবাদের উপরে নয়।"

"কিন্তু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দিলে নীতি কেবল পুঁথিসর্বস্ব হয়ে যাবে যে"— দুঃখী বললে।

"মানলাম"। মহাদেব বললেন, "ব্যক্তি আর নীতি দুটোরই দরকার আছে। ভালো নীতি আছে। ব্যক্তি নেই তো কোনো কাজ হতে পারে না। তেমনি ব্যক্তি আছে অথচ নীতি নেই, সেখানেও কাজ হয় না।"

শুকুরা বললে— "ঠিক বলেছেন মহাদেববাবু। কংগ্রেসের নীতি নেই কিম্বা নেতা নেই।"

"তোর কংগ্রেসের ওপরে এত রাগ কেন রে?"

"একটা বিশ্বাসঘাতকের দল। মিরজাফরের দল। পিতৃহন্তা। মহাত্মা গান্ধীকে ঠকিয়েছে এর নেতারা। এরা মুচি — নিজেকে ডাক্তার বানিয়ে অপারেশান করছে। এর নেতারা আপনার স্বার্থের জন্যে সবকিছু করতে পারে। দেখতে থাক, এরা নিজের পা নিজে কেটে নির্মূল না হয় তো আমার নামে কুকুর পোষো। নেতাজী বলতেন— সব পাপের পার আছে, বিশ্বাসঘাতকতার পার নেই। তুমি এদের গুণ জান না। শুনলে কানে হাত দেবে। আমি কলকাতায় সব জেনেছি এদের গুণপনা।"

"কাদের গুণ রে?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল শুকুরাকে।

"এই যে তোমার ওড়িশা কংগ্রেসের নেতাদের গুণ। হাটেবাজারে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমরা কি মুখ দেখাতে পারি বিদেশে?"

মহাদেব খুব আগ্রহ দেখালেন শোনার জন্যে। আগ্রহ হওয়ার কথা। বিরোধীদের দুর্বলতার ওপরে বেঁচে থাকার খুব চেষ্টা তাঁর। ওড়িশার অন্য সব দলের নেতাদের মতো। নিজের বাহুবলের ওপরে কারো বিশ্বাস নেই।

"কহন্ কহন্, শুনমা।" মহাদেব বললেন।

শুকুরা পা তুলে গুছিয়ে বসল। বলল— "আমি তোমায় আজ পর্যন্ত বলিনি সেকথা। কেমন ইংরেজি ঝেড়ে তোমার যুবনেতা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলেন। ভারি মজার, শোন।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল শুকুরার দিকে। তার মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল— মনে ঘৃণা, ক্রোধ আর পরিহাসের ভাব।.

"এই যে হিরদিবাবুকে দেখছ— ওই হৃদয়রঞ্জন রায়— উনিই সব নাটের গোবর্ধন। ওঁর গুণ অগুনতি। অল্প ব্যক্তি নন। গোটা পুকুরের মাছ খাবেন, গায়ে পাঁক লাগবে না একটুও। ওঁরই বুদ্ধিতে সব হল। জয়রামবাবু আর হরিরামবাবুর মধ্যে পালা চলেছিল। কলকাতা শহর হুলস্থুল। এখানে এক থোক ওড়িয়া জয়রামের পক্ষে তো সেখানে এক থোক হরিরামের তরফে। সময় সময় দুদলে ঝগড়া বেধে যায়। হিরদিবাবু তো ভিতরে ভিতরে

ছিলেন জয়রামের পক্ষে। বাইরে নিরপেক্ষ। দুপক্ষ থেকেই মেরে দিতেন। আর সব খবর গিয়ে বলতেন জয়রামের কাছে। একদিন গিয়ে বললেন— 'জাঁহাপানা'।"

দুঃখী হেসে বললে— "জাঁহাপানা কে রে?"

"জাঁহাপানা বুঝতে পারছ না? শোন না, আপনি বুঝবে। বললেন জাঁহাপানা, কামদেববাবু হরিরামবাবুর ডান হাত। তাঁকে যদি আমাদের দিকে টানতে পারেন তো বাজিমাত।

জয়রাম বললেন— কথাটা ঠিক বটে। তবে কামদেববাবু বড় তুখোড় লোক, তাঁকে আমাদের দলে টানা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই। আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি না টেনে আনতে পারি তো আমার নাম হৃদয়রঞ্জন নয়।

জয়রাম বড় দিলদার মানুষ। হিরদিবাবু যা চান তা দেন, যা বলেন তাই করেন। দেখা গেল কামদেববাবুর জামাই জয়রামবাবুর অফিসে একজন বড় অফিসার।"

"জয়রামের অফিস?" জিজ্ঞেস করলেন মহাদেববাবু।

"জয়রামবাবুর কারখানার অফিস ছিল কলকাতায়।" শুকুরা বলল।

"কামদেববাবুর জামাই কি খুব বিচক্ষণ লোক?"

"বিচক্ষণ? গাল টিপলে দুধ বেরোবে— ছোকরা। ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যা। চাকরিটা কিন্তু খুব বড়। হাজার টাকা মাইনে।"

"কি রকম?" মহাদেব আর দুঃখী একসঙ্গে জানতে চাইলেন।

"সে এক উপন্যাস। চাকরি পাওয়ার পর মেয়ে-জামাই গিয়ে থাকত একটা ছোটো ফ্ল্যাটে। একদিন জয়রামবাবু গিয়ে সেখানে হাজির। বললেন 'তুই কেমন আছিস দেখতে এলাম।' জামাই তো কৃতার্থ। সেইদিন কামদেবের মেয়ে হল জয়রামের ধর্মমেয়ে। জয়রাম বলে এলেন, 'এই ছোট্ট অস্বাস্থ্যকর বাড়িতে তোমরা থাকতে পারবে না। আমি ব্যবস্থা করছি। বাড়ি কোম্পানি দেবে।'

দুদিন পরে নেমন্তন্ন হল মেয়ে-জামাই দুজনেরই জয়রামের বাড়িতে। খাওয়াদাওয়ার ধুম। বাবুর্চি খানা তৈরি করছে। হঠাৎ জয়রাম বললেন আজ আমার মেয়ে বেড়ে দেবে, আমি খাব। মেয়ে তুই কিচেনে যা। এই খানসামা তুম কিচেন ছোড়।

মেয়ে বড় অসুবিধায় পড়ে গেল। মেয়েছেলে আর কেউ নেই। সে একা। কিচেনে যেতে হবে বেড়ে আনতে। ভারি অস্বস্তি লাগছিল। এদিকে নতুন বাবার কথা কাটে কি করে? কিন্তু সেয়ানী মেয়ে। বলে বসল। বাবুর্চির কিচেনে কি কুলের বউমানুষ যায়? বাবা, আমার বাড়িতে আসুন, রেঁধে খাইয়ে খুশি করে দোব?

'ভেরি গুড'— বলে ফেললেন জয়রামবাবু।"

"তারপর, তারপর কি হল?" জিজ্ঞেস করলেন মহাদেববাবু।

"তারপরে বাবুর্চি এনে দিয়ে গেল পোলাও, কালিয়া, চপ কাটলেট আর বোতলও।"

"বোতল? মেয়েটাও খেল?"

"আজ্ঞে আমি বলতে পারব না সেকথা। পরের মেয়ে পরমেশ্বরী। সে খেল কি না জানি না। যতটুকু শুনেছি বলছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর?"

"চমৎকার খানা, খাওয়াতে সকলে মশগুল। বাপ জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে — কোন বাবাকে তুই বেশি ভালোবাসিস বলত?

মেয়ে বলল— বাড়িতে গেলে বাবাকে আর কলকাতায় আপনাকে।

তারপরে সাহস বেড়ে গেল জয়রামের। বললেন— কি করে জানব তুই আমাকে ভালোবাসিস বলে? তুই যদি আমার কথা রাখিস, মান রাখিস তবে না?

মেয়ে বললে— বাপ মেয়ের মান রাখলে মেয়ে কেন বাপের মান রাখবে না?

তোর কি চাই? তুই কি চাস? তোর মান রাখতে আমি কি করতে পারি? ইংরিজেতে বলতে থাকেন জয়রাম।

মেয়ে বলে— জয়রামবাবুর মেয়ে বলে আমায় কলকাতার মানুষ জানছে তো? মেয়ে-জামাই কলকাতা শহরে মান-মর্যাদা ধরে কেমন করে থাকবে সেটা কি আপনাকে বলে দিতে হবে?

তখন সঙ্গে সঙ্গে ফোন হল ম্যানেজারকে — হ্যালো, কে? ম্যানেজার? কালিদাসবাবুর অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্ডার ইস্যু কর। দেড় হাজার টাকা স্যালারি।"

"সত্যি? এমন শ্বশুর ভাগ্যে থাকলে মেলে।" মন্তব্য করলেন মহাদেববাবু।

"মেয়ে কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী।" বললে দুঃখী।

"বুদ্ধি মেয়ের নয়। সব বুদ্ধি হিরদিবাবুর। এ ঘরের মাসি ও ঘরের পিসি। আগে থেকে মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। রিহার্সাল করানো হয়েছিল। এদিকে জয়ীবাবুকে পরামর্শ সেদিকে মেয়ে-জামাইয়ের একেবারে আপনার। 'মওকা ছেড়ো না— এই বেলা যা চাইবে পেয়ে যাবে' শিখিয়ে দিয়েছিল। হিরদিবাবু কি কম? কলকাতার ওড়িয়া ভায়েরা তাকে হিরদিবাবু না বলে বুদ্ধিবাবু বলে।"

"বুদ্ধিবাবুর নেমন্তন্ন হয়েছিল তো?" দুঃখী দাস জিজ্ঞেস করল।

"হয়নি যে। ঠিক সময়ে কিন্তু প্ল্যান মাফিক পৌঁছে গেলেন মহাত্মা। বললেন— স্যার, দুটো ফাস্টক্লাসের রিজার্ভেসান একটা কুপে।"

"ভেরি গুড" বলে জয়ীবাবু আরো এক পেগ চালিয়ে দিয়ে থাকবেন।

"তারপর?" মহাদেব জিজ্ঞেস করলেন।

"জয়ীবাবু মেয়েটিকে বললেন— দেখ মেয়ে। আমাকে আজ রাতে তোমার বাড়ি যেতে হবে। মানে তোমাদের গাঁয়ে।

আমাদের গাঁয়ে? বাবার কাছে? বাবা কি গাঁয়ে আছেন? আমি তো জানি না— মেয়ে বললে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কামদেববাবু গাঁয়ে আছেন আমি জানি। কাল তিনি চলে যাবেন গাঁ থেকে।

হরিরামবাবুর জন্যে প্রচার করেতে। আমি খোঁজ নিয়েছি।— জয়রাম বলেন।

মেয়ে বললে— কিসের প্রচার?

বাবা বললেন— আরে, তুই জানিস না? হরিরাম আর আমি কংগ্রেস সভাপতির পদের জন্যে লড়ছি। তোর বাবা হরিরামের পক্ষে।

মেয়ে বেচারি খুব লজ্জা পেল। জয়রাম কি আর ছাড়েন সে মওকা? বললেন— এটা কি ভালো দেখাবে মেয়ে?

মাথা নেড়ে মেয়ে বলল— না।

তখন কি খুশি জয়রামের। বললেন— আমি জানি আমার মেয়ে আমায় কত ভালোবাসে। সে নিজের বাপ হোক না কেন, তবু ওর কখনো ভালো লাগবে না একথা। আমি তাই বলছিলাম এ বাপটাকে যদি ভালোবাসিস মা, আমার মান রাখিস। বলছিলাম কি, তুই আমার সঙ্গে যেতিস। তোর বাবাকে যে করে হোক সেই ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনব। একা তুই এ কাজ পারবি। আর কেউ নয়। তোর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে কি আর কেউ আছে? যে-কোনো উপায়ে কামদেবকে আমাদের দিকে টেনে আনতে হবে।"

"মেয়ে রাজি হল?" দুঃখী বললে।

"রাজি না হওয়ার চারা ছিল? মাথা তো বিকিয়ে দিয়েছে। আর উপায় কি? দেড় হাজার টাকা মাসে। সামনে আবার রাখা হয়েছে মেয়ের জন্যে সোনার হার, ঝলমলে শাড়ি, জামাইয়ের স্যুট।"

"তারপরে, তারপরে?"

"তারপরে মেয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছোল। জয়ীবাবু থেকে গেলেন স্টেশনে। বাড়ি গিয়ে মেয়ে কাউকে কিছু না বলে গিয়ে শুয়ে রইল ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে। ডাকলে শোনে না। বাপের একটিমাত্র আদুরে মেয়ে। বাপ বললে 'ভেঙে গেলে গড়িয়ে দোব, হারিয়ে গেলে খুঁজে আনব, যা চাইবি তাই দোব। তুই উঠে খা। তুই না খেলে আমিও খাব না।'

তবু মেয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। খালি শুনছে মাসে শয়ে শয়ে দশ-শো আর পাঁচ-শো। বছরে বারো আর ছয় আঠারো হাজার চোখে নাচছে। বাপকে বলল— বাবা, আমার গা ছুঁয়ে বল, যা বলব করবে। বাপ নাচার। কথা দিল। তখন গিয়ে মেয়ে উঠল। মুখ ধুল। খাওয়াদাওয়া করল। বাপ বললে— এবার কি বলবি বল। খাচ্ছিল দুজনে এক থালায়।

মেয়ে বলল— হরিরামবাবুকে ছেড়ে জয়রামবাবুকে জিতিয়ে দিতে হবে। যেই মেয়ের কথা শুনেছে ভাতের ডেলা খসে পড়ল কামবাবুর হাত থেকে।"

"তারপরে, তারপরে?" মহাদেববাবুর আবার প্রশ্ন।

"তারপরে আর কি? সব শেষ। ড্রপ পড়ে গেল। নতুন অঙ্কের আরম্ভ। পালটে গেল ওড়িশার রাজনীতি। আপনার কি অজানা? জয়রাম জিতলেন, হারলেন হরিরাম।"

বেচারা হরিরামবাবু যত এসে ডাকেন কামদেববাবুকে আর তাঁকে পাওয়া যায় না। আমার শরীর ভালো নেই, মাথা ধরেছে। পেট কামড়াচ্ছে। মাথা ব্যথা করছে। কেই বা দেখতে

পাচ্ছে কোথায় পেট কামড়াল, মাথা ব্যথা করল? কিন্তু হরিরামবাবুর নিশ্বাস পড়েছিল 'ভাইনা' তাঁর ওপর। মাত্র ছটা মাস। বুড়ো যা বলেছিল তাই ঘটল।"

"কি বলেছিল, কি বলেছিল?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"বলেছিল— ছ মাস যাবে না, এমনি চেয়ে থাকবি, হায় হায় করবি, তোর প্রাণ চলে যাবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না।.... তাই হল। সত্যি ঘটনা এক একসময় গল্প থেকেও আজব হয়।"

দুঃখী দাস, মহাদেববাবু দুজনে নিঃশ্বাস ফেললেন, লম্বা শ্বাস। শুকুরা বললে— "একা কামদেব নয় বা জয়রাম নয়, গোটা কংগ্রেসটাই একটা ধাপ্পাবাজ ফেরেববাজের দল। অমন দলে কি ভালোমানুষ থাকে? মহাদেববাবু, আজ্ঞে আপনি যা বলছেন আমি তাতে একমত।"

দুঃখী হাসতে হাসতে বলল— "মহাদেববাবু এখন কংগ্রেস ছেড়ে যে দলে গেছেন সেটাই বা কোন ভালো? বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ!"

"আপন ভি সেন্তা কহছন দুখীবাবু!" মহাদেব বললেন। "বিরোধী দলগুলো আমাদের কোনো দোষ পায় না বলে অমন করে বলে। রাজাজী কোন দেশের রাজা? "

"আমায় ক্ষমা করেন মহাদেববাবু"— দুঃখী বললে, "আমি একটু রহস্য করে ওরকম বলে ফেললাম। কিন্তু একথা সত্যি, ওড়িশাতে স্বতন্ত্রদল রাজামহারাজাদের কবল থেকে মুক্ত না হলে আর একটি ব্যক্তিবাদী দল হয়ে থাকবে।"

"কংগ্রেসের মতো ঠিক সমাজবাদী দল হওয়াটা বড় ভয়ের। বরং ব্যক্তিবাদী দল হওয়া ভালো। আপনি নিশ্চয়ই জানেন একটা সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে মেশবার জন্যে আমরা খুব চেষ্টা করেছিলাম। আপনাদের এই সমাজবাদী দলগুলোর কেউ রাজি হল, কেউ মুখ ফেরাল। কারো মুখে এক তো পেটে অন্য কথা। আর কারো পেটে খিদে মুখে লাজ। শেষে প্রজাসমাজবাদী দলের সঙ্গে মেশার সব নিষ্পত্তি হল। কিন্তু তাদের নেতারা ভয় পেল। গড়জাতে তো তাদের কোনো কেরামতি নেই, যা লাফায় তোমার এই উপকূল অঞ্চলে। আর তাও এখানে বিশ-পঁচিশ দল। সব ভাগ-ভাগ। আর ওখানে তো রাজাদের পুরোপুরি সমর্থন সব সলিড। তার জন্যে তাদের দলে নিলে নেতা হবে গড়জাতীয়েরা। এরা আর হতে পারবে না। এই ভয়ে রাজিনামাকে ভেঙে দিল প্রজাসমাজবাদীরা। বুঝলেন? আচ্ছা বেশ, দুখীবাবু, আমি আসছি। আমাদের লিটারেচার দিচ্ছি পড়ে দেখবেন। যদি কোথাও সন্দেহ হয় তো আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন।" বিদায় নিলেন মহাদেববাবু। দুঃখী এগিয়ে দিয়ে এসে বললে— "দেখলে তো শুক্রসেন আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের রূপ? এখানে একটা নির্দিষ্ট নীতির ওপরে কোনো দল প্রতিষ্ঠিত নয়। সবখানে ব্যক্তির প্রাধান্য, ব্যক্তির পূজা। তারই জন্যে ধুয়ো উঠেছে— নেহেরুর পরে কে? একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এরকম প্রশ্ন কেউ কখনো তোলে না। আমাদের দেশের মানুষ যেন গণতন্ত্রের জন্যে প্রস্তুত হয়নি। সময় সময় এমনি মনে হয় আমার।"

"শ শ বছর ধরে পরাধীন একটা জাত— একছত্র শাসনে অভ্যস্ত। খাঁচার পাখিকে ছেড়ে দিলে যা অবস্থা হয় আমাদের সেই অবস্থা। গণতন্ত্র আমাদের ওপরে জবরদস্তি চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছে। সে ভার আমরা সামলাতে পারছি না। বরং কিছুদিন প্রথম থেকে একচ্ছত্র শাসন জারি হয়ে থাকলে সুবিধে হত।" শুকুরা বললে।

দুঃখী একমত হতে পারল না। বললে— "মানুষ বড় দুর্বল। গণতন্ত্রকামী শাসক যতই উদার হোক না কেন যদি তাকে একচ্ছত্র আধিপত্য অল্পকালের জন্যে অস্থায়ীভাবেও দেওয়া হয় সে তাকে স্থায়ী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। গণতন্ত্র আর সম্ভব হবে না।"

"শাসক কি ইচ্ছে করে একচ্ছত্র শাসক হয় দাদা? আমরা একচ্ছত্র করে দিই, আমরা, এই লোকেরা। পরের ওপর নির্ভর করা আমাদের অভ্যেস— আদত হয়ে গেছে। নিজে কোনো দায়িত্ব মাথায় নিতে আমরা নারাজ। তুমি দেখবে এদেশে একচ্ছত্র শাসন জারি হবে। লোকে ভোট দিয়ে একচ্ছত্র শাসন ডেকে আনবে। ওপর থেকে কোনো শাসকের জবরদস্তি একচ্ছত্র শাসন জারি করাবার দরকার হবে না।"

"আমি মানছি"— বললে দুঃখী, "একচ্ছত্র শাসনের জন্যে বর্তমান ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু তার জন্যে এককভাবে লোকে দায়ী নয় বা কোনো ব্যক্তিবিশেষ দায়ী নয়। দায়ী এদেশের রাজনৈতিক দল। কারণ সব দলের এক সমস্যা— নেতা কে হবে! নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়াতে মেলামেশার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু নীতি নিয়ে পার্থক্যতে দুটো বিবাদীয় নীতির মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনা স্বাভাবিক।"

"কংগ্রেসেও?" বললে শুকুরা।

"নিশ্চয়"— দুঃখী জোর দিয়ে বলল। কংগ্রেসে তো এই নেতৃত্ব নিয়ে ব্যক্তিগত কলহ সবথেকে বেশি। ফলে একচ্ছত্র শাসনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করাতে কংগ্রেসই অগ্রণী। প্রত্যেক নির্বাচনে কংগ্রেসের বুলি তার প্রমাণ। 'আমাদের বাদ দিয়ে দেশকে আর কেউ শাসন করতে পারবে না'— এ প্রকার ধ্বনির মানে কি? গণতন্ত্র রাষ্ট্রে একটা রাজনৈতিক দলের এরকম প্রচার হাস্যকর। এটা একচ্ছত্রবাদী মনোভাবের পরিচয় দেয়।"

"তুমি তো একথা বলছ। কিন্তু জানো ভাইনা, নেতাজী বলতেন— নতুন সংবিধান জারি হওয়া পর্যন্ত প্রথম অবস্থায় ভারতে একচ্ছত্র শাসন হওয়াই উচিত। ভারতের স্থায়ী সংবিধান কিন্তু গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত।"

"সেইখানে বোধহয় ভারতের উচ্চতম নেতা ও নেতাজীর মধ্যে পার্থক্য। নেতাজী, তোর কথামতো, প্রথমে একচ্ছত্র শাসন জারি করে পরে গণতান্ত্রিক সংবিধান চালু করে দিয়ে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে দেশকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিতেন। তাই কংগ্রেসের মতিগতিকে আমি ঘৃণা করি। তবে নেতাজীর স্বপ্ন সফল হত কিনা সন্দেহ। পাকিস্তান তার নজির। যেমন বলে— মানুষেরা মানুষই। তার দুর্বলতা আছে।" দুঃখী কথা শেষ করল।

"সে-কথা অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে কিন্তু নেতাজী নেতাজী। তাঁর আর নেহেরুর মধ্যে তফাত সেইখানে। নেহেরু নুয়ে যাবেন কিন্তু ভাঙবেন না। নেতাজী ভাঙবেন বরং, নোয়াবেন না।"

"ভারতের ভাগ্যডোর কিন্তু নেতাজীর হাতে নয়— নেহেরুর হাতে। দেশের দুর্ভাগ্য।"

"সেটা মহাত্মাজীর ভুল," বললে শুকুরা। "নেহেরু আমার উত্তরাধিকারী বলে যদি না বলতেন তবে দেশের এত বড় দুর্গতি এড়ানো যেত।"

"তুই কোথা থেকে শুনলি এ কথা? বললে দুঃখী দাস, "গান্ধীজি এমন ভুল করতে পারেন না। এটা নেহেরুপন্থীদের মিথ্যে প্রচার। স্বাধীনতার পরে নেহেরু সরকার যা যা করেছে সব গান্ধীকথার বিরোধী। আমরা মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিলাম। এখন বড় বড় কংগ্রেস নেতারা মদ খায়। বড় বড় হাকিমেরা মদ খায়। মদ এখন একটা পানীয়তে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা লবণ সত্যাগ্রহ করে লাঠি খেয়েছিলাম। এখন নুনের ওপর দু-পয়সা থেকে দু-আনায় উঠেছে ট্যাক্স। গান্ধী বলেছিলেন, কেটে পর কুটে খাও। কংগ্রেসওলারা কাপড়ের কল বসাল, চালের মিল করল। গান্ধী বলেছিলেন এসব করতে?"

"কিন্তু গান্ধীজী তো কোথাও নেহেরুর ভিন্ন গুষ্টি বলে সাফ সাফ বলেননি।"

"বলেননি ঠিক। বলতে অবসর দিল না কাল। আমি শুনেছি তিনি এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং নেহেরুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন বিবৃতি দেবার জন্যে।"

রতনী এসে বলল— "এ বেলা বেগুনের কেয়ারিতে সেচানো হবে।" রোদ নেমে গেছিল। চমকে উঠল দুজনে।

সেদিন দুঃখী সকালে উঠবার সময় দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে ঘন— ওর জেলসাথী ঘনশ্যাম।

"সকালে আজ তোরই মুখ দেখলাম"— হেসে হেসে বলল দুঃখী।

"ভালো খাবারদাবার জোগাড় কর।" ঘন উত্তর দিল।

ঘন! জেলের সাথী। এক ওয়ার্ডে থাকত। দুঃখীর বাবাও এসে রইলেন সেখানে। ঘনকে দেখে অনেক ভুলে যাওয়া কথা না-ভোলা ঘটনা মনে পড়ে গেল দুঃখীর। টেনে নেওয়া শ্বাসটা বেরিয়ে পড়ল ফোঁস করে।

দুঃখীর বাবা। ব্রাহ্মণের ঘরে 'ননা' ডাকে বাবাকে। একদিন খবর এল জেলের গেটে কজন নতুন কয়েদি— রাজনৈতিক বন্দী। তাদের মধ্যে আছে অগনি দাশ। আর দায়রা বিচারের হাজতবাসী আসামী দুই পট্টনায়ক — বাপ-বেটা দুজনে— মদন এবং রাধাগোবিন্দ।

হাজতের আসামী দুজন থেকে গেল সেধারে— সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে। অগনি দাশ ও সঙ্গে আরো বিশ-পঁচিশ জন রাজনৈতিক বন্দী এল এধারে।

"এ যে দুখী'— অগনি দাশের চোখ কপালে উঠে গেল। তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একদণ্ড। কেউ দেখতে পায়নি। চোখ দিয়ে বয়ে গেল জল দুধার। যেন গলে গেল জমাটবাঁধা বরফ। কাউকে জানতে দেয়নি।

অগনি দাশ জানত ওর ছেলে আর বেঁচে নেই। কে যেন এসে খবর দিয়েছিল দুঃখীকে মেরে ফেলে দিয়েছে কেওড়া ঝোপের গোড়ায়। ঝোপেতে আবার আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়েছে একদল পুলিস। বুকটাকে পাথর করে দিয়েছিল। মনটাকে বেঁধে ফেলেছিল মমতার দড়িটা পাকিয়ে শক্ত করে নিজেরই গায়ে ওকে সর্বংসহ করে। সে ভুলে গিয়েছিল তার চলে যাওয়া দিনগুলোকে, মরা অতীতকে। মনে পড়লে সে পা দিয়ে ইট-পাথর ঠেলার মতো ঠেলে ফেলে দেয়, সরিয়ে দেয়, যেন সেগুলো পথের কাঁটা। এই ছেলে-বউ, ঘরসম্পত্তি সব গেছে। যাওয়ার যেটা যাক। আগামী দিনকে হাতে নিয়ে কোদালে কোপানোর মতো

সে ঘেঁটে দেখতে যেন তৈরি হচ্ছিল প্রতিদিন সকালে উঠে, ভোরের লালিমা ফোটার আগেই। কিন্তু সে ভুলতে পারে না একটি কথা— ওরই চোখের সামনে ঘটে গেল সেদিন। ধনিয়া— ধনিয়া মাস্টার। তার বুকে বন্দুকের মুখ লাগিয়ে দেগে দিল। ফট করে গড়িয়ে পড়ল ধনিয়া। উড়ে গেল প্রাণবায়ু চোখের পলকে। 'ঠো'— সব শেষ।

মেরে ফেলল ধনিয়াকে। কাঁচা বয়েসের জোয়ান ছেলেটা। এই পুলিস। পুলিস! কালা আদমি। গোরা নয়, কালা। গোরাদের গোলাম। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হত্যা। মহাভারত। এমন কত ধনিয়া মরে থাকবে। এই কালো চামড়া পল্টনের গুলিতে। ওর ছেলে মরল তো কি ভেসে গেল। তাদেরও তো মা-বাবা আছে, তারাও সয়ে থাকবে। বুক পাথর করে, চোখ বুজে, কাঠের পুতুলের মতো।

'দুখিয়া!'

পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ডাকটা। জিভের ডগায় আটকে গেল। কেউ শুনতে পায়নি। কাউকে শুনতে দেয়নি অগনি দাশ। দুঃখী এসে দণ্ডবৎ করল। ওর বিশ্বাস হল দুঃখী বেঁচে আছে। কি সব জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। সব মিলিয়ে গেল। গিলে ফেলল বেরিয়ে আসা কথা। যে পথ দিয়ে খাওয়া, চিবোনো, জলীয় পদার্থ ঢোক গেলে সেই পথে। থেকে গেল পেটের মধ্যে কোনখানে, তবে হজম হল না।

বেরিয়ে পড়ল। দুঃখী যে ঘরে থাকত সেই ঘরে বিছানা পাতা হল অগনি দাশের। কম্বল, সতরঞ্জি, বিছানাচাদর, বালিশ।

সোজা মাথা নুয়ে যায়নি। চোখের পাতা পড়েনি। জিব আড়ষ্ট হয়নি। কথা বলতে ঠোঁট কাঁপেনি। গা থর থর করেনি। একটি একটি করে এক এক বছর গোনার মতো বলে গেল অগনি দাশ। 'তোর মা পুড়ে মলো'। ব্যস ওইটুকু। আর কোন কথা নেই। দুঃখী শুনল। পাশে বসেছিল, কাঁদেনি। তেমনি কাঠ হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেল। চান করল। দশদিন অশৌচ পালল। নেড়া হল। শ্রাদ্ধ দিল— পুরোহিত নিজে অগনি দাশ।

কিন্তু বাবা বলে ডাকার সুযোগ তাকে বেশিদিন দিল না অগনি দাশ। বাইরে সুস্থ সবল, ভিতরটা কিন্তু জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ঝুরত প্রাণটা ভেঙে পড়ল। শুকনো পচা বাঁশটাকে যেন মড়মড় করে ভেঙে ফেলল কেউ। ঠ্যাঙার মতো চারহাত মানুষটা ভেঙে দুখানা। সেই যে বিছানা ধরল আর ওঠেনি।

দুখীর মনে সান্ত্বনা সে বাপের সেবা করতে পারল শেষ বেলায়। জীবন যাবার সময় বুড়ো খালি প্রলাপ বকল। সেই একটি কথা। 'দুখীর মা - দুখীর মা!' দুখীর মা হয়ে হয়ে ওর জীবন বেরিয়ে গেল।

বুড়ো বকতে থাকে। যেন ওর চোখে দুখীর মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছে। বলে চলে— ' দুখীর মা, তুমি এসেছ? চল। এই যে আমি বেরোচ্ছি। সে কি? তোমার ঘা এখনো শুকোয়নি? এতদিন পরে এলে? আমি যে চেয়ে বসে আছি তোমাকে। আমায় ছেড়ে একা একা চলে গেলে কি করে? ভয় করল না তোমার? তোমার দোষ নেই। আমি জানি। ইংরেজরা সতীদাহ তুলে দিল। ইতিহাসে নাম থেকে গেল। এখন নতুন করে সেই প্রথা চালু করে

দিল। স্বামী মরবে না, চেয়ে থাকবে ড্যাব ড্যাব করে। তারই চোখের সামনে স্ত্রীকে জ্বেলেপুড়ে সতী করে দিল তারা। তবে আমি ঠিক জানতাম তুমি পুড়বে না। অগ্নিদেবতা তোমাকে পোড়াতে পারবে না। সীতাকে কি পোড়াতে পেরেছিল? তোমাকেও পারল না। এতদিন 'ছিলে কোথায়? আমাকে মনে পড়ছিল? ও কি পায়ে? এখনো সেই ঘা শুকোয়নি? দাঁড়াও, আমি নারকেল তেল কর্পূর মিশিয়ে লাগিয়ে দিই। শুকিয়ে যাবে পা। সরিয়ে নিচ্ছ কেন? ভয় নেই, খুব আস্তে আস্তে লাগিয়ে দেব। ছিঃ কিসের? ও, অধর্ম হবে! তোমার পায়ে হাত দিলে তোমার পাপ লাগবে? মোটেই নয়। আমি বলছি তুমি পা এগিয়ে দাও লক্ষ্মী মেয়ের মতো। অধর্ম হলে আমার হবে, তোমার নয়। শাস্ত্রে আছে তোমার পাপ আমার। তোমার হাত ধরেছি না আমি? .... পতি পরম গুরু! .... তোমার কিছু হবে না। যমদণ্ড নেই তোমার। আমার নেই তো তোমার কি করে হবে?.... যমের বাবাও নিতে পারবে না আমায়। কেন নেবে? আমি কারো খাই না ধারি? কারো মন্দ করিনি বা ভাবিনি। তুমি ভয় করো না। আমি আছি। .... এ কি, তুমি কাঁদছ? কেন? ছি ছি, পিছনে তাকাও কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুখিয়া বিয়ে করবে, বংশ থাকবে,পিণ্ড পাবে। চিন্তা কিসের? আমরা কি পিণ্ডের জন্যে চেয়ে বসে থাকব? পিণ্ড কি আর আছে কলিকালে? রাম বল। লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়া— পিণ্ড দেবে কে? ব্রাহ্মণ আসবে কোথা থেকে? ব্রাহ্মণরা তো ইঞ্জিরি পড়ল। ও বিদ্যাতে কি পিণ্ড আছে যে দেবে। .... দেখতে থাক — খালি ডাইনি - পেত্নি - ভূত- প্রেতে কিলবিল করবে গোটা দেশ। তুমি হবে না। আমি হব না। তুমি বড়ই যজ্ঞ করলে। সে মারণ-যজ্ঞে স্বাহা করে আমি তোমাকে পূর্ণাহুতি দিলাম। .... দেশ স্বাধীন হবে। মানুষ পেটের দানা পাবে। সেই যজ্ঞ কি নিষ্ফল হবে? অগনি দাশ যে কর্ম করে তা নিষ্ফল হয় না। এত পুণ্য করে আমরা ভূত হব? কক্‌খনো নয়। রাম বল। কৃষ্ণ বল!'

বলতে বলতে গলা বসে গেল বুড়োর। কথা বেরোল না। ঠোঁট নড়ছিল শুধু। ছেলে বসে থাকে মাথার কাছে। গাঁয়ের মানুষ যারা ছিল জেলে, ঘিরে বসেছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরা এসে দেখে যাচ্ছিল। বুড়ো ইশারা করল। ওয়ার্ডার-এর কাছ থেকে নির্মাল্য এককণা কেউ চেপে নিয়ে এসে দিল। জেলের মধ্যে নির্মাল্য দুষ্প্রাপ্য।

ঠোঁটে রাম নাম। চোখ স্থির হয়ে গেল। বুকটা ওঠাপড়া করছিল। থেমে গেল। উড়ে গেল প্রাণবায়ু। সব শান্ত। মহানিদ্রা।

ফুলেতে ডুবে গেল অগনি দাশের শব।

শহীদ অগনি দাশ! অগনি দাশ কি জয়! মহাত্মা গান্ধীকি জয়। তুমুল ধ্বনির মধ্যে সরকারি লোকেরা নিয়ে গেল অগনি দাশকে — বাইরে — জেলের বাইরে সংস্কার করতে। মুখে আগুন দেয়নি দুঃখী। কান্নাও পায়নি দুঃখীর। হ্যাঁ কেঁদেছিল বটে, একবার মাত্র।

গেট খুলে গেল। তাকিয়ে ছিল দুঃখী— বাপকে ওর গেটের বাইরে নিয়ে যাওয়া মাত্র পড়ে গেল ফাটক। সে ফিরে এসেছিল। কেউ ছিল না সেখানে। একটি নিরালা কোণে বসে পড়েছিল। বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে উঠেছিল। ওই পর্যন্ত।

সেই শহীদ অগনি দাশকে কেউ আর মনে রাখেনি। সেদিন শোকসভা হয়েছিল শহীদ অগনি দাশের জন্যে। দুখী যায়নি সভাতে।

নীরবে বসে ধ্যান করেছিল সেই দেবমূর্তিতে। সে মূর্তি যেন ওর চোখের সামনে এসে বার বার বলছিল সেই পুরোনো কথা— 'যে ধর্ম নিজে আচরিবে, আনে প্রকাশ না করিবে।' দয়া ধর্ম সদাচারকে প্রচার করলে আপনার উপচার হয়ে যায়। পুণ্য পচে যায়। 'হাঁ জী হাঁ জী করতে রহো বৈঠে আপনা ঠাম।'

দুঃখীর শোক করার কিছু নেই। যেন বাপের এই উপদেশ, এই আজ্ঞারূপে ওর বাবা এখনো বেঁচে আছেন। সে কেঁদেছিল সত্যি। সে কান্না নিজের অপরাধের জন্যে। জীবনে সে যতটা বাবার অবাধ্য হয়েছে, তারই জন্যে। অনুতাপে, শোকে নয়।

আর একদিন সভা হয়েছিল। মনে পড়িয়ে দিল ঘন। গল্প করতে করতে কত কথা হল। পরিয়ার কথাও। সভা হয়েছিল পরিয়ার জন্যে। পরমানন্দ জেনা। ভালো ছেলেটা। অকালে চলে গেল। খালি জলের মতো বাহ্যে হয়ে যাচ্ছিল। সেবা করছিল দুঃখী আর ঘন। এত সেবা করল, তবু যদি বাঁচত! স্বাধীন ভারতকি জয়, মহাত্মা গান্ধীকি জয় বলতে বলতে জীবন ছাড়ল। সন্নিপাত। ঘন বসে সেঁক দিচ্ছিল পায়ে। কিছুতে কি শুনল? কোরামিন শুনল না। যাবার কথা গেল। কে আটকাবে? শহীদ হয়ে গেল শত্রুর শিবিরের মধ্যে। সে হরিনাম করেনি। তবু মুক্তপরুষ।

আর অগনি দাশ? অগনি দাশ ভারত বুঝত না, দেশ চিনত না, গান্ধী কে জানত না। শুধু নাম শুনেছিল। একটা মাত্র কথা ছিল তার— অধর্মকে বরদাস্ত কোরো না কোথাও। ধর্ম হল সাক্ষাৎ ভগবান। যে অধর্ম করে সে ঈশ্বরদ্রোহী। সে দেশের জন্যে লড়েনি, দেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করেনি, মহাত্মা গান্ধীর কথায় জেলে যায়নি। সে কেবল রুখে দাঁড়াল সেদিন অধর্মের সামনে— অধর্মকে বরদাস্ত করতে না পেরে।

'হরি' 'হরি' বলে সে চলে গেল। সারা জীবনে কখনো কোথাও ঘন্টাখানেক বসেও হরিভজন হয়ত করেনি সে। সবসময় কিন্তু একটি কথা মুখে— ধর্মে প্রাপত নরহরি।

সরকার দয়া করে শবদাহ করেছিল। কুকুর শেয়ালের মুখে ফেলে দিলেও দুঃখী দাস দুঃখ করত না। সকলে বলল দুঃখী দাস 'প্যারোলে' যাক — পিতৃশ্রাদ্ধ দেবে। বড় বড় নেতাদের উপদেশ শুনল না। শত্রুর কাছে ভিক্ষা করতে শেখেনি সে। শেখায়নি ওর বাপ। শত্রু নয় অধর্ম। অধর্মের কাছে সে মাথা নোয়ায়নি, নোয়াল না।

"সে ধর্ম কি উবে গেল কোথায়— বছর কটাতে? অগনি দাশের ধর্ম, পরিয়ার ধর্ম, শত শত শহীদের ধর্মের ফল কি এই হল?" বলছিল ঘন। "শেয়াল কুকুরের মতো কিরকম কামড়া-কামড়ি লাগিয়েছে এরা। লাজ নেই শরম নেই এদের।"

"আমার মনে হয় সেটা অতি শুভ লক্ষণ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শিবিরে বিভেদ স্বাগতযোগ্য। সেজন্যে দুঃখ নেই। দুঃখ আমার কেবল নিষ্ক্রিয়তার জন্যে। আমাদের কি কোনো কর্তব্য নেই ঘন? আমরা কি এমনি চুপ করে বসে থাকব?" দুঃখী বলে।

"চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি? লোকে তোমাকে খুঁজলে পরে তবে তো তুমি কিছু বলবে? মেগে পেন্নাম যেচে কল্যাণ করার মানুষ আমি নই। তার চেয়ে নিজের ধান্দায় লেগে থাকা ভালো।"

"এটা পলায়ন পন্থা।"

"পলায়ন নয়। দুনিয়া যদি ভুল পথে যায় আর তোমাকে বাধ্য করে যেতে, তুমি দেখিয়ে শিখিয়ে দিলেও শিখতে প্রস্তুত নয়, তোমার উপায় কি? শুধু ঠাকুরকে ডাকা ছাড়া?" ঘন বললে।

"প্রার্থনাতে অনেক কাজ হয়। শুধু প্রার্থনাতে।" দুঃখী বললে। "কিন্তু সেই প্রার্থনাটুকুও আমরা করছি কই? প্রার্থনাও একটা কাজ। সে এত সহজ কথা নয়। সকলে মিলে যদি ঠাকুরকে ডাকত তবে অবস্থা বদলে যেত। বালুঙ্গাদা বলে— 'সর্বে হইয়া একমুখ, ডাকিল নারায়ণ রাখ'। তবে গিয়ে ভগবান দেবতাদের দুঃখ শুনে অসুরবিনাশ করলেন। আমরা কি একমুখ হতে পারছি?"

"সে জন্যেই তো বলছি সবসে ভলা চুপ। "

"চুপ হয়ে কি থাকতে পারবি ঘন? প্রকৃতি তো টানবে। গীতায় বলেনি? মনে আছে তো?"

"গীতায় যে প্রকৃতির বশে অবশ হওয়া বলা হয়েছে সে কাজ করতে গেলে মানুষ একলা হয়ে যাবে এ সমাজে, সে তো আরো বিপদ।"

"সেই বিপদকে ভয় করে নীরব থাকতে বলিস? বিপদের সম্মুখীন হওয়াই পৌরুষ। 'সুখীনো ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমিদৃশম্'।"

"যুদ্ধ আমি করেছি। নদীর স্রোতের মুখে উজান যেতে চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা কেবল ডুবে মরার জন্যে। আমার অবস্থা এখন কি?"

দুঃখী তাকাল। দাঁত কয়েকটা পড়ে গেছে ঘনর। সামনের দাঁত। কানের গোড়ায় চুল পাকতে লেগেছে। চোখে চালশে চশমা একটা— চেয়ে আনার মতো— পড়বার সময় নাকে লাগায়। কাঁধের ঝোলাতে পড়ে থাকে। সেই যে নুনমারার আন্দোলনে যোগ দিয়ে জামা পোশাক ছেড়েছিল আর কখনো মন করেনি পরতে। জমি দু-চার বিঘা ছিল। ইংরেজ সরকার সব নিলাম করে নিল জরিমানা বাবদ। বাস্তুভিটার লাগোয়া বিঘা তিনেক জমি আছে। তাতে যা ফসল হয় তরিতরকারিটা চলে যায়। আগে চাঁদা দিত কিছু কিছু গুজরাটি কচ্ছি ব্যবসাদারেরা গান্ধীজীর খাতিরে। আর দেয় না। দু-দশ বার চেয়ে না পাওয়ার পর আর চাইতে যায় না। মানা করে না কেউ। কাল, পরশু, দুদিন বাদে আসুন এমনি বলে। উপোস রইল দিন কতক। পাঁচ প্রাণীর সংসার। তিন ছেলে আর স্ত্রী— এক বেলা খায়, এক বেলা উপোস। মন্ত্রীদের কাছে দৌড়ে দৌড়ে পাঁচ-সাত বছর বাদে জমিগুলো ফেরত পাওয়া গেল। নিশ্বাস ফেলল ঘন। পেটে দানা পড়ল। ট্যাঁকে পয়সা আসতে মন উসখুস করল। শুরু করল মৌলিক বিদ্যালয়।

"আমার তো নেশা লাগল," ঘন বলতে থাকে। দুঃখী শুক্রা শুনতে থাকে বসে। "চারদিকে খালি হাইস্কুল কলেজ খোলা হতে থাকে। সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। লোকেরা চাঁদা দেয়, চুরিও করে। পাগলা কুকুরের মতো মেতেছিল লোকেরা। সেই স্রোতের মুখে আমি দাঁড়ালাম একা। কেউ সহায় নেই। গুঁড়ো দুধ বেচে আমি পয়সা করতে পারলাম

না। আমেরিকা আমাদের ভিক্ষে দেয়। আমাদের ছেলেপিলেদের জন্যে। পোয়াতি মেয়েদের জন্যে। সেটা কারো পেটে যায় না। পড়ে চা-খোর নেশাখোরদের পেটে। আমাদের জাতীয় চরিত্রকে নষ্ট করল ওই গুঁড়ো দুধ।"

বলতে বলতে ঘনের রক্ত যেন তেতে উঠছিল। আসল কথার খেই ছেড়ে চলে যাচ্ছিল এদিকে সেদিকে। দুঃখী বুঝল। বললে— "বেসিক ইস্কুল কি হল? চলছে তো?"

"চলবে কি করে? পড়বে কে? সব বাবা-মা তো চাইল তাদের ছেলেমেয়েরা কোনমতে চাকরি করে চেয়ারে বসে তাদের পুষবে। খেটে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে পড়া কি তাদের পোষাবে? কথায় বলে 'খেলোয়াড় বুদ্ধি ছাড় রে বাবু, লেখাপড়া করে হবি যে বাবু!' বেসিক স্কুলে পড়বে কে। সবাই বলে ইংরেজি ছাড়। ইংরেজি ছাড়তে বলে তাদের ছেলেমেয়েকে কনভেন্টে স্টুয়ার্টে ইংরেজি পড়ানোর মতো তোমার ছেলেমেয়েকে তুমি কি এখানে পড়াবে? তোমাদের ছেলেরা লেখাপড়া করে বাবু হবে, আমাদের ছেলেরা গজমূর্খ? ঘাস কাটবে ইস্কুলে? আমি তো পড়িয়েছিলাম তিন ছেলেকে ওই বেসিক স্কুলে।"

"আরো তো কোথাও কোথাও বেসিক স্কুল হয়েছিল।" দুঃখী বলল।

"হ্যাঁ, হয়েছিল।" ঘন বলল।

"সে সব আছে না উঠে গেছে?"

"অন্য সবের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, ত্যাগবীর মহাপাত্র মশায় যে বেসিক স্কুল বসিয়েছিল সেও তো গেছে। অন্য কার কথা বলবো বল?"

"কি হল, সে স্কুল উঠে গেল?" দুঃখী জানতে চাইল।

"উঠে যাবে কেন? সেটা গান্ধী-মার্কা বিড়ি হয়ে গেল!"

"গান্ধী-মার্কা বিড়ি?" শুকুরার কৌতূহলী প্রশ্ন।

"দেখনি গান্ধী-মার্কা বিড়ি, তামাক সব পাওয়া যায়? মদও মেলে।"

"গান্ধী-মার্কা মদও বেরিয়েছে?" শুকুরা আশ্চর্য হয়।

"না, গান্ধী-মার্কা মদ পাওয়া যায় না বটে, তবে কংগ্রেসী নেতারা যে মদ খেয়ে গান্ধীজয়ন্তীর পুরোধা হয় তার নাম গান্ধী-মদ। তারা বলে গান্ধীজীও শেষের দিকে ডাক্তারের কথায় বেশি কাজ করার জন্যে নাকি খেতেন।"

"সত্যি খেতেন?" চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করল শুকুরা। হো হো করে হেসে উঠল ঘন - দুঃখী দুজনেই।

"আচ্ছা ওই মহাপাত্রের মৌলিক বিদ্যালয়ের কি হল বলত?"

"সে জায়গায় এখন মহাপাত্র মশায়ের স্মৃতিতে মহাপাত্র মহাবিদ্যালয় মানে কলেজ হয়েছে। আর শ্রীমতী মহাপাত্রের নামে একটা মহিলা মহাবিদ্যালয়।"

"হে ভগবান! বেঁচে থাকাকালে তো তাঁকে অবজ্ঞা হতাদর যত করেছে, মরার পরেও স্বর্গত আত্মাকে নরক যন্ত্রণা দিতে এত ষড়যন্ত্র!" দুঃখী দুঃখ করে।

"আমাকে শিক্ষাবিভাগের কর্তারা অনুরোধ করেছিল— হাইস্কুল করে দেবে।"

"যুক্তিটা কি?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"সেই পুরোনো যুক্তি। ডিরেকটার, সেক্রেটারি সকলের সেই একই কথা। বললে লাভ কি? অযথা অর্থহানি। প্রথমে বললে— ছাত্র হচ্ছে না। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পেলাম তাদের হাতে পায়ে ধরে তাদের ছেলেপিলেদের ছাত্রাবাসে রেখে খরচ দিয়ে পড়ালাম। তখন বললে— রিপোর্ট আসছে ছেলেরা ইংরেজিতে অঙ্কতে বড় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বেসিক স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজের পাঠ পেরে উঠছে না। সেকেন্ডারি বোর্ডএ স্কুল তুলে দিতে মত দিয়েছে। কারণ তাদের মতে বেসিক স্কুল থেকে বেরোনো ছাত্ররা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। মৌলিক স্কুলে মূল কাঁচা রয়ে যাচ্ছে। ফলে আই.এ.এস., আই.পি.এস. ইত্যাদিতে ওড়িয়া ছেলেরা বেশি সংখ্যায় স্থান পাবে না।"

"তা ছাড়া আর কি বলত?" বললে দুঃখী। "সরকার তো চলেছে সেই একটি ধাঁচায়। একমুখো। গাছের ডগায় দৃষ্টি। গোড়ায় নয়। ওপরেই না যত ফুল ফল। গোড়াতে কি ফুল ফোটে, না ফল ধরে? চারিদিকে বেকারী স্কুল। বেকার সৃষ্টি করে চলেছে। এর শেষ কোথায় কে জানে?"

"বেকার তারা কেন সৃষ্টি করবে? বেকার সৃষ্টি করলাম আমি। তিন তিনটে ছেলেকে মৌলিক স্কুলে দিলাম। শেষে লাঙল ধরল।"

"মন্ত্রীকে দেখা করে বলেছিলেন?" বললে শুকুরা।

"তা আর বলিনি?" ঘন বললে।

"কি বললেন তিনি?"

"শিক্ষামন্ত্রী বললেন— 'আপনি কেন ভুয়ো কাজে মেতেছেন? মাতলেও নিজের ছেলেপিলেদের কমন স্কুলে দিয়ে দিন। তাদের জীবন নষ্ট করবেন না।' আমি কি শুনলাম সে কথা? হয়ত তারা ঠিক বলেছিল।"

"আর মুখ্যমন্ত্রী?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

"হ্যাঁ, একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা করলাম। একজন যা বললেন সে কথা ভুলতে পারছি না। একসঙ্গে জেলে ছিলাম। বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। চুপ করে ডেকে নিয়ে বললেন— ঘন, কিছু গ্র্যান্ট দিচ্ছি নিয়ে যাও। তোমার অভাব কিছুটা মিটবে। স্কুল তো থাকবে না। স্বতঃসিদ্ধ কথা। চাকা কি আর পিছনে ঘুরবে? ঘুরবে না।

"আমার ভীষণ রাগ হল দুখী। এরা নিজেরা যা, সবাইকে ভাবে তাই। আমি যাচ্ছেতাই বলে চলে আসতাম। কিন্তু স্কুলটা চোখের সামনে নাচল। স্কুলের জন্যে সমস্ত দিয়েছিলাম, ইজ্জৎটুকু বাকি ছিল। তাকেও দিয়ে যাব এখানে? ভাবলাম, সব যাক সম্মানটা থাক। মান গেলে আর ফেরে না। নমস্কার করে উঠলাম। আমাকে উঠতে দেখে মন্ত্রী বললেন— চলে যাচ্ছ নাকি; বস বস কথা আছে। আমি যত মানা করলাম মন্ত্রী ছাড়লেন না। চা বিস্কুট কাজু এল। আমাকেও দিলেন। খাওয়া সেরে বললেন— ঘন, তুমি বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারলে না। সেই জন্যে রেগে গেলে, অভাবটা তোমার একার নয়। অভাব আমাদের সকলের। সকলের অভাব যাতে মেটে তার জন্যে আমাদের নামে ওই স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখতে

হবে। কিন্তু তুমি যেমনভাবে দিন নেই রাত নেই খাওয়া নেই শোওয়া নেই স্কুলের পেছনে মেতে আছ সেটা করলে পণ্ডশ্রম হবে। লোকে গান্ধীকে যতদিন পুরোপুরি ভুলে না যায় ততদিন পর্যন্ত এরকম বেসিক স্কুল দুটো একটা থাকা দরকার। শুধু দোষ ছাড়ানোর জন্যে। যেমন খাদি বোড় খাদি কমিশন করে বসে গেছি। বুঝলে? খাদি সকলে পরুক বলে কি আমরা চাই না পরি? বাইরে খদ্দর। বাড়িতে বউ-ছেলেরা কি খদ্দর পরে? শতকরা পঞ্চাশ কংগ্রেসী এম-এল-এ খাদি পরে না। তবুও তারা খাঁটি কংগ্রেসওলা। বুঝলে?

"আমার আরো রাগ হল। এত কথা বলে তিনি তাঁর দোষ ঢাকতে অযথা চেষ্টা করেছিলেন। আমি বললাম— আপনি বলতে চান যে আমিও সরকারের মতো লোকদের ঠকাব? সেটা আমার দ্বারা হবে না। বললেন— আহা-হা, আমি কি তাই বললাম? তুমি বুঝতে পারলে না। আমার বলার কথা— গান্ধীকে লোকে ভুলেছে। গান্ধীর কথাও। অন্যদের কথা বাদ দাও, আমাদের কংগ্রেসীরাও ভুলেছে। যে কংগ্রেসী এম-এল-এরা গান্ধীর নাম ধরে ভোট নেয় তারা যদি ভুলল, আর কে মনে রাখবে? কার কি গরজ? তাই বলছিলাম কি, স্কুলটাকে রাখ। মহাত্মা গান্ধীর একটা স্মৃতি থেকে যাক। অন্যে তা রাখতে পারল না, রাখল ঘনশ্যাম দাস।"

ঘন বলতে থাকে — "আমি এলাম একটা জিদ ধরে। ছেলেদের বেসিক স্কুলে পড়ালাম। ফলটা হল কি? এখন তিনজনেই বেকার। তাদের ভিতর থেকে উঁচু ধাপেও পড়ল না কেউ।"

গুম মেরে বসেছিল দুঃখী। শুকুরাও তাকিয়েছিল হাঁ করে। দুঃখীর ছেলেপিলে কেউ নেই। শুকুরারও। কেউ কখনো চিন্তা করেনি ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কথা। তবু মনে হল আর মানুষ গড়ার দরকার নেই। ঠাকুর গড়ার দরকার নেই। বাঁদর চাই, বাঁদর!

এই ঘনশ্যাম একজন আদর্শ মানুষ। দুঃখী সব খবর রাখে। গান্ধীগত প্রাণ। আজও সুতো কাটে। প্রতিদিন। রাত থাকতে উঠে তকলি ধরে সুতো কাটে। চরকা না। বলে— নিজের কাটা সুতোয় নিজে কাপড় পরা আর ওর লক্ষ্য নয়। বস্ত্রাভাবে সূত্রং দদ্যাৎ করছে। কেবল একটা ব্রত। শুধু নিষ্ঠা। সামাজিক জীবনে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। সেজন্যে জীবনের শৃঙ্খলাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে অনেক বড় কাজ হল বলে সে মনে করে। এ একটা অতি ক্ষীণ স্বর। তবু এর মূল্য আছে। তার যুক্তি— গান্ধীজীর কুটীরশিল্প, গ্রামরাজ্য, গ্রামোদ্যোগ মস্ত বড় দেউলের মতো। বড় নিরেট কল্পনা। সেটা ডুবে যাচ্ছে। ঘন শুধু নীলচক্র থেকে একটু বালি বের করে নিয়ে বসে আছে। কোনো গালমাধবের ঘোড়ার খুরে কোনোদিন যদি ঠেকে যায়!

খেটে খায় ঘন। ছেলেরা তার খেতে যায়। জাতে কায়স্থ। একটা পরগাছা সভ্যতার দায়াদ। ঘন দাসের ছেলে-ভাইপোরা হাল-লাঙল নিয়ে খেতে চাষ করে। বললে কেউ বিশ্বাস করে না। এক ছেলে খাদি সংস্থায় কাজ করে। মৌয়ের বাক্স গোনে। পিওনের চেয়েও কম মাইনে। ওর ছোটো ভাইয়ের দুটো ছেলে। রাজধানী স্কুলে পড়ে। সে বড় ভাইয়ের কথা শুনল না। ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে পড়াল। হয়ত একদিন আই.এ.এস. হবে। ঘনশ্যাম দাসের ভাইপো আই.এ.এস.। ঘন হাসে। ছোট ভাই ঘনকে বলে— তার ভাইয়ের ছেলেও তো ওই 'মৌলিক' স্কুলেই পড়ছে। ঘন আশ্চর্য হয়ে তাকায় মুখের দিকে। গুরুজনকে ঠাট্টা। ছোটভাই

বুঝিয়ে দেয়— হ্যাঁ দাদা, এখন সবগুলো প্রাথমিক স্কুলের নাম মৌলিক স্কুল হয়ে গেল। একটা কলমের আঁচড়ে মন্ত্রী সব স্কুলকে মৌলিক স্কুল করে দিলেন।

খুশি হয়ে ঘন বলে— "সেখানে কি চরকা চালায়? কার্পাস বোনে? পড়ার সঙ্গে ধান্দাও শেখে ছেলেরা?"

"সে সব কিছু নেই দাদা, শুধু নামটা মৌলিক।" ছোটভাই বলে।

রাতারাতি ওড়িশার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম 'মৌলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়' হয়ে গেল। টাকা জোগালেন ভারত সরকার। সেই টাকায় চলল গান্ধীমার্কা মদের প্রচার। ঘন বলে। দুঃখ করে না। লোকদের ধোঁকা দিয়ে যতদিন শাসন চলবে চলুক। এ তো একটা সামান্য নমুনা। এক যুগ ধরে গান্ধীজীর নামে চলে এসেছে কেবল ধোঁকাবাজি।

"বোধহয় ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলই এ ধোঁকাবাজি থেকে মুক্ত নয় কেবল কম্যুনিস্টরা ছাড়া," ঘন বললে, "কারণ এরা কথায় ও কাজে গান্ধীবিরোধী?"

দুঃখী প্রতিবাদ করল না। ঘন শুরু থেকেই জেলের মধ্যে কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি দেখাত। কম্যুনিজমের প্রতি নয়। কারণ তারা আত্মপ্রতারণা করত না। নিজের আদর্শে বিশ্বাস করত। মানুষ পরিস্থিতির দাস। তারা নিজেদের পরিস্থিতির দাস করে নিত। পরিস্থিতির প্রভু বলে কখনো ঘোষণা করত না। তারা পরম্পরায় বিরোধী। সেজন্যে স্পষ্ট বলত রুশদেশ থেকে নতুন সভ্যতা আনা উচিত। অবশ্য ঘন স্বীকার করে যে পরিস্থিতির দাস হলে মানুষ নতুন কিছু করতে পারে না। কেবল পরম্পরাকে ভুলে যাওয়া সার হয়।

ঘন সামান্য একটি মানুষ নয়। সত্যের সে সন্ধান করে এসেছে সারাজীবন। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের পরে সে জেল থেকে খালাস পেল। তারপর পড়তে গেল কাশী বিদ্যাপীঠে। ওর মামা ওকে সাহায্য করতেন মাসে পাঁচশ টাকা মাত্র। তাতেই ওর চলে যেত। কয়েকমাস পরে গোলটেবিল থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী আবার বন্দী হলেন। জোরদার সত্যাগ্রহ চলল। সেই সময়ে কাশী বিদ্যাপীঠের যত ছাত্র, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা সকলে গ্রেপ্তার হল। এই কাশী বিদ্যাপীঠের ধরনে যতগুলো প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়ে উঠেছিল সে-সব নাকি সামন্তবাদী সভ্যতার শেষ চিহ্ন। মহাত্মাজীর 'রিভাইভ্যালিজম' বা পুরোনো জিনিসের ওপর আসক্তি থাকা এক একটা নমুনা। রামবাবু ও তাঁর সাথীরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম শুনলে হাসেন। মানুষ আধুনিক হলেও সহজে তার রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ছেড়ে দিতে পারে না। পুরোনো জিনিস পচে ক্ষয়ে গেলেও ফেলে দিতে কষ্ট হয়। রামবাবুর মতে, গান্ধী ছিলেন সেই ধরনের রক্ষণশীল মানুষ। যুক্তিসিদ্ধ বস্তুবাদে মৃত পদার্থের পুনর্জীবন দেওয়ার অর্থ মানুষের সমাজকে পিছনে টেনে নেওয়া। সমাজে সংঘর্ষ হবেই হবে। সংঘর্ষে তৃতীয় এক নতুন জিনিসের আবির্ভাব হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোনো বিলোপ পেয়ে যায়। তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বৃথা। ঘন কিন্তু রামবাবুর কথায় বিশ্বাস করে না। সে বলে পুরোনোর ওপরেই নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুরোনোটাই ভিত। ঘনের এ বিশ্বাসের মূলে যত না তার পড়াশোনা তার বেশি ওর নিজের মহার্ঘ অভিজ্ঞতা।

দুঃখী জানে যুক্তপ্রদেশের জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ঘন আর ওড়িশাতে ফেরেনি

অনেকদিন পর্যন্ত। পথে আটকে গেছিল কলকাতায়। তার এক বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে মিলে সেখানে অনুশীলন দলের সংস্পর্শে এল। ভাবল বরং হিংসাতে বিশ্বাস করে সেই মতো কাজ করা ভালো। কিন্তু ভিতরে হিংসাভাব রেখে অহিংসা প্রচার করা পাপ। হিংসাতে বিশ্বাস করলেও সে কিন্তু কম্যুনিস্ট হতে পারেনি। বড় কে? মাতৃভূমি না পিতৃভূমি? ভারত না রুশ? তার মনে এল প্রবল দ্বন্দ্ব।

সেইখানে ওর পরিচয় হয়েছিল পরিমল বোসের সঙ্গে। ওই কলকাতায়। ওর জেলের বন্ধু বিমল ভট্টাচার্যের বাড়িতে তিনি আসতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বিমল-পরিমলের মধ্যে আলোচনা চলত। সে বাধ্য হয়ে বসে শুনত। পরিমলের দাদার বয়স তখন ষাট। বেঁটে মতো লোকটি। নিরাড়ম্বর। একখানা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি। ব্যস ওইটুকু। চুল ছোট করে ছাঁটা। গোঁফ থেকেও না-থাকার মতো। পাকা পাকা সাদা চুল সাদায়-কালোয় আধাআধি। ঘনর কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ঠাহর হয় সে মাথার 'বাল' (ওড়িয়াতে)-কে 'চুল' বলছে। 'চুল' বলার পিছনে এক ছোট্ট ইতিহাস আছে। একবার ওর বন্ধুর সঙ্গে সে পুরী বেড়াতে এসেছিল। ওড়িশার এক বড় স্টেশনে গাড়ি থামলে ওর বন্ধু পানসিগারেটওলাকে জিজ্ঞেস করল এটা কোন স্টেশন। 'বালেশ্বর'! বিমল হেসে ফেলল।

ঘন বুঝতে পারেনি ওর হাসির কারণ। বিমলটা অমনি। ওর হাসি-কান্নাতে কিছু মানে থাকে না। বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান ছেলেটা। সেবার সে পুরী যাওয়ার জিদ ধরল। সমুদ্রের ধারে বেড়াবে— ওর অনেক দিনের সাধ। ঘন তাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছিল।

গহনার ভিতরে নিমকাঠির মতো ওড়িশার তখনকার সবচেয়ে বড় শহর কটক স্টেশনে গাড়ি ছুঁতে না ছুঁতে হকার চেঁচিয়ে উঠল— 'বালকাটি বাসন, বালকাটি বাসন'।

'অসভ্য' বলে মুখ হাঁড়ি করে বসল বিমল। এতক্ষণে গিয়ে ঘন বুঝল বালেশ্বর বলে স্টেশনের নাম শুনে সে হেসেছিল কেন। তারপরে অনেকগুলো 'বাল' শব্দের সমাহার হয়ে গেল পরপর— বালমুকুন্দপুরের ধূলিয়া পান্ডা যখন বিমলকে 'বালভোগ' এনে দিল, তখন বিমল হাসবে কি — ঘন হো হো করে হেসে ফেলল। সেইদিন থেকে ঘন, চুলের ওড়িয়া প্রতিশব্দ 'বাল'কে চুল বলে। ঘনের এই বাংলাভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বকে দুঃখী কিন্তু সমর্থন করে না। তার মতে এটা ওড়িয়া জাতির হীনমন্যতা। বাঙালিদের থেকে এ রোগ আমাদের ধরেছে। তারা যেমন নিজের সবকিছুকে খারাপ ও ইংরেজদের সবকিছুকে ভালো বলে, আমরা তেমনি আমাদের সব খারাপ ও বাঙালিদের সব ভালো বলি— ঠাট্টা করে দুঃখী বলে। ওই ইংরেজি সভ্যতাটা বাঙালিদের কাপড়ে ছাঁকা হয়ে আমাদের কাছে আসে। এই এঁটো সভ্যতা আমাদের জাতির চেতনাকে যখন পঙ্গু করতে বসল তখন বড় বড় বিদ্বান বাঙালিরা ইংরেজ বিয়ে করে যেমন গৌরবান্বিত হত, ভালো ভালো ওড়িয়ারা তখন তেমনি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে ফেললে স্বর্গ আর চারহাত বাকি বলে মনে করত। এই দাস-মনোবৃত্তির সাক্ষী তখনকার ওড়িয়া সাহিত্য। দুঃখী দাস বলে— এই যে শোন, 'ভাদর বাদল দিএ সাক্ষী'। ওড়িয়াতে 'ভাদর' শব্দ কোথা থেকে এল? 'ভোদেই' বাদল কিম্বা 'ভাদ্র বাদল' হওয়ার কথা। হল না কেন? বাংলা শব্দ আমাদের মিষ্টি লাগে। ওড়িয়া শব্দগুলো কেমন কটমটে। তাই আমরা 'শাগুআ'-কে সবুজ বলি।

ঘন বলে—"আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে অন্য ভাষা থেকে সংগ্রহ করা নেহাত দরকার।"

দুঃখী উত্তর দেয়, "মানছি। তবে যা আছে সেটা খারাপ, অন্যের যা আছে সেটা ভালো বলে মনে করে অন্যের থেকে ধার করাটা জাতির অধঃপাতের সূচনা।"

ঘনের রাজনৈতিক জীবনও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল কয়েকজন বাঙালি বিপ্লবী নেতার সংস্পর্শে এসে। গান্ধীজী সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করেছিলেন। ঘনকে গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। করা অসুন্দর। তবু গান্ধীজীর জীবনের সঙ্গে তার যেন কোনো এক জায়গায় মিল আছে। সে সত্যের পরীক্ষা করেনি সত্যি, কিন্তু সত্যের সন্ধান করে এসেছে সারাজীবন। সবখানে যেন বিফল হয়েছে। কাশী বিদ্যাপীঠে সে সত্যের সন্ধান পায়নি। বঙ্গের অনুশীলন দল তাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি। বিমল, পরিমল, নির্মলরা কেউ তাকে বলতে পারেনি সত্য কোনখানে। সংসার সে করত না। পরিমলের তাড়নায় সে সংসারী হতে বাধ্য হয়েছিল। পরিমল ছিলেন সংসার করার ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে ঘরকন্না বিপ্লবের পরিপন্থী। সংসার ঈশ্বরপ্রাপ্তির অন্তরায় বলে সে ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে। কিন্তু পরিমলবাবু ঈশ্বরের নাম ধরেন না।

তবু আধুনিক যুগের সন্ন্যাসী পরিমলদা। ঈশ্বর উপলব্ধির জন্যে যারা সন্ন্যাস নেয় সে ধরনের সন্ন্যাসী তিনি নন। ঈশ্বর উপলব্ধির আবশ্যকতা তিনি অনুভব করতেন না। কিন্তু তিনি সংসারত্যাগী হয়েছিলেন ঈশ্বরের জন্য নয়, মানুষের জন্য। মানুষের মঙ্গলসাধন করতে। সন্ন্যাসীদের মতো তিনি শিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করেননি। জীবিকা অর্জনের জন্যে তাঁর ছিল একটি মুদির দোকান। নিজে এম.এসসি. কেমিস্ট্রিতে সেকেন্ড ক্লাস। সরকারি চাকরি তাঁর পায়ের কাছে এসেছিল। করলেন না। কিছুদিন মাস্টারি করলেন একটি ঘরোয়া স্কুলে। সেখানে তিষ্ঠোতে পারলেন না। তারপর থেকে বন্ধনহীন হয়ে তাঁর ধর্মপ্রচারে লেগে গেলেন।

তাঁর একটা আশ্রমও আছে। সে এক বিচিত্র আশ্রম। তিনি তাঁর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন ঘনকে। কলকাতা থেকে অনেক দূর। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। তাঁর মতে সেই স্থানটা শ্রেণী সংঘর্ষ বা ক্লাস ওয়ারের জন্যে আদর্শ ছিল। কারণ সেখানে কয়েকজন বড় জমিদার আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মাহাল। জমিদারি লাগোয়া একটি ধর্মপীঠ। দেবোত্তর। জমিদারির নামান্তর। সামন্তবাদের পীঠস্থল বললে অত্যুক্তি হবে না। মঠটি বসে-খাওয়া বৈষ্ণবদের আখড়া। ঠাকুর, মন্দির, মোহান্ত, মাতাজি, জমি, জমিদারি কোনোটাতে কমতি নেই। বেগারি, রুসুম পাওনা সব আদায় হয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ শোষিত হয়ে এসেছে। রাজা জমিদারদের নামে, ঠাকুর মোহান্তদের নামে। এই অত্যাচারিত লোকগুলোর মধ্যে অসন্তোষের আগুন সহজে জ্বেলে দেওয়া যায়। কিন্তু সে আগুন জ্বালাবে কে? দলিত অত্যাচারিত লোকেরা কখনো বিপ্লব করতে পারে না। ভালো খায়, ভালো থাকে এমন বাড়ির ছেলেরাই বিপ্লবে আগুয়ান হয়ে থাকে চিরদিন। কিন্তু তাদের শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। কারণ বুর্জোয়ারা ডিক্লাসড্ বা শ্রেণীচ্যুত না হলে বিপ্লবী হতে পারবে না। এটা পরিমলদার দৃঢ় মত।

পরিমলদার কর্মস্থানটি সত্যি যাকে বলে একটি আশ্রম। আশ্রমের বাতাবরণ পরিবেশ

সব রয়েছে। গহন বনানী। তারি ভিতরে পাতার কুঁড়েঘর। খড়ের ছাওয়া দাদার শোবার ঘর বাদে আর কোনো ঘরের দেওয়াল নেই। ঝাটিমাটির বেড়া। পাশে একটা বড় বাগান। তার মধ্যে কয়েকটা বড় বড় কাটা গাছ পড়ে আছে। নতুন পুরোনো ছোট বড় অনেক গাছ। সেগুলোর জায়গায় জায়গায় উই লেগেছে। জঙ্গলের ঠিকা নিয়ে দাদা ব্যবসা করেন বলে লোকের ধারণা। দাদা যে কি করেন সেখানে ভালোভাবে জানতে কেউ কখনো মন দেয়নি বোধহয়। ঘন সেদিন আশ্চর্য হল যখন দাদার শোবার ঘরে গিয়ে দেখল দুটো বড় বড় ছবি টাঙানো। সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ বা শিবদুর্গা কেউ নেই তাতে, কেবল মার্কস আর লেনিন। ওঁরাই তাঁর নমস্য। নবযুগের স্রষ্টা। নতুন সভ্যতার প্রতীক। 'পরম জ্ঞানযোগী' পরিমলদাদার ভাষায়।

অগাধ পাণ্ডিত্য লোকটির। তিনি গীতা জানেন। কিন্তু গীতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী বলে বিশ্বাস করেন না। শ্রীকৃষ্ণকে একজন ঐতিহাসিক পুরষ বলে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন জ্ঞানযোগী বলে ধরেন। তাঁর মতে মহাভারত যুদ্ধ একটি আখ্যান। জ্ঞানদানের ছলে গীতা বলা হয়েছে। তিনি বলেন জ্ঞানই আলোক, জ্ঞানই মনুষ্যত্ব, চরম সিদ্ধি। 'নাস্তি জ্ঞানমিদং পার্থ পবিত্রমিহ বিদ্যতে'। কিন্তু শ্রীকষ্ণ গীতায় 'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' বলেও শেষে কর্মকেই মুখ্য স্থান দিয়ে গিয়েছেন। জ্ঞান বিনা কর্ম অকর্ম— তাই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে কর্ম সাধ্য। কর্ম দ্বারা জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়। এটাই প্রগতি। এই প্রগতির নাম যোগ। তাই গীতার শেষে যোগেশ্বর অর্থাৎ প্রগতিশীল কৃষ্ণ ধনুর্ধর মানে নিষ্ঠাবান কর্মী পার্থকে বলছেন— যেখানে আমরা দুজনে থাকব সেখানে প্রগতির দিকে অগ্রগতি থাকবে, সেখানে শ্রী, বিজয় ও সমৃদ্ধি থাকবেই থাকবে।

একদিন ঘন প্রশ্ন করল— "আচ্ছা দাদা, গীতায় তো ভক্তিযোগ বলে একটা যোগ আছে?"

সঙ্গে সঙ্গে পরিমলদা ওর কথার জবাবে বললেন, "গীতায় তো আরো ঢের ঢের যোগের কথা আছে। আঠারোটা অধ্যায় যোগের উপরেই নিবদ্ধ। তাছাড়া অভ্যাসযোগ, বুদ্ধিযোগ এমনি আরো কতগুলি যোগের কথা রয়েছে। সে-সব ভাত-ডালের সঙ্গে ভাজা তরকারি চাটনির মতো। ভক্তিযোগও তেমনি একটা কথা। সেটা লক্ষ্য নয়। সবেতে ভক্তিটা একটু মিশে থাকে — ল.সা.গু.। জ্ঞানের জন্য কর্মের জন্য ভক্তিটা প্রেরণা। তাতে উৎসাহ মেলে। কিন্তু তার ভাগ মাপ থাকা দরকার। বেশি হয়ে গেলে ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ।" উদাহরণ দিয়ে আবার বললেন, "যেমন মদ অল্প অল্প খেলে কাজে উৎসাহ দেয়, বেশি হয়ে গেলে মুশকিল, তেমনি।"

ঘন একটু হাসল। পরিমলদা বললেন— "তুমি কখনো মদ খাওনি বুঝি? আচ্ছা, আমি একদিন তোমায় মদ খাওয়াব। দেখবে মদ খেলে কেমন একাগ্রতা আসে। ওহ, ভয় পাচ্ছ — হা হা হা, সব ভ্রান্ত ধারণা। মদ খেলে নাকি ধর্ম চলে যায়। মাংস খেলে ছাগল পেটে ম্যাঁ ম্যাঁ করে। সব সুপারস্টিশন— অন্ধবিশ্বাস। গান্ধী এ দেশটাকে নষ্ট করে দিল। যাও বা অন্ধবিশ্বাস ছিল দেশে, সে-সব আরো শক্ত করে দিয়ে গেল। একটা সংশোধক, রিভিজনালিস্ট,

সংস্কারকও নয়। প্রগতির পরিপন্থী। ভারতের বিপ্লবকে পিছিয়ে দিয়ে গেল। গান্ধী বুঝতে পারেনি মত সংশোধন করলেও প্রগতির ধারাকে কেউ রুখতে পারবে না। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই ঘনশ্যাম, বিমল, এরা হবে ওই বিপ্লবের অগ্রদূত।"

ঘনের পিঠ চাপড়ে পরিমলদা বললেন— "ভয় পেও না ঘন। দরকার হলে মদ খেতে হবে। তাতে পাপ নেই। যদি মদ খাওয়ার দ্বারা তোমার কাজে বাধা পড়ে, জানবে সেটা অন্যায়। পাপ বলে জগতে কিছু নেই। পাপ মনের সুপারস্টিশন। মানুষ জীবনের জন্যে সংগ্রাম করে। প্রেমে ও সংগ্রামে অন্যায় কিছু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— তুমি যুদ্ধ কর, নৈবং পাপম্ম অবাপ্‌সথসি। তুমি তো সেদিন ভাগবত উদ্ধার করে বলছিলে— 'ধর্ম অধর্ম বেনি বাণী, য়েহা মুঁ একুঅ বোলি জানি'।"

ঘন কখন কি বলতে বলতে জগন্নাথ দাসের এই পদ বলেছিল মনে রেখেছে বুড়ো। এ বয়সেও দাদার স্মৃতিশক্তি আগের মতো সতেজ ও প্রখর। ঘন বললে, "এ লোকটার সামনে কিছু বলতেও ভয় করে। পাণ্ডিত্য দেখিয়েছ কি মরেছ। অসাধারণ পাণ্ডিত্য লোকটার। পুরাণ-শাস্ত্রও পড়েছে। তাঁর মতে ভক্তিটা জ্ঞান ও কর্মের অপভ্রংশ। বেদ উপনিষদ ভক্তি শেখায় না, জ্ঞান শেখায়। কর্মে প্রেরণা দেয়। ব্যাসদেব একটি বুর্জোয়ার ওস্তাদ, যত পুরাণ তাঁরই সৃষ্টি। পুরাণগুলো ভক্তিশাস্ত্র। রাজা জমিদার দেবতা ব্রাহ্মণদের প্রতি অযথা অন্ধবিশ্বাস ও আনুগত্য এনে দেয়। শোষণের পথ সহজ হয়ে যায়। গীতায় যাকে তামসিক ভক্তি বলা হয়েছে এ সেই ভক্তি, এসব বিপ্লবের অন্তরায়। সাত্ত্বিক ভক্তি তখন হবে যখন তোমার মনের আনুগত্য দেবতা ব্রাহ্মণ থেকে সরে গিয়ে ন্যস্ত হবে পৃথিবীর শ্রমিকদের কাছে। অর্থাৎ শোষিত সর্বহারা প্রোলিটেরিয়েটদের প্রতি যখন তোমার নিছক সহানুভূতি জন্মাবে তখন জানবে তোমার ভক্তিটা সাত্ত্বিক হল। সেটাই বিপ্লবের সহায়ক।"

দাদা একটা খাটিয়াতে বসে তাঁর বক্তৃতা শোনাচ্ছিলেন। সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঝোপগাছে ঘেরা কুঁড়ের ভিতরে দেখলে পুরোনো যুগের ঋষি-আশ্রমের কথা মনে পড়ে, মনে হবে সত্যি বুঝি বোধিবৃক্ষতলে বসে মানুষের দুঃখ বিনাশের জন্যে আলোক দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "মানুষের চিন্তাধারায় বুদ্ধদেবই বাস্তবিক বিপ্লবের অগ্রদূত। বুদ্ধদেবই সর্বপ্রথম মনুষ্যসমাজকে সত্যের আলোক দিয়ে গেছেন। রাম, কৃষ্ণ, শিবপার্বতী সব মানুষের কল্পনাবিলাস। বুদ্ধদেবই একমাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি যিনি মানুষকে অন্ধ বৈদিক পূজাপদ্ধতি, অদৃষ্ট ঈশ্বর পরমাত্মার কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন।"

ঘন বলে, "কিন্তু বুদ্ধদেব তো আচারের ওপরে জোর দিয়েছিলেন।" দাদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "বুদ্ধদেব কেবল জ্ঞানালোকের আভাস মাত্র পেয়েছিলেন। সেই আলোকের পূর্ণতর পরিপ্রকাশ হলেন মার্কস আর এঙ্গেলস। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে কেবল নীরব থেকেছেন। ধর্ম, ঈশ্বরবিশ্বাস যে আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী, অহিফেন সদৃশ মানুষের বুদ্ধি ও বিচারকে যে জড় করে রেখে দেয়। একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে তাঁর বুর্জোয়া সামন্তবাদী রক্ত তাঁকে যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য দেয়নি।"

ঘন বলে— 'ঈশ্বরবিশ্বাসটা কি অন্ধবিশ্বাস?''

"এতে সন্দেহ কি আছে?" পরিমলদা বলেন। "আদিম যুগ থেকে আদিমানব কতকগুলো অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়েছিল। সে সব অজ্ঞানতা। জ্ঞানের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব অজ্ঞানতা তার দূর হয়ে গেছে। প্রথমে সে তার সামনে যেখানে অধিক শক্তির পরিপ্রকাশ দেখল, মাথা নিচু করে তাকেই পুজো করল। প্রথমে সে বড় বড় গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী সমুদ্রের পুজো করল। তারপরে চন্দ্র সূর্য মেঘ বাতাস আগুন মাটির আরাধনায় মজে রইল। সেজন্যে বেদে তোমরা ইন্দ্র, মরুত, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতির স্তুতিগান দেখবে। জ্ঞানপরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বহু ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদের দিকে এগোল। একেশ্বরবাদ থেকে বুদ্ধদেব আমাদের ঈশ্বরের আবশ্যকতা হতে ছিন্ন করে নিয়ে গেলেন। তারপরে এল নতুন যুগ— আধুনিক যুগ, নিরীশ্বরবাদের যুগ। মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের যুগ। জ্ঞানের ক্রমবিকাশে এটা অনিবার্য। তোমার তথাকথিত ঋষি চার্বাকও এই নরালোকের বর্তিকা ধরেছিলেন। বলেছিলেন— 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'— তিনি হলেন বুদ্ধদেবের গুরু। বুদ্ধ তাঁরই বাণীকে আরো মনোজ্ঞ করে উপস্থাপিত করে গেছেন।"

পরিমলদার এইসব আলোচনা ঘনের মনে সৃষ্টি করেছিল তুমুল আলোড়ন। ভীষণ দ্বন্দ্ব। সে আদপে বিশ্বাস করতে পারছিল না পরিমলদার সেই তথ্য যে মন একটা বস্তু। হ্যাঁ, বস্তু থেকে মনের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু মন বা মনের কল্পনা থেকে বস্তুর সম্ভাবনা হয় না। পরিমলদা বোঝালেও ঘনের মন মানত না। তার তখনকার মনের অবস্থা সে অতি সুন্দরভাবে দুঃখীর কাছে একটি চিঠিতে প্রকাশ করেছিল। সে চিঠি বাস্তবিক এক ঐতিহাসিক লিখন। এক দীর্ঘ পত্র। দুঃখী তাকে আজও যত্নে তুলে রেখেছে। ঘন লিখেছিল :

প্রিয় সাথী,

অনেকদিন পরে এ চিঠি লিখছি। আমি এমন এক জায়গা থেকে চিঠি দিচ্ছি যেটা অতি মনোরম। ওড়িশার অতীত গৌরবের অবশেষ আজও সময় সময় বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণান্তক চেষ্টা করছে এই ঘন বনানীর মধ্যে। যে গরম বাতাস বয়, তাতে আমি তার সন্ধান পাই। যখন আমি প্রথম এই অঞ্চলে এলাম আমার মনে হল, এই বন জঙ্গলের গাছ-লতাপাতা সব আমার দেশের কথা আমার দেশের ভাষায় বলতে শুরু করে দিল। সেই পুরোনো কথা। ১৯২১ সাল, ওডোনেল কমিটি বসার সময়কার কথা। তখন আমি ঠিক এই জায়গায় আসিনি। নদীর ওপার থেকে ফিরে গিয়েছিলাম। তখন বার বার আমার মনে পড়ছিল কুলবৃদ্ধ মধুসূদনের কবিতা—

মা মা বলে যত ডাকিলেও
পাইনি মায়েরে মোর।
ভাই ভাই বলে কত না ডেকেছি
দেয়নি কেউ উত্তর।

সুবর্ণরেখার বালি ধূ-ধূ হয়ে জ্বলছিল। আমি নদীর ওপাশ থেকে ফিরে গেলাম। এপাশে আসিনি। সমগ্র ওড়িশার ছবি আমার চোখের সামনে দেখা দিল। একা এই দক্ষিণ-মেদিনীপুর

ঝাড়গ্রাম কাঁথির ছবি নয়। যাকে ওড়িশা বলে ধরা হয় সেখানেও সেই একই কথা। একটি ওড়িয়া অন্য একটি ওড়িয়াকে ডাকলে সে ওড়িয়াতে উত্তর দেয় না। তা না হলে ওড়িশা কংগ্রেসের নেতারা ওডোনেল কমিটিকে বর্জন করত। বয়কট করত। সে-সময় মহাভারতীয় প্রীতিতে তারা একেবারে উদ্বুদ্ধ হয়ে গেল। তোমরা সব মানা করা সত্ত্বেও আমি এখানে চলে এলাম প্রচার করতে। আমার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাগত শাস্তিবিধান করা হল। একপ্রকার সেদিনই আমি কংগ্রেস থেকে আলাদা হলাম। সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হল যে দেশের সেবা করতে গেলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিতান্ত দরকার নয়। তুই জানিস মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন। আমি তাই প্রার্থী হইনি। কিন্তু কারাবরণ করেছি— সত্যাগ্রহী হিসেবে নয়, আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করাতে ব্রিটিশ সরকার আমাকে সশ্রম কারাদন্ড দিল। আমি কংগ্রেস সভ্য না থাকা সত্ত্বেও ১৯৪২ আন্দোলনে আটকবন্দী হলাম। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যাদের দেখলে ক্রোধে আমার গা আগুন হয়ে যায়, তেমনি কয়েকজন স্বার্থপর ওড়িশী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হল।

এটা রামচন্দ্র, শিখি মনাইদের অভিশপ্ত দেশ। আজ অনেক দেশভক্ত শিখি মনাই রামচন্দ্রকে নিন্দা করে। কিন্তু তাদের প্রেতাত্মা যদি দেখা দিত আর তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হত 'তোমরা এমন আত্মঘাতী দেশদ্রোহের কাজ করলে কেন?', তারা হয়ত উত্তর দিত— 'কে বলে আমরা দেশদ্রোহী? আমরা নই, দেশদ্রোহী হল রাজা মুকুন্দদেব। লক্ষ লক্ষ ওড়িয়ার প্রাণবলি দিয়ে গোহিরাটিকিরিতে রক্তনদী বইয়ে দিল সে কেন? কার স্বার্থে? কখনও ওড়িশা বা ওড়িয়ার স্বার্থে নয়। ওড়িশার মতো ক্ষুদ্র ভূখন্ডের অধিপতি থাকবার আত্মস্বার্থে সে এই জঘন্য ভ্রাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। ওড়িশার এবং ওড়িয়ার সর্বাত্মক উন্নতি তথা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কি কূপমণ্ডুকতায় সম্ভব? তাই আমরা মহাভারতীয় ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের এক গৌরবময় উজ্জ্বলতম অংশরূপে ভারতের মানচিত্রে ওড়িশাকে এক স্বর্ণমণ্ডিত রেখা দিয়ে চিহ্নিত হবার সৌভাগ্য এনে দিতে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা শাহানশা আকবরের নিরঙ্কুশ ছত্রতলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এই সাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। রামচন্দ্র শিখি মনাইদের এই স্বর সেদিন ওড়িশা কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর গলায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমি চেয়েছিলাম সেদিন সেই নদীপারে মেদিনীপুরের বুকে দাঁড়িয়ে, মেদিনী কখন ফাটবে, আমি তার মধ্যে আশ্রয় নেব। এক কোটি ওড়িয়ার মধ্যে অন্তত একটি ওড়িয়ার উদাত্ত কন্ঠ শোনা যাবে—

> ভূমিকম্প হবে ধরণী ফাটিবে
> উঠিবে সহস্রভুজা,
> সেই তোর মাতা সেই তোর পিতা
> তার পায়ে কর পূজা।

কিন্তু এখানে ভূমিকম্প হয়নি, ধরণী ফাটেনি আজও। অথচ সুবর্ণরেখার জল বাংলা থেকে বয়ে এসে ওড়িশাকে বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। ওড়িশা খুশি হয়— ভালো ফসল হবে!

কালকের মতো মনে পড়ে। এই সুবর্ণরেখার বালি। পূর্ণিমার চাঁদ উঠে আসছিল ওড়িশার

তটে বঙ্গোপসাগর থেকে। বালি চিক চিক করছিল। .... সভা ভেঙে গিয়েছিল। আমরা আসছিলাম নদীর সেপার থেকে এপারে। গোপীবল্লভপুরের ওড়িয়ারা ভ্রাতৃহন্তা ওড়িয়া জাতের উপযুক্ত দায়াদ বলে প্রমাণ দিয়ে রেখেছিল। চেলার চোটে আমাদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। বিজেতা বঙ্গনেতারা সভা থেকে ফিরে নদীর পাড়ে বনভোজনে মেতেছিল। যতসব মাইতি, বেরা, শাসমল, জানা, পাণ্ডা আমাদেরই মহান্তি বেহেরা সামল জেনা পণ্ডাদের বংশধর। আমাদের দেখে তারা বিজেতার গর্বে নিমন্ত্রণ করল তাদের সঙ্গে খেতে। আমি সাফ সাফ মানা করে দিলাম। মানা করাটাকে সঙ্কীর্ণতা বলে প্রমাণ করতে বঙ্গনেতা উদারতার এক প্রদর্শনী করে বললেন— 'আমি প্রথমে মানুষ, তারপরে ভারতবাসী, তারপরে গিয়ে উড়ে বা বাঙালি যা কিছু'।

আমি তখন তরুণ। ভাবপ্রবণতা আমার ধর্ম। বাঙালিরা 'উড়ে' বললে আমার গা জ্বলে আগুন হয়ে যায়। আহত ফণীর মতো আমি সেদিন তাঁকে জবাব না দিয়ে পারিনি— 'ওড়িয়াদের উড়ে বলাটা উদারতা নয়। ময়ূরপুচ্ছধারী কাক বা বাঙালি বেশধারী ওড়িয়াদের মুখে এ রকম বিদ্রূপাত্মক শব্দ আত্মমর্যাদাহীনতার প্রমাণ। এমন অসভ্য আচরণ মাছের হাটে কেওট কেওটনীদের মুখে মানায়। তারা বাঙালিদের বলে 'ব্যাঙ'। কিন্তু এ প্রকার অভদ্র শব্দ আমাদের কাছ থেকে আপনারা শুনতে পাবেন না।'

আমার মুখ থেকে কথা ফুরোবার আগেই তাদের ভিতর থেকে একজন উঠে এল। হাত মুঠো করে সে মারে আর কি। আর একজন তাকে ধরে ফেলে বললে— 'ছেড়ে দাও, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।' লোকটি থেমে গেল। কিন্তু রাগের চোটে বলল, 'আপনি বাংলার বুকের উপর দাঁড়িয়ে যা বললেন তার উত্তর আপনার বুকের রক্তে দেওয়া হত। কিন্তু এখন আপনি অতিথি, তাই ছেড়ে দিলাম।'

আমরা চলে এলাম। কুড়ি বছর পরে আমি আবার সেই সুবর্ণরেখার কূলে ফিরে এসেছি। একেবারে আলাদা পরিস্থিতিতে। সুবর্ণরেখা আজও সেদিনের মতো বঙ্গভূমির শোভাবর্ধন করছে। কিন্তু সেদিনের বাংলা আর নেই। বঙ্গভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ভাষার দাবির ওপরে ধর্মের দাবি। ভাষা ইহ জগতের। ধর্ম ইহ-পর উভয় লোকের। কিন্তু এই ভাষা এবং ধর্ম উভয়ের সংঘর্ষের মধ্যে কোনোটিই অর্থনৈতিক শ্রেণীসংঘের পর্যায়ে পড়ে না। বলা হয় এরই মূলে আর্থনীতিক কারণ লুকিয়ে আছে। আর্থনীতিক সংঘর্ষের এসব এক একটি বিস্ফোরণ। যত বললেও আমার মন মানে না। সেটা আমার পক্ষে এক সমস্যা।

পরিমলদাদার কথা তোমায় বলেছি। কেউ নিজের ছেলেকেও এত ভালবাসে কিনা সন্দেহ। এমনকি একদিন তিনি বলে ফেললেন— ঘনশ্যাম, মৃত্যুর পর কোনো সংস্কারের আবশ্যকতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবুও আমি লোকাচারকে অগ্রাহ্য করতে পারব না। ভূ-সম্পত্তি নেই। আমার চিন্তার উত্তরাধিকারী আমি তোমাকেই দিয়ে যেতে চাই।

সেই পরিমলদার কথায় আমি এখানে এসেছি। ওপারে গোপীবল্লভপুর। এপারে আমি। মাঝে সুবর্ণরেখা নদীকূলে দাঁড়ালে দেউলের চুড়ো দেখা যায়। গোবিন্দজীউর মন্দির। প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের পীঠ। দুজন চৈতন্যভক্ত ওড়িয়া। পরম বৈষ্ণব। শ্যামানন্দের ওপরে

ন্যস্ত ছিল ওড়িশাতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব। তাঁর পরে এলেন তাঁর প্রিয় অনুগামী প্রভু রসিকানন্দ। আজ ওড়িশার গ্রামে গ্রামে প্রভু রসিকানন্দের কৃতির স্মৃতি। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত যত 'দাস' আছে সব প্রভু রসিকানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত। কুলশীল জাতি অভিমান ভুলে সেদিন সকলে সাম্যবাদের গান গেয়েছিল,— সকলে নিজেকে একই ভগবানের ভৃত্য বা দাস বলে জানিয়ে। এখন কিন্তু কতক ইংরেজি-শিক্ষিত যুবক জাতিকুলের আভিজাত্য দেখিয়ে দাসকে নিরর্থক 'দাশে' পরিণত করেছে। কিন্তু কণ্ঠিধারী যত ওড়িয়া সব এই শ্যামানন্দ আর রসিকানন্দের সাম্যধর্মের দায়াদ।

এখন আমার মানসিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটু বলি। এ বিষয়ে তোর পরামর্শ চাইছি। তাই এ লম্বা চিঠি।

যে পুণ্যভূমির ওপরে বসে লিখছি এখন সেস্থান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমা করবি, আমার কথা বলার প্রসঙ্গে নানাদি আনুসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু আমার এই চিঠি চিঠি নয়— একটা দলিল। আমি যে রাস্তায় এসে ঠেকেছি, এ যদি অন্ধগলি নাও হয় তবুও দলিত জনতার সেবা করতে করতে আমি যেখানে গিয়ে পৌঁছুব সেখানে দুখীর সঙ্গে ঘনর আবার দেখা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাই আমার এই পত্র প্রাণের বন্ধু দুখী দাসের কাছে একটি সংরক্ষণীয় স্মরণিকা বলে বিচার করে দেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ পত্র আমি অপাত্রে দিলাম বলে মনে করি না। সুবর্ণরেখার এই জল কত ওড়িয়ার প্রাণে জীবন সঞ্চার করে। এই পত্রের বিষয়বস্তু যদি কারো জীবনপ্রবাহের ধারা বদলে দিতে সাহায্য না করে, অথবা উল্টে যদি জাতীয় জীবনকে ভ্রষ্ট করে দেওয়ার আশঙ্কা আছে বলে তোর মনে হয়, তবে এই দলিলটাকে নষ্ট করে দেবার অধিকার তোর রইল।

আমি সুবর্ণরেখার পাড়ে বসে লিখছি, দূরে সূর্য ডুববো ডুববো করছে। মাটি ছুঁতে দেরি আছে। এ লেখা সন্ধ্যার আগে শেষ না হতে পারে। না হোক। কিন্তু এই মুহূর্তের বর্ণনা না করে থাকতে পারছি না। এ একটা অতি মনোরম ক্ষণ। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে যাচ্ছে সোনালী রঙের পোঁচ। ওপাশে ঘন বনানীর সবুজ আভাতে মিশে মিশে যাচ্ছে ভুঁইয়ের ভিতর থেকে উঠে আসা এক আঁধারি শিহরণ। আমার প্রতি লোমকূপে কার স্পর্শ নিয়ে আমার পেট ভরে যাচ্ছে। জীবনের এ এক করুণ মুহূর্ত। আমি ভীষণ আশাবাদী। তাই সত্যের অনুসরণ আমার জীবনে কখনো ফুরোবে কিনা না জানলেও আমি ভেঙে পড়ি না। কিন্তু দুঃখের কথা আমার দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। তার কারণ কি জানিস? অসূয়া। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এ জাতির জীবনশক্তিকে ক্ষয় করে দিয়েছে!

আমার মনে আছে, লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার পর আমরা জেলে গেলাম। তারপর হল গান্ধী-আরউইন রাজিনামা। সকলে জেলখানা থেকে ছাড়া পেল। প্রথমবার উৎকল কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল কটকে। পুরীতে কংগ্রেস অধিবেশন বসার আয়োজন করার জন্যে সকলে প্রস্তুত হচ্ছিল। সমগ্র উৎকল কংগ্রেসের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিল। উৎকল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তি জেলাগুলোর তালিকাতে বিহারের সিংভুম ও

মানভূমের অংশ, বাংলার দক্ষিণ মেদিনীপুর, মাদ্রাজের গঞ্জাম ও শ্রীকাকুলম, মধ্যপ্রদেশের বস্তর, বিন্দ্রা, নুয়াগড়, জলন্ধর প্রভৃতি স্থান পেয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এই সব অঞ্চল থেকে ওড়িয়া প্রতিনিধিকে বাছার জন্যে নির্দেশ এসেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের ওড়িশা কংগ্রেস নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা তথা ক্ষমতালিপ্সার যজ্ঞপীঠে সেসব অঞ্চলকে একটি একটি করে বলি দেওয়া হল। ওড়িয়া নেতারা পরস্পর প্রতিঈর্ষা ও অসূয়ার বিষজ্বালায় পুড়ে মরার সময় অন্যান্য প্রদেশের নেতারা ক্রমে ক্রমে আমাদের এইসব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করল। ওড়িশা কংগ্রেস মাত্র কয়েকটি উপকূলবর্তী জেলায় ও গড়জাতের* মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। এ বিষয়ে কোনো ওড়িয়ার কখনো স্বর উত্তোলন করার কথা শুনিনি। তাই কোনো ওড়িয়া কোনোকালেও আমার কথা বুঝবে বলে আমি বিশ্বাস রাখি না।

কিন্তু আমি যদি দাদার এই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাই, তখন নিজেকে ওড়িয়া বলে জানার অবকাশ থাকবে না। কারণ মনুষ্য জাতি এক। কিন্তু কেন জানি না এই মহান আদর্শে নিজেকে অনুপ্রাণিত করার পর সব চেষ্টা সত্ত্বেও নিজে অক্ষম হয়ে পড়ছি। তবুও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে মনুষ্যজাতি এক, তবে দুই ভাগে বিভক্ত। নারী-পুরুষভেদে নয়— 'হ্যাবস এ্যান্ড হ্যাব-নটস' অর্থাৎ শোষক এবং শোষিত ভেদে। এই বিভেদ ব্যাপারেই আমার মনে দ্বন্দ্ব। সেদিন ওই বঙ্গনেতা এই সুবর্ণরেখা নদীতীরে যে জোরগলায় বলেছিলেন— আমরা প্রথমে মানুষ, তারপরে ভারতীয়, তারপরে ওড়িয়া বা বাঙালি— সেটাই কি ঠিক? আমার ভিতরে কে যেন বলে— আমি প্রথমে আমি অর্থাৎ আমার বাপের ছেলে। তারপরে আমার গাঁয়ের 'ঘনা', তারপরে আমার জেলার সেবক, তারপরে আমার দেশের কর্মী, তারপরে গিয়ে সমগ্র ভারতের নাগরিক। ভারতীয় নাগরিক হয়েও আমার কি পৃথিবীর একজন অধিবাসী মানুষ হতে কোনো বাধা আছে? আমি নিজেকে একজন মানুষ বলে পরিচয় দেওয়ার সময় আমি আমার পিতার পুত্র বলে ভুলে যাওয়া কি নিতান্ত আবশ্যক? ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তান কিম্বা ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ হলে, আমি কি সমগ্র দেশের জন্যে একজন ওড়িয়া হিসেবে প্রাণবলি দিতে পারব না? সমগ্র ভারত আমার শহীদত্বে গর্ব করার বেলায় আমার রাজ্য আমার পরিবার গর্ব করাতে কিছু আপত্তি আছে? আমার কেন বরাবর মনে হয় আমি যদি আমার পিতার যোগ্য সন্তান হতে না পারি তবে আমি দেশের একজন সুনাগরিক বা মানবসমাজের একজন সভ্য বলে গর্ব করার কোনো অধিকার থাকে না। দ্বন্দ্বটা কেবল এতেই শেষ নয়। আমার মনের মধ্যে আরো এক জটিলতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই দ্বন্দ্বটা আমার অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে— আমার পরম্পরা এবং আধুনিক পর্যায়ের মধ্যে।

একথা লেখার সময় আমার চোখের সামনে গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দজীউ মন্দির দেখা যাচ্ছে। আমি ঠাকুর ও মন্দিরের কথা বললে দাদা হাসেন, বিদ্রূপ করেন। তাঁর মতে ওসব মধ্যযুগীয় কুসংস্কার। এইখানে দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ। এই মতভেদটাই আজ আমায় বিভ্রান্ত করছে— করে দিয়েছে। একদিকে দাদা একান্ত স্নেহপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন; তাঁর বাচন আমায় মুগ্ধ করেছে। আমার এক সময় মনে হয় তিনি যেন স্তরে স্তরে পার

* দেশীয় রাজ্য

করিয়ে আমাকে জ্ঞানালোকের পথে এগিয়ে নিচ্ছেন। লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল, এরিস্টটল ও গেটে আদি মহাপুরুষদের কৃতি সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ অবগত হয়েছি। এই মননশীল মানুষদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। তাছাড়া কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো আমি পড়েছি। বহুবার পড়েছি। অভ্যাস করেছি। মুখস্থ হয়ে গেছে বলা চলে। তবুও আমি তুলনা না করে থাকতে পারি না এই মুনিদের সঙ্গে সেই মধ্যযুগীয় দুটি ব্যক্তিকে, যারা তিনশো বছরের অধিককাল প্রায় চারশো বছর পূর্বে এই ওড়িয়া জাতিকে পুনর্জীবন দিয়ে গিয়েছিল। তারা এ জাতির প্রাণে যে নতুন জীবনের সঞ্চার করেছিল তা নিজে মার্কস বা তাঁর শিষ্য লেনিন ও ষ্ট্যালিন দিতে পেরেছেন কি? দাদাকে জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় হয়। আমি দাদার প্রতি এত বেশি পক্ষপাতী যে তাঁর মনে কষ্ট দেওয়ার মতো মানসিক সুস্থিতিকে বরণ করতে পারব না।

মার্কস বলেন— বস্তুই সব। হেগেল থেকে একপা এগিয়ে গিয়ে মার্কস বললেন— বস্তুই মানুষের চরম সিদ্ধি। বস্তুর স্বয়ং-চলন বা সঞ্চালনের ফলেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। স্থাবর, জঙ্গম, জড় ও চৈতন্য আদি অখিল সৃষ্টিমূলে এই বস্তুরই চিরন্তন সঞ্চার। আমি এখানে অণু-পরমাণু বা সূক্ষ্মাণুর ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি না। মার্কসের সামনে তখন আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারগুলো উপস্থিত ছিল না। কিন্তু মার্কসের জীবনকাল পর্যন্ত মানবসমাজের ভাবরাজ্যে যে সমস্ত বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, মার্কসের মতো একজন গবেষক সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কি করে নির্ভীকভাবে বলতে পারলেন যে বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ হতে অর্থাৎ বিষয়ভোগ থেকেই ভাবের সৃষ্টি!

গোপীবল্লভপুরের এই ওড়িয়া বৈষ্ণবের জীবনী তুই নিশ্চয় পড়ে থাকবি। বৃন্দাবনে মানসিক সেবা করতে করতে তিনি ভাবময় মনোরাজ্যে সাক্ষাৎ রাসদর্শন করেছিলেন। রাসময়ী নৃত্যরতা শ্রীমতী নিশাবসানে রাসস্থলী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর অগোচরে স্বর্ণময় নূপুরের একটি ঘন্টি কুঞ্জকাননে পড়ে রইল। শ্যামানন্দ ভাবরাজ্য থেকে ফিরে এসে বাস্তব রাজ্যে দেখলেন— নিকুঞ্জকাননের সেই নূপুরের ঘন্টিটি এখনো ধুলায় পড়ে রয়েছে। এই ভাবরাজ্য ও বাস্তবরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? তুই বলতে পারিস এসব কেবল কাহিনী। পরীরাজ্যের কথায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা তবে কি আমাদের প্রতারিত করে গিয়েছেন?

তাঁর শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী আরো অদ্ভুত। এইখানে তাঁর জন্ম। এই সুবর্ণরেখার তীরে। রোহিণী গ্রাম এখান থেকে বেশিদূর নয়। তাকে এখন বাংলাতে রয়নী বলা হয়। প্রবাদ আছে যে মুসলমান দস্যুরা তাঁর স্পর্শমাত্রে সাধু পাল্টে যেত অদ্ভুত যাদুবলে। সে সময় সমগ্র ভারত স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, জাতি অজাতি ভেদে অতিমাত্রায় বিভক্ত। বঙ্গদেশে অস্পৃশ্য নমঃশূদ্ররা স্বর্ণদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিত। তার প্রভাব পড়ল ওড়িশার ওপরে। তখন ওড়িশার উত্তর সীমা ছিল গঙ্গানদী। ওড়িশার সুবেদার ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আহম্মদ বেগ। তিনি শুনতে পেলেন যে ওড়িশাতে কোনো অস্পৃশ্য মুসলমান হওয়া দূরে থাক, মুসলমানেরা উল্টে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়ার মূলে একমাত্র ব্যক্তি

হলেন যাদুকর রসিকানন্দ। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আহম্মদ বেগ আদেশ দিলেন তাঁকে ধরে আনতে। রসিকানন্দ নিরপরাধ। কিন্তু অভিযোগ ছিল যে মুসলমানদের কুপরামর্শ দিয়ে হিন্দু করাতে লেগেছেন। রসিকানন্দ যে নিরপরাধ তার প্রমাণ তাঁকে দিতে হবে বলে সুবেদার হুকুম দিল। যদি কেবল তাঁর সংস্পর্শে আসা মাত্র মুসলমানেরা হিন্দু হয়ে যেতে মন করছে, তবে গ্রামের সীমান্তে মেতে ওঠা পাগলা হাতীও রসিকানন্দকে দেখা মাত্র পায়ের কাছে এসে শান্ত হয়ে যাবে। তাই হল। পাগলা হাতী রসিকানন্দকে দেখা মাত্র পায়ের তলায় প্রণাম জানাল।

এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে বস্তুর প্রভাবে ভাবের রূপান্তর ঘটল, না ভাবের প্রভাবে বস্তুর পরিবর্তন হল— আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুব? এর থেকে কি বিশ্বাস হবে যে জগৎ কেবল বস্তুময়? অবশ্যই পরস্পরবিরোধী বস্তুর মধ্যে বা বস্তুজাত ভাবের মধ্যে সংঘর্ষ দ্বারা যদি নতুন উন্নততর বস্তু বা ভাবের সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনা হয় তবে বিনা সংঘর্ষে এ বস্তুর ভাগবত ও বস্তুগত উন্নত অবস্থা সম্ভব হল কি করে? যদি বলা যায় যে আর্থনীতিক ভিত্তিতেই বাস্তব ভাবগত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তথা বিকাশ সম্ভব তবে দরিদ্র ভিক্ষাশী— গৃহত্যাগী ওড়িয়া সন্ন্যাসী দুজন শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের জীবনে সমাজের কোন প্রভাব পড়েছিল? রসিকানন্দ ছিলেন রাজপুত্র। রাজা অচ্যুতানন্দের দায়াদ। এখানে সামন্তবাদের সঙ্গে কোন আর্থনীতিক বিভব ও ভাবের সংঘর্ষে রসিকানন্দের নতুন স্বভাব সম্ভব হল? কোন ক্রিয়া ও বিক্রিয়ার সংঘর্ষে, কোন অন্বয় ও প্রত্যন্বয়ের বিরোধক্রমে নতুন প্রক্রিয়া বা সমন্বয় উদ্ভূত হল? মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার ও বিচার সব যদি বস্তুর বাহ্য বিকাশ, কলা সাহিত্য যদি অর্থগত প্রাণের শ্রম-নিষ্কৃতি জনিত সময়ের উপযোগ, তবে ওই বিরাট বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের মূলে কোন আর্থনীতিক হেতু নিহিত রয়েছে আমরা তা আবিষ্কার করতে পারব কি? এসব সন্দেহ সত্ত্বেও আমি একটি বিষয়ে এই জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে একমত যে মনুষ্যজাতির মধ্যে ধনী দরিদ্র বিভাজনটা ঈশ্বরকৃত নয়, মনুষ্যকৃত। আমরা ভারতীয়েরা অতিরিক্ত অদৃষ্টবাদী। তাই আমরা মানুষের দ্বারা মানুষের ওপরে অত্যাচারকে বরদাস্ত করি। পাপ-পুণ্যে যার বিশ্বাস আছে সে নিশ্চয় বলবে যে আমাদের যাবতীয় অধোগতির মূলে এই অদৃষ্টবাদই আস্থান জমিয়ে বসে আছে। অদৃষ্টবাদের বিরোধী মনোবৃত্তিই আমাকে দাদার ভক্ত করেছে। সব সন্দেহ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আমি এ পথ থেকে ভীরুর মতো পালিয়ে যেতে চাই না। তবু যদি এটাকে কেউ আমার পতন বলে ভাবে, আমি বলব বাঙালিদের ভাষায়— 'যদি ডুবতে হয় দেখি পাতাল কতদূর'। তবে মর্তের সব সম্পর্ক বাদ দিয়ে এই সংকটের মাঝে আমি তোরই কাছ থেকে কিছু নতুন দিগদর্শন পাব বলে তোকে এ চিঠি লিখছি।

পরম্পরা এবং সাম্প্রতিক স্থিতির মধ্যে সংযোগ কোথায়, জড় ও চেতনার মধ্যে, বদ্ধজীব ও সচ্চিদানন্দের মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং কোথায়? জড়ের ভিতরে চৈতন্য ও চেতনার ভিতরে জড়ত্বের আবিষ্কার কি সম্ভব? উত্তরের আশায় রইলাম। তোর সুচিন্তিত মতামত দিস। তোর শারীরিক ও মানসিক কুশল কামনা করি। দীর্ঘ পত্রের জন্যে ক্ষমা করিস। ইতি

তোর ঘন

ওই চিঠি এনে ঘনকে দেখাল দুঃখী। কত বছর কেটে গেছে এর মধ্যে। ঘন নিজের চিঠি পড়ে হাসল। বললে— "আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তখন, না দুখী? চিঠি পড়ে তাই ভেবেছিলি নিশ্চয়?"

দুঃখী বললে— "বরং বর্তমান তোর মধ্যে কিছু কিছু পাগলামি গজিয়েছে বলে কেউ বলে, প্রতিবাদ করা কষ্টকর হবে।"

ঘন — "হতে পারে। এখন আমাকে কেউ পাগল বললে বলব যে আমার সেই অতীত জীবনের প্রভাবই তার জন্যে দায়ী। আজ হঠাৎ কেন তোর কাছে চলে এলাম, এতক্ষণ কই জিজ্ঞেস করলি না তো? বলছি শোন। মনটা আমার বড় অস্থির হল। আমি নিজেকে এমন হীন অবস্থায় কখনো দেখিনি এর আগে। আমার খাওয়া-পরার জোগানদার বাবা যখন চলে গেল তখনও নয়। হ্যাঁ, জানিস দুখী, পরিমলদা আর নেই"— বলে ঘন সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলল। এই বয়সে, একজন বাইরের অন্যপ্রদেশের অন্য ভাষাভাষী অন্য জাতের মানুষের জন্যে মমতায় চোখের জল ফেলা বড় বিরল— দুঃখী ভাবল। বললে— "আমি কি ভাবতাম জানিস? মার্কসই মার্কসবাদের সব থেকে বড় বিরোধী।"

"তা না বলে বরং বলতে পারিস, জড়বাদী মার্কসিস্টরাই সবচে বেশি চৈতন্যবাদী।" ঘন হাসল।

দুঃখী — "আমি এ সংশোধন মেনে নিচ্ছি। আমি যত মার্কসবাদীর সংস্পর্শে এসেছি, তাদের আচরণ থেকে যতদূর মনে হয় তারা বাইরে যত জড়বাদের প্রচার করুক না কেন দলের প্রতি তাদের মোহ অতি উৎকট। নিজেকে যতই বস্তুবাদী বলে বড়াই করুক, নিজের আদর্শের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য কোনো ধর্মান্ধ ব্যক্তির চেয়ে কম নয়।"

"সেই জন্যেই বোধহয় দাদা আমাকে আপনার করেছিলেন। আমি কিন্তু তাঁকে ততটা আপনার করতে পারলাম না। তাঁর শেষ আশা পূরণ করিনি। মরবার সময় আমি পাশে ছিলাম না।" ঘন আবার কাঁদল।

দুঃখী — "তারই জন্যে কংগ্রেসওলাদের থেকে কম্যুনিস্টদের আমি বেশি পছন্দ করি। কংগ্রেসীদের আদর্শের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা নেই। তা যদি থাকত তবে ভুখা কুকুররা ছেঁড়া রুটির জন্যে কামড়াকামড়ি করার মতো নিজের অহিংসা নীতিকে ভুলে আপনার মধ্যে এরা এমনভাবে মারামারি করত না। নির্মম অহিংসার চেয়ে হিংস্র মমতা বরং ভাল।"

"একই কথা। নির্মম জড়তা ও জড় মমতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?" ঘন চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসে বললে— "তুই দেখছিস তো একদিন কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট এক হয়ে যাবে। তাদের ভিতরে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল এক বলে যখন বুঝতে পারবে তখন তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। এই দ্বন্দ্বের প্রেরণা কোত্থেকে আসে জানিস? আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি বাসনা।"

দুঃখী — "সেটাই বোধ হয় ঠিক। কারণ কোথাও সামন্তবাদ অন্বয় হলে পুঁজিবাদ তার প্রত্যন্বয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কোথাও পুঁজিবাদকে সমন্বয় করে সামন্তবাদের নতুন প্রকরণ সাম্রাজ্যবাদ ওর ব্যত্যয় বা নিবারকভাবে কাজ করেছে। উভয়ের সংঘর্ষে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা

কখনো সম্ভব নয়। সম্ভব হলে হবে কেবল তার নতুন রূপ 'বৌদ্ধিক সাম্রাজ্যবাদের' প্রকাশ।"

ঘন — "কেবল নতুন ছাপ, মসলা একই।"

দুঃখী — "আমি একটা কথা বুঝি, সেদিন চিঠির উত্তরে যা লিখেছিলাম— পরম্পরাকে বাদ দিয়ে প্রগতি সম্ভব নয়। যদি কেউ বলে যে সম্ভব, আমি বলব সেটা প্রগতি নয়— দুর্গতি। তা যদি না হত, তবে মার্কস হেগেলকে ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে ডায়ালেকটিক্স বা তর্কশাস্ত্র নিয়ে বিবাদাত্মক দর্শনের উপরে নিজের বস্তুবাদকে খাড়া করতেন না।"

ঘন — "আমি তোর চিঠি পেয়েছিলাম। তার উত্তর দিতে আমার আর ধৈর্য ছিল না। ততদিনে আমি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম। আমার নিষ্পত্তিটা যে ঠিক তার সমর্থন তোর চিঠিতে ছিল, কিন্তু সেই নিষ্পত্তি আমি নিজে নিইনি। পরিস্থিতি আমাকে ওরকম নিষ্পত্তি নিতে বাধ্য করেছিল।"

পরিস্থিতিটা কি জানতে দুঃখী আগ্রহ প্রকাশ করল। ঘন ওর জীবনী থেকে একটি ঘটনাবহুল পৃষ্ঠা উদ্ধার করে বলতে থাকল।

বিমলের বাড়ি কলকাতার যে গলিতে সেখান থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রোড বেশিদূর নয়। সেটা আমাদের ওড়িয়া কুলিদের ঘাঁটি — ট্রেড য়ুনিয়ান কর্মীদের আড্ডা সে জায়গায়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতা বা বাংলা শাখাতে যত সব কিছু বিভেদ মতভেদ সে সবের সূত্রপাত সেখান থেকেই। কে কোন শ্রমিক সঙ্ঘকে হাত করবে তার জন্যে চলে প্রতিযোগিতা। তার পরে মন ফাটাফাটি ও মতের অমিল। ছানা থেকে রসগোল্লা, পানতুয়া, লেডিকেনি তৈরি হওয়ার মতো একই মার্কসবাদ নানা রূপ নেয়। দক্ষিণ, বাম, ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, সেন্টার, লেফট উইং আদি কত মার্কসবাদী দলের সৃষ্টি হয়। আমার বড় হাসি পায়। উৎকলের অর্থ কুলির দেশ বলে যে বাঙালিদের অভিধান একদিন ব্যাখ্যা করত এখন তারাই কলিকাতাবাসী, ওড়িয়া কুলির সাহায্য ছাড়া নেতার পদ পাওয়া কষ্ট। বিমল আমাকে ওর স্বার্থের খাতিরে সেখানে নিয়ে জুটিয়েছিল। দাদা কিন্তু এ সবের খবর রাখতেন না। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে কখনোই মন দেননি। মার্কস দর্শনই তাঁর জীবনকে পরিপ্লুত করে রেখেছিল। সেজন্যে সব কম্যুনিস্ট নেতারা তাঁকে আচার্য নাম দিয়েছিল। খাতিরও খুব ছিল।

"তোর এ গল্প দারুণ মজার তো"— হাসল দুঃখী।

ঘনও হাসল— "হ্যাঁ, কি বলছিলাম? এই বিমলের কথা। সে আমায় নিয়ে সেই কুলিপট্টিতে জুটিয়ে দিল। ওর অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমি ওর বাড়ি থেকে গিয়ে সেখানে এক ওড়িয়ার কুঁড়েতে থাকলাম। ততদিনে বিমলের বাড়িতে আমি ওদের পরিবারের একজন হয়ে বছরখানেক কাটিয়েছি। সেই পট্টিতে আমার কাজ হল বিমল যে ট্রেড ইউনিয়ানের সেক্রেটারি সেই য়ুনিয়ানে ওড়িশা কুলিদের তালিকাভুক্ত করা। কিছুদিন সেখানে থাকার পর আমি বিমলের বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিলাম। বিমল রোজ আসে। ওর সঙ্গে দেখা হয়। তাই ওর বাড়ি যাওয়া আমার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু সেখান থেকে অল্পদূরে দাদার মুদীর দোকান— তারই লাগোয়া তাঁর ফ্ল্যাট। সেখানে যেতাম প্রত্যেক দিন। একমাস কাটল। হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম ডাকে। খামের ওপরে চেনা চেনা হাতের লেখা।

কিন্তু কার হঠাৎ ঠিক ধরতে পারলাম না। লেফাফা চিরে চিঠির ভাঁজ খুলে নীচে চোখ ফেলতে দেখি বাংলাতে লেখা আছে — 'অলকা'। ঠিকানাটা অবশ্য ইংরেজিতে লেখা ছিল। বাড়ি থেকে হয়ত খারাপ খবর এসেছে এমন আশঙ্কা মনে যা উঁকি মারছিল তার অবসান হল। সে জায়গায় আর একটা বিচিত্র আশঙ্কা আমার ভিতরটাকে বেশ কাঁপিয়ে দিল। একটা চমক যাতে ভয় থাকে না, থাকে যমক। অন্যমনস্ক থাকার সময় চুপি চুপি কেউ এসে হঠাৎ কানের গোড়ায় সরু পালক নাড়িয়ে দিলে যেমন লাগে তেমনি।

বিমলের বোন অলকা। বিদ্যাসাগর কলেজে তৃতীয় বার্ষিক কলার ছাত্রী। লিখেছিল— মা বলছেন আপনি বড় নির্মম। দুমাস হল আপনি আমাদের বাড়ি আসেননি। মা বলছিলেন আপনি বোধহয় আমাদের ভুলে গেছেন। আমার কিন্তু ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে আপনি না আসাতে। এই ধরুন, আমি কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। দাদা আমায় বুঝিয়ে দেয় না। আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারবে না আপনি ছাড়া। বোঝালেও আমি বোধহয় বুঝতে পারব না। আপনি দয়া করে বুঝিয়ে দিয়ে যান। এরপরে না হয় না আসবেন। আমাকে এইবারটি বুঝিয়ে দিয়ে যান। ইতি, আপনার স্নেহান্ধ বোন— অলকা।

এ আহ্বান কল্পনাতীত। ম্যানিফেস্টো ব্যাপারে আমি যে বেশি কিছু বুঝি সে বিশ্বাস আমার ছিল না। অলকারও নয়। তবু অলকা ডেকেছে। কেন ডেকেছে? বোধহয় অলকা আমায় ভালোবাসে। অলকা আমাকে ভালোবাসতে পারে এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এর আগে। জীবনে নারীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধহয় এই আমার প্রথম। দাদা এই আকর্ষণ সম্বন্ধে সময় সময় আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের গুরুজনদের কাম বা সেক্স সম্বন্ধে ছেলেপিলেদের শিক্ষা দিতে সঙ্কোচ করাটা মূর্খতা। তাঁর মতে কাম এক অনিবার্য অঙ্গ— এই মানবদেহের তথা মনের। শাস্ত্র যে বীর্যপাতকে মৃত্যু বলে লিখেছে তার আসল অর্থ আমরা বুঝতে না পেরে ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য বলে চেঁচাই। বিন্দুপাতকে এক ভয়াবহ ব্যাপার বলে ধরে নিই। কিন্তু যৌবনের এটা স্বভাবিক ধর্ম। পাত্র পরিপূর্ণ হলে উছলে পড়তে বাধ্য। বিন্দুপাত এক শারীরতাত্ত্বিক আবশ্যকতা। তেমনি মৃত্যুও জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই বিন্দুপাতকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বীর্যধারণ আবশ্যক সৃষ্টিক্রিয়ার জন্য। মরণশীল মানব সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাই জীবনের ধর্ম, সৃষ্টির রহস্য আর মৃত্যুর স্বাগতিকা। মৃত্যুকে যেমন ভয় করা উচিত নয় বিন্দুপাতকেও তেমনি ভয় পাওয়া অনুচিত। তবে আহারে এবং বিহারে সংযম থাকা উচিত। এই ব্যাপারে বুদ্ধদেব আমাদের পথপ্রদর্শক। অতিরিক্ত সংযম অথবা অতিমাত্রায় সম্ভোগের মাঝামাঝি পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাই কামকে কেবল মিতাচার দ্বারা আয়ত্ত করা যেতে পারে। কাম-বিমুখতা অপসৃষ্টির হেতু। এ কথা বলার সময় দাদা কিন্তু আমাদের সতর্ক করে দিতেন যে বিপ্লবীর পক্ষে সমস্ত প্রকার গতানুগতিকতা বর্জনীয়। বিপ্লবী পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিপদজনক।

দাদার এ কথার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও নারী থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে এসেছি। অলকার চিঠি পাওয়ার পরে নিজের মনের ভিতরে যে দুর্বলতার

সন্ধান পেলাম তাকে জবরদস্তি চেপে দেওয়াতে সেটা বরং প্রবল হয়ে উঠছে বলে অনুভব করলাম। দাদা একবার বলেছিলেন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গতিরোধ মানসিক বিকারের হেতু। তাই কৌশলে তাকে আয়ত্ত করা উচিত। সেইজন্যে গীতায় বলা হয়েছে — 'যোগ কর্ম সুকৌশলম'— কৌশলই যোগ।

চিঠি পাওয়ার প্রায় সাতদিন পর্যন্ত মনের ইচ্ছে মনে চেপে রইলাম। বিমলের বাড়িতে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বেশিদিন দমন করে থাকতে পারলাম না। অলকাকে দেখতে গেলাম। দোরগোড়ায় বিমল বললে 'অলকার অসুখ'। আশ্চর্য ব্যাপার, সেইদিন বেলা চারটের সময় আমি দাদার কাছে গিয়ে দেখি ঘরের ভিতরে দাদা ও বিমল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেলাম। তারা দুজন কি কথাবার্তা বলছিল, আমার কেন যেন কান পেতে শোনবার ইচ্ছে হল। নিঃশব্দে শুনতে লাগলাম। দাদা বলছিলেন— 'এ ত্যাগ তোমায় করতে হবে।'

বিমল বললে— 'আমার হাতে কিছু নেই। মা-বাবার ইচ্ছে।'

দাদা বললেন— 'তুমি মিথ্যে বলছ। তোমার বাবার ইচ্ছে আমি জানি। একজন বড় অফিসার। কিন্তু তোমার ইচ্ছে অন্যরকম। বাবা-মা তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না।'

আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে। কেন জানি ভয় হল কথাটা আমাকে নিয়ে বুঝি? বিমল বললে— 'না আপনি ঠিক বোঝেননি। এটা আমার ইচ্ছে নয়, অলকার ইচ্ছে।'

'বিমল! তুমি ছেলেমানুষ আমার কাছে। অলকার বয়স অতি অল্প। মতি চপল। ঘনর প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণকে প্রশ্রয় দিয়েছ তুমি। আমি আপত্তি করিনি। আমি চেয়েছিলাম ঘন ও তোমার মধ্যে বন্ধুত্বটা কোনোমতে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যাক। ঘনর প্রতি অলকার মমতাটা তাতে সহায়ক হতে পারে বলে আমি নীরব ছিলাম। তাছাড়া অনুশীলন দলের প্রতি ঘনর সহানুভূতিকে নষ্ট করা ছিল আমার উদ্দেশ্য। অলকা সে কাজ হাসিল করতে পেরেছে। সম্পর্কটা বাড়তে আর সুযোগ দেওয়া উচিত নয়— আমাদের দলের স্বার্থে, মার্কসবাদের স্বার্থে।'

বিমল — 'দাদা, আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার কেন মনে হয় অলকার এই নিষ্পত্তি আমাদের দলের পক্ষে সহায়ক হবে। অলকা যদি একজন অফিসারকে বিয়ে না করে একজন কমরেডকে বিয়ে করে, আপনি কি বেশি খুশি হবেন না?'

দাদা — 'নিশ্চয়। কিন্তু ঘনকে আমি তোমার দলের সক্রিয় কার্যক্রমে বেশিদিন সম্পৃক্ত রাখতে চাই না। ওকে ট্রেড য়ুনিয়ন কাজে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে কয়েকদিনের জন্যে পোস্তার ওড়িয়া বস্তিতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ কাজের জায়গা অন্যখানে। এখানকার ক্ষেত্র বিমল ভট্টাচার্যের জন্যে উদ্দিষ্ট। ঘন আমার চিন্তারাজ্যের উত্তরাধিকারী। সে হবে আচার্য। তাকে আর কলকাতায় থাকতে দেব না। ঝাড়গ্রাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। একমাসের মধ্যে আমি অলকার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। ঘন ঝাড়গ্রামে থাকাকালে ওর অগোচরে এ বিয়ে হবে। ঘন যেন এ বিয়ের কোনো সুলুক না পায়। তুমি অচিন্ত্যকে খবর দাও। তাকে পাঠিয়ে দেব ঘনর সঙ্গে।'

বিমল — 'অলকার ভীষণ কষ্ট হবে।'

দাদা — 'বিমল, আবার ওই বুর্জোয়া সংস্কৃতির জীবাণু কিলবিল করছে তোমার ভিতরে। প্রেমের জন্যে যত অশ্রু হাহাকার, ব্যথা বেদনা সব বুর্জোয়া সাহিত্য ও কলার অবাঞ্ছিত অনাবশ্যক আড়ম্বর। আড়ম্বর নয়, বিড়ম্বনা। ছাড় সে সব। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আর ঘন?' বিমল জিজ্ঞেস করল।

দাদা — 'ঘনর জন্যে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। ঘনর মনে এখনো নারী বাস্তব নয়। একটা কল্পনা। সেই কল্পনাতেই তাকে শেষ করে দিতে চাই। বুর্জোয়া সভ্যতার এই কল্পনাবিলাসকে ঠিক পথে চালিয়ে নিলে সেটা বিপ্লব-অভিমুখী হয়। সেজন্যে নারীর আকর্ষণকে বিকর্ষণে পরিণত করতে হবে। সে দায়িত্ব আমার।'

এইখানে ঘন বললে "দুখী, বিকর্ষণ শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। আর বেশি সময় বাইরে অপেক্ষা করে থাকতে পারলাম না। ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভাববার শক্তি যেন আমার চলে গিয়েছিল। লোকটা যাদুকর নাকি? অলকা অনেকদিন থেকে আমায় ভালোবাসে এ কথা মোটেই আমি জানতাম না। মাত্র এই কদিন আগের অলকার প্রতি আমার আকর্ষণটাকে কাজে বা কথায় কারো কাছে আমি প্রকাশ করিনি। তাহলে আমার সেই আকর্ষণের কথা দাদা জানলেন কি করে? মেসমেরাইজড হওয়ার মতো আমি দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রণাম করলাম কিনা মনে পড়ছে না।"

'এই যে ঘন'। দাদা বললেন। 'তোমারই কথা আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ। তুমি বোধহয় বাইরে থেকে সব শুনেছ।'

দাদা হাসলেন। স্তম্ভীভূত হয়ে গেলাম। দাদার সামনে অঙ্কের একটা বিরাট শূন্যের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ভয় খেলে গেল আমার মনে। দাদার নিশ্চয় কিছু সিদ্ধাই আছে। তা নাহলে সব কথা জানতে পারছেন কি করে? সত্যি কথা বলা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু সত্যি বলার সাহসও ছিল না আমার মধ্যে। তার ওপরে আবার সঙ্কোচ বিমল উপস্থিত বলে। 'না' বললাম। বুকটা কিন্তু কাঁপছিল।

'আচ্ছা বেশ'— দাদা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন। কথার খেই বদলে দিলেন— 'ঘনশ্যাম, তোমার ওই স্লাম এরিয়াতে আর পড়ে থাকা চলবে না' বলে বিমলকে আদেশ দিলেন অচিন্ত্যকে ডেকে আনতে। বিমল চলে গেল।

দাদা আমায় কাছে ডাকলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'ঝাড়গ্রামের আশ্রম তোমার জন্যে একটা বিরাট শিক্ষায়তন। সেখানে আমার লাইব্রেরিতে যত বই আছে সেগুলো পড়ে শেষ করতে হবে। মাঝে আমি যাবো। যেটা দরকার মনে হবে আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। অচিন্ত্য হবে তোমার একমাত্র সাথী। খুব ভালো ছেলে। মেধাবী। ছেলেবেলা থেকে মনটাকে একটা ছাঁচে না ফেললে পরিস্থিতির চাপে মানুষ বিগড়ে যায়। আমি অচিন্ত্যকে মানুষ করতে চাই। তোমার পেছন পেছন সে দাঁড়াবে। যাতে ভারতবর্ষে মার্কসবাদ শিক্ষার স্তরের পর স্তর ক্রমটা জারি থাকে তার জন্যে তোমরা দুজন আমার দুটো বড় পরিকল্পনা।

পরস্পরের সাহচর্যে তোমরা উভয়ে সুখী হবে। সুন্দর ছেলে অচিন্ত্য কিন্তু বড় লাজুক — ডেলিকেট। তার সঙ্গে তোমার ব্যবহার যথেষ্ঠ নরম হওয়া দরকার। তোমার বন্ধুত্ব যত প্রগাঢ় হবে ততই তোমার অন্তরের প্রবৃত্তিটা সাবলিমেটেড হয়ে যাবে।'

'সাবলিমেটেড কি করে হয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেটা অভিজ্ঞতা থেকে জানবে। আমি যে রাস্তা দেখাচ্ছি সেই রাস্তায় চলতে চলতে আপনি হবে। তোমার বৈষ্ণবদর্শনটা একটা সাবলিমেটেড দর্শন। পুরুষের পৌরুষ সাবলিমেটেড হয়ে গেলে সে নিজেকে নারীজ্ঞান করে। সাবলিমেশান মানে চিত্তের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য ভাব। মনের উন্নততর অবস্থা। স্বাভাবিক মনের বিকল্প ভাবের সঙ্গে অর্থাৎ পারভারসানের সঙ্গে সংঘর্ষে এলে তার পরিণামটা সাবলিমেশান।'

ইতিমধ্যে অচিন্ত্য এসে গেল। বাস্তবিক দেখতে সুন্দর ছেলেটি। স্বভাব ভারী মিষ্টি। আমার থেকে ছ-সাত বছর ছোট। স্কুলে পড়ে। ঐ বছরে পরীক্ষা দেওয়ার কথা। বোর্ড এগজামিনেশান। টেস্ট হয়ে গেছিল। বড় গরীব ছেলে। ওর পাশ করার দায়িত্ব দাদা আমার ওপরে চাপালেন। ঝাড়গ্রাম আশ্রমে সে আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাকে পড়াব। খুব গরীব, বাপ-মা কেউ নেই। দাদা বললেন— 'অচিন্ত্যকে চেন? ও তোমার অঞ্চলের লোক।'

'ওড়িয়া?' আমি বললাম। সে মাথা নেড়ে না বলল।

'ও কিন্তু বাড়িতে ওড়িয়া বলে'— দাদা বললেন।

এবার আর সে লুকোতে পারল না। ওর মাথা নিচু হল। মুখে ওর নতুন বউয়ের লজ্জা।

'বাড়িতে তোমার ওড়িয়া পুঁথি আছে?' দাদা জিজ্ঞেস করলেন। মাথা নীচের দিকে হেঁট করে হাঁ বলল অচিন্ত্য।

মেদিনীপুরে বাংলা অক্ষরে ছাপা ওড়িয়া পুরাণ সব লোকে পড়ে। এরা ওড়িয়া বলে কিন্তু ওড়িয়া অক্ষর চেনে না। পুঁথি-পড়া ওড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রতি গাঁয়ে থাকে। 'এরা তালপাতার পুঁথি থেকে জগন্নাথ দাস-ভাগবত পড়ে'— দাদা বললেন আমায়। আবার অচিন্ত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোর পুরো নামটা বল অচিন্ত্য।'

'অচিন্ত্য কুমার বেরা'।

মানে 'বেহেরা'— আমি বললাম। অচিন্ত্য উঁ-চুঁ কিছু করল না। আমি যে মেদিনীপুরে ওড়িয়া প্রচার করতাম এ কথা দাদা জানেন। কিন্তু কখনো সে বিষয়ে আলোচনা করেননি। বিচিত্র চরিত্র দাদার। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রৌঢ়ি বলে আদৌ কিছু নেই মনে। ওড়িয়া বাঙালি বিহারী ভেদ তাঁকে স্পর্শ করেনি। সত্যিকে মিথ্যে বলার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না।

'এদের ভিতরে বিপ্লবটা অতি স্বাভাবিক। এরা জাত বিপ্লবী। বিপ্লবের আগুন এদের বুকে যত শিগগির জ্বলতে পারবে, তোমার আমার ভিতরে অত সহজে সে আগুন ধরবে না। কারণ এদের ভিতরে দৃঢ় জাতীয় ভাবের অভাব। এরা ওড়িয়া হয়েও ওড়িয়া নয়। অথচ বাঙালি হওয়াও এদের পক্ষে সহজ নয়। তাই আন্তর্জাতীয় প্রেরণা দেওয়ার জন্যে এদের ভিতরে ক্ষেত্র প্রস্তুত। কম্যুনিজমের ভিত এদের ভিতরে খুব মজবুত করে দেওয়া যেতে

পারবে। কম্যুনিজমের ভিত অন্য এক জায়গাতেও দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোথায় জান ঘনশ্যাম? চিন্তা করে দেখেছ?'

আমি মাথা নাড়লাম। কখনো চিন্তা করিনি একথা এর আগে।

'সে জায়গাটা হল ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত। কারণ যে নতুন জাতীয়তা সৃষ্টি হল, মানে ভারতীয় জাতীয়তা আর পাকিস্তানী জাতীয়তা, তার কোনো প্রভাব সীমান্ত লোকদের ওপরে আদৌ থাকবে না। সেখানে ভাগনে যদি হিন্দুস্থানী মামা পাকিস্তানী। বাপ হিন্দুস্থানী মা পাকিস্তানী। এদের মধ্যে দৃঢ় জাতীয়তার অভাব মহামানবীয় ভাব বিস্তারের জন্যে আবশ্যকীয় বিপ্লবকে স্বাগত করে আনবে'।

দাদা যা বললেন তা হয়ত সত্যি। কিন্তু আমার মনে হল এরা এক একটা ভ্রষ্ট মানবসমাজের গুষ্টি। এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অবশ্য পঞ্চাশ বছর বা দুপুরুষ বাদে এদের ভিতরে ওড়িয়াত্বের গন্ধ থাকবে না। কিন্তু তারপরে পুরোপুরি বাঙালি বনে যেতে কমপক্ষে আরো পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে। এই পট পরিবর্তন বা ট্রাঞ্জিসান-এর সময়টা এই স্তরের লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছর মিশিয়ে প্রায় তিনশো বছর এ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বেশ নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এদের নাম থাকার সম্ভাবনা নেই। জনৈক ওড়িয়া ওড়িয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দেশপ্রাণ না দেশজীবন বলে কি একটা আখ্যা পেয়েছিলেন। এখন তিনি বিস্মৃতির গর্ভে।

বহু ভাষা, ভাষাভাষী বহু জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে আসা-যাওয়া করছে। সংস্কৃত একদিন সমৃদ্ধশালী ছিল। সে এখন মৃত। হাজার বছর আগে ওড়িয়া ভাষা হয়ত ছিল না। এখন ওড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চল ভারতের একটি অঙ্গ। ওড়িয়া যদি আবার কবে প্রাকৃতিক গতিতে লোপ পেয়ে যায়, দুঃখ করার কিছু নেই। কিন্তু ওড়িয়া ভাষাকে ভুলে ওড়িয়া বলে কথিত এই রাজ্যের লোকেরা যে ভাষাকে আপনার করতে যাবে সেই ভাষায় পুরোপুরি পটু ও অভ্যস্ত না হওয়া-তক মধ্যবর্তী সময়ে সেই লোকেদের অধঃপতন থেকে উদ্ধার করা কষ্ট। কারো কারো মতে ওড়িয়া ভাষার উপর হিন্দির আক্রমণ যেমনভাবে চলছে, সিনেমা - রেডিও, পত্রপত্রিকা এবং সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে পঞ্চাশ, একশো বা দুশো বছর পরে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। তার জন্যে আমি মোটেই দুঃখিত নই। কিন্তু প্রত্যেক ওড়িয়া তার মাতৃভাষা ভুলে হিন্দিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার না করা পর্যন্ত তাদের গৌণ মনোবৃত্তিই হিন্দিক্ষেত্রে তাদের যেমনভাবে লাঞ্ছিত করবে, সেটা ঠিক মেদিনীপুরের ওড়িয়াদের দুর্ভাগা জীবনের পুনরাবৃত্তি হবে শুধু। অচিন্ত্যের মতো এক তরুণ বিকাশশীল কম্যুনিস্টকে মানুষ করার দায়িত্ববোধ আমার যত না ছিল, তার সঙ্গে কিছুদিন থেকে যাওয়ার পর একটি কোকিলকে কাকের বাসা থেকে উদ্ধার করার প্রবৃত্তি ঢের বেশি আমার মনে কেন জেগে উঠল আমি জানি না।

অচিন্ত্যের ব্যবহার যত সরল বলে আমার প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, কিছুদিন পরে দেখলাম আমার সে ধারণা ঠিক নয়। ছেলেটি খুব আদুরে মনে হল। রাতে একা শুতে ভয়

পায়। শীতকালে আমরা একই লেপের তলায় ঘুমোই। কেন কে জানে, অচিন্ত্য দিনে অন্তত একবার মনে করিয়ে দেয় যে তার মা-বাপ ভাই-বোন কেউ নেই। আমি ওর বাবা-ভাই সবকিছু। একথা সে বার বার কেন বলে ধরতে পারি না।

দুঃখী কথার মাঝখানে রসভঙ্গ করে কেন না জানি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল— "আচ্ছা ঘন, একটা কথা জানতে চাই। তোর মতো দারুণ এক গান্ধীভক্ত অহিংবাদী হঠাৎ কি করে হিংস্র কম্যুনিস্টদের পাল্লায় গিয়ে পড়লি বল ত? নিশ্চয় কিছু একটা রহস্য আছে।"

ঘন বলে— 'আছে। আমি অহিংস গান্ধীবাদ থেকে এক লাফে হিংসায় বিশ্বাসী কম্যুনিস্টবাদকে গ্রহণ করিনি। প্রথমে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিমলেরও ছিল না। আমরা দুজনে অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিলাম। গীতার ধর্ম ছিল আমাদের ধর্ম। গান্ধীজীর গীতাভাষ্য আমি পড়েছিলাম। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের হত্যা করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে হিংস্র উদ্বোধন দিয়েছেন তাকে অহিংস বলে মেনে নিতে আমার সত্যানুসন্ধানী মন বিদ্রোহ করত। ভারতের স্বাধীনতার পরে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস প্রচার সত্ত্বেও যেভাবে হিংসার ঝড় ভারত ও পাকিস্তানে বয়ে গেল তার প্রতিকার কেবল ন্যায়নিষ্ঠ সবল পুরুষের সশস্ত্র প্রতিরোধের দ্বারাই সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস ছিল। ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির সমস্ত সংকীর্ণতাকে বর্জন করে আমরা কয়েকজন পণ করলাম ভারতের অখণ্ডতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবার।

সেই আদর্শ চোখের সামনে রেখে কয়েকজন দেশপ্রেমিক শুদ্ধচরিত্র ত্যাগী অনুশীলন দল-নেতাদের সংস্রবে আমরা এলাম। স্বাধীনতার আগে এদের সঙ্গে অবশ্য আমাদের পরিচয় ছিল। দেশের জন্যে আত্মবলিদানের মহৎশিক্ষা এই অনুশীলন দলের নেতাদের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। আমাদের মন্ত্র ছিল— 'হতোইবা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম'! আমাদের ধ্যেয় ছিলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে ধ্যান করামাত্র আমার মনে হত তিনি যেন বলছেন— 'ময়া হতাস্তে জহি মাবতিষ্ঠা নিমিত্তমাত্রম ভব সব্যস্রাচিন'। কিন্তু উনিশশো বিয়াল্লিশের বিপ্লব আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। জেলে থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বিমলের সঙ্গে আমার কলকাতা আসার উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা। কিন্তু দেখলাম স্বাধীনতার পরে ওই দল ক্রমশ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সেইসব নেতারা তখনো নিজের পরিসরের ভিতরে এক এক জন বিরাট পুরুষ। কিন্তু দেশ যেন তাঁদের পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে এমনি মনে হল। দেশের এ গতি কোনদিকে? এটাই ছিল আমার প্রশ্ন। তখন আমাকে তার উত্তর দিয়েছিলেন পরিমল দাদা। সে উত্তর ঠিক হোক বা না হোক, সে সময়ে আমি ভেবে দেখলাম উত্তম লক্ষ্যসাধনের জন্যে অন্যায় উপায় যদি অবলম্বন করতেই হয় প্রকাশ্যে সে মতবাদকে সমর্থন করা উচিত। সেটা না-করা আমার মতে ভীরুতা। কম্যুনিস্টরা তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে যে কোন অসৎ উপায় গ্রহণ করতে পেছপা নয় বলে খোলাখুলি বলত। তাছাড়া কংগ্রেসীরা অত্যন্ত রক্ষণশীল বলে আমার মনে হল এবং ওপরে সত্য অহিংসা প্রচার করে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যে-কোনো অসদুপায়ের আশ্রয় নেওয়াতে কম্যুনিস্টদেরও তারা টেক্কা দিচ্ছে দেখলাম। সেজন্যে কংগ্রেসীদের চেয়ে

কম্যুনিস্টদের আমার ভালো লাগল। অনুশীলন দলের নেতারা শুধু আদর্শ হয়ে রয়ে গেলেন আমার চোখে। তাঁরা কংগ্রেসী হতে পারলেন না কিম্বা কম্যুনিস্টও হতে পারলেন না। কিন্তু আমার কাছে তাঁরা দেবপ্রতিম ও পূজ্য।

দুঃখী বললে— "ওইটুকুই যথেষ্ট। তারপরে কি হল বল।"

একদিন দাদার একটা পুরোনো ডায়েরী দৈবাৎ আলমারির ভিতরে পেলাম ওই ঝাড়গ্রাম আশ্রমে। একসময় দাদা ডায়েরী লিখতেন। সেই পুরোনো ডায়রীর একখানা বোধহয় ভুলক্রমে বইয়ের সঙ্গে থেকে গেছে। পরে দাদা আর ডায়েরী লিখতেন না। আমার ডায়েরী লেখা দেখে বলেছিলেন, 'সখ থাকে তো লেখ। এতে অবশ্য নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। কিন্তু মনে রাখার কথা এটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র নয়। সামন্তবাদী রাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের সুবিধার জন্যে অবশ্য তুমি ডায়েরী লিখছ না মনে রেখ।'

সেইদিন থেকে আমার ডায়েরী লেখা বন্ধ হল। কিন্তু দাদার এই পুরোনো ডায়েরীটা দেখে আমার আশ্চর্য লাগল। অন্যের ডায়েরী পড়তে নেই। তবু পড়ার আগ্রহ চাপতে পারলাম না। ডায়েরী লেখা লোক লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরে অন্যের ডায়েরী পড়ার জন্যে তার যে আগ্রহ সেটা বড় দুরন্ত।

লেখা ছিল— 'পরম্পরা থেকে বিচ্যুতি না ঘটলে বিপ্লব অসম্ভব। পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হতে হলে সবার আগে রুচিকে বিকৃত করে দিতে হবে। রুচির বিকৃতি এমনকি জাতির বিকৃতিও আবশ্যক। ছেলেবেলা থেকে মানুষের মনে যে-সব ছাপ থেকে যায় সেটাই রুচি। তাকে ঘষেমেজে সাফ করে না দিলে বিপ্লবের প্রকৃত রূপ প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয়। এই মাজাঘষার ফলে মানুষের যে নতুন বিকার সৃষ্টি হয় তাকে আমরা শূন্য বা জিরো বলে ধরতে পারি। তবে ব্যবহারিক জগতে তাকে মনের বিকৃত অবস্থা বলা যেতে পারে। সেক্স বা লিঙ্গ-বোধটা মানুষের মস্তিষ্কের ওপরে সেইরকম আচার বা ব্যবহারের একটা ছাপ। সেই রঙকে তুলে না দিলে মানুষ বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে না। এই রঙ ছাড়ানো বা প্রসেসক্রমে আমাদের যা করতে হয় তাকে বাইরের জগৎ কামবিকৃতি বা সেক্স পারভারসন আখ্যা দিতে পারে। কিন্তু বিপ্লবীদের সেই পন্থা আশ্রয় করা ছাড়া গতি নেই। কম্যুনিস্টরা যদি একথা না বোঝে তবে বহু 'অমূল্য' বহু 'রত্নাকে' নিয়ে পালাবার প্রহসন আমাদের উপভোগ করতে হবে। ....'

এটুকু পড়ে আমার মনে হল দুঃখী, আমার মস্তিষ্ক যেন বিকৃত হতে শুরু করেছে।

"তুই কি করে জানলি তার আগেই তোর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়নি বলে?" দুঃখী হাসল।

হয়ে থাকতে পারে। আমি বলতে পারছি না। কিন্তু ওই ডায়েরী পড়ে ফেলার পর আমার আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকার ইচ্ছে ছিল না। তবুও দাদার মমতা আমি কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। বললে দাদা ছাড়বেন না। না বলে পালিয়ে আসাটা অভদ্রতা ও ভীরুতা। আমি আমার জাতের কলঙ্ক হতে চাইনি। ওড়িয়াগুলো ভীরু বলে কালে কালে এদের মহলে কথা থেকে যাবে।

আমার এই মনোভাবের সুলুক অচিন্ত্য কি করে পেয়ে গেল। একদিন বললে, 'সার,

আমকু আপন যেমন ভালবাসন্তি তেমন কেহি বাসি নাই। আমে পিলাদিনু কাহারি আদর পারিনু। আমকু একটু আদর করুন।'

কিছুদিন আগে সে একথা বললে আমি হয়ত এই বাপ-মা মরা ছেলেটাকে কাছে নিয়ে আদর করতাম। কিন্তু দাদার ডায়েরী পড়ে ফেলার পর অচিন্ত্যের প্রতি আমার সমস্ত দয়া কোথায় উবে গিয়েছিল। বললাম— 'বেশি আদুরে হলে ছেলেরা নষ্ট হয়ে যায়।' ও চুপ মেরে গেল। আমি অলকার কাছে চিঠি লিখতে বসলাম একটা জেদ নিয়ে।

'এখানে আমি একা নেই। আমার সঙ্গে একটা ছেলে আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। ওর নাম অচিন্ত্য। ছেলেটির মা-বাপ নেই। কিন্তু সে এই নির্জন নিবাসে আমার সঙ্গী হওয়ার যোগ্য নয়। বয়েসে তোমার চেয়ে বেশি ছোট না হলেও মানসিক বিকাশের দিক থেকে সে তোমার তুলনায় অতি শিশু। সেজন্যে আমি সবসময় ভাবি অলকা যদি আমার কাছে থাকত তবে আমার পড়াশোনায় অনেক সাহায্য পাওয়া যেত। আমি কেমন করে তোমার সাহচর্য পাব সেই চিন্তা আমায় কুরে খাচ্ছে। আমার কেন যেন আশঙ্কা হয় তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা নাও হতে পারে। হয়তো খুব শিগগির তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। তোমার বাড়িতে একথা সকলে আমার কাছে লুকিয়েছে। তার মধ্যে তুমিও থাকতে পার। একথার সামান্য আভাস যদি তুমি আমায় আগে দিতে তবে আজ যে আশার সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তাকে গড়তে আমি আদৌ চেষ্টা করতাম না। আমার দুর্গম যাত্রাপথে একমাত্র প্রেরণার উৎস, আমার কল্পনার রানী অলকাপুরীর অলকাকে হারিয়ে বেশিদূর এগোতে পারব কিনা সন্দেহ। তুমি আমায় সত্যি ভালোবাসো কি না জানতে চাই। তাহলে আমার কর্তব্য বেছে নিতে কষ্ট হবে না। শুধু তোমার সাহস চাই।

যত শীঘ্র পার উত্তর দিও— উত্তরের আশায় চেয়ে রইলাম। ইতি—'

"উত্তর এল?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক চার দিনের দিন উত্তর পেলাম।"

"কি লিখেছিল?" অলকার চিঠি নিয়ে দুঃখীর প্রবল আগ্রহ।

"তোর মন বিকৃত হবে না তো?"

"সে আশঙ্কার জন্যে সময় পার হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, তবে শোন।"

"কি, সে চিঠি তোর মুখস্থ নাকি?"

"ভাষা নয়, ভাবটা। সম্বোধনটা কিন্তু মনে আছে। ওর সম্বোধন যদি সত্যি হয় তাহলে আমি ওর প্রাণের দেবতা।"

উভয়ে হাসল। ঘন বলতে শুরু করল।

'আপনার চিঠি পেয়ে আমি কত যে কেঁদেছি তা কেবল আমি জানি। আর দেখলে দেখে থাকবেন এই বন্ধ ঘরের দেওয়াল দরজার সঙ্গে সীমাবদ্ধ শূন্য আকাশ। সেই আকাশের গায়ে মিশে গেছে বাষ্প হয়ে আমার দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসে অবারিত উষ্ণ বারি। আপনাকে যদি

আমার হৃদয় চিরে দেখাতে পারতাম তবে দেখতে পেতেন আমার বুকে আপনার ফটোটা কেমন ব্ল্যাক অ্যান্ড হুইটে ব্রাইট হয়ে আছে। আপনাকে ছেড়ে আমি একদণ্ড বাঁচতে চাই না। পরীক্ষা আর অল্পদিন রইল। আপনি একটি দিন হলেও এসে দেখে যান। সব কথা জানতে পারবেন। আমাকে চিনতে পারবেন, আমার মনের কথা বুঝতে পারবেন। আপনি না এলে আমার পাস করা হয়ত হবে না।

আপনি যেমন করে হোক আসুন। আপনি বোধহয় দাদাকে ভয় পাচ্ছেন। রাত ন'টার পরে দাদা কখনো আমাদের বাড়ি আসেন না। আপনি সেই সময় এলে দাদা জানতে পারবেন না। আমাদের বাড়িতে সবাই আপনার দিকে। একমাত্র দাদাই বাধা।'

"ব্যস, এইটুকু? আর কিছু নয়?" দুঃখীর প্রশ্ন।

"হ্যাঁ আরো অনেক কথা। সে সব খালি কবিতা। চাঁদনী, মলয়, বন, উপবন, সংগীত, মূর্চ্ছনা, ব্যথা, বেদনা আদি বহু শব্দের আড়ম্বর।"

"শেষে ভণিতা কি ছিল?"

"আপনার একান্ত নিবেদিতা পূজারিণী অলকা!"

"তারপর তুই বাসার থেকে উঠে চলে গেলি নিশ্চয়?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"যেতে তর সয় না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম দু-লাইনে। অমুক তারিখে রাত দশটায় পৌঁছুব।" ঘন বলল।

"তারিখটা মনে আছে?"

"মনে নেই।"

"তারপর? গেলি সেদিন?"

"যেদিন যাবার ছিল ঠিক তার আগের দিন হঠাৎ এসে পৌঁছলেন সাক্ষাৎ দাদা বিনা প্রোগ্রামে। আমার বুক খালি কাঁপছিল। চিঠিটা পড়ে গেল নাকি দাদার হাতে। না পড়লেও দাদা তো সব কথা জানতে পারেন কেমন করে। যেন না জানতে পেরে থাকেন, হে ভগবান! ভগবানকে অবিশ্বাস করার অভ্যাসটা মুহূর্তে চলে গেল। ভগবান কিন্তু রক্ষা করার মতো লাগল। দাদার ভাবভঙ্গি থেকে তিনি কিছু জানতে পেরেছেন মনে হল না।"

"তাহলে তিনি এসেছিলেন কেন?"

"দাদা এসেছিলেন প্রকারান্তরে জানিয়ে দিতে যে কম্যুনিজম প্রচারকার্য আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"তাহলে তো দাদা সব কথা জেনে গিয়েছিলেন।"

"জানুন আর নাই জানুন আমার কৌশলটা কিন্তু কার্যকরী হল দেখলাম।"

"তবে তো সেরেছিস। ওড়িয়াদের নাম ডোবালি।" হেসে হেসে দুঃখী বলে। "তারপর কি করলেন দাদা?"

"দাদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন— 'বাড়ি থেকে কোনো চিঠি পেয়েছ?'

আমি বললাম— 'না'।

'খবরের কাগজে দেখনি? বন্যায় তোমাদের অঞ্চল ডুবে গেছে। বাত্যায় উড়ে গেছে।

'না। এখানে তিনদিন পরে কাগজ আসে।'

'আমি জানি সেকথা। তাই চলে এলাম। ওদিকে বিপদ। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। আমি অবিশ্যি অচিন্ত্যকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

"রুগী যা চাইছিল বদ্যিও তাই বাতলাল। আমি চুপচাপ চলে এলাম।"

"আর যাসনি তার পর থেকে?"

"গিয়েছিলাম, অনেকদিন পরে।"

"গাঁয়ে কি অনেক ক্ষতি হয়েছিল?"

"ক্ষতি হয়েছিল বইকি। তবে যতটা আশঙ্কা করেছিলাম ততটা নয়।"

"তোমাদের গাঁয়ে ক্ষতি হয়েছিল বলে দাদা জানলেন কি করে? খবরের কাগজে কি তোমার গাঁয়ের কথা বেরিয়েছিল?"

"না, আমাদের গাঁয়ের কথা খাস করে কিছু বেরোয়নি। কিন্তু দাদা তো কেমন করে সব জানতে পারতেন! তাঁকে আমরা সবাই বলতাম কম্যুনিস্ট সন্ন্যাসী— একজন সিদ্ধপুরুষ। ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি জানতে পারতেন।"

দুঃখী হাসল। বলল, "তুই চেলা না হয়ে যা পালিয়ে এলি!"

"চেলার কি অভাব আছে? আমি এলে কি হল? অচিন্ত্য তো রইল। অচিন্ত্য উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। সে কি করে জানিস? ভূত-প্রেতের নাম শুনেও ভীষণ ডরায়। ভয় পাওয়া মাত্র হাত মুঠো করে তুলে ধরে বলে 'মার্কস এঙ্গেলস লেনিন'! আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম— 'এরকম করিস কেন?' বললে— 'ভূত ভয়ে পালাবে'।"

দুঃখী আগের সেই মনে-লাগা কথাটাকে আবার খুঁচিয়ে বের করতে চাইল। বললে, "অলকার খবর কি? চিঠিপত্র দেয়?"

"নাহ, আর তো কই দেয় না।"

"তুই দিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ, বাড়ি এসে আমি একখানা পোস্টকার্ড ফেলে দিয়েছিলাম। এক লাইন— ঝড়ে ঘরদোর ভেঙে যাওয়ার কথা শুনে এখানে চলে এসেছি। দাদার কাছ থেকে শুনে থাকবে।"

"ওইটুকু?"

"হ্যাঁ"।

"আর দাদা?".

"হ্যাঁ লিখেছিলাম।"

"তিনি উত্তর দিয়েছিলেন?"

'টাকা পাঠিয়েছিলেন বাড়ি মেরামতের জন্যে।"

"তারপর?"

"আমি চিঠি দিতাম। আর জবাব পাইনি। আমিও আর লিখিনি।"

"অলকা?"

"সে তো এখন অলকা সান্যাল। কমরেড সান্যালের সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী।"

"তুই আর যাসনি দাদাকে দেখতে?"

"হ্যাঁ, দু-একবার গেছি। অনেকদিন চিঠি না পেয়ে মনটা কেমন করল। গেলাম। দেখা করে এলাম।"

"আগের মতো আদর-স্নেহ করেন?"

"দাদা আর যাই হোন অভদ্র নন।"

"মার্কস, লেনিনের কথা ওঠে?"

"না। কম্যুনিস্ট দর্শন সম্বন্ধে তিনি আর আমার সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করতেন না। আমি যখন সে কথা তুলি তিনি বলেন, 'আমি তো বুড়ো হলাম। এখন যারা পার এ পতাকা তুলে ধর। সংগ্রাম চালু থাক'।"

"ব্যস, ওইটুকু?"

"হ্যাঁ"।

"ঝাড়গ্রামের সে আশ্রম আছে?"

"আছে বলে শুনেছি। কে একজন কমরেড সেখানে ছেলেপিলে নিয়ে থাকেন।"

দুঃখী আবার জিজ্ঞেস করল— "আচ্ছা ঘন, তোর কি বিশ্বাস যে অলকা তোকে ভালোবাসত?"

ঘন — আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি তো তাকে ভালবাসিনি।

দুঃখী — তুই কি বিশ্বাস করিস যে সেদিন বিমলের সঙ্গে দাদার যে কথাবার্তা হয়েছিল সেটা তোকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে হয়নি— তার মধ্যে সত্যতার গন্ধ ছিল?

ঘন — অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখিনি।

দুঃখী — আমার মনে হয় সেটা উভয়ের একটা চাল এবং তোর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র।

ঘন — আমি দাদাকে অবিশ্বাস করতে পারব না।

দুঃখী — তুই ভুলে যাচ্ছিস যে দাদা একজন কম্যুনিস্ট।

ঘন — সে-কথা মনে করে আর কোনো লাভ নেই। আমরা যে খুব জোরে ওই আদর্শবাদের দিকে দৌড়োচ্ছি সে কথাই আমরা ভুলে যাচ্ছি বলে ভয় হয়।

দুঃখী — কিন্তু দেশকে ঠিক রাস্তায় নেওয়ার দায়িত্ব কার?

ঘন নীরব রইল। দুঃখী বললে— "সে দায়িত্ব আমাদের। আমরা যে কজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এখনো বেঁচে আছি। কংগ্রেসের দূষিত হাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে এরা যদি দেশের দুর্গতির মোড় না ফেরায় আর কেউ পারবে না।"

ঘন হাসল। বললে, "ভগবান বড় ঈর্ষাতুর। তিনি কারো গর্ব রাখেন না। তোর এমন

দাম্ভিক উক্তি শুনে আমার ভয় হয়। ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ। তার ভিতরে ওড়িশা এক ক্ষুদ্র দরিদ্র রাজ্য। সে রাজ্যের অবহেলিত, জাতীয় স্তরে বিস্মৃত, ঘন আর দুখীর মতো কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষ বিভিন্নতা-পূর্ণ এই বিশাল দেশের গতিপথকে বদলে দিতে পারবে? এটা দুঃসাহসিক চিন্তা। চিন্তা নয়, একটা ব্যাধি। আমাদের জানে কে, মানে কে? এ দেশে আমরা কি মানুষ? এ দেশে মানুষ বলে গণ্য কেবল ধনী পয়সাওলা। লোকে ধেয়ে চলেছে তাদের দিকে। সবাই চায় কি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে। এর সহজ ও সোজা উপায় কিছু নেই। সেজন্যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঠকাতে চেষ্টা করছে। এই হল সাম্প্রতিক জাতীয় জীবনের ছবি। তাতে তুই সাহস করিস আমাদের মতো কয়েকজন লোক, আঙুলে গোনা যায়, তারা সমস্ত ভারতবর্ষটাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে?"

"তা হলে কি আমরা নীরব দ্রষ্টা হয়ে থাকব?"

"উপায় নেই। এ দেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল তিষ্ঠোতে পারবে? পণ্ডিত নেহেরুর নির্বাচনী প্রচার কি? 'কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দল এ দেশকে শাসন করতে পারবে না'। এই বুলির পিছনে কোন মনোভাব প্রকাশ পায়? কংগ্রেসটা রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির মতো না হয়ে যায়!"

"অসম্ভব নয়। তবে সহজও নয়।"

"সহজ নয় কেন?"

"লোকেরা শাসককে পুজো করতে শিখেছে। যে শাসনের গদিতে বসে আছে সেই হল তাদের আদর্শ। কংগ্রেসের শাসকরা চায় একচ্ছত্রবাদ। সর্বহারার একচ্ছত্রবাদ নয়, কংগ্রেস দলের। তবে এই অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র আলোর রেখা যা দেখা যায় সেটা হল যারা একচ্ছত্রবাদের পরখ এ দেশে করতে চায়, তাদের কোনো সুচিন্তিত যোজনা নেই।" দুঃখী বললে।

ঘন — "যোজনা নেই বলাটা ঠিক হবে না। যোজনা আছে তবে সেটা কংগ্রেসের নয়। সে যোজনা কমরেডদের। কংগ্রেস নেতারা চায় তাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যে করে হোক ক্ষমতায় থাকবে। তার জন্যে তারা দেশের মান-সম্মান অর্থগৌরব সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে পেছপা হয় না। ক্ষমতার নেশা তাদের পুরো মাতিয়ে রেখেছে। আগে রাজাদের রাজত্বের সময় যে লক্ষণ দেখা যেত কংগ্রেস আমলে তার আর একটা রূপ দেখা যাচ্ছে। রাজারা বিলাস ব্যসনে মত্ত থাকার সময় শত্রুরা বিনা রক্তপাতে যেমনভাবে রাজ্য অধিকার করে নেয়, কংগ্রেসের এখন ঠিক সেই অবস্থা। বর্তমান বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা— কংগ্রেসের ভিতরে কম্যুনিস্ট ইনফিলট্রেশান— গুপ্ত প্রবেশ। কংগ্রেসের ছদ্মবেশ পরে এরা কংগ্রেসী নেতাদের ব্রেনওয়াশ করতে আরম্ভ করেছে।"

দুঃখী— "যে যতই ব্রেনওয়াশ করুক ভারত কিন্তু সহজে কম্যুনিস্ট হবে না, এটা আমার দৃঢ় ধারণা। অবস্থা শেষকালে কি হবে আমি ঠিক বলতে পারছি না তবে যোজনায় যত টাকা খরচ করা হচ্ছে তার ফলে দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ হওয়াই সার।"

ঘন — "শুধু তাই নয়। নির্বাচনের বাতাস সেই দুর্নীতির আগুনকে কেমন ঘরে ঘরে

লাগিয়ে দিচ্ছে তুই লক্ষ্য করে দেখেছিস দুখী? তাছাড়া নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রতিজ্ঞা আর যোজনাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে লোকেরা আর আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার মনে করে না। সব সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে।"

"ছেলেপিলে জন্ম করার দায়িত্বও সরকারের এখন।"— এত বড় গলায় চেঁচিয়ে বলতে বলতে বালুঙ্গা পৌঁছোল যে হেসে উঠল সকলে।

"আমি কি মিথ্যে বলছি দাঠাকুর?" বালুঙ্গা বলতে থাকে। "তোমরা বুঝি যোজনার কথা কইছিলে? যোজনা কি জান? যোড়-না। মানে স্ত্রী পুরুষ জোড়া হতে মানা। যদি জুড়বে তবে ছেলেপিলে করতে মানা। পয়লা পয়লা বলল— বেশি নয়। চারটি বা পাঁচটি। তারপরে তিন বা চার। তারপরে দুই বা তিন। এখন দেখ ছাপা হয়েছে 'আমরা দুই। মোদের দুই'— মানে মাগের একটি ত মরদের একটি। এর মানে কি দুখিয়াম্না? আমার মগজে তো ঢোকে না। মরদের দিক থেকে যেটি সেটা ত মরদের। আর বউয়ের যেটি সেটা কোত্থেকে হবে? ওর সোয়ামির দিক থেকে না হয়ে অন্য কোথা থেকে হলে চলবে ত?"

সকলে আবার হেসে উঠল। "তুমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা বলছ তো?" দুঃখী বললে।

"কে জানে বাবু। আমার কিছু জানা নেই। আমি শুধু শুনছি মরদগুলোকে পয়সাকড়ি দিয়ে খাসি বানিয়ে দিচ্ছে।"

দুঃখী — "বালুঙ্গাদা, তুমি জান না। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা এমন বেড়ে চলেছে যে পঞ্চাশ বছর পরে আমরা যত আছি তার দুগুণ হয়ে যাব। খেতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।"

"পঞ্চাশ বছর পরে কি হবে তার জন্যে এত চিন্তা?" বালুঙ্গা বললে। "মানুষগুলো এত বোকা! কেন হে, তোমরা নাকি বুদ্ধিবলে চাঁদে যেতে বসেছ? পঞ্চাশ বছর বাদে সেখান থেকে ধান চাল আসবে না? মানুষ বেশি হয়ে গেলে এক থোক সেখানে উঠে যাব না?"

"আগে থেকে এত ভাবা কি যায়?" ঘন বললে।

"ভাবছ না ত কি করছ? পঞ্চাশ বছর পরে কি হবে তোমার কেন মাথাব্যথা। যে যা বল, আমি বলি মানুষ হেরে গেল। আমরা আবার এত নিলাজ! আজকালকার ছোকরাদের দেখ রাস্তায় কেমন বুক ফুলিয়ে হাঁটে। যত অপুরুষ 'খোজা' হয়ে চলেছে। তাদের দেখলে লজ্জা হয়। তাতে আবার কি বখামি। রামবাবুকে বললাম, 'হ্যাঁ হে, রামবাবু। আমরাও ত একদিন ছোকরা ছিলাম। এমন বখাটে ত কই হইনি?' তিনি বললেন 'এরা সব আধুনিক যুবক'। জিজ্ঞেস করলাম, 'আধুনিক কেমন চিজ বাবু? লম্বা না গোল না চ্যাপ্টা?' তিনি বোঝালেন, 'আধুনিক মানে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বারা মানুষ কত সিদ্ধি হাসিল করতে পেরেছে।' ওহে, সে যা বললে আমি ত শুনে হাঁদা হয়ে গেলাম। বিজ্ঞান কি না করল! আমরা শাস্ত্রে পড়েছিলাম যোগবলে যোগী ঋষিরা অষ্টসিদ্ধি পেতে পারত। এখান থেকে হাজার ক্রোশ দূরের কথা শোনা, জিনিস দেখা,— মানে দূরশ্রবণ দূরদর্শন একা যোগী ঋষিরাই করতে পারত। এখন ত বিজ্ঞান সেই সিদ্ধি সবাইকে দিয়ে দিল। শুধু রেডিও বাজছে না, রামবাবুর ঐ ঋষিরাজ্যে নাকি শ শ ক্রোশ দূরে কি হচ্ছে ঘরে বসে দেখতে পায়।

"তাই বলি, হ্যাঁ হে, তোমাদের ত এত সিদ্ধি। তোমরা আধুনিক ছেলে। বিজ্ঞান জানা মানুষ। তোমরা পঞ্চাশ বছর পরে মানুষগুলোকে খেতে দিতে পারবে না? তাই বলছি মানুষ হেরে গেল।"

"তা নয় বালুঙ্গাদা। বেশি ছেলেপিলে হলে তাদের মানুষ করবে কে?"

এতক্ষণে শুকুরা মুখ খুলল। সব শুনছিল চুপটি মেরে। বালুঙ্গা আসাতে ওর যেন বলবার সাহস এল। দুঃখী আর ঘনর আলোচনা সে শুনছিল কিন্তু বলার মতো কথা পাচ্ছিল না। এখন বালুঙ্গার কথার উত্তরে সে বললে— "আজকাল লোকেরা গরিব হয়ে গেছে দেখছ না?"

"এই মলো যা, কেমন বেআক্কেলে কথা রে তোর শুকুরা! তুই কলকাতা, রেঙ্গুন গিয়ে এই শিকেছিস? কম ছেলেপুলে হলে মানুষ হয়, বেশি হলে হয় না? মানুষ কারে বলে? যে মানুষের হাতে একগোছা ঘাসও কাঁচায় না, বাবু হয়ে চেয়ারে বসে কলমের দাগ কাটে, সেই লোকগুলোকে তোমরা বল মানুষ! সেই বসে-খাওয়া মানুষকে তোমরা যত জন্ম দেবে তাদের কেউ খেতে দিতে পারবে না। আমি তাদের মানুষ বলি না। তারা সব সমাজের মশা, ছারপোকা। আমরা যারা সব ফসল ফলাই, মশা ছারপোকার মতো এরা আমাদের রক্ত চুষে খায়। না হয় হল বাবু, তোমরা মানুষ আমরা পশু। মরবার সময় বুড়ো বাপ-মায়ের কানের কাছে একপদ ভাগবত গাইতে পার? বিদ্যা ভাগবতাবধি। ভাগবত গাইতে না পার ত কিসের মানুষ গো?"

ঘন দেখল বালুঙ্গার মাথায় রক্ত উঠছে। কথার মোড় ফেরাবে বলে একটা কথা বলল— "কি জান দাদা, পুরুষগুলো বড় নিষ্ঠুর। স্ত্রীদের দুঃখ বোঝে না। একপাল ছেলেপিলে প্রতি বছর আঁতুড়ে ঢোকায়। মায়েরা সামলাবে কি করে?"

রেগে গেল বালুঙ্গা— "আমার মুখ থেকে যা-তা বেরোবে এখন। আজকের মানুষগুলো এত বেশরম— মেয়েছেলের হাত ধরেছিলে কেন? তাকে পাশে নিয়ে শুতে? নারী আর মা হবে না, খালি তোমারই ভার্যা হয়ে থাকবে? 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'— ছেলে হল ত কাজ সারা, মামলা খতম। বলে 'পুত্র নিবেশি পত্নি পাশে, অথবা চলিবে সন্ন্যাসে'। ছেলেটি হল, আর বউ-সোহাগী হয়ে কি লাভ? বউয়ের কাছে যাবে কেন, ছেলেপিলে হবে কেন? শাস্ত্র বলে তোমার আত্মা তোমার বীর্যে গিয়ে স্ত্রী-গর্ভে জন্ম নিল। তাই ছেলেকে বলা হয় আত্মজ। নিজে যার পেট থেকে জন্ম নিলে সে ত আর বউ হয়ে রইল না। সে বিচার কোথায় গেল? এখন কুকুর বেড়ালকেও ছাড়িয়ে গেল এ মানুষগুলো। কুকুর বেড়ালের ত সময়-অসময় থাকে। আজকালকার মানুষগুলোর কিছু নেই।"

দুঃখী বলল— "আজকালকার মানুষ যা করে সে সব বিজ্ঞান-সম্মত। সরকার বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ নিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ যোজনা করেছে।"

আর বালুঙ্গাকে সামলায় কে? আগুনে কেউ যেন ঘি ঢেলে দিল— "কি বললে? বিজ্ঞান? বিজ্ঞান মানে অজ্ঞান— মূর্খ। পদকর্তা বলেছেন— 'বিজ্ঞানী কৈবর্ত ধোইলা......' মানে রামচন্দ্রের পা মূর্খ কেওট ধুয়ে দিল। বিজ্ঞান এল কোত্থেকে হে? আমরা সব জানতাম জ্ঞান—

'আমি যারে হইব সদয়, জ্ঞান তার হৃদয়ে উদয়'— জ্ঞানের উপরে আবার বিজ্ঞান কি? এ বিজ্ঞান হল বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন গাই, বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করলেন মোষ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন আম, বিশ্বামিত্র করলেন আমড়া। ভগবান দিলেন জ্ঞান, বিশ্বামিত্র দিলেন বিজ্ঞান। জ্ঞান যত বড় তার প্রভু তত বড়। মানুষের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে বিজ্ঞান যদি এগিয়ে গেল, আর সে মানুষকে মানবে? তোমার বিজ্ঞান কি ভগবানের চেয়ে বড় হয়ে গেল?"

দুঃখী বললে— "বালুঙ্গাদা, ভগবান মানুষ সৃষ্টি করলেন। ভগবানের মানুষ বিজ্ঞান তৈরি করল। তার দোষ কি? তাকেও তো বলা হয় এটা বিদ্যা।"

"হ্যাঁ, বিদ্যা, বিদ্যা। সে-সব অপরাবিদ্যা। জ্ঞান হল পরাবিদ্যা। নিধু গুণীনকে জান? আমাদের গাঁয়ের নিধু গুণীন? অনেকদিন হল মারা গেছে। দুখী দেখে থাকবে, মনে নেই। সে মেলা বিদ্যা সেধেছিল। মাঝরাতে মশানে যায়, মশাচণ্ডী সাধে। ওরে বাবা, কি সাহস সে লোকটার। মড়ার ওপর বসে সাধনা করে। চণ্ডী আসার সময় যদি ভয় না পেলে ত বর্তে গেলে। না হলে সেইখানে তোমার ঘাড় মটকে খাবে। সে কি সাংঘাতিক আওয়াজ! লম্বা লাল জিভ। রক্ত মেখে লাল। বুকে মড়ার মাথা ঝুলছে। ওইসব দেখে কোন ব্যাটা সাহস ধরে? সাহস রাখলেও কী নিস্তার আছে? চণ্ডী বলবে— খেতে দে, সাধক কাছে ছুরি রেখে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উরুতে ঢুকিয়ে রক্ত বের করে না দিয়েছ কি মরেছ। রক্ত দেওয়া মাত্র চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেলবে। তারপর চণ্ডী আবার বলবে— 'আরও দে, আরও দে, আরও খাব।' সাধক যদি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জানে ত সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিলে মড়াটা বেঁচে উঠবে। তক্ষুনি খাঁড়া দিয়ে সেই মড়ার ঘাড়ে এক চোট দিতে হবে। যদি একটু দেরি করেছ ত সেই মড়াটা তোমায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। নিধু গুণীন এমনি কত কি সাধন করেছিল। চণ্ডী প্রসন্ন হয়ে তাকে বর দিয়েছিলেন। তবে ছেলেপুলে ওর কিছু রইল না। যত এই বিজ্ঞানীরা সব আগুন-গেলা। এদের পরে আর মানুষ থাকবে না। মানুষ নির্বংশ হয়ে যাবে।"

"নিধু গুণীন কি সব সিদ্ধি করেছিল?" জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

"আরে জানিস না? তুই যা চাইবি, হাত নেড়ে একবার হাত ঘুরিয়ে আনলে সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। তুই এখানে বসে আছিস, কলকাতায় তোর মেয়েমানুষ কি করছে....."

"আমার কোনো মেয়েমানুষ-টানুষ নেই"— শুকুরা প্রতিবাদ করে ওঠে। বালুঙ্গা বলে, "ওরে কথার কথা বলছি। তোর দিকে টানিস কেন? বলছি কি, কলকাতায় কি হচ্ছে সে বলে দেবে। তাকে চণ্ডী এমন প্রসন্ন হয়েছিলেন যে সে যে পুরাণে চোখ রাখবে সেটা ওর মুখস্থ হয়ে যাবে। তবে এত বিদ্যা হাসিল করেও সে নিরাশ্রয় হয়ে মলো। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষত না। জল এক ফোঁটা দেবার কেউ ছিল না কাছে। খিদে তেষ্টায় প্রাণ বেরিয়ে গেল।"

"সে নাকি যা চাইত আনতে পারত? না খেতে পেয়ে মরল কি করে?"

"গুরুর বারণ ছিল। যে জিনিস চাইবে পাবে তবে কিনা নিজের জন্যে নয়। নিজের জন্যে কিছু করলেই মরবে।"

"সেই বিদ্যা কাউকে অন্তত দিয়ে গেছে কি?" জানতে চাইল ঘন।

"বিজ্ঞানীরা কি তাদের বিদ্যা অন্য কাউকে বলে? তাহলে আর তাদের কি বাহাদুরি রইল? এ বিজ্ঞানীরা যে বলছে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর, কেন বলছে জান? সংসারে তারাই একা বড় মানুষ হয়ে থাকবে। আর কোনো বড় মানুষ পৃথিবীতে না আসুক। আরে বাবা, তোমরা ত যৌবনকালে একটা দুটো ছেলে করে খাসি হয়ে গেলে। যৌবনবেলায় বাপ-মায়ের যা স্বভাব ছেলেপিলেদের ওই স্বভাব হবে। সে সময় মনটা চঞ্চল থাকে। তারই জন্যে ছেলেমেয়েরাও উদোম হয়। পোক্ত বয়স না হলে কি ভালো ছেলে জনম হবে? দেখ না, শাস্তর পড়নি? রামকৃষ্ণ কি তাঁর বাপ-মায়ের বয়েসকালের ছেলে? দশরথের বুড়ো বয়েসে রামচন্দ্রের জন্ম। কৃষ্ণের ওপরে সাত-সাতটা ছেলে। ওহে, মানুষের দেহ পেতে দেবতারা চেয়ে আছে। আর তোমরা কিনা তাদের মানা করছ আসতে! খালি ডেকে আনছ কাদের, না যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব যতসব অপসৃষ্টি। ছোকরা বয়েসের ছেলেপিলে আর কি হবে? নাচ তামাসাতে মন থাকাকালে, ভোগ লালসাতে মেতে থাকার সময় আর কি প্রকার গর্ভাধান হবে? তোমরা বিজ্ঞানীরা এতই স্বার্থপর?"

দুঃখী বললে, "বালুঙ্গাদা, তোমার এ সব কথা আজকাল আর কেউ শুনবে না। রাম ঠিকই তোমায় বলে 'আঠারশ বাষট্টি।' দেবতারা কি স্বর্গে থাকে? এই মানুষই দেবতা হয়।"

"আমি ত তাই বলছি। মানুষ দেবতা হবে কি করে? এই মায়ের পেটে ত দেবতা থাকবে? তোমরা কি দেবতা সঞ্চার করছ? তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভে ত ভূত!"

"কোন মানুষকে দেবতা বলে? যে পরের জন্যে জীবন দেয়। নর নারায়ণের সেবা করে। ভগবানের সেবার চেয়ে ভগবানের সৃষ্টির সেবা বড়।"

"হো - হো - হো"— হেসে ফেলল বালুঙ্গা। "আমার ছেলের পেট ভরে গেলে আমার পেট ভরল। আচ্ছা তাই না হয় হল। আমার ছেলেকে খেতে দিলে আমি খুশি, আমার পেটও পুরল। আমার ছেলেকে ভালো করে খেতে দাও তাহলে। রামা, হরিয়া, গোপাল, মধু আমার যতগুলো ছেলে আছে সকলকে দেখবে না রামটি বড় হয়েছে বলে শুধু তারই খবর নেবে? ভগবানের সৃষ্টিতে কি কেবল হাতি, বাঘ, গোরু, মোষ, মানুষ আর বাঁদর আছে? ছাগল মুরগিও তাঁরই সৃষ্টি। তুমি তাদের সেবা করবে, না তাদেরকে সেবা করে ফেলছ? ভগবানের সেবা না করে খালি সৃষ্টির সেবা করলে আপনার সেবা হয়ে যায়। যে ভগবানকে না মানে সে কি তার সৃষ্টিকে মানবে? সৃষ্টির সেবা নয়, স্বার্থের সেবা। তোমরা সব নেতা সাজার জন্যে আমাদের ভাঁওতা দিচ্ছ।"

বালুঙ্গার কথা শুনে দুঃখী বললে— "যারা ভগবানের সেবা করে তাদের কি কিছু স্বার্থ থাকে না?"

বালুঙ্গার আক্কেল গুড়ুম তার বুদ্ধিতে কুলোল না। এইসময় ঘন ওর পক্ষ নিয়ে বলল, "স্বার্থ থাকে বটে তবে সে স্বার্থটা মানুষের চোখ ওপরের দিকে তোলে। মানুষকে নীচ করে না। বালুঙ্গাদার কথাটার ওজন অনেক। গীতায় নিজে ভগবান বলেছেন তাঁর ভক্ত চার প্রকার— আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। এ সবারই তো স্বার্থ রয়েছে।"

এতক্ষণে গিয়ে বালুঙ্গার মাথায় বুদ্ধি এল। "শুধু কি অর্থ বাবু? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—

চতুর্বর্গের কোনটা স্বার্থ নয়? হলেও, যা বললে ঘনবাবু, এ জাতের স্বার্থ মানুষকে দেবতা করে। ওপরে তুলে নেয়। এ স্বার্থে হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই। স্বার্থকে নিজের দেহের ভেতরে নিজে রাখলে সেই স্বার্থের জন্যে যদি তুমি সেবা কর, তা সে ভগবানেরই সেবা হোক বা তাঁর সৃষ্টির সেবা হোক, তাতে রেষারেষি বা বল কষাকষির কি দরকার? ভোট-ফোটের কি দরকার?"

দুঃখী বললে, "বালুঙ্গাদা, আমার কি মনে হয় জান? ঠাকুরের সেবা হোক বা ঠাকুরের সৃষ্টির সেবা হোক, যে নিজে ওপরে উঠতে— মুক্তি বল, মোক্ষ বল, ভক্তি বল— কিছু একটা পেতে আশা করে সে বড় গরিব। যে সবাইকে ওপরে তোলার জন্যে কাজ করে সেই একা বড়লোক।*

বালুঙ্গা — "খুব বড় একটা কথা বললে দুখীঠাকুর। তবে তার সঙ্গে মিলিয়ে বালুঙ্গা একটা কথা বলছে শোন। সংসারে সকলের ভালোর জন্যে যে কিছু করে তাকে ক্ষতি সইতে হয়। নিজের ক্ষতি না করলে অপরকে লাভ দিতে পারবে না। আর নিজের ভালো করতে বসলে অন্যের ক্ষতি হবেই হবে। এটা এ রাজ্যের কথা। সে রাজ্যে নিজের জন্যে করলে পরের জন্যে আপনা-আপনি হয়ে যায়। আপনি ভাল ত দুনিয়া ভালো। মনে রেখ এটা গুরুবচন। একটা বালুঙ্গা* বলছে বলে হেসে উড়িয়ে দিও না। আমি যাই, নাতি বেটা আবদার করেছে মৌ-শরবত খাবে। একটু মৌ দাও তো।"

বালুঙ্গা মধু নিয়ে চলে গেল। এই রকম সে এক এক সময় হঠাৎ এসে পৌঁছে যায় আর দু-কথা বলে দিয়ে চলে যায়। মুখফোড় মানুষ।

দুঃখী বললে, "ঘন এ এক আজব মানুষ। এ ধাঁচের লোক এর বাদে আর মিলবে না। এর ধাঁচায় জীবনকে ফেলে আজ আর খাপ খাওয়ানো সহজ নয়। তবু সময় সময় মনে হয় এই পুরোনো মাপের মধ্যে থেকে যেন আধুনিক জীবনের সত্য উঁকি দিচ্ছে। তাকে আবিষ্কার করতে কারো ধৈর্য নেই।"

ঘন বললে, "আমার ভয় হয় আমাদের জীবন যে নতুন মূল্যবোধ তাতে কেউ লেবেল এঁটে দিয়েছে। আর বেশি বাড়তে পারবে না। কেবল কালোবাজারি হতে পারে। সেজন্যে বাজারে তার ডিমিনিশিং রিটার্ন হয়। ধীরে ধীরে বাজারে তার দাম পড়ে যেতে পারে।"

দুঃখী — এই নতুন আর পুরোনোর মধ্যে আমাদের একটা সোজা পথ বার করতে হবে। সেটাই এ যুগের একান্ত দরকার।

ঘন — সোজা রাস্তার কথা ভুলে যা। মাটির ওপরে কোথাও কি সোজা রাস্তা থাকে? থাকে আসমানে। আমরা মাটির মানুষ। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। না হলে বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা হেরে যাব। এই আলের ওপর যত ভাঙা হাড় পড়ে আছে তাকেই জীবন্যাস দিয়ে আমাদের ভিটের ওপর দাঁড় করাতে হবে। কঙ্কালকে কথা বলাতে হবে। কিন্তু কে করবে? আমি ভয় পাচ্ছি। নদীর উজানে নৌকা ঠেলবার শক্তি আমার নেই।

---

* বালুঙ্গা — বুনো ধান (অশিক্ষিত লোক)

দুঃখী— বল সঞ্চয় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া না যেতে পারে— আদপেই না পেতে পারি। নৌকো হয়তো নড়বে না। তবুও আমরা পিছু হটব না— কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—

ঘন — কি করা যাবে তুই কিছু চিন্তা করেছিস?

দুঃখী — করেছি। আমরা যত এক চিন্তাধারার মানুষ একজোট না হলে চলবে না। দীনু, কাশীকে চিঠি লিখে আসতে বল। আমি ভাবছি এখানে আমাদের কর্মক্ষেত্র করব।

ঘন — দেখ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে আমার বিশ্বাস নেই। কেন্দ্র-টেন্দ্রর নাম শুনলেই আমি ডরাই। যেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে কেন্দ্র আর কেন্দ্র হয়ে থাকবে না। ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে যাবে। ভারতের সব রাজনৈতিক দলের অবস্থা আজ তাই।

দুঃখী — কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে কাজ শুরু করা অপরিহার্য নয়। যদি প্রতিষ্ঠান করতে হয় সেটা একটু হালকা ধরনের হবে। বিধি নিয়মের বাঁধনে বেঁধে ফেলা ঠিক হবে না। কি বলিস?

ঘন — হ্যাঁ তাই, সভাপতি-সম্পাদক কেউ থাকবে না। মঠ করে যেমন ধর্মের শঠতা বেড়েছে, দল করে তেমনি সকলে খল হয়ে উঠেছে। আমি ভাবছি আমরা সাময়িক সমস্যার দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে স্থায়ী সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করব। তার জন্যে বিধিবদ্ধ সংঘীয় অনুষ্ঠানের দরকার নেই। একটা আদর্শের ওপর কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার বদলে আমরা সমান আদর্শের কয়েকজন লোক একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করে এক পরিবারভুক্ত হয়ে থাকব।

দুঃখী হাসল। "তুই একটা রাজনৈতিক শব্দজালের ভিতরে পড়ে গেছিস। দুটো জিনিসই এক।"

ঘন বললে, "না, এক নয়। আর্দশে যাদের নিষ্ঠা থাকবে শুধু তাদের নিয়ে ভ্রাতৃমণ্ডলী গড়া হবে না। আদর্শ যাকে ছোঁবে সেও এর মধ্যে থাকতে পারবে। তাহলে আর মিথ্যাচারের জো থাকবে না। আমরা আমাদের সীমাটাকে জেনে নিলে আদর্শের পেছনে যে যতটুকু পারবে যাবে।"

দুঃখী — তাতে আর একটা ভয় আছে। যে যতটুকু পারবে ততটাই যাবে বললে অহিংসার নামে হিংসা চলবে। সমাজবাদের নামে যতসব অসামাজিক প্রাণী একজোট হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঠকাতে চেষ্টা করবে। মতান্তর থেকে মনান্তর হবে।

ঘন — আমি তা মনে করি না। আমি ভাবছি মনের মিল থেকে আরম্ভ করলে মতের মিল আপনি এসে যাবে। প্রথমে মনের মিল, তারপরে মত। মনের মিল থাকলে যদি মতের অমিল হয় কেবল কার্যক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দেখা দিতে পারে। যেমন, কোনো একটি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করার জন্যে বিভিন্ন প্রয়োগশালাতে যদি আমরা যাই, তাহলে মতের অমিল সত্ত্বেও মনের অমিল থাকার সম্ভাবনা নেই। লক্ষ্য এক কিন্তু পথ অনেক।

দুঃখী — বুঝেছি। আমার কোনো আপত্তি নেই। তাহলে আমার প্রস্তাব মতো আমার বাড়িকে আপাতত কর্মকেন্দ্র করা যাক।

ঘন — সেকথা ভেবেই আমি তোর কাছে এসেছি। গ্রামের ওপর শহরের প্রত্যক্ষ এবং

পরোক্ষ আক্রমণের একটা ভালো নমুনা তোদের এই গাঁ-টি। এখানে কতজনের ভিটে ও খেত জমি পুঁজিপতিরা একটা বড় ধানের মিল বসাবে বলে কিনে নিতে চায় বলে শুনলাম। এ খবর সত্যি?

দুঃখী — হ্যাঁ।

ঘন — এখন এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। কোনোমতেই এ গাঁয়ে মিল বসাতে দেব না।

"আন্দোলনের রূপ কি হবে?" দুঃখী জিজ্ঞেস করে।

"আমি সে-বিষয়ে কিছু চিন্তা করিনি। তুই কি ভেবেছিস বল।" ঘন আগ্রহ দেখাল।

"আমি ভাবছি আন্দোলনটা অহিংস তো নিশ্চয় হবে। কিন্তু আন্দোলনের ধারাটা বদলে দিতে হবে। যেখানে যত আন্দোলন হয়েছে, সহিংস হোক বা অহিংস হোক, যে লক্ষ্যসাধনের জন্যে আন্দোলন হয় সেই লক্ষ্যে যাদের স্বার্থ থাকে কেবল তাদেরকে নিয়েই আন্দোলন করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা একজোট হয়ে নিজের ফায়দা তোলার জন্যে আন্দোলন করে থাকে। মহাত্মাজী যে লবণ সত্যাগ্রহ করেছিলেন তার কারণ ভারতবাসী সকলে লবণকর দ্বারা উৎপীড়িত হত। আমরা তখন বিক্ষোভ করেছিলাম বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে। এখন আমাদের নিজের সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেজন্যে আমি ভাবছি অহিংস আন্দোলনকে আরও সূক্ষ্মতর করতে হবে যাতে স্বার্থের গন্ধও থাকবে না।"

ঘন ঠিক ধরতে না পেরে বলে, "স্বার্থ না থেকে আন্দোলন হবে কি করে? অবশ্য সেই স্বার্থটা ন্যায়পূর্ণ হওয়া উচিত। সত্যকে আশ্রয় করা উচিত।"

"স্বার্থ না থেকেও আন্দোলন হতে পারে। এই যেমন ধর, যাদের ভিটে-বাড়ি, জমিজমা চলে যাচ্ছে তারা যদি আন্দোলন করে সেটা ন্যায়পূর্ণ ও সত্যাশ্রয়ী হলেও স্বার্থজড়িত। তাদেরকে যদি আমরা আন্দোলন থেকে দূরে রেখে যাদের ঘর জমি যাচ্ছে না তাদের নিয়ে আন্দোলন করি তবে আমাদের সে সংগ্রাম বেশি নৈতিকবল লাভ করতে পারবে।" দুঃখী খোলসা করে।

"তুই ঠিক ভেবেছিস। আমারও একদিন এই কথাটা ভারি খটকা লেগেছিল। প্রাথমিক শিক্ষকরা যখন মাইনে বাড়ানোর জন্যে দাবি জানিয়ে ধর্মঘট করল। গুরু শিষ্যকে যা দেয় তার দাম কি কেউ দিতে পারে? যে শিক্ষকরা বাড়তি পয়সা না পেলে পড়াবে না বলে স্বর তোলে মনু তাদের একঘরে করতে মত দিয়েছেন। তারা গুরু নয়, মাইনে খাওয়া চাকর। মনু বলছেন—

ভৃত্যকাধ্যাপকো যস্য ভৃতকাধ্যাপিত স্তথা
প্রেত নির্যাতকশ্চৈব বর্জনীয় প্রযত্নতঃ।"

"আমার মনে আছে," দুঃখী বললে, "তখন কংগ্রেস সরকার ওড়িশাতে। কংগ্রেসবিরোধী নেতারা বেরিয়ে পড়ল মাস্টারদের সমর্থন করে। আমাকে ডেকেছিল তাদের সপক্ষে বলতে। আমি মানা করে দিলাম— তাদের দাবির প্রতি আমার সমর্থন থাকলেও। মাস্টাররা দাবি করল— আমাদের এত দাও, না হলে পড়াব না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বরং মূর্খ

হোক। কাল ডাক্তাররা বলবে আমাদের এত টাকা দাও, নইলে আমরা চিকিৎসা করব না। রুগীরা মরলে বরং মরুক! তাদের দেখাদেখি একদিন আবার মায়েরা একজোট হয়ে বলবে— আমাদের এত টাকার গয়না দাও, শাড়ি দাও। নইলে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াব না! বিদ্যাদানের কি প্রতিদান কখনো দেওয়া যেতে পারে? ওই মনুরই ভাষায়—

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ
পৃথিব্যাং নাস্তি তৎ দ্রব্যং যেনাস্য তুল্যমইতি।"

"ঠিক কথা", ঘন বললে। "মাস্টারদের দাবি যদি ন্যায়সংগত হয় তবে ছাত্র বা অভিভাবকরা কেন তাদের জন্যে আন্দোলন করবে না? আমাদের সংস্কৃতিতে নিজের জন্যে নিজে বলা অসুন্দর, অসৌজন্য। বিশেষত শিক্ষকরা যদি তা বলে ছেলেরা কি শিখবে?"

"তারা স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানবে না। যাদের স্বার্থে আন্দোলন হবে তারা তাতে ভাগ না নিয়ে অন্যেরা নিলে সেটা বেশি সুন্দর হবে। তাকে বলব শুদ্ধ সত্যাগ্রহ। কারণ এরকম যুদ্ধে যোদ্ধার জয়-পরাজয়ে সমজ্ঞান আপনা-আপনি এসে যায়। স্বার্থ থাকলে জেতায় সুখ ও হেরে যাওয়াতে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। না থাকলে— 'সুখিনো ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমিদৃশম্', ফলাফলে 'সুখেষু বিগতস্পৃহ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা'।"

নেচে উঠল ঘন। "রাস্তা পেয়ে গেলাম দুখী! তুই একটা নতুন রাস্তা বের করলি। ভগবান তোর মঙ্গল করুন। আমি ঝাড়গ্রাম থেকে ফেরা অবধি অন্ধকারে ঘুরছিলাম। এখন আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। তুই তো জানিস আমি কয়েকদিন 'ভূদানে' যোগ দিয়েছিলাম। আমার অর্ধেক সম্পত্তি দান করে দিয়েছি। ভূদান অনেকটা এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একতরফা। ভূমি-মালিক ভূমিহীনকে দান করে। ভূমিহীন লোকের আন্দোলন করে জমি কেড়ে আনবার পণ নেই। এতে জমিমালিকের মনের ওপর সত্যাগ্রহের কিছু প্রভাব নিশ্চয় পড়ে। কিন্তু গ্রামের অন্যদের ওপর এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে না। দাতার প্রতি ভূমিহীন মানুষের কৃতজ্ঞতার ভাবও আমি দেখিনি।

"ভূদানে দানের গৌরব আমরা একজনকে দিই— বিনোবাজীকে,— জমি মালিককে নয়। জলের জন্যে আমরা ইন্দ্রপূজা করি— বরুণের নয়। তাই 'ভূদান' দিয়ে সমাজে সামান্য আলোড়ন হল বটে কিন্তু ভূমির প্রকৃত উপযোগের জন্যে দরকারী আগ্রহ সৃষ্টি হল না। আমার মতে এককালে সমূহ মানসিক পরিবর্তনই প্রকৃত আন্দোলনের ফল। আন্দোলন নিবিড় হলে, গভীর হলে বিপ্লব আখ্যা পেয়ে থাকে।"

"তাছাড়া"— দুঃখী বললে, "দানে পাত্রাপাত্রের বিচার থাকাও উচিত।"

"শুধু পাত্র না, স্থান-কাল-পাত্র সবগুলোর বিচার থাকা বাঞ্ছনীয়," ঘন বললে। "সেইজন্যে গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দানের প্রভেদ রয়েছে।"

দুঃখী — "আমি ভাবছি ভূমিহীন লোকেরা যদি ভূমি-মালিকদের কোনো স্বার্থের জন্যে আন্দোলন করত তবে সেটা ভূমিহীন ও ভূস্বামী উভয়ের মধ্যে মানসিক বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করে দিত।"

ঘন — সেরকম হলে তো ভালোই হত কিন্তু সেটা কতদূর সম্ভব সে সম্বন্ধে আমার

সন্দেহ আছে। কারণ বহু স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ ও ভূমিহীনের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী।

দুঃখী — সেটাই তো রক্ষণশীলতার লক্ষণ। জমির মালিকানা নিয়ে আমাদের মান্ধাতা মনোবৃত্তিই এর কারণ। জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কে আশাকরি তোকে বোঝানোর দরকার নেই। ভূমির যে সেবা করে, ভূমি তার। আমরা যদি ভূমিকে মা বলে বিশ্বাস করি তাহলে যে মায়ের সেবা করছে সেই তো মায়ের সত্যিকার ছেলে। তবু যদি কেউ টাকা খাটিয়ে ভূমির ওপর তার স্বত্ব সাব্যস্ত করে, ভূমিহীন লোকের স্বার্থের সঙ্গে সব ব্যাপারে যে ওর স্বার্থের সংঘর্ষ হবে এমন কোনো কথা নেই। কতক ক্ষেত্রে উভয়ের স্বার্থের সংঘাত হবে না। যেমন ধর, পথকর। ভূম্যধিকারীরা পথকর দেয়। যার গাঁয়ে রাস্তা গেছে সেও দেয়, যার যায়নি সেও দেয়। তাছাড়া এমন অনেকে আছে যারা পথকর মোটেই দেয় না কিন্তু রাস্তাঘাটের সব সুবিধে ভোগ করে। ভূমিহীনেরা যদি আন্দোলন করত যে প্রত্যেক সাবালক মানুষ পথকর দিতে বাধ্য নইলে জমির মালিকদের কাছ থেকে পথকর আদায় করা বন্ধ হোক। তাহলে জমির মালিকদের হৃদয়ের পরিবর্তন হত। ঠিক তেমনি, ভূমি-মালিকেরা যদি আন্দোলন করত যে যারা ভূমিহীন মজুর তারাও কারখানার কুলিমজুরদের জন্যে নির্দিষ্ট সুবিধা উপভোগ করুক। ততে ভূমিহীন চাষাদের হৃদয়ে প্রভাব পড়ত। ক্রমে ভূমিহীন চাষী ও ভূমি-মালিকদের ভিতরে সৌহার্দ্য সৃষ্টি হত। সরকার আইন করে গাঁগুলোকে যেমন ভেঙে দিচ্ছে, ভূমিহীন, ভূমি-মালিক, চাষী, বর্গাদার চাষী ইত্যাদি নানা ভেদ আইনের দরুণ সৃষ্টি করছে, সেই ফাটল ধরাবার সুযোগ থাকত না। শহুরে নেতারা গাঁয়ে নানা বিভেদ সৃষ্টি করে চিরদিন শাসন করার সুবিধা পেত না।

ঘন — আরো একটা কথা ভাববার আছে। ভূ-দানে যে ভূমিহীনেরা বিনাশ্রমে জমি পেল তাদের সমাজের প্রতি কর্তব্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। শ্রমশীল লোকের দারিদ্র্য যেমন প্রাপ্য নয়। শ্রমহীন লোকের ধনে তেমনি অধিকার থাকা উচিত নয়।

দুঃখী — তুই এইসব কারণে বোধহয় ভূ-দান ছেড়ে দিলি।

ঘন — না, অন্য কারণে। দেখলাম এই আন্দোলনের প্রাধান্য ক্রমে কমে যাচ্ছে। মানুষ প্রত্যেক ব্যাপারে সরকারের মুখাপেক্ষী হচ্ছে। এমনকি ভূ-দান কর্মীরাও বিনোবার পরামর্শক্রমে নিধিমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর বেশি করে সরকারি নিধিযুক্ত হতে অপেক্ষা করে রইল। এখন সমাজের সব স্তরে সকলে সব কাজের জন্যে সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সরকার বর্তমান সমাজের সর্বময় কর্তা। আমাদের কর্তৃত্ব, কাজ করার শক্তি তথা কর্মফলের ওপর সমস্ত অধিকার সরকার আয়ত্ত করে নিয়েছে। এটাই বোধ হয় শাসনের সার্বভৌমত্বের নবতম টীকা।

দুঃখী — আমিও তাই লক্ষ্য করছি। এখন লোকের আনুকূল্যে স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি খোলার কথা একদম শোনা যায় না। আগের ন্যায় রাস্তাঘাটে কারো গাছ লাগান কিম্বা জলছত্রের জন্যে কুয়ো পুকুর আদি খোঁড়া স্বপ্ন হয়ে গেছে।

ঘন — এরকম হওয়ার ফলে ক্রমে সরকারের কাছে লোকেরা কেবল দাবি পেশ করতে শিখল কিন্তু সমাজের প্রতি তাদের কোনো কর্তব্য আছে বলে কখনো ভাবল না। ভূ-দান

দ্বারা এই দায়িত্ববোধ আমরা তৈরি করতে পারিনি, বরং দায়িত্বহীনতা বেড়ে চলেছে বলে ভয় হয়েছিল আমার।

দুঃখী — আমারও একদিন লোভ হয়েছিল ওর ভিতরে ঢুকতে। ভাবলাম, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো খুব পুরোনো সেবা প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়ে যদি অন্য কোনো সেবা-সংস্থায় যোগ দিতে হয় তবে 'ভূ-দান' কার্যক্রমই সবচেয়ে ভালো। সরকারি আশ্রয় ভিক্ষা তো আমার কাম্য নয়।

ঘন — সরকারের কাছে আশ্রয় চাওয়া পাপ নয় কিন্তু সরকারি টাকায় নিজেকে দাতা বলে প্রচার করাতে বিপদ আছে। আমার আশঙ্কা হয় তাতে আমাদের শেষে সরকারি দলের সঙ্গে এক হয়ে যেতে হবে।

দুঃখী — ওর বিপরীত গতি হওয়াও বিচিত্র নয়। ওরকম করাতে যে গৌণ মনোবৃত্তি জন্মায় তার ফলে সরকারি দলের সঙ্গে মেশার বদলে একেবারে বিরোধী শক্তির সমর্থন করার মানসিকতাও সৃষ্টি হবে।

ঘন — সে আশঙ্কা যথার্থ নাও হতে পারে। যাকগে, তাতে মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই। আমরা যে পরিকল্পনা করছি তার জন্যে তৈরি হতে হবে।

"আমি তো সবসময় প্রস্তুত।" দুঃখী বললে।

"প্রশ্নটা তোর প্রস্তুত থাকাতে নয়। সমস্যাটা হল আমার। তোর মনে থাকবে লক্ষণ নায়েকের ফাঁসিঘরের দেয়ালে রক্তে লিখে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে পণ আমার রইল না। আমার গলায় বালির কলসি— বিরাট পরিবার।" ঘনের স্বরে বিষাদ।

"তুই তো স্বাধীনতার পর বিয়ে করলি। প্রতিজ্ঞা রইল না কোথায়?"

"আমি ঠিক তাই ভেবে বিয়ে করে ফেললাম। কিন্তু আমরা কি স্বাধীন হয়েছি? স্বাধীন হয়েছে তো আমলারা, পয়সাওলা ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা। আর বলতে পার আমলা ও শিল্পপতিদের গোলাম মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারা।" ক্ষোভের সঙ্গে ঘন বললে।

দুঃখী হাসল। "আর এক শ্রেণীর লোকও কিছুটা স্বাধীন বলে বলতে পারিস। তারা হল শহরবাসী। শহরে মন্ত্রী, নেতা, শিল্পপতি এবং আমলারা থাকে। তারা মাংস খেয়ে, সুরুয়া খেয়ে যে হাড়গোড় ফেলে দেয় তাই নিয়ে শহরবাসী মশগুল। সে হাড়গোড় গাঁয়ের মানুষদের কাছে আসে না। কারণ গাঁয়ের লোকেরা হই-হল্লা করতে পারে না।"

"তাদের কথা ছাড়", ঘন বললে। "দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথা বৌদ্ধিক, পারমার্থিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্যে যারা আমাদের সহায়ক হবে তাদের কথা ভাব।"

"আর সহায়ক কে হবে? তুই যদি বালির কলসি গলায় ঝুলিয়েছিস বলে নদীতে লাফ না দিস, দীনু কাশী কি সহজে এগোবে? তারা দুজনেও তো সংসারী হয়ে গিয়েছে।" দুঃখী বললে।

"হ্যাঁ, বিরাট বোঝা তাদেরও ঘাড়ে। তবে কাজ করবে কে?"

ঘরের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল শুকুরা, "কেন, শুক্রসেন আছে!"

দুঃখী বলল, "তুইও তো বিয়ে থা করা।"

"বিয়ে করেছি তো কি হয়েছে? আমার বউ কি আমার গলায় বালির কলসি? আমি মরলে বা জেলে গেলে সে কি তোমাদের ধোপদুরস্ত ভদ্দর লোকের মতো উপোস করে মরবে? যে খেটে খেতে শিখেছে তার মাথায় কিসের ভাবনা? মানুষের ঘামের সঙ্গে সব ময়লা ধুয়ে যায়, আলসেমিও।"

শুকুরার কথায় সকলে হাসল। ঘন জিজ্ঞেস করল— "দুখী, দীনবন্ধু তো অনেকদিন অবিবাহিত ছিল। বিয়ে করল কবে?"

"অনেকদিন পরোপকার করার পর। সে এক লম্বা গল্প। দীনু আদিমানব কল্যাণ সমিতির সভ্য হল, আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করে খুব প্রশংসা পেল। একবার দীনুর কাছে গেলাম দেখতে সে কি করছে। খুব ভালো লাগল। ইচ্ছে হল দীনুর সঙ্গে মিলে কাজ করতে। আহা, সেই পাহাড় জঙ্গল আমার মনকে এমন বেঁধেছিল, সেই ঝরণার জল আমায় আনন্দে এমন ডুবিয়েছিল— আমি আজও সে জায়গার স্বপ্ন দেখি।"

"তুই তাহলে ওই আদিমানব সমিতির সভ্য হয়েছিলি!"

"না, হইনি। তারা আশা করেছিল। আমি মানা করে দিলাম।"

"কেন, মানা করলি কেন?" জিজ্ঞেস করল ঘন।

দুঃখী বললে, "এক -আধ দিন নয়, দু-দু বছর আমি সেখানে কাটিয়েছিলাম। আমার মনে হল, সব পণ্ডশ্রম। দেখলাম আমাদের কাজের দ্বারা আদিবাসীদের কিছু লাভ হয়নি। তাদের স্বভাবচরিত্রের সরলতা আমায় তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। মনে হল তারা সব এক একটি ঠাকুর। তাদের সেবা করার যোগ্য আমি নই। যে কাজ করে মনে সন্তোষ হয় না, সে কাজে লেগে থাকা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা বা অন্যদের ঠকানো ছাড়া আর কিছু নয়।"

"আজ পর্যন্ত আদিবাসী উন্নয়নের জন্যে যতসব কাজ হয়েছে সরকারের দ্বারা হোক বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা হোক— সব পণ্ডশ্রম?"

"পণ্ডশ্রম বললে বরং ওগুলোকে মর্যাদা দেওয়া হয়। কারণ শ্রম পণ্ড হলে লাভ হোক না হোক ক্ষতি কিছু হয়নি বলে ধরতে হয়। কিন্তু আমার মতে সরকারের সমস্ত যোজনা আদিবাসীদের মঙ্গল না করে অমঙ্গলই করেছে বেশি।"

"আমি কিন্তু তোর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কিছু না হোক শিক্ষার প্রসার তো হয়েছে?" বললে ঘন।

"কি শিক্ষা? তাকে কি শিক্ষা বলে? যে শিক্ষা আমাদের সবাইকে পঙ্গু অকর্মণ্য করে দিয়েছে সেই শিক্ষা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলব যে আমরা তাদের উপকার করলাম। তাছাড়া নিজের সংস্কৃতি ভুলে যে ইংরেজি সংস্কৃতিকে নিয়ে তাদের সংস্কার চালিয়েছি তার দ্বারা তারা গোলামের গোলাম হবে শুধু। স্বাধীন মানব বলে আর অভিমান করতে পারবে না। তাদের নিজেদেরও তো একটা সংস্কৃতি আছে। সে সংস্কৃতি বোঝার শক্তি আমাদের নেই। কারণ আমাদের সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের রঙে রাঙানো। আদিবাসীদের শিক্ষিত সংস্কৃত

করার ইচ্ছে নিয়ে তাদের সেবা করতে যাওয়া মূর্খতা। কারণ তাতে আমরা তাদের কোনো সংস্কৃতি না দিয়ে কেবল আমাদের দুষ্ট প্রকৃতিটাকে তাদের ওপর চাপিয়ে দিই।"

"চাপালে ক্ষতি কিসের? কাপড় না পরা তাদের স্বভাব, কাপড় পরা আমাদের। তাদের কাপড় পরতে শেখালে কি ভুল হবে?"

"হ্যাঁ, ভুল হবে।" উত্তর দেয় দুঃখী।

"তারা কি চিরদিন অসভ্য হয়ে থাকবে নাকি?" ঘন বলে।

"না, কাপড় পরতে শিখুক ক্ষতি নেই কিন্তু আমরা যেমন কাপড় পরাতে নতুন ফ্যাশন আঁকড়ে যৌন-সচেতন হয়ে যাচ্ছি। সেই স্বভাবকে যদি তাদের স্বভাবের ভিতরে কলম করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে আমার ভয় হয় আমাদের দেশের একটা আদিম সভ্যতা লোপ পেয়ে যাবে।"

"তুই কি বলতে চাস, তারা কেবল সংগ্রহালয়ের প্রদর্শনী থাকবে?" জিজ্ঞেস করে ঘন।

"না, তা বলি না," দুঃখী উত্তর দেয়। "আমাদের সভ্যতাটা কি? ভদ্র পোশাকটাই কি আমাদের সভ্যতা? তার ভিতরে চুরি, জালজোচ্চুরি, যত দুর্নীতি দুশ্চরিত্রতা থাকলেও ভদ্র পোশাকের আড়ালে সব লুকিয়ে থাকে। একটি সাধু সচ্চরিত্র লোক যদি গরিব হয় সমাজে সে ঘৃণ্য। আমরা সেই সভ্যতাকে সেই সংস্কৃতিকে নিয়ে তাদের উপর চাপালে তাদের কি লাভ হল?"

ঘন বললে, "প্রত্যেক সভ্যতার ভালো-মন্দ উভয় দিক থাকে।"

দুঃখী বলে, "মানছি। কিন্তু মন্দটাকেই মানুষ সহজে আপনার করে। আমরা স্বধর্ম ভুলে কি পরধর্মকে গ্রহণ করতে পেরেছি? পরধর্মের আবর্জনাটাকেই রেখেছি। সেজন্যে আমরা ভৌতিক উন্নতিকে মানবিক বিকাশের মানদণ্ড বলে ধরে নিই।"

"মানুষের একান্ত আবশ্যকতার মাত্রা কোথায় শেষ হয়েছে বলতে পারিস? কাল যেটা আড়ম্বর বলে মনে করা হত। আজ তাকে একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম— এগুলো চিরদিন ক্রমবর্ধনশীল। নির্দয়ভাবে এর গতিরোধ না করলে মানুষের জীবন কেবল ভৌতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরে থাকবে। আজ আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি তার প্রভাব সরল আদিবাসীর জীবনে দেখা দিয়েছে। বাহ্য আড়ম্বরের দিকে তাদের আকর্ষণ বেড়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আড়ম্বরপ্রিয় সমাজ থেকে তারা শঠতা, মিথ্যা, ঈর্ষা, কলহ, স্বার্থপরতা বেশ শিখে ফেলেছে। নৈতিকতার নতুন মূল্যবোধ বুঝতে শিখেছে। এসব সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে সমকক্ষ হওয়ার জন্যে এরা যদি বর্তমান গতিতে এগোয়, অন্তত আরো দুশো বছর লেগে যাবে। এই সময়ের মধ্যে তারা তথাকথিত আর্যদের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। কারণ আড়ম্বর উপভোগে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যে তারা আমাদের উপর নির্ভর করবে। ভৌতিক উন্নতিকে উন্নতির মানদণ্ড বলে ধরে নিয়ে জীবনটা শুধু সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবার জন্যে উদ্দিষ্ট বলে বিচার করাতে এখন আমাদের অবস্থা কি হয়েছে? ভৌতিক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া কারো না কারো ছত্রছায়ায় থাকতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। স্বাধীনতার পরে ছিলাম ইংল্যাণ্ডের কৃপাপ্রার্থী। তারপর হলাম আমেরিকার কাছে ভিক্ষার্থী। এখন হয়েছি

রুশের তাঁবেদার। তারপরে যে চীন বা জাপানের পোষা কুকুর হয়ে থাকব না একথা কে বলবে?"

"আমার কিন্তু মনে হয় তারা আমাদের গোলাম না হয়ে বরং আমাদের ঈর্ষা করবে। ফলে তারা স্বতন্ত্র রাজ্যও দাবি করতে পারে।" ঘন বললে।

"অসম্ভব নয়। তবে ঈর্ষা হীন মনোবৃত্তি থেকেই আসে। গৌণ বা হীন মনোভাব জাতির পক্ষে বড় মারাত্মক। ইংরেজদের সামনে সেই হীন মনোবৃত্তিই আমাদের এই অধোগতি এনে দিয়েছে। যা-কিছু তাদের সব ভালো আর আমাদের যা-কিছু আছে সব খারাপ এই রকম হীনমন্যতা আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্ষয় বা ব্যাধিগ্রস্ত করে ফেলেছে। প্রতি কথায় আমরা ইংরেজদের তুলনা দিই। তাদের শেকস্‌পীয়ার ইংল্যাণ্ডের কালিদাস নয়, আমাদের কালিদাস ভারতীয় শেকস্‌পীয়ার! আমার দেশের বিবেকানন্দ সে-দেশ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর স্বামীজী হলেন। আমাদের রবি ঠাকুর সে-দেশ থেকে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে কবিগুরু আখ্যা পেলেন। আদিবাসীদের ওই রোগ ধরতে শুরু করেছে। তাদের যা আছে তাকে খারাপ মনে করে আমাদের একেবারে অনুকরণ করতে চেষ্টা করছে।"

"তারা বিদেশী পাদ্রীদের অনুকরণ না করে আমাদের কেন অনুকরণ করছে?" ঘন জিজ্ঞেস করল।

"আমরা তো পাদ্রীদের অনুকরণ করছি। নকল করা লোকের কাছ থেকে নকল শেখা সহজ। যেমন ইংরেজের কাছ থেকে ইংরেজি শেখার চাইতে ইংরেজি-পড়া ওড়িয়ার কাছ থেকে শেখা সহজ। ভ্রষ্টাচারী থেকে ভ্রষ্টাচার শেখা যত সহজ হয় ভ্রষ্টাচারী সাহিত্য পড়ে ভ্রষ্টাচারী হওয়া তত সহজ নয়। যাকগে, খাওয়ার সময় হয়েছে।" দুঃখী উঠে দাঁড়ায়।

সেদিন সকালে রাধাগোবিন্দবাবু এলেন। ঘন ছিল, শুকুরাও ছিল। দীনবন্ধু এসে পৌঁছোয়নি। ঘন, দুঃখী বসে কি-সব কথা বলছিল, দূর থেকে গলা শোনা গেল— 'দুখী আছ নাকি, ও দুখীশ্যাম! কি করছ বাবা?"

দুঃখী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এল, চেয়ার দিল বসতে। দু-একটা ভাঙাচোরা চেয়ার থাকে দুঃখীর বাড়িতে। ভদ্রলোক এলে বসতে দেয়। সে নিজে বসে মাদুরে।

প্রথমে চিনিয়ে দিল ঘনকে। জেলের সাথী। গান্ধী-গোল সময়ের। অনেকদিন একই আশ্রমে ছিল, একসঙ্গে কাজ করত। এক জায়গায় নুন তৈরি করত। তারপর দুজনে অ্যারেস্ট হল। জেলে রইল একসঙ্গে। "আর এ হল শুকুরা। চিনতে পারছেন তো?"

"শুকুরা? কোন শুকুরা? কলকেতিয়া শুকুরা?" রাধাগোবিন্দ বললেন।

"হ্যাঁ, সেই। কুড়ি বছর বাদে বাড়ি ফিরেছে," দুঃখী বলল।

"বাড়ি আর কই? ছেলেটি তো মারা গেল। দুর্ভিক্ষে। যুদ্ধ খেয়ে ফেলল হে যুদ্ধ! আমাদের সরকার ধান-চাল সব বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। দর বাড়িয়ে দিলেন। লোকেরা কিনে খেতে পারে না। শুঁয়ে শয়ে মানুষ পথেঘাটে পড়ে মরল। যাকে বলে দুর্ভিক্ষ। যার যা গেল গেল, শুকুরার তো বংশ লোপ পেল। সব শুনেছি। তুমি দুখী একটা ভালো কাজ করলে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলে।"

শুকুরা প্রণাম করল। "হ্যাঁ, কর্তা, যা হবার তো হয়েছে। আর কি বয়েস আছে? এখন অন্তত আপনারা সহায় হতেন যদি। মাথা গোঁজার ঘর একখানা বানাতাম।"

"আমাদের দিনকাল কি আর ভালো যাচ্ছে রে শুকুরা?" রাধাগোবিন্দ বললেন।

"এসব কি হয়ে গেল কর্তা?" শুকুরা বললে। "দুখীননা জেলে গেল, লাঠি খেল। ধনী মাস্টার পুলিশের গুলিতে মলো। আপনারা সরকারকে সাহায্য করলেন। কোনোটাতে যদি ফল কিছু মিলত!"

"কি বললি, কি বললি? আমরা সরকারকে সাহায্য করলাম?" রাধাগোবিন্দবাবু তেতে উঠলেন, "এটা কি ঠিক কথা বলছে শুকুরা? ওহে দুখী তুমি বল না? আমরা কি ভুল করলাম? তোমরা তো ইংরেজদের সঙ্গে লড়লে। লড়তে লড়তে জমিদারদের মাথায় ঘা দিলে কেন? তারা কি তোমাদের পাঁচ-পঁচিশ খেয়েছিল? জমিদাররা অত্যাচারী! শোরগোল তুললে মার মার কেষ্টাকে মার। আমরা তো আবার আত্মরক্ষা করব? হলাম না হয় আমরা অত্যাচারী। এখন তো জমিদার সব গেছেন। মদন পটনায়েক মারা গেছেন। রাধাগোবিন্দ যেতে বসেছেন। সামলাও এবার বিশ্বজিৎ পটনায়েককে। এই রক্ত থেকে না অন্য কোত্থেকে? যতকিছুই কর, আমাদের চৌকি বজায় থাকবে। সব কালে থাকবে। জমিদার হয়ে চৌকির ওপর বসতাম। না হয় নাই হল জমিদার হওয়া। আমাদেরই ছেলে নাতি হাকিম হয়ে আবার চৌকিতে বসছে। আমাদের আসনের নড়চড় হবে না তোমরা যতই চেঁচামেচি কর। জেলে গেলে, লাঠি খেলে, মরলে কার জন্যে? এই বুদ্ধিমান আমরা, যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাদেরই জন্যে। আমাদের চেয়ে বড়সড় যারা তাদের জন্যে। তোমরা যত গরিবগুরবো কিষ্কিন্ধ্যাবাসী তোমাদের অযোধ্যাতে অধিকার নেই। রাম রাজা হলে তোমাদের কিছু আসে যায় না।"

ঘন বললে, "আজ্ঞে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি আর থাকবে? বলছে সমাজবাদে নাকি দুটো শ্রেণী থাকবে। যাদের আছে আর যাদের নেই মানে ধনী আর দরিদ্র।"

"যা বলেছ", বললেন রাধাগোবিন্দ। "গাঁয়ে মধ্যবিত্ত বলে আর কেউ থাকবে না। সরকার ভাগচাষী আইন করেছে। যে বখরায় চাষ করল জমি তার। লাঙল যার জমি তার। ভালো কথা। এখন বল যার কল তার কর না কেন? কারখানা মজুরদের না হয়ে মালিকদের কেন হবে? কি হে বাবু? কি যেন নাম— ঘনবাবু। বলত, শহরে যে ভাড়া ঘরে থাকে সেই ঘর ভাড়াটিয়াদের বলে আইন কর না কেন? শহরবাসীদের সাত খুন মাপ। পণ্ডিতের ছেলে বাঁদর মারলে দোষ নেই। শহরের লোকেরা মন্ত্রীদের বাহুচ্ছায়ার তলায় থাকে। তারা গোলমাল করবে— ভোটের সময় আছে না? ভূ-সংস্কার ভূ-সংস্কার বলে গাঁগুলোকে ফাটিয়ে দিলে। যার কুড়ি একরের বেশি আছে তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। ভালো কথা। যার বেশি আছে তার কাছ থেকে নিয়ে যার কম আছে তাকে দিলে কেন? যাকে দিলে, সেই বা কই রাখতে পারল? গাঁয়ে দারিদ্র্য বন্টন হয়ে গেল।"

শুকুরা বললে, "আজ্ঞে, যার দশ বা কুড়ি একর আছে সে তো বড়লোক। দরিদ্র কেন হবে?"

"কি বললি? কলকাতায় থেকে এই বুদ্ধি শিখেছিস? কলকাতায় এত বড় বড় সব

কোঠা বাড়ি নজরে পড়েনি? হ্যাঁরে শুকুরা, কুড়ি একর জমির দাম কত রে?"

"আজ্ঞে, কত আর? এই কুড়ি হাজার"— ঘন বললে।

"দু ফসলি ভালো জমি দু-তিন হাজার টাকা একর হতে পারে।"

"হল না হয় পঞ্চাশ-ষাট হাজার, এক লক্ষই হোক। শহরে যার একলক্ষ টাকার বেশি সম্পত্তি আছে কেড়ে নিচ্ছে না কেন? দেখি কোন বেটার সাহস আছে! মারবি তো মার নাপিতের বেটাকে। শান্ত গাইয়ের বাছুর মরে! সব মার এই গাঁয়ের মানুষদের ওপরে। আমরা অক্ষম বলে। আরে বাপু, আমরা তো বেশ ছিলাম। জমিদারে প্রজাতে বাপ-বেটার সম্বন্ধ। তোমার দুঃখ আমার, আমার দুঃখ তোমার, এমনি চলছিল। এখন তো কেউ কারো নয়।"

শুকুরা বললে, "যাই হোক কর্তা, আর কি জমিদারি ফিরবে? সে কথা আর ভাবেন কেন?"

রাধাগোবিন্দ বললেন, "হ্যাঁরে বাপ, ওই জমিদার তোমার চোখের সামনে ভাসছে। দশ একর কুড়ি একর জমিওলাকে তোমরা দু-চোখে দেখতে পার না। শত্রু থাকে মায়ের পেটে। গ্রামবাসীর শত্রু এই গ্রামবাসী। বুঝলে বাপ। আর আমাদের পোষণকারী বসে আছেন শহরে। আমাদের প্রভু। আমাদের ভগবান।"

ওদিক থেকে এল বালুঙ্গা। "পেন্নাম কর্তা, পেন্নাম। কর্তা কি বলছিলেন?"

"আমি নই, এই শুকুরা", রাধাগোবিন্দ বললেন। "বলছে আমার কেন দশ একর থাকবে, ওর কেন থাকবে না। বললাম হ্যাঁরে, তুই তো কলকাতা ঘুরে এলি, সেখানে কোটিপতিদের ধন তোর চোখে পড়ল না?"

"তা কি করে পড়বে? ঈর্ষা হল আরশোলা পাখি। সে বেশিদূর উড়তে পারে না। গাঁয়ে কি শাকখেকোকে ফ্যানখেকো দেখতে পারে? আমাদের কংগ্রেস সরকার সেটা ভালো বোঝেন। তাই চুরমার করে দিলেন গাঁকে। ভূ-সংস্কার ভাগচাষ সব আইন এই গাঁগুলোকে ভাঙার জন্যে। আজ্ঞে কর্তা হুজুরের দশ একর জমি, জমি থেকে আমদানী কত? আর আইন করছেন যে মন্ত্রী আর হাকিম তাদের মাইনে ও পাওনা মিলে কত? কি গো দুখীননা, বড় চুপ মেরে বসে আছ যে?" বালুঙ্গা বললে।

ঘন বললে, "মন্ত্রীর মাইনে এক হাজার। মুখ্যমন্ত্রীর দেড় হাজার।"

"আর বড় হাকিমদের?"

"দু হাজার তিন হাজার।"

"আর রাজ্যপালের?"

"পাঁচ হাজার।"

"আর রাষ্ট্রপতির?"

"দশ হাজার।"

রাধাগোবিন্দ বললেন, "এটা তো মাসে। বছরে কত হল? দশ-বিশ একর জমি থেকে ততটা আয় হবে তো?"

"কোত্থেকে হবে?" বালুঙ্গা বললে, "এ সব আমাদের নেতাদের ফন্দি। একদল গরিব না হলে বড়লোকদের বড়মানুষী থাকে কি করে? আজ্ঞে, আমি যখন বলি ইংরেজ সরকার ছিল খুব ভালো ছিল, দুখীননা আমায় মারতে আসে।"

"আহা, কথা একটা বললি বটে রে বালুঙ্গা। তোর একশ বছর পরমায়ু হোক। ওহে, আমরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতাম বলে চেঁচালে, জমিদারি তো উঠে গেল। জিজ্ঞেস কর তো ওই প্রজাদের অত্যাচারী কে? আমরা না তোমাদের কংগ্রেস সরকার? জমি জমিদারি কেড়ে নিয়ে তোমরা কোন বড়লোক হয়ে গেলে? হ্যাঁ রে বালুঙ্গা, তোদের কি লাভ হল? বড়লোক কে হল? খেটে খাওয়া গাঁয়ের প্রজা না শহরের বসে খাওয়া হাকিম হুকুম মন্ত্রী এম.এল.এ. ব্যবসায়ী ঠিকাদারের দল?"

দুঃখী, ঘন ততক্ষণে বড় অস্বস্তি বোধ করছে। আশি বছরের এই বুড়োর বাচালতা বাড়ছে। কটু তবু উপভোগ্য। অনেককালের সঞ্চিত ক্রোধ— আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ। দুঃখীর অজানা নয় রাধাগোবিন্দের এই ধরনের আক্ষেপ। যুক্তিগুলো কাটতে না পারলেও দুজনে তাঁর সঙ্গে একমত হতেও মন সায় দিচ্ছিল না। তবু উভয়ের মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হল একটি শুভলক্ষণ দেখে। তারা ভাবল ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত।

দুঃখী জিজ্ঞেস করল, "কর্তামশায়ের এত সকালে গরিবের কুঁড়েতে পায়ের ধুলো পড়ল কেন?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন রাধাগোবিন্দ। "আমি আজ তোমার কাছে আমার দুঃখের কথা বলতে এসেছি দুখী।"

"আমি কি কিছু করতে পারি?"

"তুমি সৎ ও সাধু। তোমার কাছে মন খুলে বললে মনটা একটু হালকা হবে।" রাধাগোবিন্দ বললেন।

বালুঙ্গা বললে, "সে-কথা আর বলেন কেন কর্তা! জমিদারি গেল, ভাগচাষীরা জমি দখল করে বসল। আচ্ছা, বেদখল করতে পারেননি কাউকে?"

রাধাগোবিন্দ — "করব কেমন করে? মোকদ্দমা করব পয়সা কই? দু-চারবার কোটকাছারি গেলাম। সেখানকার কারবার আমার পোষাল না। বাপঠাকুর্দার আমল থেকে কোটকাছারি মাড়াইনি, মহানদীর জল খাইনি। দেখলাম ভাগচাষীরা জমি একতিয়ার করে ভোগ করবে সে বরং ভালো, কোর্টের আশ্রয় নেওয়া বেকুবি। এক একটা মামলা আট-দশ বছর লেগে যায়। পিওন চাপরাসী থেকে কেরানী হাকিম পর্যন্ত কারো পাওনার ছাড়ান নেই। উকিলগুলো সব থেকে বেশি ধাপ্পাবাজ, দুদিক থেকে মেরে বসে যায়। তারাই আবার হয় জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। ওই তেলা মাথায় তেল দেওয়ার চেয়ে ধুলো মাথায় তেল দেওয়া বরং ভালো। যত জোরজুলুম করে খেলেও পাড়াপড়শি তো বটে। খেলে খাক, পর কেন খাবে? শহুরে লোকদের কেন দেব?"

বালুঙ্গা — "সেকথা গাঁয়ের লোক কি কেউ বুঝল? আপনার হেনস্থা দেখে লোকেরা খুশি। টিটকিরি দেয়, হাসে। আমি কি দেখি না?"

শুকুরা — "আপনার দেবোত্তর সম্পত্তি কি হল কর্তা?"

"সে আর কি বলব। তাকে তো সরকার নিয়ে যেতে বসেছেন।"

"সরকার নিয়ে নেবেন? সে কি কথা?" আশ্চর্য হয় বালুঙ্গা।

"তাই তো কথা। তুমিই বল ঠাকুর কার? সম্পত্তি কার? সরকারের চোদ্দপুরুষের না আমার চোদ্দপুরুষের?"

বালুঙ্গা বললে, "আজ্ঞে কে না জানে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনার পূর্বপুরুষ। জমি দান-বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। আমি বাবার কাছে শুনেছি। আপনাকে নিয়ে সাতপুরুষ হল। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃত্তিবাস পটনায়েক। বিগ্রহ এনে বসিয়েছিলেন বৃন্দাবন থেকে।"

পূর্বপুরুষের নাম শুনে রাধাগোবিন্দ উৎসাহে চেয়ার ছেড়ে ধপ করে নীচে বসে পড়লেন আসন জমিয়ে। বললেন, "শাবাশ বালুঙ্গা, শাবাশ। সত্যি কথায় মারপ্যাঁচ নেই। ঠিকই বলেছিস। কৃত্তিবাস পটনায়েক পায়ে হেঁটে গিয়ে বৃন্দাবন থেকে বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। সম্পত্তি আলাদা নিয়োগ করে দিলেন।......একশ বিশ একর জমি শ্রী শ্রী রাসবিহারী জীউসের সেবাপূজার জন্যে দেবোত্তর লাখরাজ বাহেল দান করে লিখে দিয়েছিলেন যে 'যাবৎ চন্দ্রার্কে ইহা ইস্তমুরারি হইয়া থাকিবে'....."

বালুঙ্গা বললে, "আজ্ঞে, বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, বুড়ো কৃত্তিবাস পটনায়েককে স্বপ্নাদেশ হয়েছিল শ্রী রাসবিহারী জীউ মহাপ্রভুর যে 'আমি বৃন্দাবন মথুরা রাস্তার ধারে নিমগাছের তলায় পড়ে আছি। আমাকে তুলে নিয়ে আমার সেবাপূজার বিধান কর। বুড়ো পটনায়েক কর্তা অনেক খুঁজে খুঁজে শেষে স্বপ্নে দেখা মাফিক বিগ্রহ পেলেন। এ মানুষের তৈরি প্রতিমা নয় আজ্ঞে। সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ। বুড়ো দেউল গড়িয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন। কম পুণ্য করেননি কৃত্তিবাস কর্তা। ভাগবতে বলেছে—

যে মোরে দেয় সুভবন হেলায় লভে ত্রিভুবন॥
মোরে মণ্ডপে স্থাপে যবে প্রতিষ্ঠা করে প্রিয়ভাবে॥
সপত দীপে হয় রাজা আমারি ন্যায় লভে পূজা॥
যে মোরে পূজে এ সংসারে সে ব্রহ্মলোক ভোগ করে॥"

রাধাগোবিন্দ বললেন, "পুণ্য তো তিনি করে গেলেন। আমরা পূর্বজন্মে কি পাপ করেছিলাম যে হেনস্থা হচ্ছে এত।"

বালুঙ্গা বললে, "পাপ আপনার কেন হবে? পাপ এই সরকারের। যারা নেতা হয়ে মন্ত্রী হয়ে আইনের বলে দেবস্ব অপহরণ করছে। কৃষ্ণ বললেন—

শুন উদ্ধব কহঁ তোরে যে প্রাণী জন্মে এ সংসারে॥
স্বদত্ত পরদত্ত বৃত্তি অজ্ঞানে হরয়ে কুমতি॥
দেব ব্রাহ্মণ পায় শোক সে কোথা রবে নরলোক॥
জীবন অন্তে কুম্ভীপাকে পড়ে সে বিষ্ঠা কৃমি নর্কে॥
কেবল নরক আহার লক্ষ বৎসর ঘটে তার॥

এরা নরকে যাবে, নরকে। পরদত্তবৃত্তি, দেবতা ব্রাহ্মণ সম্পত্তি যারা হরণ করছে। ভাগবতে বলেছে সে কি মিছে হবে?"

ঘন বললে, "সরকার সম্পত্তি কি খেয়ে ফেললেন? ঠাকুরের সম্পত্তি মহান্তরা অব্যাজে উড়িয়ে দেয়। সেই জন্যে সরকার আইন করে ভালোভাবে চালাবার জন্যে হাতে নিচ্ছেন।"

"ভালোভাবে চালানো?"রাধাগোবিন্দ বললেন, "দেখগে যাও, সরকার যেটা নিয়েছেন সেখানে ঠাকুরের কাছে তুলসীপাতাটিও লাগে কি না। ঠাকুর সম্পত্তি এখন কমিশনারের খাসমাহাল। ইন্সপেকটাররা ঠাকুর খেয়ে ঠাকুরের আস্থানটিও হজম করে ফেলেছে। মহান্তরা উড়িয়ে দিত কিন্তু ভগবানের নাম করত। এখন যে ইংরেজি পড়া মহান্তরা এলেন— কমিশনার, অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার, এরা সবাই তো প্যান্ট হাওয়াই পরে খালি হাওয়াতে ওড়ে। ঠাকুরদেবতা মানে এরা? আমার বলার কথা, ঠাকুর-সম্পত্তি না হয় সর্বসাধারণের। ঠাকুর কি করে সর্বসাধারণ হলেন? সাতপুরুষের ঠাকুর আমার রাসবিহারী জীউ। তুমি এক কলমের খোঁচায় সর্বসাধারণ করে দিলে? রাসবিহারীর ওপরে আমার যে মমতা সেটা কি সর্বসাধারণের হবে?"

"আজ্ঞে ঠাকুর তো সকলের। তিনি সর্বঘটে থাকেন।" ঘন বললে। "বরং দেবোত্তর সম্পত্তিটা আপনার পূর্বপুরুষ যুগিয়েছেন। তাতে আপনার দাবি থাকতে পারে। ঠাকুর কি কখনো একজনের হতে পারেন?"

বালুঙ্গা বললে, "ওহে বাবুমশায়, তুমিও ইঞ্জিরি পড়া বোধহয়। তা না হলে এমন কথা বলতে?"

"বল তো বালুঙ্গা। এ ছোকরা বলে কি? ঠাকুর সকলের? বললেই হল, হুঁ!"

বালুঙ্গা বললে, "হ্যাঁ হে ঘনবাবু, একটা কথার জবাব দাও ত দেখি। গ্রামদেবতা আছেন। তিনি আমার না সকলের?"

"সকলের", ঘন উত্তর দিল,"আমি তো তাই বলছি।"

"গ্রামদেবতা সকলের হল বলে আমার পূজার সামগ্রী, আমার শালগ্রামও সকলের? যা আমার স্ত্রীকেও ছুঁতে দিই না। সে কেমন করে আর কারো হবে?"

"বল তো, বল তো রে বালুঙ্গা। আমি যে ঠাকুরকে পুজো করি সে সর্বসাধারণের কি করে হবে? এই ঠাকুর সকলের আবার এই ঠাকুরই একজনার। গীতা বললেন, 'সে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ স্তথৈব ভজাম্যহম। মন নিয়ে ঠাকুর।"

বালুঙ্গা — "তা নয় তো কি? পরব্রহ্ম ত নিরাকার। তাকে তো মানুষে আবার আকার দিয়েছে। নিরাকার আবার আকার হবে কি করে যে? ভক্তের মন নিয়ে সেই নিরাপত্তা সাকার হন।"

রাধাগোবিন্দ — "যা বলেছিস বালুঙ্গা। আজকালকার ছেলেরা এসব বুঝবে কোত্থেকে? একটি হল তত্ত্ব আর একটি প্রকাশ। দুটো আলাদা আবার এক। ভক্ত এক, ভাব দুই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভগবান কখনো একজনের হন, কখনো সকলের।"

দুঃখী বললে, "আজ্ঞে, আমার মনে হয় আজকাল যে আইন হয়েছে, তাতে ঠাকুরকে পাবলিক করা বরং ভালো। আমি শুনলাম আপনি প্রাইভেট করার জন্যে এণ্ডাওমেন্ট কমিশনারের সঙ্গে লড়ছেন। মিছে পাথরে মাথা ঠোকা। যে ভূ-সংস্কার আইন হয়েছে তাতে প্রাইভেট ঠাকুরকে ঠাকুর বলে স্বীকার করা হয়নি। বউ ছেলেমেয়েদের থেকেও আইনের চোখে হীন হয়েছেন ঠাকুর দেবতা। নাবালক ছেলে, বিধবা স্ত্রীলোক জমি বখরায় চাষ করাতে পারবে, ঘরোয়া ঠাকুর কিন্তু পারবেন না।"

রাধাগোবিন্দ — "আমি সেকথা অনেক ভেবেছি। দেবোত্তর বিভাগ যে-সব ঠাকুর সর্বসাধারণ করে দিয়েছেন তাঁদের অবস্থা কুকুরের চেয়েও হীন। আমি বেঁচে থাকতে রাসবিহারীর এমন হেনস্থা হবে। আমার কি সইবে দুঃখী?"

ঘন হেসে হেসে বললে, "আমি একটা কথা বলব করবেন? সব মহান্তরা মিলে ঠাকুর সম্পত্তিগুলোকে সরকারের হাতে তুলে দিন। সেবাপূজার জন্যে সে যা দেবে দিক নইলে ভিক্ষে করে সেবাপূজা চালান। সরকার অসুবিধায় পড়ে যাবেন।"

"সে কথা কেউ করবে না।" দুঃখী বললে।

"তার মানে সম্পত্তির ওপর লোভ আছে। সম্পত্তি আগে, ঠাকুর পরে।" ঘন বললে।

"হতে পারে। তবে ঠাকুর ও ঠাকুর সম্পত্তিকে একটা প্রতিষ্ঠান বলে ধরতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ছিল। সেইজন্যে মন্দির তৈরি করত। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করত। সম্পত্তি দান করত। এই মন্দিরগুলো তার সাক্ষী। এখন আর সে রকম অনুষ্ঠান কি কেউ করে? সম্পত্তি আছে, দানধর্ম নেই। ঠাকুর আর সম্পত্তিকে আলাদা আলাদা করে দিলে যা হয় তাই।"

ঘন বললে— "শুধু কি ঠাকুরের জন্যে সম্পত্তি রেখে দিলে দান হয়, আর কোনটাতে নয়? মঠ বা মন্দির না হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো করে লোকে। সে কি সরস্বতীর মন্দির নয়? সে দানের মাহাত্ম্য নেই? দানের রীতি বদলে যাচ্ছে। উপলক্ষ ভিন্ন। কিন্তু দান বন্ধ হয়নি।"

রাধাগোবিন্দ বললেন— "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি সরস্বতীর মন্দির হয়ে আর আছে? যত চোর-জোচ্চোরের আড্ডা। আমেরিকা দেয় গুঁড়োদুধ ছেলেমেয়েদের জন্যে। সেগুলো চোরাইতে বিক্রি করে পয়সা মারে। আমাদের ছেলেরা তাই শিখছে। ওটাই আদর্শ হয়েছে।"

বালুঙ্গা বললে— "আজ্ঞে যে ঘুষ দেওয়া হয় মন্ত্রীর পার্টি আর অফিসারদের পেট পুষতে তাকেও বলে দান। সেই দান না দিলে ইস্কুলের মঞ্জুরি মেলে না।"

"ঠিক বলেছিস বাপ, ঠিক বলেছিস," বললেন রাধাগোবিন্দ। এই রাজনৈতিক দলের নেতারা যতরকম ঠকিয়ে চাঁদা তুলে খায়, হিসেব করে দেখলে মহান্তদের খাওয়া সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মতো মনে হবে। নেতাদের মতো মন্ত্রীদের মতো জুয়াচুরি ব্যভিচার কখনো কোনো মহান্ত হয়তো করেনি।"

রাধাগোবিন্দকে শান্ত করার জন্যে দুঃখী কথা ঘুরিয়ে বললে, "আপনি বুঝি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলেন?"

"আর বেশি কি বলব বাবা? সবই তো শুনেছ," রাধাগোবিন্দ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বলছিলাম কি আমাকে এই মামলা থেকে তুমি রক্ষা কর।"

"আমি কি করে তা পারব?"

"পারবে পারবে। নিশ্চয় পারবে। তুমি চাইলে হল।"

"আজ্ঞে, কি করব বলুন।"

"বলছিলাম কি, তুমি একটু আইনমন্ত্রীকে বললে হত না? শুনলাম তিনি তোমায় খুব খাতির করেন। তাঁকে বললে তিনি মামলা তুলে নিতেন।"

"মোকদ্দমা যে বিচারাধীন আছে। দেবোত্তর কমিশনার বিচার করছেন, বিচারাধীন মামলাতে মন্ত্রীর কোনো হাত নেই।" বললে দুঃখী।

"মন্ত্রী কি না করতে পারেন?" রাধাগোবিন্দ বললেন। "একটু শুধু কমিশনারকে ইশারা দেবেন, 'এই কেসটা একটু দেখো'। সেই ঢের। প্রাইভেট না করতে কমিশনার পথ পাবেন না।"

"আমায় ক্ষমা করবেন, আজ্ঞে, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। বরঞ্চ যদি বলেন তো যারা ঠাকুরের সম্পত্তি জোর করে দখল করছে তাদের হাত ধরে বলে কয়ে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করব। কিন্তু সরকারি কর্তাদের ওপরে চাপ দিয়ে কিছু করতে পারব না।"

রাধাগোবিন্দ একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেশ, সেটুকু না হয় কর। দেখ যদি পার। আমি চললাম, নমস্কার।"

রাধাগোবিন্দ চলে গেলেন। তাঁর ছায়াটা যেন লম্বা হতে হতে উঠোন ভরে দিল। ছায়া নয় একটা ভূত। ভূত নয় অতীত। অতীত মরে মরে যাচ্ছে। ভূত হয়ে যাচ্ছে। খাঁ খাঁ করে তাড়া করছে সবাইকে। সকলে ভীত। বুকে থুথু ফেলে আবার সাহস বাঁধছে।

"ভূতকে ভয় নেই। ভয় এই ভবিষ্যৎটাকে।" বালুঙ্গা বললে। ভয় আমাদের আগামীকালকে। ঠাকুর বামুন থাকবে না। দানখয়বাত থাকবে না।.... 'সর্বে হইবে একাকার, না রবে বেদের বিচার'। যাকগে, আমি এখন আসি। সব ঠাকুরের ইচ্ছা। পেন্নাম দুখীননা। আসি ঘনবাবু। আমার ওপর রাগ কোর না।"

চলে গেল বালুঙ্গা।

চিঠি পেয়ে দীনবন্ধু কাশীনাথ দুজনেই এসে গেল।

দীনবন্ধু খুব রোগা হয়ে গেছে। চুল পেকে গেছে অকালে। বয়েসের গত দিনগুলোকে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ডে ধরে গুনতে গুনতে সামনের থেকে পিছনের দিকে ক্রমশ চুলগুলো কখন একটি একটি করে খসে পড়েছে অজান্তে। কপালটা বেশ উঁচু দেখায়। সংসারের চড় খেতে খেতে গাল দুটো ঢুকে গেছে ভিতরে। সামনের কয়েকটা দাঁতও পড়ে গেছে। যমের পরোয়ানা জারি। কোমর ঝুঁকে পড়েছে একটু সামনের দিকে দায়িত্বের বোঝা বইতে বইতে।

এই দীনবন্ধু দুঃখীর জেলের সাথী। কাছাকাছি ছিল। একই দিনে খালাস পেয়ে এসেছিল

পাটনা ক্যাম্প জেল থেকে গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে। আসার সময় সদাকত আশ্রম হয়ে এল। সেখানে একজন খুব বড় কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তিনিও জেল থেকে খালাস হয়ে এসেছিলেন হালে। হাজারিবাগ জেলে ছিলেন। সেটা ছিল ইংরেজি-পড়া সত্যাগ্রহীদের জন্যে।

বড় বড় নেতাদের জন্যে সেখানে জায়গা করা হয়েছিল। তারা সব 'এ' আর 'বি' ডিভিজন কয়েদী। দুঃখী, ঘন, কাশী, দীনু ছিল 'সি' বিভাগ কয়েদী। মানে চোর ডাকাতের সঙ্গে সমান। তাদের জন্যে দিনে খোরাকি চার আনা। আর 'এ' 'বি' ডিভিজন নেতাদের জন্যে বারো আনা, একটাকা। 'সি' ডিভিজন কয়েদীদের পোশাক দুখানা জাঙ্গিয়া ও দুটো হাফ জামা। জাঙ্গিয়াতে দড়ি লাগানো মানা— যদি কেউ গলায় লাগিয়ে দেয়! অমনি গিঁট দিয়ে পরে কয়েদীরা। 'বি' কয়েদীদের পা পর্যন্ত পুরো পাজামা আর পুরোহাতা জামা। 'এ' ডিভিজনেরও তাই। তফাত এইটুকু যে 'এ' ডিভিজনওলারা সেই জামা প্যান্ট না পরে নিজের নিজের কাপড় পরতে পারে। 'সি' ডিভিজন বন্দীরা তিনমাসে একবার বাড়িতে চিঠি দিতে পারে ও একবার বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারে। 'বি' বন্দীদের মাসে একবার এবং 'এ' বন্দীদের সাতদিনে একবার চিঠি ও সাক্ষাৎ। কেউ যদি 'এ' বা 'বি' ডিভিজনে না থেকে 'সি' ডিভিজনে সকলের সঙ্গে থাকতে চাইত ইংরেজ সরকার মানা করত না। কিন্তু পাটনা ক্যাম্প জেলে তিন-চার হাজার কয়েদীদের মধ্যে তেমন একটি মাথাও দেখা যায়নি— দুঃখী দীনুদের।

দুঃখী, দীনবন্ধু দুজনে গিয়ে দেখা করল কংগ্রেসের বড় পাণ্ডা সেই গুঁফো নেতার সঙ্গে। খদ্দরের চাদর বিছান, খদ্দরের তাকিয়া হেলান দিয়ে নেতা শুয়েছিলেন একটি খাটে। দুঃখী নমস্কার করল, দীনুও। নেতা উঠে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কাঁহাসে আ রহে হো?"

"ফুলওয়ারি সরিফসে"— দুঃখী বললে।

"ও, পাটনা কেম্প জেলামে থে?"

"জী হাঁ"।

"কঁহাকে রহনেবালে হো?"

"ওড়িশাকে"।

"অপনে দেশকো যাকর ক্যা করনা চাহতে হো? কুছ শোচা?"

দুঃখী বললে— "মৈ সিংভূমমে কাম করনা চাহতা হুঁ।"

"সিংভূমে? ওড়িশামে নহিঁ?" জিজ্ঞেস করলেন নেতা।

"সিংভূম তো ওড়িশাকা অন্দর হায়", জবাব দিল দুঃখী।

"কৈসে?"

"ওড়িয়া লোগোঁকি আজাদ হিন্দিভাষিয়োঁ সে কাফি জ্যাদা হায়," দুঃখী বললে। "ইসলিয়ে সিংভূত ওড়িশাকা হায় কহনেসে কুছ ভুল নহিঁ হোগা।"

নেতা একটু হাসলেন। ধীর, শান্ত, গম্ভীর। অনেক চিন্তা করে বলছেন মনে হল। "মৈ মানতা হুঁ ওড়িয়া লোগোঁকি আজাদ হিন্দিভাষিয়োঁ সে কুছ জ্যাদা তো জরুর হৈ, ফিরভি 'হো' ঔর দুসরা আদিবাসীওঁ কে সংখ্যা কহিঁ ঔরভি জ্যাদা হৈ। ওড়িশামে অগর সিংভূম সামিল হো যায় তো মুঝে কোই ফিকর নহিঁ। পর আদিবাসীওঁ কো বড়ি দিক্‌কত্ হোগি।"

"ক্যোঁ, কৈসে?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"সিংভূমকে রহনেওয়ালে আদিবাসীওঁকো চার চার ভাষায়েঁ শিখনি পড়েগি। এক তো আপনি মাতৃভাষা, দুসরি ওড়িয়া প্রান্ত্‌কি ভাষা মতলব ওড়িয়া, তিসরি রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ঔর চৌথি সরকারি ভাষা অংগ্রেজি।"

"অংগ্রেজি ক্যোঁও? ফির হম অংগ্রেজি ক্যোঁও পঢ়েঙ্গে? স্বাধীন ভারতমে অংগ্রেজিকা কোই স্থান নেহি হৈ।" দুঃখী বললে।

দুঃখীর কথা শুনে তার দিকে একবার তাকালেন কংগ্রেস নেতা। আবার কি ভেবে বললেন, 'খৈর, অংগ্রেজি শিখনেকি অগর জরুরৎ ন হো তোভি ওড়িশামে রহনেসে উন্‌হে তিন তিন ভাষা শিখনি পড়তি হৈ। ঔর বিহারমে রহনেসে দো মতলব অপনি মাতৃভাষা ঔর রাষ্ট্রভাষা"।

দুঃখী আর দীনবন্ধু নেতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল। দুঃখী সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিল দীনুকে মহাভারতীয় নেতাদের মতিগতি। সবাকার রক্তে প্রাদেশিকতা ভরপুর। শুধু আমাদের ওড়িয়া নেতারা মহাভারতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ।

দীনবন্ধু বললে— "উদ্বুদ্ধ নয় গদগদ।"

দুঃখী যোগ করল— "ওড়িয়া নেতাদের নিজের তো কোনো জ্যোতি নেই। মহাভারতীয় নেতাদের জ্যোতিতে জোতিষ্মান। সেজন্যে এরা নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলে তাদের পেছনে ঘোরে।"

দীনু বললে,"সিংভূমে বিচ্ছিন্নাঞ্চলের ওড়িয়াদের জন্যে কাজ করার চাইতে আদিবাসী 'হো'দের ভিতরে গিয়ে করা বেশি দরকার। কারণ বিচ্ছিন্নাঞ্চল ওড়িয়াদের ভিতরে জাগরণ আনলে ওড়িশা যা হারিয়েছে সেটা ফিরে পাবে। কিন্তু ওড়িশার আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে তাদের আপনার করে না নিলে ওড়িশার যা আছে তাকেও হারাবে।"

"কেমন করে?" দুঃখী জিজ্ঞেস করল।

"ওড়িশার আদিবাসীরা একদিন না একদিন একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ চাইবে, আমরা যদি সেই 'ভূমিজ' ও 'দিকু'দের ভিতরের ভেদকে ঘোচাতে না পারি।"

দুঃখী বললে, "ওড়িয়া নেতাদের বুদ্ধি গোল হয়ে যাবে। ওড়িশা আবার আদিবাসী ও বেআদিবাসীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে যাবে। তোর মনে থাকবে দীনু ওভোনেল কমিটি বসার সময় ছোটনাগপুরের আদিবাসী নেতারা প্রস্তাব দিয়েছিল ওড়িশাটা যদি একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ার জন্যে অতি ছোট হয় তবে বিহার থেকে ছোটনাগপুরকে আলাদা করে এই দুটো ডিভিজনকে মিশিয়ে একটা প্রদেশ হোক। কারণ হিসেবে তারা বলেছিল যে কেবল ওড়িশায় আর ছোটনাগপুরে আদিবাসী আছে। মুখ্য বিহার বা পাটনা ডিভিশানে আদিবাসী নেই বললে চলে। কিন্তু বুদ্ধিমান ওড়িয়া নেতারা তাতে রাজি হলেন না।"

"ও হো, বুঝলাম। নেতারা ভয় পেয়ে গেল। যদি তাদের নেতৃত্ব হাত থেকে খসে যায়— তাই না?"

দুঃখী — "হ্যাঁ, ঠিক তাই। ওড়িশা প্রদেশে ওড়িয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে যেত। আদিবাসী সংখ্যা বেশি হত।"

দীনু — "সেই ভয়ে বোধহয় স্বাধীনতার পরে পরে ওড়িয়া নেতারা সিংভূমের যে এক টুকরো ওড়িশাতে মিশেছিল তাকে বিহারের হাতে তুলে দিলেন।"

দুঃখী — "বিহার সরকারের হাতে নয়। বিহারে মিশল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তুলে দিয়েছিল সর্বভারতীয় নেতার হাতে।"

দীনু — "এ দুর্বুদ্ধি তাদের কেন হল?"

দুঃখী — "লক্ষ্মী ছেলে হওয়ার জন্যে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, গভর্নর হওয়ার জন্যে। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রদূত হওয়ার আশায়।"

জেলখানায় থাকাকালেও নানা প্রসঙ্গে দীনু ওর দৃঢ়মত প্রকাশ করত যে ওড়িয়া এবং আদিবাসী মিশ্রণ না হলে ওড়িশার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দুঃখী ও তার বন্ধুরা অনেকসময় দীনুর আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করার স্পৃহা দেখে হাসাহাসি করত। 'তুই নিশ্চয় একটা আদিবাসী বিয়ে করবি দেখা যাচ্ছে' বলে ঠাট্টা করত।

সেটাই হল। দীনু যা বলত অক্ষরে অক্ষরে তাই ফলল আর দীনুকে যা বলা হত তাও ঘটে গেল।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলন হল। ছোটনাগপুর আদিবাসী অঞ্চল এবং উত্তর-ওড়িশার আদিবাসী অঞ্চলকে মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করার দাবি এল। শুধু তাই নয়। আবার পশ্চিম-ওড়িশা পূর্ব-ওড়িশার মধ্যে ভেদভাব সৃষ্টি করে এখন ওড়িয়া নেতারা ওড়িশাকে নিজের নিজের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করতে বসেছে। পশ্চিম ওড়িশাটা নাকি কোশল রাজ্য হবে!

সত্যি সত্যি দীনু একটি আদিবাসী মেয়েকে শেষে বিয়ে করল। চিনমিনকে বিয়ে করল বললে ঠিক হবে না বরং উদ্ধার করল বলা চলে। দীনুকে যদি কেউ ঠাট্টা করে— 'হ্যাঁরে দীনু, তুই কি কিছুই পেলি না, শেষে একটা আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করলি?', দীনু বলে, 'অন্ধকারে খেলে যা, আলোয় খেলেও তা। আমি আদিবাসী বিয়ে করেছি? তোমরা সব আর কি করেছ? যাদের বিয়ে করেছ তারাও সকলে আদিবাসী। ভেবো না তোমরা সব আর্য, কশ্যপ ঋষির বাড়ি কাস্পিয়ান হ্রদের কাছ থেকে এসেছ। আমরা একটা মিশ্র জাতি। আমাদের রক্তে আর্য অনার্য আর মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। তাছাড়া ওড়িয়া সংস্কৃতিও আর্য নয় কিম্বা অনার্য নয়— উভয়ের সমন্বয়? শবরদের ঠাকুর 'জগা বলিয়া'কে আমরা কি মিছেই পুজো করি?'

চিনমিনকে বিয়ে করে দীনবন্ধু খুব খুশি। তার সুখের সংসার। এ বিয়ে ঠিক প্রেম করা বিয়ে নয়। এর পিছনে কোনো রোমাঞ্চকর কাহিনী নেই। তবু বৈচিত্র্য আছে।

গুনুপুর আর কোরাপুট সীমান্তের আদিবাসী অঞ্চলে দীনবন্ধু কাজ করত। আদিবাসীদের সে পড়াত।

চিনমিন ছিল তার ছাত্রী। আদিবাসী মেয়েটি আশ্রম স্কুলে পড়ত। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেও প্রার্থনা গান করত। ওর গলা ছিল খুব মিষ্টি। ভজন গাওয়ার সময় ওর স্বর কাঁপে। চিনমিন তন্ময় হয়ে গায়। দীনুও তন্ময় হয়ে শোনে। ব্যস ওইটুকু। মেয়েটি কে, তার বাড়ি কোথায় কত দূরে দীনু জানত না বা জানার আগ্রহ ছিল না তার।

বনের মধ্যে আদিবাসী পল্লী অনেকগুলো এখানে সেখানে। সেই গাঁগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে দীনু একদিন দৈবাৎ এসে ঠেকল একটি কুঁড়ের দোরে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। সে চিনমিন। চিনতে পারল দীনু। তাকে দেখে মেয়েটি দৌড়ে গেল ঘরের ভিতরে। ডেকে আনল ওর বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে। চিনমিনের বাবা এসে খাটিয়া একটা পেতে দিল দীনুর বসার জন্যে। দীনু বসল। চিনমিন কাছে এসে দাঁড়াল। ওর বাপ বসল একটা মোড়ার ওপর। কথাবার্তা হল।

চিনমিনের গায়ে লজ্জার গন্ধ কেউ লাগিয়ে দিয়েছে যেন। ভারি লাজুক মেয়ে। দীনু বলছিল। চিনু যখন লজ্জা করে ওর সরলতার রং যেন ওর মুখে এখানে সেখানে ছোপান।

একদিন ওর বিয়ের গল্প বলছিল দীনু ওর দুই বন্ধুর কাছে। ঘন আর দুঃখী শুনছিল দারুণ আগ্রহে।

"আদিবাসী মেয়েদের লজ্জাটা দেহে থাকে না। থাকে মুখে। সেটাকে অনেক সময় আমাদের এদিককার লোক প্রেম বলে ভুল করে। আদিবাসী অঞ্চলের একজন সরকারি আমলার কাছ থেকে শোনা। নতুন গেছেন সে অঞ্চলে। পরিবার সঙ্গে নেই। কোয়ার্টারে থাকতেন একা। আদিবাসী একটি মেয়ে কাজ করত ওঁর বাড়িতে। কাঁচা বয়েস। সরকারি চাকুরে ভদ্রলোক সামলাতে পারলেন না নিজেকে। একে ছোকরা, তায় ক্ষমতা আবার পয়সা। একৈকোদপি অনর্থায়—"

ঘন বললে, "কিছু অনর্থ হল নাকি?"

"বাবুটি মেয়েটিকে ডেকে নিলেন ঘরের ভিতরে," বললে দীনু।

"উঁ হুঁ, ব্যাপারটা এত সহজে হবার নয়। মেয়েটি তো চেঁচিয়ে থাকবে। খুব হইহল্লা হয়ে থাকবে। অফিসারটির প্রাণ রইল না গেল?" জানতে চাইল ঘন।

"চেঁচামেচি করেনি। বাবু যেই ধরে ফেলেছেন, সে 'দাঁড়াও আমি আসছি' বলে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনল ওর বাপকে।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"তারপরে বাপ-মা দুজনে এসে পৌঁছোল তাদের নতুন নাতিটিকে দেখতে।"

শুকুরা বললে, "নাতি? নাতি কি করে হল? দুঃখী বললে, "পুরাণের কথা সত্যি হল নাকি? কার্তিক জন্ম নিলেন বল।"

দীনু বললে, "না, না, কার্তিক টার্তিক নয়। নাতি হলেন তোমার ওই অফিসার নিজে।"

"কেমন করে?" একসঙ্গে সবাই জিজ্ঞেস করল।

"কতক আদিবাসীদের মধ্যে রেওয়াজ আছে, যদি কোনো পুরুষ অন্য কোনো স্ত্রীলোকের

স্তনে হাত দেয় তবে তখনি ওই স্ত্রীলোকটি সেই পুরুষটিকে ছেলে বলে মানবে। কারণ স্তনে শুধু সন্তানের অধিকার, স্বামীর নয়।"

শুকুরা — "বড় আজব জাত তো! এদের ব্যাপার-স্যাপারই কেমন ধারা।"

ঘন — "আমার তো মনে হয় এরাই প্রকৃত সভ্য। স্তনের সৃষ্টি তো কেবল সন্তানের জন্যে। সন্তানের জন্ম হলে স্তনে ক্ষীরের সঞ্চার হয়। তাই এই প্রথার গোড়ায় একটা বিরাট সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

দুঃখী — "সেজন্যেই বোধহয় দীনু এই বিরাট সভ্যতাকে আপনার করে নিল।"

পরিহাসটাকে উপভোগ করল দীনবন্ধু। সবাই হাসল।

ঘন বললে, "যাকগে, এখন আমাদের কথা হোক। গ্রামবাসী সকলের সমর্থন পাওয়া যাবে তো?"

"বোধহয় পাওয়া যাবে।" দুঃখী বললে।

"ভাগু মহান্তি?" জিজ্ঞেস করল দীনু।

"আমাদের পরামর্শ শুনে যতদূর মনে হয় ভাগু মহান্তি ভয় পেয়েছে।"

শুকুরা বললে— "ভাগু মহান্তি ভয় পাওয়ার লোক নয়। তাকে যে না চেনে সে তার বাপকেও চেনে না। ওর বাইরে একটা কথা, ভেতরে আর একটা। ওপরে তোমার ভাল করবে বলে ভেতরে শিকড় কাটতে শুরু করে দেবে। আমি খবর পেয়েছি সে আট-দশটা গুণ্ডা যোগাড় করেছে। হরিজন বস্তির কজন, মহান্তিপাড়ার কজন ছোঁড়াকে খেতে দিয়ে পুষছে। তোমরা সত্যাগ্রহ করার সময় নিশ্চয় কিছু একটা গণ্ডগোল হবে।"

দুঃখী — "তোর কিছু ভয় করার নেই শুকুরা। তুই আর সাঁওটা নিরাপদ।"

শুকুরা — "মানে?"

দুঃখী — "মানে তোদের দুজনকে সত্যাগ্রহে যোগ দিতে দেওয়া হবে না।"

শুকুরা চটে গেল— "কেন?"

দুঃখী — "যাদের জমি চলে যাচ্ছে তারা এ জমি দখলের সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারবে না। তোর ও সাঁওটার জমি যাচ্ছে, নয় কি?"

শুকুরা — "আমার কিসের জমি? জমি ভাগু মহান্তির। সে নিলাম আর কোরক করে আমার জমি নিয়ে গেছে। বরং ভাগু মহান্তি সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়া উচিত নয়। আমি কেন দেব না? আলবাত দেব। আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক যুদ্ধের সময় পিছু হটতে শেখেনি।"

"ঠিক কথা—" বললে দীনু। "শুকুরার তো জমি নেই। সে জমি আইনত ভাগু মহান্তির। ভাগু বেচেছে চিরঞ্জিলালকে। শুকুরা বা সাঁওটার জমি সরকার জবরদস্তি কিনে দখল দেবে চিরঞ্জিলালকে। শুকুরা বা সাঁওটা কেউ টাকা নেবে না সরকারের কাছ থেকে। চিরঞ্জিলাল পুলিশ এনে দখল নিতে এলে আমরা বাধা দেব।"

"গাঁয়ের সকলে আসবে তো?" বললে শুকুরা।

"মুখে তো সবাই বলছে"— দুঃখী বললে। "আমি ঘরে ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি।

খবর নিয়েছি। সকলে আসবে, সত্যাগ্রহে যোগ দেবে বলেছে। কিন্তু আমরা সকলে একসঙ্গে সত্যাগ্রহ না করে দলে দলে পাঠাব। না কি বলিস ঘন?"

"হ্যাঁ, সেটাই ঠিক হবে।" ঘন বললে।

এতক্ষণে কাশী মুখ খুলল। বললে, "গোটা গাঁ টা একেবারে উঠে আসবে আমার মনে হয় না। কথাটা এত সহজ বলে ভেবো না। আজ যারা হাঁ বলছে পরে হয়ত তারা সরে দাঁড়াবে। দুখিয়ান্নার উপরোধে পড়ে হয়ত তারা রাজি হয়েছে। কাল সকালে শুনবে অন্য কথা। এই ব্যাপার সব জায়গায় হয়। ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ, ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন— এ সবের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। সে সময় তো বরং একটা উত্তেজনা ছিল, এখন তো সব ঠাণ্ডা। রক্ত গরম না করে আন্দোলন করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না?"

দুঃখী বললে, "তবে তুই কি বলিস? আন্দোলন করব না?"

"না, আমি সে কথা বলি না। আন্দোলন করব। তার আগে লোকেদের একটু তাতিয়ে দিতে হবে।"

"তাতানো হবে কি করে?" ঘন বললে।

"বিনা সংগঠনে লোক তেতে উঠবে না। গান্ধীজী কি করেছিলেন? দশ বছর সংগঠন, তারপরে বিপ্লব। ১৯৩০-এ লবণ সত্যাগ্রহ। তারপর ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে সংগঠন। তার ভিতরে হরিজন উদ্ধার, খাদি প্রচার ইত্যাদি। তারপর ১৯৪১-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন। খালি সংগঠনে কাজ হয় না কিম্বা খালি আন্দোলনে ফল পাওয়া যাবে না।"

কাশীর সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না দুঃখীর। কিন্তু সে বিশ্লেষণ করে দেখছিল সংগঠনের উদ্দেশ্য দুরকম হতে পারে। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ। আবার আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করা যেতে পারে। আক্রমণ আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কৌশল। তেমনি আক্রমণ করতে হলে প্রথমে আত্মরক্ষা আবশ্যক।

দুঃখীর এ যুক্তি শুনে নানারকম আলোচনা চলল। শেষে স্থির হল আগে সংগঠন করতে হবে। সে সংগঠনের প্রথম কাজ হবে আত্মরক্ষা। আবশ্যক হলে আক্রমণও। লক্ষ্য হবে শহরের শোষণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করা। তার জন্যে শহরের ওপরও আক্রমণ করা যেতে পারে।

শুকুরা বললে, "শুনেছ? রামবাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বলছেন।"

"বলছেন?"— ঘন আশ্চর্য হল।

"আমার বিশ্বাস হয় না"— দুঃখী বললে। "রামবাবু শহরমুখী শিল্পবিপ্লবে বিশ্বাস করেন। শিল্পক্ষেত্রের শোষিতেরাই এদেশে একচ্ছত্র রাজত্ব করবে বলে তারা দল তৈরি করেছে। তাই তাঁর স্বার্থ শহরে। শহরের বিরুদ্ধে তিনি যাবেন কেন?"

দীনু বললে, "সব রাজনৈতিক দলের অবস্থা তাই। সকলের মুখ শহরের দিকে। যে নেতা হল সে গেল শহরে। বরং বললে ঠিক হবে যে শহরবাসী না হলে কেউ নেতা, এম-এল-এ, এম-পি বা মন্ত্রী হতে পারে না।"

দুঃখী বললে— "সত্যি, সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য শহরের শিল্পাঞ্চলগুলোতে থাকা ট্রেড য়ুনিয়নগুলো হাত করা।"

ঘন বললে— "শুধু কি ট্রেড ইউনিয়ন? স্কুল-কলেজের ছাত্রদের হাতানোর জন্যে সব রাজনৈতিক দল উঠেপড়ে লেগেছে। কংগ্রেসের স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, কমিউনিস্টদের স্টুডেন্টস ফেডেরেশান, পি-এস-পির বোধহয় ছাত্রকংগ্রেস না কি যেন, আর বিদ্যার্থী পরিষদ হল জনসংঘের। এখন সোস্যালিস্ট ইউনিয়ন সেন্টারের না কার একটা ছাত্রসংঘ হয়েছে — প্রগতিবাদী ছাত্র ইউনিয়ন। এমনি কত কি।"

কাশী বললে— "এই রাজনৈতিক দলের নেতারাই ছাত্রদের বিভ্রান্ত করছে। যত রকমের ছাত্র বিশৃঙ্খলা হয় তার জন্যে এরাই দায়ী। এদের গুলি করে মারলে অন্যায় হবে না।"

"হিংসা তো হবে।" দুঃখী হেসে হেসে বলে।

"না," কাশী জবাব দেয়, "রোগের জীবাণু নষ্ট করা হিংসা নয়।"

দীনু বললে— "আমার কেন আশঙ্কা হয় এই ছাত্রেরাই একদিন এই নেতাদের গুলি করে মারবে।"

দুঃখী — "তোর আশঙ্কা অমূলক নয়। কিন্তু আমাদের কর্তব্য এই স্রোতের মুখকে ফেরান। যুবকদের হিংস্র মনোবৃত্তি বড় মারাত্মক। বর্তমান আবহাওয়া থেকে হিংসা লোপ না করলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের মহাত্মা গান্ধীর পথ বেছে নিতে হবে। সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্যে অহিংসার প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।"

কাশী — "আমার তাতে বিশ্বাস নেই।" শুকুরা উঠে পড়ে বললে, "আমিও অহিংসা-টহিংসাতে বিশ্বাস করি না।"

"আমি তোমাদের সব প্রস্তাব শুনেছি।" কাশী বলতে থাকে "তোমরা একদল অপদার্থ এখানে একজোট হয়েছ। যুগ বদলে গেছে। গান্ধীজী থাকলে এপ্রকার হিংসাকে আজ অহিংসা নাম দিতেন। মশা, মাছি, ছারপোকা মারা হিংসা নয়।"

দুঃখী — "তাহলে তুই কি করতে বলিস?"

কাশী —"আমি তো বললাম আগে সংগঠন কর। তারপর আক্রমণ।"

দুঃখী — "অহিংস উপায়ে তো?"

কাশী — "হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলো না। অন্যায়কে সহ্য করা হিংসা। অন্যায়ের প্রতিরোধ করা অহিংসা।"

দীনু — "তুই যে সংগঠনের কথা বলছিস কাশী, সে-রকম সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। এখন তো সংগঠন বললে টাকা। টাকা ফেললে সংগঠন হল। গত তিনটে সাধারণ নির্বাচন আমাদের এটাই শিখিয়েছে।"

ঘন — "ঠিক কথা। এখন তো কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো সংগঠন নেই। নির্বাচনের সময় একটা আলগা সংগঠন আপনি গড়ে ওঠে। নির্বাচন ফুরোলে সেটা মরে যায়। সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি?"

কাশী — "কর্তব্য চুপচাপ বসে যাওয়া। যো হোতা হায় উসে হোনে দো। কংগ্রেসওলারা যা করছে সে সব বিপ্লবকে স্বাগত করে আনবে। তাদের ছেড়ে দাও। তারা তাদের রাস্তায় যাক। লোকেরা দুঃখ নির্যাতনের চরম সীমায় না পৌঁছলে বিপ্লব হবে না। আমাদের গাঁয়ের লোকগুলো সব অকর্মা। এই টিয়ারঙের ধানখেত সোনা ফলিয়ে এদের কুঁড়ে করে ফেলেছে। যা পায় সেই ঢের। ওপরে ওঠবার আগ্রহ নেই। কি মোহ এই মাটিখেতের। তারই মোহে ভিটে ছেড়ে তারা কোথাও নড়বে না। তাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকবে। মরবে বরং, তবু বাপ-মা সাতপুরুষের ভিটে ছাড়বে না।"

দুঃখী — "সেকথা সত্যি। তেলেঙ্গারা কোরাপুটের দিক থেকে এসে হীরাকুদে ছেয়ে গেছে। এক আধজন নয়। গোটা গোটা গাঁ উঠে চলে আসছে। সঙ্গে নাপিত, বামুন, ডাক্তার, উকিলও নিয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের কাউকে কোরাপুট যেতে বল, গায়ে জ্বর আসবে। যে সরকারি কর্মচারীর কোরাপুটে বদলি হয় সে ছেলেমেয়ে বুড়ো বাপ-মা সবাইকে নিয়ে আছড়ে পড়ে গিয়ে মন্ত্রীর পায়ের তলায়। এ জাত বাঁচবে কি করে?"

কাশী — "আর একটা কথা আমার মনে বারবার জাগে, জেগে থাকে। ব্রিটিশ দেশ ছেড়ে চলে গেল। শোরশব্দ নেই। হানাহানি নেই। চুপচাপ মাঝরাতে কংগ্রেসের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। স্বাধীনতার জন্যে যত ত্যাগ করার কথা, যত দুঃখ সহার কথা, কোথায় আমরা করেছি, সয়েছি? সেইজন্যে লোকে স্বাধীনতার মূল্য বোঝেনি। খুব শস্তায় পেয়ে গেল। দামী জিনিস মুফতে পেয়ে গেলে মানুষ ঠিকমতো হেপাজত করে রাখতে পারে না। অপব্যবহার করে।"

শুকুরা — "এ কাজ করল কে? ওই কংগ্রেস নেতারা। আমরা আজাদ হিন্দের লোক রক্ত দিয়ে জীবন বলি দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। কংগ্রেসওলারা পালমাধব*। জেলে আরামে শুয়ে থেকে বল্‌লে কিনা 'আমরাই এনে দিয়েছি স্বাধীনতা'। যত সব ভণ্ড।"

কাশী — "ঠিক কথা বলেছ ভাই। এই যতসব নেতা জেলে গিয়ে স্বাধীনতা এনে দিল বলে ঢাক বাজিয়ে বেড়ায় আর লোকদের ভাঁওতা দিয়ে ভোট নেয় আর গদিতে চেপে বসে এবং যাবৎ চন্দ্রার্কে গদিতে বসে থাকবে বলে স্বপ্ন দেখে। যতদিন এরা বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ দেশের উন্নতি হবে না। একথা লোকে যখন বুঝবে তখন এদের ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে প্রাণ নেবে দেখো।"

দুঃখী জিজ্ঞেস করল— "তুই শুধু কংগ্রেস নেতাদের কথা বলছিস, না.....?"

"আমি সবগুলোর কথা বলছি," কাশী উত্তর দিল, "ভারতের সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতারা একই গোয়ালঘর থেকে এসে আলাদা আলাদা হয়েছে। নেতা হবার জন্যে দল গড়েছে, নীতির জন্যে নয়।"

"সে-কথা সত্যি কিন্তু তারা না মরা পর্যন্ত আমরা কি বসে থাকব?" দুঃখী বলল।

কাশী বললে — "বসে থাকতে বলছি না। তা বলে ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগাতে

---

* পুরীর মন্দিরের আবিষ্কর্তা

বলছি না। তোমরা যা করছ তাতে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা ভাববে এগোচ্ছ বলে কিন্তু বিপ্লবটা তোমাদের পিছন থেকে পিছিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকবে। কংগ্রেসওলারা লোকের ধন, মান, ইজ্জৎ এবং ন্যায় ও ধর্ম সব নিয়ে নিয়েছে। শুধু জীবনটা পড়ে আছে। ধুক ধুক করছে। লোকেরা মরুক। কোরামিন দিও না। তোমরাও তাদের সঙ্গে মরতে তৈরি হয়ে যাও।"

ঘন বললে, "বক্তৃতাটা তো ভালো হল। কাজের কথা হোক।"

কাশী বললে, "আমি বাজে কথা বলতে শিখিনি। যা বলছি কাজের কথাই বলছি। মিল বসবে। তার জন্যে সরকার আমাদের ভাতের হাঁড়িতে লাঠি মেরেছে। আমরাও ধরব লাঠি। যে দখল নিতে আসবে এক এক মারের চোটে শেষ করে দাও। আর নিজে গিয়ে গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়। এই জোচ্চোর নেতাদের জেলখানার মধ্যে ফাঁসির খুঁটিতে মরলে আমাদের আত্মা অপবিত্র হবে। তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো। আমার মতে এটাই অহিংসা।"

দুঃখী বললে, "এটা তো ডবল হিংসা। হত্যা আর আত্মহত্যা। দুটো পাপের ভাগী হব?"

কাশীনাথ খুব জোর দিয়ে বলল, "না, কক্‌খনো নয়। নিজের স্বার্থে অন্যের অনিষ্ট করা হিংসা। হত্যা করা পাপ। কিন্তু যে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে তার কিসের স্বার্থ? ধরা পড়ে বিচার হয়ে ফাঁসিতে লটকানো পর্যন্ত কথা যাবে কেন? তাতে বাঁচার আশাটা মিট মিট করে জ্বলতে থাকে। ভবিষ্যতে নেতা হয়ে আবার শাসনের গদিতে চেপে বসার লোভ থেকে যায়। এয়সা নহিঁ হোগা।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ

লোকান্ সমাহর্তুম ইহ প্রবৃত্তঃ। — ভগবান লোকক্ষয়কারী কাল হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর দেরি নেই। ভয় করার নেই।

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে

যেঽবস্থিতা প্রত্যনীকেষু যোদ্ধাঃ।

তোমরা তাদের হত্যা না করলেও কেউ থাকবে না।"

কাশীর এ রূপ দেখে সকলে অবাক। দুঃখী বলল— "তুই হিংসাবাদী কম্যুনিস্ট হয়ে গেলি কবে থেকে?"

"কম্যুনিস্ট? হা হা হা"— হেসে উঠল কাশী। "আমি কখনো কংগ্রেসী ছিলাম না কিম্বা হব না।"

"না না, আমি কংগ্রেসের কথা বলছি না। তুই কম্যুনিস্ট হলি কবে জিজ্ঞেস করছি।"

"কংগ্রেস কম্যুনিস্ট এক। তাদের মধ্যে আমি তফাত দেখি না"— কাশী উত্তর দিল। তফাত এইটুকু, কংগ্রেসওলারা মুখে অহিংসা অহিংসা বলে সবরকম হিংসা করে। আর কম্যুনিস্টরা 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতি আওড়ে দরকার হলে হিংসা করব বলেও প্রাণের ভয়ে বৈধানিক উপায় অবলম্বন করে। হিংসাবাদী সকলেই। কিন্তু স্বীকার করতে নারাজ। আমি ওই দু-নৌকায়-পা নীতিকে পছন্দ করি না।"

দুঃখী কাশীর দিকে তাকিয়ে থাকে তীব্র চোখে। কাশীর এটা নতুন রূপ।

কাশী ছিল জেলের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ বন্দী। রাত তিনটেয় ওঠে। কারণ সেটা ব্রাহ্ম মুহূর্ত। ওয়ার্ডে ভোর পাঁচটায় ঘন্টা বাজে। সকলে উঠে একত্র হয়। প্রার্থনা করা হয়। কম্যুনিস্টদের প্রার্থনার ঝামেলা থাকে না। বুর্জোয়া নেতারা আবার সমূহ-প্রার্থনায় আসে না। নিজের নিজের বিছানায় বসে মনে মনে প্রার্থনা করে। কারণ বোধহয়, নেতা হওয়ার জন্যে প্রার্থনাটা সবাই তো একসঙ্গে করতে পারবে না! অথবা সকলে একসঙ্গে নেতা হতে পারবে না! তাই তারা আলাদা এক নেতা-ভগবানকে ডাকে। কাশীনাথ সমূহ-প্রার্থনায় যোগ দেয়। ততক্ষণ ওর সব নিত্যকর্ম সারা।

কাশীর সুন্দর স্বাস্থ্য। অতি ভদ্র আর নম্র। মাছিকে মর বলার মানুষ নয়। সে যা ঠিক বলে ভাবে তাই করে। কর্মে ওর অধিকার, ফলে নয়। ফলের আশা থাকলে মানুষ ভীতু হয়। কোনো সঙ্কট উপস্থিত হলে সে পালিয়ে যায়। নেতারা ক্ষমা চেয়ে টিপসই দিয়ে, নাক-কান মলে প্যারোলে খালাস হওয়ার মতো। কাশী বলে, ফল যদি পাওয়া যায় তো ভালো। যে ভোগ করার করুক। আমাদের সেখানে আটকে যাওয়া ঠিক নয়। ফলে অধিকার নেই বলে গীতার নিষ্কাম কর্মের অর্থকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে বলে, এর সহজ মানে কর্মফল পাওয়া গেলে তার অধিকার কর্মীর নয়, অন্যের। অর্থাৎ কামনা রেখে কাজ কর কিন্তু ফলকে ফেলে দাও। এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলে কাজটা আপনাআপনি নিষ্কাম হয়ে যাবে।

চিরদিন ওর আলাদা অভিমত। ওর কথা বলাটা বক্তৃতা। বলার সময় মনে হয় কথাগুলো পড়া বা শোনা থেকে নয়, ওর অনুভূতি অভিজ্ঞতা থেকে বলছে। ওর কথা এখন তো সত্যি হতে চলেছে বলে মনে হয়।

কাশী বললে, "তোর মনে আছে দুখী? জেলে থাকার সময় বলতাম যে কর্মের ফলের ওপর মোহ এলেই মরবে। আমাদের নেতাদের তাই হয়েছে। তারা মরেছে। তাদের মারবে কে? যে স্থানু, নির্জীব, অগ্রগতির চিন্তাকে ভয় পায় সে ত মৃত। চরৈবেতি, চরৈবেতি, সামনে এগিয়ে চল।"

ঘন বললে, "সামনে তো মৃত্যু। সবাই মৃত্যুর দিকে চলেছি। কিবা নেতা, কিবা নীতি সকলে একদিন মরব।" ঘনর স্বরে ঠাট্টা।

কাশীর চোখ জ্বলে উঠল। মুখ উত্তেজিত, গলায় দৃঢ়তা— "না, যে এগিয়ে চলে সে মরে না। যে জীবনের যাত্রাপথে থেমে যায় সে মরে। তার জীবন্ত মৃত্যু হয়। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য নয়। জীবনই জীবনের লক্ষ্য। পুরোনো জীবনের বদলে নতুন জীবন। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরানি— অনন্ত পথ। পথিকের লক্ষ্য হল জীবনের রহস্যভেদ। মৃত্যুর নয়। মৃত্যুর রহস্য তো বহু সহস্র বছর আগে নচিকেতা যমালয় পর্যন্ত গিয়ে মনুষ্যজাতির জন্যে বর চেয়ে জেনে নিয়েছিলেন। আজ আবার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে চাইবে কেন জ্ঞানী মানব? জীবনের রহস্যভেদ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যে যেদিকে এগিয়ে চলে সে অমর। মৃত্যুকে জয় করে কেউ অমর হয় না। মৃত্যু একটা পর্দা— রঙ্গমঞ্চের পর্দা। পর্দা পড়ে গেলে অভিনয় শেষ হয় না, আবার নতুন দৃশ্য শুরু হয়। জীবনের রহস্যভেদের দিকে

এগোনোই অমরত্ব। রহস্য ভেদ করে জীবনের বন্ধন ছিন্ন করাকে অমরত্ব বলা হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে কি মানুষের মৃত্যু হয় না? তাহলে তো সকলে ওই মন্ত্র পড়ে আর মরত না। তবে কি 'মহামৃত্যুঞ্জয়' জপ মিথ্যে? তা নয়। এ মন্ত্র জপ করলে জীবনের পুষ্টি সাধিত হয়। মৃত্যু উন্মোচিত হয়ে যায়। মৃত্যুর আবরণ খুলে যায়। মৃত্যুর মিথ্যাভয় দূর হয়ে যায়। সেই জন্যে আমি বলি অন্যায়কারীকে হত্যা করে আত্মহত্যা করাতে পাপ নেই। যে এ কাজ করতে পারে তার মৃত্যুভয় থাকে না— সে অমর।"

আদর্শ জীবন এই কাশীনাথের। জেলের ভিতরে দুঃখী, ঘন তাকে খেপাত 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' বলে, মানে ঘড়ির দ্বিতীয় কাঁটা। রুটিন বাঁধা ওর কাজ। যতটা সময় পড়ে ততটা সময় মাটি কোপায় আর ততটাই রুগীর সেবা করে রোজ। কোনো ব্যতিক্রম নেই। ওর মতে মানুষের ইন্দ্রিয় তিন প্রকার— জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় আর চিত্তেন্দ্রিয়। তিনটির বিকাশ না হলে মানুষের পূর্ণতা আসে না। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সে যে জ্ঞানলাভ করে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেটা প্রয়োগ করে। তার ফলকে সে চিত্তেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্যের সেবাতে লাগায়। অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়, শারীরিক শ্রমের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয় ও সেবা দ্বারা চিত্তের বিকাশ হয়।

পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা করে সে ওর এই তথ্যের সত্যতা প্রতিপাদন করে। ব্যাখ্যা নয়, ভাষ্য বলা চলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এ ত্রিমূর্তির কল্পনা কেবল এই তথ্যের দৃষ্টান্ত মাত্র। ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ। তার মানে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সমবিকাশ ও সমান প্রয়োগ করা দরকার— সৃষ্টিকামী মানবের। সৃষ্টিরক্ষা করতে হলে জ্ঞানের চেয়ে বরং কর্মেন্দ্রিয়ের অধিক প্রয়োজন। সেজন্যে পালনকর্তা বিষ্ণুর মাথা একটি ও হাত চারটি। মানুষ যা সৃষ্টি করে, অর্জন করে, তাকে রক্ষা করতে হলে কাজ বেশি করা চাই। কিন্তু মানুষ বেশি বুদ্ধি, বেশি জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে পঞ্চানন হয়ে গেল। পাঁচ পাঁচটা মাথা মহেশের— চার হাত, পাঁচ মাথা। কর্মেন্দ্রিয়ের চেয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় না বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় একটি বেশি হওয়াতেই তিনি হলেন ধ্বংসকর্তা। মানুষ যত না কাজ করে তার চেয়ে বেশি চিন্তা, বেশি জ্ঞান আহরণ করে। ফল ধ্বংস। আণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবন। ভগবান দেখলেন কেবল জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যজীবনের সমাধান সম্ভব হল না। তাই চিত্তেন্দ্রিয় বা প্রেমেন্দ্রিয়ের বিকাশ প্রয়োজন। সেজন্যে শ্রীচৈতন্য অবতার হলেন ভগবান। চিত্তেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় অন্যের সেবা করে। কেবল জ্ঞান ও কর্মের উৎকর্ষ সাধন করলে মানুষ পতিত হয়ে যায়। মনুষ্যত্বের পতন হয়। সেই পতিতদের উদ্ধার করার জন্যে শ্রীগৌরাঙ্গ যুগাবতার হলেন।

এমনি সব উদ্ভট কল্পনা কাশীনাথের। জেলখানাতে শোনাত ওর বিচিত্র কথা, অদ্ভুত চিন্তা আর অসম্ভব কল্পনা কিন্তু কেউ তাকে গ্রহণ করত না। সার্কাস দেখে আনন্দ পাওয়ার মতো সকলে সাগ্রহে শুনত। কিন্তু ওর কথা ফুরোলে সকলের নটে গাছ মুড়িয়ে যেত। কাউকে ওর প্রশংসা করতে কখনো দুঃখী শোনেনি। ঘনও নয়। সকলে ভাবে কাশীনাথ মানুষ নয়। একটা জন্তু দেখলে মজা লাগে, কাছে গেলে ভয় করে।

কম্যুনিস্টরা তাকে বলত 'সাইবেরিয়ার সাদা ভাল্লুক' কারণ একদিন সে তাদের আড্ডায় ঢুকে তর্ক শুরু করে দিল। সারা পৃথিবীর শ্রমিক কখনো একজোট হতে পারবে? মিছেই

তোমরা ধুয়ো তুলছ। কম্যুনিস্টরা চটে গেল। কাশীর একটা গুণ সে সহজে চটত না। বললে— 'রাগলে আমি কি মেনে নেব? অথচ একজোট হওয়ার পেছনে কিছু বুদ্ধি আর বেশি হৃদয়ের প্রয়োগ চাই। বুদ্ধিটা রইল নেতাদের মাথায় যারা কম্যুনিস্ট রাজ্যের এক একটা বড় বুর্জোয়া। আর হৃদয়টা রইল মার্কসের পুঁথির মধ্যে। সেরকম বিশ্বাস মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে— মরার পরে। কিন্তু এ বস্তুবাদী জগতে সেটা কোনো কাজ দেবে না।'

কম্যুনিস্টরা এটাকে বিতণ্ডা বলে চুপ মেরে গেল। আর সেইদিন থেকে তাদের ক্যাম্পে কাশীর নাম হল 'সাইবেরিয়ার সাদা ভাল্লুক'। কাশী দেখতে ছিল খুব ফর্সা।

আর একদিন তেমনি গিয়ে গান্ধীবাদীদের সভায় বসে গেল। গান্ধীবাদের ওপরে আলোচনা হচ্ছিল। বিনোবার লেখা পড়া হচ্ছিল। ততদিনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী বিনোবা ভাবে খবর কাগজের চরিত্র হয়ে গেছেন। তাঁর বই বেশ বিক্রি হয়— তাঁর মৌলিক চিন্তার জন্যে। দেবসভাতে ছদ্মবেশী অসুরের মতো কখন গিয়ে সকলের পিছনে বসে পড়েছে ভুশপণ্ডিত কাশীনাথ।

অধ্যাপক, মানে যিনি বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে ছোট ধুতি-চাদর পরা শ্রোতাদের কাছে টীকা করছিলেন— তিনি বললেন— বিনোবার বলার উদ্দেশ্য মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা করা উচিত। আমি মরে যাব, তবে আর পড়ব কেন শিখব কেন, এরকম হল বুড়োটে মনোবৃত্তি। কি চমৎকার চিন্তা, কি অভিনব যুক্তি।

হঠাৎ কাশী উঠে পড়ে বললেন— "আজ্ঞে, এতে চমৎকারিতা কিছু নেই। এটা ভুল কথা।" সকলে চাইল কাশীনাথের দিকে। মুচকি মুচকি হাসল। একজন বলে উঠল— ওহ, ইনি বিনোবার চেয়ে বেশি পণ্ডিত? জানো, তিনি তাঁর পাশ সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছিলেন?

কাশী বললে, "আমি সব জানি। বিনোবার প্রতি আমার ভক্তি তোমাদের চেয়ে কম নয়। তা বলে চোখ বুজে তাঁর সব কথা মেনে নিতে আমি প্রস্তুত নই।"

"এখানে বিনোবা যা বলেছেন আপনার মেনে নিতে আপত্তি কোথায়?"— একজন 'প্রজাহাতি' জিজ্ঞেস করল। কাশী এই গান্ধীবেশীদের প্রজাহাতি বলে। সন্ধ্যা-প্রার্থনার সময় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ গাওয়ার সময় 'প্রজাহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্' শ্লোক আসে। তার প্রথম শব্দটাকে নিয়ে এদের সঙ্গে রগড় করে।

কাশী বললে, "আমি সবসময় নিজেকে যুবক না ভেবে বুড়ো বলে মনে করি। 'নহে বৃদ্ধ সেই জন শুক্লকেশ হয় যার শির। যৌবনে যে জ্ঞানে রত জনে তারে কহে যে স্থবির'। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ হব। তাছাড়া নিজেকে বুড়ো ভাবলে, শমনের ওয়ারেন্ট এসে গেছে ভাবলে মানুষের মায়ামোহ কেটে যাবে। মানুষ ভালো করে ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবে। অর্জুনের মৃত্যুভয় হয়ে না থাকলে আমরা গীতা পেতাম না। পরীক্ষিতের মরণ না হলে ভাগবত শুনতাম না।"

"পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ— আমাদের কাশীভাই পরীক্ষিৎ"— একজন প্রজাহাতি বললে, "পরীক্ষিৎ না অর্জুন, তুমি কি কাশীভাই?"

কাশী রাগ করল না। হাসতে হাসতে বলল— রাশিয়ার কম্যুনিস্ট দলের মতো তোমরা

কংগ্রেসকে একটা ধর্মান্ধ দল না করে ছাড়বে না। একদিন এটা হবে। তাদের দেবতা মার্কস। তোমরা পেয়ে গেছ মহাত্মা গান্ধীকে। যেমন বিভিন্ন কম্যুনিস্ট চাষীরা নানা রকম টীকা করে মার্কসকে খেয়ে ফেলেছে, তোমাদের মতো খুনিরা তেমনি গান্ধীজীর যা ইচ্ছে টীকা করে আপনার কাজে লাগাবে।

কাশীনাথের পিছনে সকলে বলল গান্ধীজীর তিনটে বাঁদরের এটি একটি। কানে হাত দেওয়া যেটি। তারপর থেকে গান্ধীওলারা ওর নাম দিল কিষ্কিন্ধ্যা।

আর একদিন। বুর্জোয়া নেতাদের আলোচনা হচ্ছে। ভারতের রাজনীতিটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এটা ভারতীয়দের রক্তে আছে। চিরকাল ভারতীয়রা রাজাকে দেবতা বলে মেনে এসেছে। তাই এদেশে গণতন্ত্র টিকবে না। এতে সকলে একমত। কাশীনাথ আলোচনামগুলীর ভিতরে যেতে ভরসা না পেয়ে জানলার এধারে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে বলে উঠল, "আজ্ঞে, নেতা ও নীতি উভয় দরকার। খালি নেতাকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন সুশাসন হতে পারে না। সে যতবড় সুশাসক হোক না কেন। কিম্বা কোনো নীতি বা প্রশাসনিক পদ্ধতিও,— সে গণতন্ত্র হোক বা একচ্ছত্রবাদ হোক — সুশাসন দিতে পারে না। ভালো ডাক্তারের হাতে কুড়াল দিলে সে অপারেশান করতে পারে না। কিম্বা ভালো শল্য উপকরণ ধরিয়ে দিলে মুচি অস্ত্রোপচার করতে পারে না।"

বুর্জোয়া নেতারা কটমট করে তাকালেন। কিন্তু কাশীকে বেখাতির দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কাশী চলে এল। বুর্জোয়ারা কাশীর নাম দিল 'জ্যাক'— মানে সব ব্যাপারে মাথা গলায়।

হাজার লোকের ভিতরে কাশী আলাদা নজরে পড়ে যায়। চেহারার জন্যে নয়। চেহারাও ওর দিব্যি কিন্তু কারো ভাল লাগুক বা নাই লাগুক সকলে জানে যে কাশীনাথ নির্ভীক আর স্পষ্টবাদী। অনেকে ওর বেয়াড়া কথায় চটলেও জানে যে ওর চিন্তাধারায় মৌলিকতা থাকে।

জেল থেকে খালাস হওয়ার পর ওর হল আলাদা পরিমণ্ডল। কংগ্রেসের হাতে তখন পুরো ক্ষমতা। দেশ ভাগ ভাগ হয়েছে। সাধারণ নির্বাচন হয়নি। জেলাবোর্ড সব কংগ্রেসের এখতিয়ারে। কাশীও ঢুকল জেলাবোর্ডে। তারপরে মহাত্মা গান্ধী গডসের গুলিতে মারা গেলেন। কয়েকদিন আগে তিনি যে প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিয়েছিলেন তাই শুনে সে কংগ্রেস ছাড়ল। বললে ধর্ম ছেড়ে গেছে এই কংগ্রেস নেতাদের। পিতৃদ্রোহী এরা। মহাত্মাজীকে জাতির জনক বলে কোন মুখে বলে এরা? নির্লজ্জ বেহায়া!

১৯৫২ সাধারণ-নির্বাচনে লড়ল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে— স্বাধীনভাবে। কংগ্রেসের সে সময় যা বোলবোলাও স্বাধীনতা এনে দিয়েছে বলে, কাশী একেবারে চিৎপটাং। বাড়ি দেওয়াল গাছ পাথরে সাঁটা পোস্টার মোতাবেক নেহেরুর মুঠো শক্ত করতে লোকে কংগ্রেসকে ভোট দিল। কাশীর আমানত উড়ে গেল। কিন্তু ওর মনের বল ভাঙল না। সাতান্নর দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে সে জিতল ওই স্বাধীনভাবে। স্বাধীন সভ্য কাশীনাথ পরিড়া। সরকারের হৃৎকম্প। কাশীনাথ দাঁড়ালে মুখ্যমন্ত্রী চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেন।

হঠাৎ একদিন কাগজে বেরোল বিধানসভা সদস্য কাশীনাথ পরিড়া অমুক দফায় গ্রেপ্তার।

সকলে অবাক, কাশী শেষে এই করল। কয়েকদিন বাইরে মুখ দেখাতে পারল না। বিধানসভা বৈঠকে যোগও দিল না। রায় বেরোল— নির্দোষ খালাস। রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে সরকারি দল মিথ্যে অভিযোগ করেছিল।

তারপর কিন্তু অনেকদিন কাশীবাবু কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন। কেউ বলল কাশী চলে গেছেন বাবাজী হয়ে। কেউ বললে লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে কাশী। কিন্তু যাবার সময় দুলাইন লিখে দিয়ে গেছিল দুঃখীর কাছে পোস্টকার্ডে :

'দুখী, আমি যাচ্ছি। চারদিকে অন্ধকার। আলোকের সন্ধান করতে হবে। এখানে আর নয়। কিন্তু কোথায় যাব জানি না। এদেশের লোক মাগনা খেতে চায় সত্যি কিন্তু একটা জিনিস মাগনা দিলে কেউ নেয় না, উল্টে যে দিতে চায় তার মুখে থুথু দেয়, ঢেলা মারে। সেটা হল 'চিন্তা'। এদেশের লোককে নতুন ভাবনা বা বিচার দেওয়া মহাপাপ।

ওড়িয়ারা দরিদ্র নয়। টাকা উপার্জন করে পরের বোচকা বয়ে। নিজের গুণপনার গলা টিপে মারে আঁতুড়েই— ককিয়ে ওঠার আগে। বেঁচে থাকলে পাছে পরের মোট বওয়া অভ্যাস দেখে হাসবে।

তাই আমি বলি ওড়িয়া দরিদ্র নয়। তার ধনের অভাব নেই। মনের অভাব। এখানে বৈরী থাকে মায়ের পেটে। জানি না আবার কবে দেখা হবে। ইতি।

তোর কাশিয়া।'

দুঃখী জিজ্ঞেস করল— "তুই কি এই আলোক নিয়ে ফিরেছিস নাকি? তোর চিঠি যখন পেলাম ভাবলাম তুই হিমালয়ে চলে গেছিস।"

"গেছিলাম তো!" কাশী বলল।

"সত্যি গেছিলি?" ঘন জিজ্ঞেস করল।

"তবে কি মিথ্যে বলছি?" সকলের অনুরোধে ওর হিমালয় যাবার কারণ ও বৃত্তান্ত বলতে লাগল :

"আমি খালাস পেলাম সত্যি। আমার ইজ্জৎ বেঁচে গেল সত্যি, কিন্তু ওড়িশাতে থেকে ওড়িয়াদের সেবা করতে আমার কেমন ঘৃণা হল। শুধু ওই মোকদ্দমা নয়। তুই তো জানিস দুঃখী, একবার আমি একা ট্রেনে আসার সময় কংগ্রেসওলারা কেমন দুটো গুণ্ডা লাগিয়ে দিয়েছিল। সেদিন তারা আমায় খতম করে দিত। আমি হঠাৎ চেন টেনে দিলাম, গাড়ি আটকে গেল। তারা পালাল। তারই পরে পরে একজন স্বাধীনতাসংগ্রামী কংগ্রেস নেতাকে কেমনভাবে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে হত্যা করা হয়েছিল তুই জানিস। ঘন দীনু সবাই জানে। পুলিশ তার তদন্তও করল না। এসব আমাদের দেশে ছিল না। রাজপ্রাসাদে এরকম ষড়যন্ত্রের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। বিশেষত পাঠান মোগল রাজত্বের সময়। এখন ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হওয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রও বিকেন্দ্রিত হয়ে গেল।

ইংরেজরা তো কেবল ভারতের বিত্ত অপহরণ করত। বিত্ত গেলে মানুষ আবার বিত্ত

উপার্জন করে। এখন তো ভারত স্বাধীন। তবু আমাদের এ দুর্দশা কেন? কারণ ঐ বিত্তের সঙ্গে আমাদের চিত্তও চুরি করে নিয়ে গেছে। চিত্ত একবার হারালে ফিরে পাওয়া শক্ত। স্বাধীনতার পরে আমরা সব ব্যাপারে ইংরেজ হলাম। পরম্পরাকে ভুললাম। আমরা বর্ণসঙ্কর খিচুড়ি হয়ে গেলাম। নিজত্ব রইল না। জাতীয় চরিত্র লোপ পেল। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? উপায় বিধানসভার সভ্য হওয়াতে নেই। অন্য কোথাও আছে। কে কি ভাবল জানি না, আমি কিন্তু প্রাণের ভয়ে ইজ্জতের ভয়ে পালাইনি— আমি বেরোলাম সেই উপায়ের খোঁজে।"

"কেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তো আমাদের সবরকম উন্নতি করে দেবে বলছেন সরকার।" বললে দীনু।

"সেও ওই অনুকরণ। নিজস্ব নয়। রাশিয়ার এঁটো বার্জেটটা বাৎসরিক যোজনা। এটা পাঁচ বছরের যোজনা। তফাত কিসের? ছাড় সে কথা। আমি গেলাম হিমালয়ের সীমায়। ভাবলাম আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় ছাড়া ভারতের নিখোঁজ আত্মা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেজন্যে আমি খুঁজলাম সাধুসন্ত আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক। সিদ্ধ মহাপুরুষদের খোঁজে কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদ্রীনাথ প্রভৃতি বহু তীর্থ ঘুরে বেড়ালাম। বহু সাধুসন্তের দেখা পেলাম।"

"কিছু পেলি কোথাও?" দুঃখী বলল।

"নিশ্চয়।"

"কি পেলি বল তো?"

"আমি তো চাইনি কারো কাছে কিছুই, পাব কি?"

"বললি যে পেয়েছিস।"

"তাদের কৃপায় আমি যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম।"

"কি? ভারতের আত্মা?" দীনু ঠাট্টার সুরে বলল।

"হ্যাঁ, ভারতের আত্মা। ভারতের স্বরূপ। আমার ধারণায় এল যে আমরা সিংহশিশু। দুশো বছর ধরে আমাদের কানে বারবার শিয়াল শিয়াল বলে আমাদের শিয়াল করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভাবি আমরা শিয়াল। আমাদের শুধু একবার জলের ধারে নিয়ে গিয়ে আমাদের স্বরূপ দেখিয়ে দিলে কাজ সারা। তখন আমাদের আর কে পারে? পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই যা আমাদের কোনো গুণে হারাতে পারে।"

"এইটুকুর জন্যে এত পরিশ্রম?" ঘন বললে। কাশী চুপ করে রইল। ওর অভিমান যেন আহত হল একটু।

দুঃখী জিজ্ঞেস করল— "আচ্ছা তুই তো এত সাধুসঙ্গ করলি। কত সাধু কত ভালো ভালো কথা বলে থাকবে। তার মধ্যে সবচেয়ে কি ভালো লাগল?"

"ভারতের আত্মা আবিষ্কারের কথা ছাড়া।" ঘন বললে।

"কোনটা ভালো লাগল মনে নেই। যত উপদেশ শুনেছি এ কানে ঢুকে সে কান দিয়ে

বেরিয়ে গেছে। কেউ কিছু নতুন কথা বলার মতো লাগল না। সব আমাদের পুঁথি পুরাণে আছে। কিন্তু একটি কথা জেনেছি— যেটা ভাগবতে বলেছে— যে, সাধুসঙ্গ বিনা ভাগবত উপলব্ধি অসম্ভব।"

"তোর তবে ভাগবত উপলব্ধি হয়ে থাকবে।" ঘন বললে।

"একদিনে এম.এ. পাস?" কাশী উত্তর দিল।

"অন্তত এ-বি-সি-ডি তো হয়ে থাকবে। আমরা যে গণ্ডমূর্খ।" ঘন বললে।

"তা বলতে পারব না, তবে এটুকু হয়েছে যে আমার মরণের ভয় চলে গেছে। অথচ জীবন আমার বড় প্রিয়।"

"এটা কিন্তু অধ্যাত্মবাদীর কথার মতো হল না কাশী," দীনবন্ধু বললে, "রাজনীতিজ্ঞের ভাষা হয়ে গেল।"

"প্রভেদ অনেক," কাশী বললে। "রাজনীতিজ্ঞের পেটে থাকে ছলনা। সেজন্যে তাদের ভাষা বক্র। তাতে শ্লেষ থাকে। অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় শ্লেষ নেই, ছলনা নেই, কারণ সেটা অনুভূতি থেকে আসে। যা অনুভব করে তা বলে।"

"অনুভবের কথায় কি পরস্পর বিরোধ থাকতে পারে?" দুঃখী বললে।

"তুমি যেটাকে বিরোধ ভাবছ সেটা ঠিক তা নয়। বোঝার ভুলে অমন মনে হয়। আমার নিজের মতে জীবন একটা মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের মধ্যপদ। আছে, আবার নেইও। উভয়ই ঠিক।" বলল কাশী।

এতক্ষণে শুকুরা বলল— "বাবু, তুমি তো এত সাধুসন্ত দেখলে। কেউ তোমাকে আগত-ভবিষ্যতের কথা বলেছিল? আমি একবার এক সাধুকে পেয়েছিলাম। আজাদ হিন্দে ছিলাম। আমাদের হুকুম দিল পিছু হটতে। সকলে পালাল। আমি একটু পিছনে পড়ে গেলাম। যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলেছি। জঙ্গলের পথ। পাহাড়ী অঞ্চল। যেতে যেতে দেখি পাতার বিছানা করে এক সাধু শুয়ে আছেন। ইয়া বড় জটা। নখগুলো বেড়ে গুটিয়ে গেছে। পেট ঢুকে গেছে যেন কতদিন খাননি। গিয়ে বললাম— বাবা রাস্তা কিধর?

তিনি আমার দিকে চাইলেন। চোখদুটো মোমবাতির মতো জ্বলছে। বললেন— তুম রাস্তা ভুল গয়া। ইস তরফ নেহিঁ, উস তরফ।

আপকো মালুম হায় মুঝে কহাঁ যানা হায়? আশ্চর্য হয়ে বললাম। তিনি বললেন— হাঁ হাঁ মালুম হায়। তুম জলদি যাও নহিঁ তো খতরা হায়। যাতে সময় দুশমনকি গোলি সামনা করনা হোগা। রাম নাম লেকে চলে যাও। কুছ না হোগা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— বাবা, হমারা ফৌজকা ক্যা হোগা?

তিনি বললেন— পিছে পুছোগে। জলদি করো, ভাগো। নহিঁ তো মারে যাওগে। আমি প্রণাম করে পালিয়ে যাব বলে উঠে দাঁড়াতে তিনি আপনি বললেন— শুনো বেটা, তুমহারি ফৌজকা কামিয়াবি অভি নহিঁ মিলেগী। পর ঘাবড়াও মৎ। ভারত জরুর আজাদ হোগা। পর নতিজা কুছ ঔর হোগা। ছ মাহিনে কে বিচ তুমকো অপনে দেশকো যানা পড়েগা। তাঁর কথা সব ঠিক ঠিক ফলে গেল।"

কাশী বলল— "আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। আমি একবার একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করলাম— বাবা, আমার ভবিষ্যৎ কি দেখছেন? তিনি বললেন— বেটা, আমার কথা ছাড়, নিজে সৃষ্টিকর্তাও সৃষ্টির ভবিষ্যৎ বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কারণ তিনি ইচ্ছাময়। কখন তাঁর কি ইচ্ছা হবে কে বলবে? ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা মনুষ্যশক্তির বাইরে। তবু কোনো কোনো সাধু ভবিষ্য বলেন। কিন্তু মহাকালের ভিতরে ঢুকবে কে? মানুষ সাধনা করে নিকট-ভবিষ্যৎ বলতে পারে। তবে তাতে কিছু লাভ নেই। তাতে ঈশ্বর-উপলব্ধি হয় না। কিছু অর্থলাভ হতে পারে।

কথাটা আমার খুব মনে ধরল। সেই দিন থেকে আমি আর ভাগ্যকে বিশ্বাস করি না। পুরুষকারের উপরে আমার আস্থা নেই। ইচ্ছামায়ের যা ইচ্ছা তিনি করতে থাকুন। আমাদের কর্তব্য সয়ে যাওয়া। কারণ সয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। কর্মফল হোক বা ভাগ্যফল হোক, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"একটা কথা আমায় বল তো," দীনু জিজ্ঞেস করল, "তুই অমর কেমন করে হলি! মানে মরণভয় তোর কি করে গেল?"

সকলে হাসল। কাশী বললে, "এতে হাসবার কিছু নেই। এটা কোনো কষ্টকর সাধনা নয়।"

"সাধনা তো করতে হবে? কী সাধনা একটু বুঝিয়ে বললে হত না?" ঘন বললে।

"সাধনা-টাধনা কিছু নয়। শোন যা বলছি।" কাশী বললে, "কেবল শুনলে মরণের ভয় ছেড়ে যাবে।"

আবার সকলে হেসে ফেলল। কাশী বললে, "আগে শোনই না। তারপর হাসবে।" সকলে আগ্রহে চেয়ে রইল কাশীর দিকে।

"আমি বদ্রীনাথে থাকতাম। একদিন খুব ভোরে উঠে কি মনে হল, উঠে গেলাম ওপরে। বোধহয় দেবতাত্মা হিমালয় আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সে ডাক অবহেলা করার শক্তি ছিল না আমার। ওপরে, আরো ওপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ের ধাপে একটির পর একটি সবুজ ঘাসের নরম গালিচার ওপর হেঁটে চলেছি। পার হয়ে গেছি কখন শুকনো মেঠো জমি। আমার হুঁস নেই। গিয়ে পৌঁছোলাম বরফের সরু আস্তরণের ওপর। কাঁচের গুঁড়োর মতো সেগুলো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল পায়ের তলায়। সামনে পাইন বন। আমি চেয়ে রইলাম সে শোভার দিকে কতক্ষণ। যেন পঙ্‌ক্তি-ভোজনে বসেছে গাছগুলো। ক্রমে ক্রমে বরফগুলো জমাট বেঁধে পুরু হয়ে আসছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই বরফের বিছানার ওপরে একটি মানুষ হাত-পা চোখ-কান থাকা মানুষ, চৌকো আসনপিঁড়ি হয়ে বসা। অদ্ভুত! উলঙ্গ। আমার একটু ভয় হল। তবু সাহস বেঁধে লোকটার কাছে এলাম। আমি নিজেকে জবর ঢেকেঢুকে বরফের জুতো পরে আছি। সারা গায়ে গরমের পোশাক, মাথায় গরমের টুপি। নাক চোখ ছাড়া আর কিছু খোলা নেই। তবু কাঁপুনি হচ্ছিল। কিন্তু এ লোকটা আদগা গায়ে কেমন করে বরফের ওপরে বসে আছে? কাছে গিয়ে দেখার আগ্রহ সামলাতে পারলাম না। ভয় করলেও গেলাম। ভাবলাম ভূত-টুত নয় ত? নড়াচড়া করছে না। কাঠ হয়ে বসে আছে।

একটি নেংটা মূর্তি গড়ে কে এখানে রেখে গেল? ভূত নয় এ কখনো। দিনেরবেলা। বরফগুলো গায়ের ওপর পড়ে ছিটকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। লেগেও থাকছে জায়গায় জায়গায়। লোকটার গা একটু কাঁপছে না। মরা মানুষ নাকি? নাহ্, এমন সোজা খাড়া হয়ে বসে থাকত কি করে? কাছে গিয়ে দেখলাম— মূর্তি নয়, মানুষ। একজন সাধু। ধ্যানে বসেছেন। কিন্তু জ্বলজ্বল চেয়ে আছেন, চোখের মণি দুটো জ্বলছে কিন্তু স্থির। অপলক। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। পা আর সরে না। ভয় ও ভক্তি একসঙ্গে আমায় অচল করে দিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম সাধুর চোখের তারা নড়ছে। নীচে নেমে আসছে। আমার একটু সাহস হল। আনন্দ হল। তারপর তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি দণ্ডবৎ করলাম। উঠে দেখলাম তাঁর মুখে হাসি। সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম— "মৈঁ কুছ পুছ সকতা হুঁ?"

"নিশ্চয়। কন পচারিবাকু চাহঁছ পচারঅ।"

"ওড়িয়াতে?" দুঃখী, দীনু, ঘন, শুকুরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

কাশী বলল, "হ্যাঁ, ওড়িয়াতে।"

"তিনি কি একজন ওড়িয়া সাধু?" শুকুরা জানতে চাইল।

"কে জানে," কাশী উত্তর দিল। "ওড়িয়াতে তো বললেন।"

"তুই কি জিজ্ঞেস করলি?" ঘন জানতে চাইল।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনার শীত করে না?' তিনি উত্তর না দিয়ে আমার মুখ চোখ নাকের দিকে দেখালেন। বুঝতে পারলাম তাঁর ইশারা থেকে যে আমার মুখ চোখ যেমন শীত সহ্য করছে তাঁর সারা শরীরটা তেমনি শীতসহনশীল হয়ে গেছে। তারপর হেসে হেসে বললেন— 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'।"

"বাংলায়?" আবার সকলে জিজ্ঞেস করে আশ্চর্য হয়ে।

"হ্যাঁ, বাংলায় ঠিক বাঙালির মতো। আমিও জেনেশুনে বাংলাতে জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনি কি এইখানে থাকেন?' মাথা নেড়ে না বললেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনার রেসিডেন্স?' 'এভরিহোয়্যার' অর্থাৎ সবখানে! এবার ওড়িয়াতে বললাম। আমার তখন লজ্জা পাচ্ছে। আমার মধ্যে একটু গর্ব ছিল যে আমি ওড়িয়া হয়েও ঠোস হিন্দি আর খাঁটি বাংলা বলতে পারি এবং আমি একজন ইংরেজি-জানা লোক। ওই গর্ব খর্ব হয়ে গেল। 'আপনি কতগুলো ভাষা জানেন'? জিজ্ঞেস করলাম।

'একটি,' তিনি উত্তর দিলেন। একথা শুনে আমি অবাক। আমার ভাবভঙ্গি থেকে হোক বা তিনি সব জানতে পারার জন্যে হোক, বললেন— 'মানুষের একটি ভাষা। সব ভাষা এক, কারণ ভাব এক। ভাব যেখানে ভাষার রূপ নেয় সেখানে পৌঁছোতে পারলে সব ভাষা এক মনে হবে।'

আমি আর কি বলব? সব জিজ্ঞাসা যেন ফুরিয়ে গেল। তবু কিছু একটা বলার জন্যে বললাম— 'আপনি কখন থেকে এখানে আসন করছেন?'

'কাল নিরবধি'— তিনি বললেন। 'তাই তুমি যখন দেখলে তখন থেকে বসে আছি বলা যা, অনন্তকাল থেকে এখানে বসেছি বলাও তাই।'

'কিন্তু মানুষ তো আবার জন্ম নেয়, মরে, সব এই কালের সীমার মধ্যে?' তখনি মনে হল বরফ সব বাষ্প হয়ে কুয়াশার মতো ঢেকে ফেলছে। ওরই গায়ে ইন্দ্রধনু যেখানে রঙের পসরা মেলে হাসছিল সেদিকে হাত বাড়িয়ে বললেন— 'কী সেখানে ছিল, আবার কি থাকবে?'

আমি মাথা নেড়ে মানা করলাম। 'ভুল'— তিনি বললেন। ''রামধনু সেখানে ছিল এবং থাকবে। সূর্য থাকা পর্যন্ত ওর স্থিতি। কেবল বৃষ্টি বা কুয়াশাতে ও দেখা যায়। মেঘ বা কুয়াশা না থাকলে দেখা যায় না। তেমনি জীবন। আত্মা থাকা পর্যন্ত সে থাকে। আত্মা অনাদি অনন্ত। জীবন অনন্ত, অনাদি। দেহটা মেঘ। দেহেতে জীবনের বিলাস। মেঘের কোলে রামধনুর মতো জন্ম, জরা, মৃত্যু সব দেহের বিভিন্ন অবস্থা, আত্মার নয়। আত্মার মৃত্যু নেই— অজোনিত্যং শাশ্বতোইয়ং পুরাণঃ।''

আমি বললাম— 'দেহ থেকে আত্মা স্বতন্ত্র বলে আমার কই বিশ্বাস হয় না।' তিনি একটু হাসলেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'এটা দেহ না আত্মা?'

আমি উত্তর দিলাম— 'দেহ।'

তিনি বললেন— 'আত্মা সর্বব্যাপী, অসীম কিন্তু দেহে সীমা আছে, নয় কি?'

'আজ্ঞে।' আমি উত্তর দিলাম।

'এ দেহ যদি সর্বব্যাপী হয়ে যায় তোমার বিশ্বাস হবে?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

তারপরে দেখলাম হঠাৎ তাঁর শরীর থেকে একটা দীপ্তি বেরোচ্ছে। চোখ ঝলসে গেল। তাকাতে পারলাম না। চোখের পাতা বন্ধ হল। চোখ খুলে দেখি, তিনি নেই, তাঁর দীপ্তি নেই।....''

''উবে গেল?'' সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

''একেবারে উবে গেলেন।'' কাশী বলল।

''গেলেন কোথায়? আবার ফিরে এসেছিলেন কি?'' জিজ্ঞেস করল শুকুরা।

''না, আর তাঁকে আমি দেখতে পাইনি। অনেক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তিনি আর ফিরলেন না। উঁচু গলায় ডাকলাম— সাধুজী, সাধুজী। কেউ শুনল না।''

''তোর কি মনে হয়? তিনি কে হতে পারেন?''

''অনেক সন্ন্যাসী, তপস্বী, সাধু আছেন যাঁরা সাধনার জোরে অণিমা, লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধি পেয়ে থাকেন। তারই বলে তাঁরা নিজের শরীরকে লঘু করে অণুর মতো হয়ে যেতে পারেন। আমার কেন যেন মনে হয়, তিনি বোধ হয় সেই বাবাজী মহাশয়। দুহাজার বছর হবে তিনি সূক্ষ্ম শরীরে ঘুরছেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে তিনি স্থূলদেহে দেখা দিয়ে 'লয়যোগ' শিক্ষা দেন। সিদ্ধ লাহিড়ি মহাশয়ের তিনি গুরু। দুঃখী, সেই ইংরেজি বইটা— 'একজন যোগীর

আত্মকথা'— তুই হয়ত পড়েছিস। তাতে বাবাজী মহাশয়ের কথা আছে।"

শুকুরা বলল, "তিনি এখনো আছেন?"

কাশী বললে, "নিশ্চয়। তাঁরা কালাতীত পুরুষ। নিত্যসত্য, প্রত্যক্ষ।"

ঘন বললে, "তুই ওর শিষ্য হলি?"

কাশী বললে, "আমি বিধিবদ্ধভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি বটে, কিন্তু তিনি আমার গুরু। তাঁকে দেখার পর থেকে আমার মৃত্যুভয় চলে গেছে। সেইদিন থেকে আমার কানে কেউ বলে সময় সময়, বারবার বলে—

নত্বেবাহং জাতুনাসং নত্বংনমে জানাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম।"

তারপর কাশীনাথ একটি ছোট বক্তৃতার মতো বললে, "মৃত্যু একটা ভূত। ভয় পেলে ভয় দেখায়। বুকে থুথু ছিটিয়ে দিলে গেল। সেজন্যে যারা জেনেশুনে মৃত্যুকে বরণ করে তারা অমৃত হয়ে যায়। 'হতো বা প্রাপস্যসে স্বর্গং'। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'সুখিনো ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমিদৃশং'। যুদ্ধ করাই মানুষের ধর্ম। যে জীবন সংগ্রাম করতে জানে তার মরণের ভয় থাকে না। সংগ্রামশীল জীবনই সুখী। সংগ্রামহীন অলস আরামের জীবন যার সে বিধর্মী। সংগ্রামে রত ব্যক্তি যুদ্ধভূমিতে কাউকে হত্যা করে না বা হত হয় না— 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'। নিঃস্বার্থপরভাবে কাজ করলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তেই হবে। সে সংগ্রামে শত্রুকে হত্যা করলে হিংসা হয় না। যার মৃত্যুভয় আছে সে অন্যকে হিংসা করে। স্বার্থই মৃত্যুভয়ের হেতু। স্বার্থ ত্যাগ করলে শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়ে সমান জ্ঞান আসে। এই সাম্যযোগে থাকতে পারলে 'নায়ং হন্তি ন জন্যতে' ভাব এসে যায়।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়ন্তি হন্তি কম্॥

যে নিজেকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলে চিনেছে সে হত্যা করে না বা করায় না।

"গীতাকে ভারতীয় দর্শনের শেষ অভিব্যক্তি বলে আমি মানি না",— দুঃখী বললে। "মহাভারত যুদ্ধে অর্জুনকে গীতা বলার বহু বছর পরে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষা অর্জুনের নাতি পরীক্ষিৎ-এর সামনে শ্রীশুকমুনি ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সনাতন চিন্তনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।"

কাশী বললে, "আমি জানি ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র। গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেয়। গীতার নিষ্কাম কর্ম বিনা ভক্তি অসম্ভব। সুতরাং কাজ আমাদের করতে হবে। সংসারটা কুরুক্ষেত্র। কাজের ক্ষেত্র। কাজটাই যুদ্ধ। সেইজন্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রটা হল ধর্মক্ষেত্র।"

দুঃখী বললে, "তুই যাই বলিস না কেন, স্বার্থে হোক নিঃস্বার্থে হোক হত্যাটা হিংসা মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তোর যুক্তি অনুসারে এটা ন্যায় হতে পারে। তবে এর পরিণাম শুভঙ্কর নয়। একটি হিংসোপূর্ণ সংঘর্ষ পরবর্তী হিংসার আহ্বায়ক।"

— "সংঘর্ষ দুরকম। একটা প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ, আর একটা হিংসাত্মক। প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ অন্য এক প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষের কারণ হয় এবং হিংসাত্মক সংঘর্ষেরও হেতু হয়। সংঘর্ষ থেকে সংঘর্ষ জাত হয় সত্যি। তবু সংঘর্ষ বিনা সৃষ্টি অসম্ভব। প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ থেকে সৃষ্টি আবার ঐ সৃষ্টি থেকেই সংঘর্ষ উৎপন্ন হয়।"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

কাশীনাথ একটু লজ্জা পেল কিন্তু নিজের বিশ্বাস থেকে একতিল হটে যাবার পাত্র সে নয়। দুঃখীর দিকে চেয়ে বললে,— "হাসতে পার কিন্তু তোমরা সব যে সত্যাগ্রহের যোজনা করচ সেটা আঠারশো বাষট্টির। তবু আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। কারণ এটা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হতে পারে। আমার আশা কেবল তাত্ত্বিক বিচার না করে কাজে নেমে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি কার্যক্রম বদলে যাবে।"

ঘন বললে, "আমি একটা সালিসী প্রস্তাব দিচ্ছি। কাশীর কথা মেনে নিলাম যে সংঘর্ষ সৃষ্টি ছাড়া অসম্ভব এবং সে সংঘর্ষ প্রীতিপূর্ণ হওয়া চাই। দীনবন্ধুর সংঘর্ষ ও কাশীর প্রীতি এ দুটি সংঘর্ষশীল বস্তুর যোগ হলে উভয়ের কথা থাকবে। তাই আগে জমিমালিক আর খেতমজুরের মধ্যে একটা প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ হোক।"

দুঃখী— "আমারও ঠিক ওই মত। এ ব্যাপারে আমি একটা পরিকল্পনা করে ফেলেছি।"

হঠাৎ রাধাগোবিন্দবাবু এসে পৌঁছলেন। বললেন, "দুখী, আমি প্রস্তুত। তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই। আমি সব শুনেছি। যাদের জমি যাচ্ছে না তারা আন্দোলন করবে। আমার জমি তো সরকার কেড়ে নিচ্ছেন না। যাদের জমি সরকার নিয়ে নেবেন, মানে এই শুকুরা, সাঁওটা এদের তরফ থেকে আমি আন্দোলনে ভাগ নেব।"

সকলে আর একবার করে নমস্কার করল। ঘন বললে— "কিস্তি মাত। আমার স্কিম এবার ঠিক কাজ করবে। কি বলিস কাশী?"

কাশী — "তোর স্কিমটা কি আমি তো জানি না, কি বলব?"

ঘন — "স্কিম তো আমার নয়। স্কিম দুখীর। তবে দুখী কি করতে চায় আমি জানি। সে চায় প্রীতি থেকে সংঘর্ষ আর সংঘর্ষ থেকে প্রীতি। মানে প্রীতি আর সংঘর্ষের মধ্যে প্রীতি।"

সকলে হেসে উঠল। দীনবন্ধু বললে, "ঘন আমার কথা ঠিক বুঝেছে। আমি চাই সংগঠন থেকে সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহ থেকে সংগঠন।"

রাধাগোবিন্দ বললেন, "এই সংগঠনের দায়িত্ব আমায় দাও। তারপর সত্যাগ্রহ যে করছে করুক। এ বয়সে আমি আর জেল-টেল খাটতে পারব না। আমি বলে চলাফেরা করছি। তোমরা সব আমার বয়সে ভুঁইয়ে নুয়ে পড়বে। আমরা যা খেয়েছি তোমরা পাবে কোথায়? সর, মাখন, দুধ, ছানা, কত কি। ছোট মাছ খেতাম না। বড় মাছ আর অনেক মুড়ো। এক গণ্ডা রুই কাতলা হলে খাওয়া ঠিক হত — না খেলে সারা গাঁয়ে চাউর হত। কর্তার শরীর ভাল নেই।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বললেন— "সে-সব দিন বাঘে খেয়েছে।"

দুঃখী বললে, "আজ্ঞে, আপনি তো আন্দোলনে যোগ দিলেন আবার সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন কথা দিলেন। দীনবন্ধু সংগঠনের কি পরিকল্পনা করেছে একটু শুনে যান। আপনার মতো প্রাজ্ঞ লোকের উপদেশ আমাদের অনেক শক্তি দেবে। দীনু, তোর স্কিমটা বল।"

দীনু বললে, "আমি ভাবছি আমরা একটা নতুন ধরনের কো-অপারেটিভ করব। সেটা হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। এতে অংশীদার হবে জমিমালিক এবং মজুর উভয়ে। একটি অংশের মূল্য পাঁচ টাকা। প্রতি মজুর কমপক্ষে একটি অংশ কিনে সহযোগ সমিতির সভ্য হবে। টাকা না থাকলে কিস্তিবন্দিতে তার মজুরী থেকে দিনে দুআনা করে কেটে অংশধন ভরবে। মালিকদের সম্পত্তির চলতি দাম যা হবে সেই অনুপাতে দশ টাকা করে। যতগুলো অংশ হবে প্রতি জমিমালিক ততটা অংশ পেতে পারে। কিন্তু একটি লোকের মাত্র একটি ভোট থাকবে। সে মজদুর হোক বা মালিক হোক। মজদুরেরা ন্যায্য মজুরী পাবে। মালিকরা জমি বাবদ যত টাকার অংশ পাবে সেই লগ্নী টাকার সুদ পেতে পারবে। সুদের হার কোনোমতে একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের দেওয়া সুদ থেকে বেশি হবে না।"

রাধাগোবিন্দ বললেন, "জমির ওপর আমার মালিকানা স্বত্ব থাকবে কি না?"

"নিশ্চয় থাকবে,"— দীনু বললে। "মালিকানা কে নেবে? উত্তরাধিকার সূত্রে যার স্বত্ব সে থেকে ইচ্ছানুসারে খরিদ বিক্রি করতে পারবে।"

দুঃখী বললে, "মালিক আর মজুর যে যার পাওনা পেয়ে যাবার পর লভ্যাংশ কেমনভাবে বাঁটা হবে?"

"যে যার অংশ অনুসারে পাবে।" দীনু বললে।

শুকুরা বললে, "দীনুদা ভারি চালাক। মালিকের পক্ষ নিয়ে বলছে। ফল মালিকদের, কষ্ট পরিশ্রম মজুরদের।"

"শুকুরা ঠিক বলেছে", দুঃখী বললে, "লভ্যাংশ থেকে পঞ্চাশ মালিক ও পঞ্চাশ মজুররা পাবে। সেই পঞ্চাশ ভাগকে অংশ অনুসারে বেঁটে দেওয়া যেতে পারে।"

ঘন বললে, "আমি ভাবছি তা না করে গাঁয়ে যত সাবালক লোক আছে সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে।"

দুঃখী বললে, "সেটা আমরা পরে বিচার করে দেখব। আগে সহযোগ সমিতিটা রেজিস্ট্রি করা হোক, না কি বলেন কর্তা?"

রাধাগোবিন্দ বললেন, "স্কিমটা তো সুন্দর মনে হচ্ছে। এটা কংগ্রেসীদের গালে জুতো মারার মতো হবে। ভাগচাষ, ভূমিসংস্কার সব হয়ে যাবে।"

"বাস্তবিক চমৎকার প্রস্তাব। আমি সম্পূর্ণ একমত।" কাশী বললে।

ঘন বললে, "আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে।"

দীনু বললে, "আশঙ্কাটা কি শুনি?"

"সেটা তেমন কিছু বড় কথা নয়। আগে কাজ শুরু হোক। অসুবিধা হলে দেখা যাবে।"

দুঃখী — "আশঙ্কাটা তো তোর মনে মনেই রইল। কেউ তো জানল না।"

ঘন — "আমার আশঙ্কা হয় পাছে মজুররা এর বিরোধ করে।"

"মজুররা কেন আপত্তি করবে?" দীনু জানতে চায়।

"আপত্তির কারণ দুটো। প্রথমটা মনস্তাত্ত্বিক। তারা নিজে কোনো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে শেখেনি। এরকম কো-অপরেটিভে মজুর ও মালিকের দায়িত্ব সমান। ভয়ের দ্বিতীয় কারণ হল আইনগত। ভূ-সংস্কার বল, ভাগচাষ আইন বল, এগুলো যখন মজুরদের বিনা পরিশ্রমে সম্পত্তি পাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে তখন পরের সম্পত্তিতে এরা কেন পরিশ্রম করবে?"

দুঃখী বললে, "প্রথম আশঙ্কাটা এড়ানো যাবে। মজুরদের হঠাৎ কোন দায়িত্ব দেওয়া হবে না। দায়িত্ব থাকবে সমিতির, সমিতির কর্মকর্তাদের। না কি বলিস দীনু?"

"হ্যাঁ, ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্ববোধ এসে যাবে।" দীনু বললে।

হঠাৎ শুকুরা মুখ খুলল— "এ সবের কর্মকর্তা কে?"

কাশী বললে, "শুকুরা আসল কথাটি জিজ্ঞেস করেছে। যারা কর্মকর্তা হবে— প্রেসিডেন্ট বল, সেক্রেটারি বল, তারা সব খেয়ে ভস্ম করবে না তো? আমাদের দেশের কো-অপারেটিভের হাল দেখছ তো?"

দীনু বললে, "এর কর্মকর্তাদেরও অংশ থাকবে। তারা মোটা বেতনভোগী কর্মচারী হবে না। মজুররা যেমন মজুরী পায় তারা তেমনি পাবে। হয়তো দু-একটাকা বেশি তাদের দেওয়া যেতে পারে। সমিতির লাভক্ষতিতে এদের স্বার্থ জড়িত থাকলে এরা আর টাকা আত্মসাৎ করতে মন করবে না।"

শুকুরা আবার বললে, "আমি কি তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি জানতে চাই এই কর্মকর্তা হবে কে? তারই স্বভাবচরিত্র নিয়ে সমিতি চললে চলবে, নয়তো চলবে না। দুখিয়াম্না বা দীনাম্না যদি হয় তবে কাজ ঠিক চলবে।"

দীনু বললে, "দরকার হলে দেখা যাবে। আমরা কর্মকর্তা হই বা না হই, আমাদের সবসময় সজাগ থাকতে হবে।"

দুঃখী বললে, "সেটা কোনো বড় কথা নয়। আমি ভাবছি ঘনর দ্বিতীয় আশঙ্কার কথা। সে বাধা দূর করা কর্মীদের কাজের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। আমরা এক মহান দায়িত্ব হাতে নেব। ভাগচাষ, ভূসংস্কার, ভূ-দান আদি বিভেদকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান। তাকে ভয় করলে চলবে না। আমরা যারা আন্দোলনের দায়িত্ব নেব তাদেরই ত্যাগের ওপরে আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে। ত্যাগের সামনে সমস্ত স্বার্থ সূর্যোদয়ে আঁধার উবে যাওয়ার মতো মুছে যাবে।"

কাশী — আমি ঠিক ওই কথা বলছিলাম। তোমরা আমার কথা বুঝতে না পেরে হাসলে। ত্যাগই হল সেই প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ। ত্যাগ ছাড়া প্রীতি অসম্ভব। আবার ত্যাগের মূলে দারুণ মানসিক সংঘর্ষ থাকে। যে-কোনো বিপ্লব ত্যাগের ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

ঘন — সেটাও মনস্তাত্ত্বিক। আমি যে-দুটো আশঙ্কার কথা জানালাম উভয়ের মূলে

মানসিক বিপ্লবের দরকার হবে। যে দ্বিতীয় বাধার কথা বললাম তা বাইরে আইনগত হলেও সমস্ত প্রতিকূল আইনের মোকাবিলা করার জন্যে এই আন্দোলনে যোগদানকারী সমস্ত কর্মীদের কাছ থেকে যে ত্যাগ আশা করা যাচ্ছে তার জন্যে মনের দিকে থেকে তৈরি হওয়া সবার আগে দরকার।

দীনু — মন থাকলে মন আপনাআপনি তৈরি হয়ে যায়। পুরোনো অভ্যেস অবশ্য সহজে ছাড়া যায় না। কিন্তু একবার ওই অভ্যেসের গোড়ায় ঘা দিলে— মারটা কিন্তু খুব জবর হওয়া চাই— তারপর আর কোনো অসুবিধা হয় না।

দুঃখী হাসল। "তুই কি করে আদিবাসীদের এতবড় অভ্যেসের ওপরে ঘা দিলি আমাদের একটু বল না।"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। হাসির জোয়ার খেলে গেল।

রাধাগোবিন্দবাবু বললেন, "এখন আমি আসি দুখী।" সকলের ভক্তি আর প্রণাম নিয়ে তিনি উঠে ধীরে ধীরে পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যেতে সকলে জিদ করল চিনমিমের কথা শুনতে। চিনমিন আদিবাসী মেয়ে হলেও 'শনিয়া'-কে ছেড়ে দীনুকে কি করে ধরল?

দীনু নাচার। লজ্জা লাগলেও অল্প অল্প হাসি দিয়ে শরম ধুয়ে ফেলে বলতে শুরু করল—

আদিমানব কল্যাণ সমিতির কাজ করতাম। একটি আশ্রমে কিছু আদিবাসী ছেলেমেয়ে থাকত। সব অল্প বয়েসের। আমি ছিলাম গানের মাস্টার। প্রার্থনাসংগীত ভজন শেখাতাম। কিছু কিছু সাহিত্যও পড়াতাম। আদিবাসী ভাষাকে ওড়িয়া হরফে লিখি, তাদের ওড়িয়া পড়াতে মন লাগবে বলে। দেশকে ফাঁক, নদীকে বাঁক। একই জেলাতে আদিবাসীদের মধ্যে রকম রকমের ভাষা। ভাষাকে 'ঠার' বলে। আমি যখন ময়ূরভঞ্জে ছিলাম দেখতাম সেখানকার আদিবাসীরা আমাদের 'দিকু' বলে। আমার মনে হত সেটা বুঝি এক ঘৃণার শব্দ। কিন্তু কোরাপুটে আমরা সব 'মাপ্রু'— মহাপ্রভু।

মাকড়া জানি বলে এক আদিবাসী আমায় খুব খাতির করত। এসে বললে, 'মাপ্রু' আমাদের দিশারী নাই, তুমি দিশারী হও। মানে আমি তাদের পুরোহিত হব। আমি ব্রাহ্মণ বলে সে জানত। আমি 'ডঙ্গরে' যেতাম 'রুআ' পরবে। হলুদ সিঁদুর মাখা পাথরকে পুজো করে তারা, ঠিক আমাদের গ্রামদেবতীকে পুজো করার মতো। কিন্তু দেখলে মনে হবে সেই পাথরেরও যেন প্রাণ আছে। সে প্রাণের টানটা কিন্তু অকারণ। আমি বুঝতে পারি না ওই পাথরটা আমায় কেন টানে। আমি যাই, প্রণাম করি। মনে হয় সে পাথরটা আমায় কিছু বলবে বলবে করে বলতে পারে না। ছাগল মোরগের রক্ত খেয়ে সে লাল হয়ে গেছে। তবু কেন যেন আমার মনে হয় সে আমাদের চণ্ডী চামুণ্ডার মতো এত নৃশংস নয়। সময় সময় ছোট ছেলের মতো খিল খিল করে হাসে।

একদিন ধ্যানে বসে আছি ডঙ্গর থেকে ফিরে। এরকম এক একবার বসি। মনটা খুব শান্ত হয়ে যায়। সেদিন ধ্যান করতে করতে চোখের পাতা বুজে এল। নিমঘুম। স্বপ্নদেখার মতো হল কিন্তু স্বপ্ন নয়।

সাক্ষাৎ ওই গ্রামদেবতী এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, চিনতে পারিস না? আমি তোদের গাঁয়ের সেই 'বাসুলাই'। তোমরা তো আমায় কেউ পুছলে না আজকাল। কত বড় বড় ঠাকুরদেবতা তোমাদের হয়েছে এখন। আদিমকাল থেকে আমি তোদেরি হয়ে সেখানে পড়ে আছি। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমার পুজো করতেন। মারী-মড়কে, যে-কোনো বিপদে দৌড়ে আসতেন আমার কাছে। এখন আর কেউ আসে না। ডাক্তারখানায় দৌড়ে যায়। আমার পুজো কে করে? আমি বললাম, 'মা, এখনও তো আমরা পুজো করি লক্ষ্মী, সরস্বতী গণেশ শিব পার্বতী রাধাকৃষ্ণ গৌর-নিতাই কত সব ঠাকুর।'

মা বাসুলাই বললেন, 'জানি, নিরাকার থেকে সাকার, সাকার থেকে বহু আকার। কিন্তু বেশি কি হল তোদের? যে মন আমায় তৈরি করেছে সেই মন কত ঠাকুরদেবতা শূন্য ব্রহ্ম পর্যন্ত সৃষ্টি করেছে। বল তো আমি তোদের কোন কথাটা না করেছি? তোমরা [illegible] অসীম অনাদি অনন্তের কাছে পৌঁছে গেছ। তোমাদের আর বেশি কি করলেন? তোমাদের জাতটা নেমকহারাম, তোমরা যত সভ্য মানুষ যারা নিজেকে সভ্য বলে থাক। তাই আমি তোমাদের গাঁ ছেড়ে চলে এলাম। আর ভালো লাগল না সেখানে। শুধু আমার ধড়টা সেখানে পড়ে আছে। আমার বাহন হাতী ঘোড়াগুলোর পা ভেঙে দিয়েছে। কেউ আর নতুন বাহন এনে দেয় না। আমি আর কার ওপর চড়ে মাঝরাতে ঘরে ঘরে সকলের ভালোমন্দ দেখব? ভাবলাম আমায় তো আর কেউ খোঁজে না, এখানে আর থাকি কেন? পালিয়ে এলাম এক নিঃশ্বাসে। এসে এইখানে পড়ে আছি। শুধু পড়ে নেই, বাঁধা পড়ে গেছি। এরা আমায় তাদের সরল বিশ্বাসে বেঁধে ফেলেছে। আমি তাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সব। সবাইকে আমার পাথরের বুকের মধ্যে বেঁধে ফেলেছে এরা। আমি আর ডানা মেলতে পারছি না। কল্পনা আর বিশ্বাসের কাছে বাঁধা পড়ে আছি। তোর বিশ্বাস বড় না কল্পনা বড়? বিশ্বাসকে কল্পনাতে বড় করে আমায় দেখ। আমার পুজো দে। দিবি না?'

বাসুলাই কাঁদছেন, চোখে জল। আমিও কাঁদলাম। বললাম, 'মা কি দিয়ে তোর পুজো করব? তোর কি ভালো লাগবে?'

'তুই ভয় পাচ্ছিস নাকি?' বাসুলাই বললেন, 'আমার বেশি কিছু দরকার নেই। ষাট মণ ঘি চাই না। এই এরা, আদিবাসী ভূমিজরা যা খায় আমি তাই খাই। যা দেয় তাই পাই। আমার আবদার বায়না কিছু নেই।'

আমি বললাম, 'আমি তাই দিলে কি তুই খুশি হবি মা?'

এবার বাসুলাই হাসলেন। বললেন, 'মানুষের মন নিয়ে দেবতা। মানুষের মন যত বড় বড় আশা করবে, তার ঈশ্বর তত বড় হতে থাকবে। সেই ঈশ্বরের পেটও ততই বেড়ে যাবে। এদের মাগন খুব ছোট ছোট। তাই এরা আমায় বড় করেনি। আমার পেটও বড় হয়নি। যা দিবি আমি তাতেই খুশি।'

যা হোক ঠাকুরকে আগে দিয়ে পরে নিজে খেত। পুজো-পার্বণ, বার-ব্রত, আনন্দ উৎসব সব ঠাকুর দেবতার নামে হত। এখন নাচগান, সিনেমা, থিয়েটার, পার্টি, মোচ্ছব, কলা সাহিত্য সব বিনা-ঠাকুরে চলে। ঠাকুরের নাম করে কেউ কিছু করলে সেটা সেকেলে বলে সবাই হাসে। আদিবাসীরা নেমকহারাম নয়। ক্রিয়াকর্ম পুজো-পার্বণ সবেতে আমি। আগে আমি। বিয়ে-শাদি, শুদ্ধিশ্রাদ্ধে আমি না হলে চলে না। আমাকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ হয় না। ছলনা নেই, কপটতা নেই। তরল মন নিয়ে এরা যখন আমাকে কাতর হয়ে ডাকে আমি জেগে ওঠি। তখন যা কিছু মনের ভিতরে থাকে সব উজাড় করে দেয় আমার কাছে। আমি পূরণ করলে করি, না করলে কখনো কিছু বলে না। ডানা ভেঙে গেলে পাখি যেমন কাহিল হয়ে নীচে পড়ে যায়, তেমনি এরা আমার সামনে পড়ে যায়। আমার এই যে পাথরের শরীরটা দেখছিস, তার যতসব সরু মিহি অণু-পরমাণু সেগুলো সব কেঁপে ওঠে। সব ফেটে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে বাজি পড়ার মতো। অণুগুলো একটা একটা করে ফোটে। কিন্তু চোঁ-চাঁ শব্দ হয় না। তাতে মানুষ কেউ মরে না, উল্টে মরা জিনিসগুলো জ্যান্ত হয়ে ওঠে। এই যে ডঙ্গর পাহাড় দেখা যায় তার বুকও ধক ধক করে।

এই গাছ-পাতা নিশ্বাস নেয়। তুমি তো এখানে এতদিন হল এসেছ। এখানকার পুকুর, ঝরণা, বাতাস, বৃষ্টি কবে কখনো ছুঁয়েছ? ছুঁয়ে দেখো। তোমার বুক কেঁপে উঠবে। কেঁপে না ওঠে তো আমায় বোলো। তুমি বুঝতে পারবে, তাদের ছুঁলে তাদের গহন মনের ভাষার সঙ্গে তাল রাখা যায়। বোঝার লোক বুঝতে পারে। শুধু কি ভজন গাইলে হয়? এই সম ফাঁককে লক্ষ্য কর। তবে গিয়ে তাকে পাবে। আচ্ছা, আমি চলি। আমায় পুজো দেবে তো? ভুলো না।'

"তুই পুজো দিলি?" জিজ্ঞেস করল কাশী।

"না দিয়ে উপায় ছিল?" দীনু বলল। "আমি পুজো দিই নীরবে। আগে হাত জোড় করে নমস্কার করতাম। স্বপ্ন দেখার পর থেকে ঠাকুরাণীর কাছে যাওয়া মাত্র আপনি মাথা নুয়ে যায়। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

একদিন দণ্ডবৎ করে আশ্রমে ফিরছি, আমার পথে 'বেজু'র বাড়ি পড়ল। বেজু আমায় দেখে ডাকল। 'মাপ্রু, এস। আমার বাড়ি আসবে না?'

গেলাম, খাটিয়ার ওপরে গিয়ে বসলাম। বেজু বললে, 'মাপ্রু, মেয়েকে একটি পারথনা শিকিয়ে দিন। সেই সে পারথনা তুমি গাও— দীনবন্ধু দইতারি— সেইটে..... এই যে, মেয়ে এসেছে। বস মা বস।' চিনমিন একটা মোড়া এনে বসল। আমি গাইলাম—

দীনবন্ধু দইতারি দুঃখ ন গলা মোহরি
হেল কি নিঠুর চিত্ত নীলাচলে বিজে করি—

গান শিখিয়ে সেদিন আমি চলে এলাম। চিনমিনকে নতুন দেখিনি সেদিন। আগে সে আশ্রমে ছিল। ঘরে থাকার বয়েস হওয়াতে ওর বাপ তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। তারপরেও আমি কয়েকবার দেখেছি তাকে তাদেরই বাড়িতে। সলাজ চোখ। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু সেদিন চিনমিন আমাকে আর এক ভাবে দেখেছিল।

অনেকদিন কেটে গেল। একদিন হঠাৎ বেজু এসে আমার পায়ে আছড়ে পড়ল— 'মাগ্রু, আমার মেয়েকে রক্ষা কর'। ভয় পেয়ে গেলাম প্রথমে। ভাবলাম চিনমিনের বোধহয় কোনো অসুখ করেছে। কিন্তু বেজু যা বলল শুনে আশ্চর্য হলাম। বললে— 'আটদিন হয়ে গেল ধাংড়া ধাংড়ি ঘরে ছেলেমেয়েরা সব নাচছিল একসঙ্গে। ব্যস, ওইটুকু। মেয়ে রাজি হয়নি। ছেলেটা গিয়ে গাঁয়ে বলে দিল চিনমিনকে সে বিয়ে করবে। গাঁয়ের লোক এসে জবরদস্তি আমার মেয়ে রাজি না থাকলেও টেনে নিয়ে গেল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে এখন কোথায়?'

'কেজানে বাবু, কার ঘরে আছে। খালি কাঁদছে নাকি। এই যে দেখ চিঠি লিখেছে, বিষ খাবে বরং, ওই ছেলেকে সে বিয়ে করবে না।'

আমরা জনকয়েক আশ্রম থেকে বেরোলাম সেই গাঁয়ের দিকে। আদিবাসী সমাজে এই পাশবিক বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ততদিনে আমরা রীতিমতো আন্দোলন চালিয়েছি। অনেক গাঁয়ে আমাদের কথা মেনে নিয়ে আমাদেরই ঢঙে পুরোহিত ডেকে মন্ত্র পড়ে হোম করে বিয়ে দেয়। রাজি হয়ে রাজি করিয়ে সব করে। জোরজবরদস্তি নেই। তাতে তারা সকলে খুশি। কন্যাপক্ষ বরপক্ষ উভয়েই। বরের তরফ তো বেশি কারণ তাদের আর কনে টেনে আনতে হবে না। কনেরাও টানাহেঁচড়া থেকে রক্ষা পেয়ে আমাদের ধন্য ধন্য করছিল।

তবু কতক পুরুষের অভ্যাসটা যেতে চায় না। শনিয়া গিয়ে ওর গাঁয়ে গিয়ে বলল চিনমিনকে ওর পছন্দ। ওর গাঁয়ের লোকেরা এসে বলে গেল অমুক দিন সন্ধ্যার দিকে তারা এসে চিনমিনকে টেনে নিয়ে যাবে। বেজুও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। সেও তার গাঁয়ের লোকদের তৈরি রাখল। হল দু-দলের মধ্যে মারপিট। মাথা ফাটল কয়েজনের। বরের গাঁয়ের লোক মার খেয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু রাগ পুষে রাখল মনে মনে। তক্কে তক্কে রইল, মেয়েকে একা পেলে টেনে নিয়ে যাবে।

একদিন হল কি বাপেতে মেয়েতে এসেছিল আশ্রমে বেড়াতে। এরকম তারা মাঝে মাঝে আসত। চিনমিন ওর সঙ্গীসাথীদের মাঝে হেসে খেলে বেড়ায়। বেজু আমাদের সঙ্গে রাজ্যের গল্প করে। সন্ধ্যার আগে চলে যায়। সেদিন ফেরার সময় শনিয়ার গাঁয়ের লোকেরা রাস্তায় ওত পেতেছিল। নিরালা জায়গা দেখে আগে বেঁধে ফেলল বেজুকে। তারপরে মেয়েকে ধরে নিয়ে পালাল।

আমরা সব গিয়ে মেয়েটাকে সেই গাঁ থেকে উদ্ধার করে আনলাম। মেয়েটা ছিল মংলু-জানি মুখিয়ার বাড়িতে। মংলু আমাদের কথা মানল। গাঁয়ের লোক মেয়েটাকে ছেড়ে দিল। আমরা বললাম মেয়ের বিয়ে করিয়ে দেব বেদীতে বসিয়ে। এরকম জোরজবরদস্তি ভাল নয়। মংলু বললে মেয়েকে বল, যদি রাজি হয় তাহলে বেদীতে বসিয়ে বিয়ে দেওয়াতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল। সে বললে, শনিয়া লেখাপড়া করেনি, ভজন গাইতে জানে না, সে তাকে বিয়ে করবে না।

মংলু একটা শর্তে মেয়েকে ছেড়ে দিল। মেয়ে তার বাপের বাড়িতে আর ফিরবে না। আশ্রমে থাকবে। আমরা তার বিয়ে করিয়ে দেব।

মেয়েটি এসে আশ্রমে রইল একজন মাস্টারের বাড়িতে। তার পরিবার ছিল। আমরা বর খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। মংলুজানির খুব প্রতিপত্তি ওই অঞ্চলে। সে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর করে দিল কেউ যেন চিনমিনকে বিয়ে না করে। যে বিয়ে করবে সে তার ফল পাবে। শুনে চিনমিন খালি কাঁদল। সন্ধ্যাবেলা যখন প্রার্থনা গান করে চোখ থেকে ওর শুধু জল ঝরে।"

দুঃখী বললে, "তখন দীনবন্ধুর হৃদয়ও গলে যায়!"

ঘন বললে, "তারপর সাক্ষাৎ দীনবন্ধু এসে দুঃখহরণ করলেন।"

কাশী বললেন, "মাঝখানে একটা কথা বাদ দিয়ে গেলে।"

"সেটা কি?" ঘন জিজ্ঞেস করল।

"প্রেম", কাশী বললে, "প্রেম না হলে দুঃখীর দুঃখ যাবে কি করে?"

"প্রেম-ট্রেম কিছু নয়"— দীনবন্ধু বললে। "আমি তো বিয়ে থা করিনি, তাই আমাদের মাষ্টাররা সব ফিসফাস করল। চিনমিন যাঁর বাড়িতে ছিল তাঁর স্ত্রী চিনমিনকে জিজ্ঞেস করলেন। চিনমিন রাজি হয়ে গেল। তারপর—"

"তারপর ছেলেও রাজি মেয়েও রাজি!" সকলে হো হো করে হাসল।

এখন দীনবন্ধুর দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। বিয়ের পর দীনু কয়েকদিন আশ্রমে রইল। তারপরে নিজের গাঁয়ে চলে এল। এদিক্কার গ্রামটা চিনমিনের ভারি বিচ্ছিরি লাগে। সে রাত থাকতে উঠে ঝরণায় জল আনতে যেতে পারে না। সকালে উঠে সে দোরগোড়ায় তাকায়। গাঁয়ের ধাংড়ি বউ মানুষ কাউকে দেখতে পায় না। কান পাতে। বাঘের ডাক শোনা যায় না। ঘরের ভিতরে ফিরে যায়। খুব নিরাশ হয়। এখানে তার কেউ সঙ্গীসাথী নেই। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে না। সবাই তার থেকে ছাড়া ছাড়া, আলাদা। তাদের সঙ্গে নেচে কুঁদে, গান গেয়ে, হেসে কেঁদে, খোঁপায় ফুল গুঁজে মনের ভারটাকে চেপে দলে দেওয়া যায় না। ভারি ভারি মনটা আরো চেপে বসে। মানুষে ভরা গাঁয়ের মধ্যে সে নেহাত একা। চারদিকে খাঁখাঁ করে। বাড়িতে কেউ নেই। সংসার বলতে একজন ওই দীনবন্ধু। শাশুড়ি শ্বশুর, ননদ জা সবার কাছ থেকে আলাদা। সকলে আলাদা করে দিয়েছে তাকে আর দীনবন্ধুকে। সে মনের কথা মনেই চেপে পড়ে থাকে। কাকেই বা বলবে!

একটির পর একটি করে তিনটি বাচ্চা হল। তিনটিই ঈশ্বরের দূত। দেখলে পেট ভরে যায়। পেট নয় বুক। বুকটা ফুলে ওঠে। মনটা ওর উঁকি মারে, খুশির ঝরকার পথে আকাশের ওধারে। কখনো মন উড়ে যায় সেই পাহাড়ে ঘেরা ঝরণাধোয়া বনজঙ্গলের কোমল ছায়া-মাখানো রাজ্যে। হঠাৎ ওর কল্পনায় ধাক্কা লাগে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সব। হাত থেকে বাসন খসে পড়ে। বড় ছেলেটা সাত-আট বছরের। এসে নালিশ করে। প্রধানের ছেলে ভীমা তাকে

মেরেছে। মুখ থেকে কথা ফুরোতে না ফুরোতে প্রধানের বউ তেড়ে আসেন। রাঁড়ের বেটা, কোন সাঁওতাল কন্ধ ঘরের মেয়ের বেটা তাঁর ছেলের সঙ্গে সমান হবে? তাঁর ছেলের সঙ্গে লাগে, মেরেছে তো কি হয়েছে? আচ্ছা করে যে ছেঁচে দেয়নি এই ভাগ্যি!

চোখে জল বয়ে যায় চিনমিনের। দীনবন্ধু শুনতে পায়। কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে লাঙলটা — খুব ভারি ভারি লাগে।

কিই বা আর করত? উপায় কি? শেষে গাঁ ছেড়ে উঠে এল দীনু। ওর জন্মমাটি ওই গাঁ। কত মায়ামমতা-মাখা ছেলেবেলার স্মৃতি জড়ানো। তবু তার বাধল না ছেড়ে আসতে। তার পা টেনে ধরে রাখল না সেই মাটি।

কারো মুখ থেকে আহা বলে একটা রা-ও বেরোল না। সে চলে যাচ্ছে শুনে কতজনে কত কথা বলল। নিন্দা করল, টিটকারি দিল— বউয়ের আঁচলধরা! বাবা-মা তেমনি দেখতে থাকল। বাড়িঘর সম্পত্তি সব তেমনি পড়ে রইল। সে ভাবল ওটাই ওর ভাগ্য। ভগবানের নির্দেশ। ওর বিপ্লবী হওয়ার কল্পনা এইখানে যেন সার্থক হয়ে গেল। এত বড় একটা পাঁচিল চীনের বিরাট প্রাচীরের মতো তার দেশটার ছাতির ওপরে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটিও ইঁট কেউ বার করেনি। আরো ইঁট দিয়ে চুন দিয়ে উঁচু করেছে বরং। সেই পাঁচিলটাকে ভাঙতে মন চাইল। ঘা দিল। আঘাতের পর আঘাত লাগল। প্রতিধ্বনি তাকে ব্যঙ্গ করেছে। তবু ঐ পাঁচিল ভাঙেনি। সে-ও ভেঙে পড়েনি।

এই গাঁ ওর জন্মমাটি। এইখানে একটি আঁতুড়ঘরে সে কঁকিয়ে কেঁদেছিল অনেকদিন আগে। কত বছর পার হয়ে গেছে। সে কত বড় হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে। এই গাঁয়ে তার বাপ ভাই, কাকা কাকী, দাদা বউদি জ্ঞাতি-কুটুম কে নেই? কেউ কোথাও যায়নি। সবাই আছে। সে চলে যাচ্ছে নিজেই। তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়নি। কেন সে যাচ্ছে তবে? হ্যাঁ সে যাচ্ছে— পরকে আপনার করতে। দূরকে নিকট করতে। দুনিয়াটা কত ছোট হয়ে গেছে। এক বছরের পথ একদিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের মনটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। মনের বোঝা সে বইতে পারছে না। ভাবের অভাব। ভালোবাসার আকাল। সেই জন্যে নিকট দূর হয়ে যাচ্ছে। দূরকে নিকটতর করবে কে? ভাবকে নিকটে, অভাবকে দূরে?

হৃদয়কে হৃদয়ে মেশানোর জন্যে এই যে রাস্তা পড়ে আছে সে পথে চললে পাথেয় ছেড়ে যেতে হয়। সব ছেড়ে যেতে হয়। মনকে খোলা রেখে এগোতে হয়। একথা কেউ বোঝে না।

ওড়িশাকে যারা দুভাগ করে বসে আছে, একদল মানুষকে উপোসে রেখে নেংটা করে নিজে খেয়েদেয়ে মোটা হচ্ছে, তাদের সে খাতির করে না। এ পথে যত বাধা বেড়া আগল সব সে ভেঙেচুরে এগিয়ে যাবে। যারা সামনে পঞ্চাশ-একশো বছর পরের দিকে চেয়ে দেখতে পারে না, দেখতে চায় না, জেগে ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগিয়ে তোলা অন্ধকে চোখ দেওয়ার মতো। সে দায়িত্বটা কি আর কারো নয়, তারই একার? তাই না হয় হল। সে বেঁচে থাকতে ওড়িশাকে ভাগ ভাগ হয়ে যেতে দেবে না। একই উঠোনের মাঝখানে সে দেওয়াল তুলবে না। একটা কেয়ারির মধ্যিখানে সে আল বাঁধবে না। সে-পার থেকে এসে ঢুকছে অন্য অন্য

জায়গার লোক, পরদেশী। তাদের আমরা আপনার করে নিচ্ছি, এদিকে আপনার জন পর হয়ে যাচ্ছে। না, সে যা করেছে ঠিক করেছে। সে সব ছেড়েছুড়ে যাবে— মা-বাপ, ভাই, বোন, জ্ঞাতি-কুটুম সকলের মায়া কাটিয়ে চলে যাবে কেবল সেই কারণে।

তাকে ওই ডঙ্গরের ঠাকুরাণী ডাকছেন। সে তাঁকেই পুজো দেবে। সেখানে মানুষ পাথরকে পুজো করে আর প্রকৃতি পুজো করে মানুষকে। সে যাবে ওই দেশে। সে তো পরদেশ নয়, স্বদেশ। যে যা বলার বলুক। সে বুঝতে পেরেছে। ছার একটা মেয়েছেলের জন্যে ঘরদোর বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না। সে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেনি। ওর সাথীরা যখন প্রস্তাব দিল, সে অনেক চিন্তা করার পরে রাজি হয়েছিল। অনেক ভেবেছে। রাতের পর রাত ঘুমোয়নি। সে শুধু আপনাকে সন্দেহ করেছে এতবড় বিপ্লবের জন্যে সে প্রস্তুত তো? ওড়িশাটাকে এক করতে হবে। অদিবাসী আর অন্যান্য ওড়িয়াদের ভিতরে ভেদের পাঁচিলটাকে ভেঙে ফেলতে হবে। ওড়িশা আর ওড়িশার আদিবাসী এক। কোরাপুট, ফুলবানী, পুরী, কটক এক— দুই নয়, তিন নয়, বারো নয়, তেরো নয়। রক্ত এক, ভগবান এক। বাপ-ঠাকুর্দার মাটিকে সে আবার পেতে চলেছে। সে মাটিও ওর জন্মমাটি। সে বিদেশে যাচ্ছে না। দূরদেশে যাচ্ছে না। এই খেত, এই মাটি, এই জল, এই বাতাস সেখানেও আছে। সেদিক থেকে ঘনকালো মেঘ উঠে আসে, এদিকে বৃষ্টি করে দিয়ে যায়। মসৃণ সবুজ ধানক্ষেত টিয়ারঙের করে দেয়। সে মাটি তারই মাটি। সে ভুঁই তারই ভুঁই।

সেই যে বাড়ি ছেড়ে গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল দীনু, এই ফিরল। দশ বছর পরে। শুধু দুঃখী ডেকেছে বলে। আর কেউ ডাকলে আসত কিনা সন্দেহ। সব কথা শুনল, পরামর্শ দিল। কিন্তু একটা চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সে তার কর্মকেন্দ্র সেখান থেকে তুলে আনতে পারবে কিনা। সে অঞ্চলে কাজ করার যে আনন্দ আছে এখানে তা পাওয়া নাও যেতে পারে। আর, সেখানকার কাজ এলোমেলো রেখে এখানে উঠে আসতে পারবে কি?

মনে পড়ছিল ওর সাহুকারের কথা। তার চেহারাটা চোখের সামনে নেচে উঠল। মাথায় তিলকফোঁটা জ্বলজ্বল করছে। কাপড়খানা দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরা। হাঁটুর নীচের কাপড় তুলে উল্টিয়ে কানি দুটো কোমরে গোঁজা। একটা কালো কোট গায়ে, গলা থেকে পেট অব্দি বড় বড় বোতাম লাগানো। কত মাস কিম্বা বছরের ময়লা চিট ধরেছে তাতে। দুই কানের গোড়ায় ও গালে দুপাটি তিলক। ঘামে ধুয়ে না গিয়ে সেটুকু এখনো পরিষ্কার দেখা যায়। কারো দুঃখ আবেদন না শোনার সে যে পণ করেছে সেটা মনে করিয়ে দেয় সেই তিলক। তার ছায়া দেখলে লোকের বুক কাঁপে। ওর কবল থেকে খসে পালানোর উপায় কারো নেই। দীনুকেও একদিন তার দোরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। তার বাড়ির শক্ত খুঁটিগুলো মানুষের হাড়ের সঙ্গে ঘা খেতে খেতে যেন আরো মজবুত হয়ে গেছে। বাড়ির পাথরের দেওয়ালের ভিতরে হাওয়া ঢোকার ফাঁক নেই। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে মানুষের গরম নিঃশ্বাস আর গায়ে লাগে না। অকলন পোতা মাল আর ধানের মরাইগুলো সব ওই সরল মানুষগুলোর অক্ষমতা দেখে হাসে। একদিন নেহাত অসুবিধায় পড়ে সে সাহুকার থেকে একশো টাকা উধার এনেছিল। সুদ দিতে দিতে কাহিল হয়েছে। এখানে চলে এলে সুদে-আসলে গুণে দিয়ে আসতে হবে।

সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তার অত্যাচার থেকে লোকগুলোকে রক্ষা করা। সেখানে আইনকানুন কিছু নেই। আইনকে আশ্রয় করলে মরবে, না করলে মরবে। সাদাসিধে আদিবাসীরা কিছু জানে না। আইনকানুন বোঝে না। বহু যুগের অভ্যাস। অভ্যাসের দাস তারা। সাউকার যা বলে তাই। সে দেবতা। বিপদে ভরসা। সে বরং জমিজমা ঘরদোর সব নিয়ে নিক, তাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

আপন্না সাউ-এর ঠাকুরর্দা বা ঠাকুর্দার বাপ এসেছিল গঞ্জাম বহরমপুর থেকে। কষিতে দশটা টাকা গুঁজে। এখন তার নাতি দশহাজার টাকার মালিক। লোকে বলে আপন্না সোনার ইঁট পুঁতে রেখেছে। পাপকে পুঁতে ফেললে আর পাপ হয়ে থাকে না। তাকে কেউ দেখতে পায় না। জানতে পারে না। পাপটাই আপন্নার ভগবান। আপন্না পাপকেও দেখেনি।

ওর অত্যাচার থেকে আদিবাসীদের রক্ষা করতে হবে। দীনবন্ধু একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি করেছে। সে নিজে দেখাশোনা করতে পারত না। কটকের এক ভূ-দান কর্মীকে এনে রাখল। সে হল সম্পাদক। নিজে রইল সভাপতি। প্রথম দিকে সে সব দেখত। পরে নানা কাজের ঝামেলায় সব ছেড়ে দিল সম্পাদকের হাতে। গ্রামবাসীরা সোসাইটির জন্যে একখানা ঘরও বানিয়ে দিল। সম্পাদক মশায় সেখানে থাকতেন। একদিন হিসেব মেলাতে গিয়ে টাকার ঘাটতি পড়ল। সেইদিন রাতে দেখা গেল ঘরে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হিসেবের কাগজপত্র সব জ্বলেপুড়ে ছাই। সবাই বললে আপন্নার লোক আগুন লাগিয়েছে। পুলিশে খবর দেওয়া হল। পুলিশ এল। থানাবাবু আপন্নার বাড়িতে খেয়েদেয়ে শুয়ে থানায় ফিরে গেলেন। কারো কিছু হল না।

আর একদিন দীনু যাচ্ছিল একা জঙ্গলের রাস্তায়। ভাগ্যিস ওর হাতে একটা লাঠি ছিল। না হলে সেদিন ওর প্রাণ চলে যেত। দুটো ষণ্ডামার্কা লোক সামনে এসে দাঁড়াল। একজন দীনুকে মারবে বলে লাঠি তুললে দীনু এমন এক ঘা দিল যে উঁচিয়ে ধরা লাঠিটা দশহাত দূরে ছিটকে পড়ল। অন্য লোকটি দীনুর মাথা লক্ষ্য করে ঘা দেবার সময় দীনুর লাঠির সঙ্গে ঠোক্কর লেগে তার লাঠিটা দুখানা হয়ে গেল। জেলের মধ্যে দীনু দুঃখী কাশী সকলে ছোরা লাঠিখেলা আর যুযুৎসু শিখেছিল, সেটা এতদিনে কাজ দিল। লাঠি ফেলে সে মরদ দুটো তেড়ে এসেছিল তাকে ধরে গলা টিপে দিতে। দীনু এমন যুযুৎসুর প্যাঁচ কষল যে তারা খানিকটা দূরে পড়ে উঃ আঃ করতে লাগল। দীনু দৌড়ে দূরে পালিয়ে বাঁচল।

না, সে জায়গা ছেড়ে সে আসতে পারবে না। লোকগুলো অরক্ষিত হয়ে যাবে। দুঃখীকে সে বোঝাতে চাইল।

সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছিলেন বুঝি। দুঃখীর দোরগোড়ায় ভাগু মহান্তির স্ত্রী। আকাশ থেকে পড়ার মতো। দুঃখী ওর চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বুড়ি পাকাচুলে সিঁদুর পরেছে। হাতে বেশ কয়েক গাছা শাঁখা। বাহুতে পাঁচ ভরি ওজনের অনন্ত। গলায় তিনগাছি সোনার সাপসুতা। কানে চম্পাকলি। সকলের চোখ টেরা। গিন্নি ঠাকরুণকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখেনি কেউ আজ পর্যন্ত। কবেকার কালে ঠাকরুণ ছিলেন, এখন তো সরপঞ্চ-গিন্নি। গুমর না জানি কত। তিনি আজ অকস্মাৎ দুঃখী দাসের বাড়িতে?

কাল সকালে পুলিশ আসবে। জমির দখল নেবে গাঁয়ে। লোকেরা একজোট হয়েছে, ছেড়ে দেবে না। তুমুল গণ্ডগোল হবে। চাষীদের নেতা রাধাগোবিন্দবাবু নিজে। গোটা গাঁয়ের মজুররা একজোট হয়েছে— যার জমি আছে, যার নেই সকলে এ গাঁয়ে মিল বসাতে দেবে না।

এগুলো সব ভুল কথা। রামবাবু বোঝাচ্ছেন লোকদের। লেগে পড়েছেন জোটকে ফাটিয়ে দেবেন। তাঁর মাথা এখন গিয়ে আকাশে ঠেকেছে। বিধানসভাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ভারতবর্ষে যদি কোনো দলের নীতি থাকে তবে সে হল কম্যুনিস্ট দল। যদি কোনো দলের শৃঙ্খলা থাকে সে হল কম্যুনিস্ট দল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় ওড়িশার এই মুখ্যমন্ত্রী। গত নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় হাসিল করা কংগ্রেসের সেই যুবনেতা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে রামবাবু নাচছেন।

তাঁর সঙ্গে মিলেছে ভাগু মহান্তি। ভাগু মহান্তি রামবাবু এক। বাঘ বকরি এক ঘাটে জল খাচ্ছে। কংগ্রেসশাসন কি না করল!

দুজনে শলাপরামর্শ করছে। বাইরের দালানে ভাগু বসে আছে একটি বেতের আরামচৌকিতে। মেঝেতে বসে আছেন দশ-বারো জন গাঁয়ের লোক। সকলে দিনমজুর। কজন মাইন্দারও আছে ভাগু মহান্তির। রামবাবু বোঝাচ্ছেন। তাঁর জন্যে একখানা ভালো চেয়ার আনানো হয়েছে নতুন ছুতোরের কারখানা থেকে।

বলছেন— "তোমরা সব ভালো করে বোঝ। না বুঝেসুঝে কোনোকিছুতে হাত দিও না। এরা তোমাদের দানাপানিতে ধুলো ফেলছে। কল কি কারো কিছু খেয়ে ফেলবে? যার জমিজমা নেই সে গিয়ে কারখানায় খেটে বেশি মজুরি পাবে। গাঁয়ের জমিওলা লোকেরা কত দেয়? বড়জোর এক বা দেড়টাকা। সেখানে দিনে তিনটাকা। মওকা দেখে স্ট্রাইক করলে, মানে ধর্মঘট— ধর্মঘট— বুঝলে? চার-পাঁচ টাকাও হবে। আমি আছি। সে ভার আমার। আমি তার জন্যে দায়ী রইলাম।"

মজুরদের একজন বললে, "আজ্ঞে আমরা তেড়া মেড়া কিছু জানি না। আমরা সোজা রাস্তায় যাবার লোক। তুমি আপনি আমাদের ভালোর জন্যে তো বলছ। না কি হে, বলছ না কেন?" হাঁ - হাঁ, সকলে হাঁ ভরল। কেউ বলল 'ভালো নয় তো কি মন্দর জন্যে?' আর কেউ বলল 'তা নয়তো কি।'

সেই লোকটি বলল, "আমাদের কি করতে হবে বল।" রামবাবু বললেন, "যে তোমাদের দানা মারবে, তোমরা কি তাকে অমনি ছেড়ে দেবে?" আর একজন মজুর বললে, "বাবু, হাতে মারলে সওয়া যায়, ভাতে মারলে সইবে না।"

অন্য একজন বললে, "আমার দানা যে মারছে আমি তাকে দেখে নেব।"

অন্যজন বললে, "দানাপানি মারাটা কম কথা নয়। বরং এক ঘা কষে দাও। দানা নিয়ে নিলে তো একটু একটু করে জ্বলেপুড়ে মরা। তাদেরই তো খুনী বলে। বালুঙ্গাদা বলছিল পুরাণে আছে ওদের মারলে দোষ হয় না।"

রামবাবু নেচে উঠলেন ওর কথায়। "বাহ, দেখ দেখ, এদের আবার দুখীননার দল বলে

মূর্খ, গাধা। ওরে, তোদের বুদ্ধিকে তো উকিল মোক্তারেও পারবে না।"

ভাগু মহান্তি বললেন, "সাবাস, সাবাস। এদেরই বলে মানুষ।"

প্রথম লোকটি আবার বললে, "বাহবা তো দিলেন অনেক। তাতে কি পেট ভরবে? কি করতে হবে বল। আমাদের দানাপানি যাতে থাকে তার উপায় কর।"

ভাগু বললেন, "উপায় তো সোজা, না কি বল রামবাবু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," রামবাবু বললেন, "তারা কি অরাজি হবে? আমরা যা বলব তারা তাই করবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। জরুর জরুর। আলবাত আলবাত।" সকলের মুখ থেকে বেরোল।

রামবাবু বললেন, "দেখ, ভয় করবে না। চুপচাপ থাকবে। সরকারি লোক ছাড়া যে সেই জমির ওপরে যাবে.... না কি বলেন কর্তা?"

"বেশি নয়, একটা করে ঘা," ভাগু মহান্তি পুরণ করে দিল। "তারপর যা হয় আমি বুঝব।"

"হবে আবার কি? সরকার আমাদের পিছনে। পুলিশ আমাদের পক্ষে। ভয়ডর কাকে?"

এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। সকলে তাকাল বাইরের দিকে। মোটরের দোর খুলে বেরিয়ে এলেন চিরঞ্জীলাল। মাথায় গোলাপী রঙের পাগড়ি। গায়ে লম্বা সিল্ক কোট। মালকোচা দিয়ে পরা সরু ধুতি। পায়ে নাগরা।

"সরপঞ্চ সাব হৈঁ? সরপঞ্চ সাব?" সকলে উঠে দাঁড়াল।

"জয় রামজী কি, জয় রামজী কি।" ভাগু মহান্তি রামবাবু নমস্কার করল। মজুররা মাথা নুইয়ে প্রণাম করল।

"আসুন আসুন, বসুন" বলে ভাগু চৌকি ছেড়ে দিলেন। ভাগু মহান্তি চিরঞ্জীলাল দুজনে 'আপ বৈঠিয়ে,' 'আপনি বসুন' বলতে বলতে দু-এক মিনিট গেল। একজন মাইনদার দৌড়ে গিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে চেয়ার একটা নিয়ে এল বাবুর জন্যে। চিরঞ্জীলাল আরামচৌকিতে আরাম করলেন। ভুঁড়িটা চৌকির হাতলের ওপরে দু-ইঞ্চি উঠে রয়েছে। পা দুটো লম্বা করলেন। ভাগুবাবু এগিয়ে দিলেন একখানা টুল পা রাখার জন্যে। চিত হয়ে চিরঞ্জীলাল বললেন— "রামবাবু, কি হোবে?"

রামবাবু বললেন, "সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"ক্যা, হামলা কোরবে?"

ভাগু মহান্তি রামবাবু দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, "বিলকুল তৈরি। সব ব্যবস্থা হয়েছে।"

"ডরিবে নেহি" চিরঞ্জী বললে, "যেত্তা রুপিয়া খরচা হোবে আমি আছি। অভি লো। পিছে ঔর দেবো। কাম খতম করো।"

টাকার থলি একটা ফেলে দিল লোকদের দিকে।

ভাগু মহান্তি জিজ্ঞেস করল চিরঞ্জীলালের কানের কাছে, "কত?"

"পাঁচ", মারোয়াড়ি বললে।

রামবাবু বললে, "এখন পাঁচশো রাখ। তোমাদের কাজ দেখে শেঠজী আরো বকশিশ দেবেন।"

মজদুররা উঠে পড়ল। তাদের মধ্যে যে একটু পাঁয়তারা দেখাচ্ছিল সে উঠে আগে নমস্কার করল। হাতে টাকার থলি ধরা। "কর্তা আমরা যাই।"

ভাগু মহান্তি বললে, "আচ্ছা যাও। তোমরা দশজন আছ। পঞ্চাশ করে ভাগ করে নিও।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা, আমরা সব সমান সমান ভাগ করে নেব।"

রামবাবু বললে, "দেখ হুঁশিয়ার, শিকার যেন খসে পালিয়ে না যায়।"

লোকটা বললে, "হেঁ হেঁ, শালারা আমাদের দানা মারবে আর আমরা ছেড়ে দেব? কর্তা, রামবাবু, আমাদের বউবাচ্চাদের দেখবেন।"

ভাগু মহান্তি বললে, "আরে, পরোয়া কিসের? আমাদের পিছনে সরকার আছেন রক্ষা করতে। আমি যা বললাম মনে আছে তো? তোদের গায়ে যদি কেউ আঙুলও ছোঁয়ায় তোরা চিল্লাবি — 'মেরে ফেললে গো, মেরে ফেললে গো' বলে। তখন পুলিশ তার কাজ করবে। তোমরা খালি কানে শুনবে ফটফাট শব্দ। না কি বলেন রামবাবু?

অন্দরে বসেছিলেন গিন্নি ঠাকরুণ। ঝি চাকরানীদের কেউ গিয়ে বললে, "মা ঠাকরুণ, মানুষ নয় একটা একটা হাতী এয়েছে। ইয়া বড় পেট। পেট নয়, জালা। দেখগে যাও।"

গিন্নি জানালার ফাঁকে তাকালেন। সব কথা শুনলেন। তাঁর চোখ কপালে উঠল। আর সামলাতে পারলেন না। গাঁয়ে গণ্ডগোল হবে। আবার নাকি পুলিশ আসবে। ধনিয়ার মতো কয়েকটা গড়িয়ে পড়বে। কারো মা আঁটকুড়ি হবে, কারো বউ বিধবা হবে। বুড়োটার এই বুদ্ধি! একপ্রস্থ গাল পাড়লেন মনে মনে আপনার স্বামীর উদ্দেশ্যে। ছুটে গেলেন দুঃখীকে খবর দিতে। কারো বারণ শুনলেন না। বাড়ির বাইরে একা পা বাড়ানো গিন্নিমার এই প্রথম।

দুঃখী চিনতে পারল। হাঁ, তিনিই বটে। কোন ছেলেবেলায় দেখেছিল। তবু মোটামুটি চেহারাটা মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল দুঃখী। গিন্নিঠাকরুণের কাছে দাঁড়াল।

"কি মনে করে মা? সব ভালো তো?"

কেঁদে ফেললেন গিন্নিমা। ভাগু মহান্তির ঘরনী। সরপঞ্চের স্ত্রী।

"মা, কাঁদো কেন? কি হয়েছে?" দুঃখী বললে।

"এই গাঁ কি আর থাকবে? সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাল সকালে পুলিশ আসবে। আমাদের দালানে শলাপরামর্শ হচ্ছে। উনি, রামবাবু আর একটা ভুঁড়িওলা মারোয়াড়ি।"

একটু একটু করে সব বলে গেলেন গিন্নিঠাকরুণ যা শুনেছিলেন। শেষে বললেন, "দুখী, লক্ষী ছেলে আমার, গাঁটাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর। বাঁচাও। আমি যাই মহাদেবের মাথায় জল চড়াই।"

বুড়ি ফিরলেন। দুঃখী নমস্কার করল। চার পা এগিয়েছেন। ফিরে দাঁড়িয়ে দুঃখীকে ডেকে

বললেন, "শোন দাসের পো, আমি বলে দিলাম, তাদের তরফের কারো গায়ে যেন টিপ ছোঁয়াবে না, আর যাই কর না কেন। এই যে নাও। সকালে তোমাদের লোক গিয়েছিল তাঁর কাছে চাঁদার জন্যে। গালমন্দ খেয়ে ফিরে এসেছে। এটা এখন আমি দিচ্ছি, নাও। তোমাদের কাজে আসবে।"

বুড়ি বাহু থেকে সোনার অনন্তটা বার করে ধরিয়ে দিলেন দুঃখীর হাতে। দুঃখী অবাক হয়ে চেয়ে আছে। নেবে না তো বলতে গিয়ে দেখে বুড়ি সেখানে নেই। দুঃখী ফিরে এসে ঘন, কাশী, দীনু সবাইকে বলল। শুকুরা খানিকটা দূরে ছিল। দৌড়ে এসে বললে— "কে গ্রামদেবতী ঠাকুরাণী?" সারা গা তার কাঁপছিল।

তুলসীতলায় সাঁঝের বাতি দিয়ে প্রণাম করছিল রতনী। দুঃখী বললে, "না রে, তিনি তোদের গিন্নিমা ঠাকরুণ। ভাগু মহান্তির স্ত্রী।"

"অ্যাঁ!" কাঠ হয়ে চেয়ে রইল শুকুরা।

গিন্নিঠাকরুণ যখন ফিরে এলেন তখনো দালানে বৈঠক চলছে। মজুররা চলে গেছে। আর একজন নতুন মানুষ এসে বসে আছে। পুলিশ। পুরো উর্দিপরা। টুপিটা খুলে রেখে দিয়েছে বেঞ্চির ওপরে। বলছে—

"হেঁ হেঁ, শেঠজী কি যে সে লোক। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধরমভাই। কখন কি হয়। থাক থাক, টাকাকড়ি আমার কি হবে? আমার কাজ আমি করব। নিজেই দেখবেন। আমার কাজে হেরফের নেই। পাকা কাজ। আমি রেডি। তবে ম্যাজিস্ট্রেট কি করবেন বলা যায় না। তাঁকে কিছু না দিলে কাজ বানচাল হয়ে যেতে পারে। বুঝলেন শেঠজী?

"হামি তৈয়ার আছে। পরন্তু কোন দিবে? হামকে তো বড়া ডর।"

"সে চিন্তা আপনার করতে হবে না। আমায় দিন। আমি দিয়ে দেব।" বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টারবাবু।

"না, না, অবিশোয়াস হামি ক্যোঁ করবে? বাত হল সে আপসে রুপিয়া লেবে তো? ঔর আপ দিতে পারবে তো? অগর তোখড় হাকিম হোবে তো আপকা নকরি যাবে। হামার তো বড়া ডর। সমঝে কি নেহি?"

পুলিশবাবু হেসে হেসে বললেন, "সে-সব আমি বুঝব। আপনি ফিকির করবেন না। আমরা অমন কত দিয়ে এসেছি না? আজ কি নতুন নাকি?"

"তো ঠিক আছে, কেত্তা দেবো?" বলে চিরঞ্জীলাল। "তাঁকে তো শো দুশো দেনা চোলে না। হাজার পাঁচশো নহি দিলে কি ভালো দিখাবে? না কি বোলো সরপঞ্চবাবু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা নয়তো কি?" ভাগু মহান্তি রায় দিলেন।

"তো লেও ইয়ে পাঁচশো", চিরঞ্জী পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে দিল।

ইন্সপেক্টারবাবু বললেন— "এটা কি দিচ্ছেন? আমার লজ্জা করবে এত কম টাকা দিতে। আমি এক হাজারের কম কখনো দিইনি। পাঁচশো দিলে ভাববেন আমি পাঁচশো মেরে দিয়েছি। রাখুন ওটা।"

"আরে পুলিশ সাহেব। আপনি সমঝতে নেহি। অভি পাঁচশো দিলম, ঔর পাঁচশো কিস্তিওয়ারি হরেক মহিনা দিবো। হোবে তো?"

রামবাবু বললেন, "ঠিক বলেছেন শেঠজী। একেবারে তিনি পাঁচশো গুণে দেবেন কেন? কাজ চলুক। তারপরে—"

"হ্যাঁ, ক্রমে ক্রমে দেবেন"। ভাগুবাবু রামবাবুকে সমর্থন করলেন।

রামবাবু বললেন— "ব্যাপারটা হল এই পাঁচশোটা পাঁচ মাসে পাঁচ হাজার হতে পারবে। না কি বলেন শেঠজী?"

"ওয়াজিব বাত বাবু ওয়াজিব বাত।"

রামবাবু হাসি আর চাপতে পারলেন না। তাঁর হাসার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টার, ভাগু মহান্তি সকলে হেসে ফেললেন। চিরঞ্জীলাল বুঝতে পারলেন না তাঁরা কেন হাসছেন। ভাবলেন তাঁরা পছন্দ করলেন তাঁর প্রস্তাব।

ইন্সপেক্টার বললেন— "শেঠজী, এটা ঘুষঘাসের ব্যাপার। ব্যবসা নয়, বুঝলেন? রোক ঠোক নগদ গুণে না দিলে কাজ হয় না।"

অগত্যা চিরঞ্জীলাল আরো পাঁচখানা নোট বের করে দিলেন। ইন্সপেক্টার সাহেব টাকা পকেটস্থ করে উঠলেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টারকে উঠতে দেখে ভাগুবাবু বলে উঠলেন, "আজ্ঞে, চলে যাবেন নাকি? আমি চায়ের জন্যে বলেছি।"

"না, না, দেরি হয়ে যাবে। আমি চলি।" ইন্সপেক্টার বললেন। ভাগুবাবু খুব জিগির করে বললেন, "এটা কি একটা কথা হল। আমার বাড়ি এসে আপনি চা-জলখাবার একটু মুখে না দিয়ে চলে যাবেন? আমার কথা বাদ দিন। ওদিকে গিন্নির কানে যদি যায় যে অমুক ভদ্রলোক চা-টা না খেয়ে চলে গেলেন, আমার কি রক্ষা থাকবে?"

"না, না, আর একদিন খাব। আজ থাক।" ইন্সপেক্টার বললেন।

"অ্যাঁ, সত্যি বলছেন? খাবেন না? আহা, চা-খাবারগুলো নষ্ট হবে। একা রামবাবু আর শেঠজী দুজন খাবে। আমি তো ওসব খাই না। আর তো কেউ নেই। যাকগে, কি আর করা যাবে! আচ্ছা, তাহলে আসুন। আর দেরি করে কি লাভ?"

এমনি চিরঞ্জীলালের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখছ কি শেঠজী? চলে যাচ্ছেন যে পুলিশ সাহেব। দাও না!"

বোকার মতো তাকাল চিরঞ্জীলাল ভাগু মহান্তির দিকে। ভাগু মহান্তি নাছোড়বান্দা। "এমন ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখে কি দেখছ? যাকে দেখার কথা তার দিকে চাও। জমিতে যদি লোভ থাকে চোখ বুজে দিয়ে দাও। এখন পাঁচশো হাজার খরচ না কর তো কোর্ট কাছারিতে বেশি গুণতে থাকবে। নাও নাও, বার কর। বাবু চলে যাবেন যে!"

"কেত্তা দিবো?" বললে চিরঞ্জী।

"আরে, কি কেত্তা দিব কেত্তা দিব করছ? খোলা হাতে যা হয় দিয়ে দেবে। উনি কি একশো দুশো নেবেন?"

চিরঞ্জীলাল আরো পাঁচশো বাড়িয়ে দিল। ভাগু মহান্তি নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টারের পকেটে গলিয়ে দিলেন। ইন্সপেক্টার না - না - থাক - থাক, এর কি দরকার ছিল করতে থাকেন। ভাগু মহান্তি তাঁর হাত ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে দিতে থাকেন। সদর রাস্তার দিকে। বলেন, "চলুন আজ্ঞে, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

সকলে নমস্কার করে। ইন্সপেক্টার হাত নেড়ে নমস্কার গ্রহণ করতে করতে মহা আনন্দে চলে যান।

ভিতর থেকে খবর আসে গিন্নিমা ডাকছেন। এমন সময় এক ছোকরা এসে রামবাবুকে খরব দিল— "সাব, সভায় লোক জমে গেছে। সবাই আপনার অপেক্ষায় আছে। শিগগির চলুন।"

"প্রোসেসান?" রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রোসেসান আর একটু বাদেই সভার থানে পৌঁছে যাবে।"

ভাগু মহান্তি বললেন, "তুমি এগোও রামবাবু। আমি যাচ্ছি।"

নেতা হাঁকছিলেন— 'চাষী মজদুর—'

'এক হও'— ধুয়া দিচ্ছিল অন্যেরা।

লাল ঝাণ্ডা — আমাদের ঝাণ্ডা

আমাদের ঝাণ্ডা — অমর হোক

ধানের কল — জিন্দাবাদ

আমাদের দাবি — ধানের কল

আমাদের চাই — কাম ধান্দা

প্রতিক্রিয়া — ধ্বংস হোক

দুখী দাস — মুর্দাবাদ

রাম ভাই — জিন্দাবাদ।

দুঃখীর দোরের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রোসেসান। দুঃখীর কানে মিছিলের ধ্বনি এসে বাজছিল। দীনু, শুকুরা, ঘন, কাশী সবাই শুনছিল। মিছিল হাঁক দিতে দিতে চলে গেল সভার দিকে।

দুঃখীর বাড়ি থেকে সভাস্থল বেশি দূরে নয়। সভায় মাইক লাগানো হয়েছিল। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল দুঃখীর বাড়িতে। মিছিল পৌঁছোলে সভার কাজ আরম্ভ হল। ভাগু মহান্তি সভাপতি। রামবাবু বক্তৃতা ঝাড়ছেন। দুঃখীর বাড়িতে সকলে বসে শুনতে থাকে।

"এখানে মিল বসবে। কাজকর্ম পাবে লোকেরা। চাকরি পাবে। যারা বাধা দিচ্ছে তারা বোঝে না যে দেশ এগিয়ে চলেছে। দুনিয়া এগোচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশে যেখান থেকে সাহেবরা এসেছে তারা কত এগিয়ে গেছে। আমরা পিছনে পড়ে আছি। আমরা কি চিরদিন পিছনে পড়ে থাকব? চিরদিন ঢেঁকিতে কুটে চুলো ফুঁকে রান্না করে খাব? এখানে মিল হবে। বিজলি

আসবে। জলের কল্ বসবে। আমাদের বউ-ঝিদের আর পুকুরপাড়ে যেতে হবে না। বিজলির চুলোতে রান্না হবে না। হাঁড়িতে কালিঝুলি লাগবে না। বাসন মাজতে গিয়ে মেয়েদের রোজ রোজ হাঁড়ি থেকে কয়লাকালি ছাড়াতে হবে না। খুব সহজে বিনা ঝামেলায় রান্নাবান্না আর সব কাজ হয়ে যাবে। এটা কি খারাপ কথা?" রামবাবু বলতে থাকেন।

"কখনো নয়, কখনো নয়"— লোকেরা চেঁচাল। "লোকেরা কাজকর্ম পাবে এটা কি খারাপ?" রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করল। আবার শোর উঠল "কখনো নয়, কখনো নয়"। "এখানে মিল বসানো কি খারাপ?" রামবাবু আবার প্রশ্ন করেন। "কখনো নয়, কখনো নয়" জনতা উত্তর দেয়। রামবাবু ঘুরিয়ে বলেন "এখানে মিল বসবে কি না?" "আলবাত বসবে" "জরুর বসবে" লোকেরা জবাব দেয়। রামবাবু খুব উৎসাহিত হন, উত্তেজিতও। অনর্গল বক্তৃতা চলে।

"যারা এতবড় একটা কাজে বাধা দিচ্ছে তারা আমাদের শত্রু, দুশমন।"

"লোকেরা এদের ক্ষমা করবে না।"

"কখনো না, কখনো না", লোকেরা চেঁচাল।

"শুনুন ভাইয়েরা, এরা গান্ধীজীর নাম নিয়ে লোকদের ঠকাচ্ছে। গান্ধীজী 'কুটে খাও ও কেটে পর' বলেছিলেন। ধানের কলও কুটবে। কাপড়ের কল কাটবে। গান্ধীজীর কথা কি অমান্য করা হল?"

"না - না"— লোকেরা জবাব দিল।

"ভাইসব! আপনারা এই প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের চিনে রাখুন। ভালো করে জেনে রাখুন। এরা তুলসীবনের বাঘ। এরা কোনো একটা মুখোশ পরে আপনাদের কাছে আসে। এদের আসল চেহারা আপনারা খুলে দিন। এরা প্রগতির পরিপন্থী, প্রগতির বিরোধী। প্রগতি পথের কাঁটা। আমাদের রাস্তা থেকে কাঁটা সরিয়ে দিতে হবে। এরা সরে না গেলে দেশ এগোতে পারবে না। প্রগতি পিছিয়ে যাবে।"

হঠাৎ বালুঙ্গা উঠে দাঁড়ায়— "আজ্ঞে পরমগতি তো গুরুবাক্য পালন করলে মেলে। গালমন্দ করলে কি পরমগতি পাওয়া যাবে?"

"আমি প্রগতির কথা বলছি। পরমগতি বলছি না। বস। বসে যাও। চুপ করে শোন। পরম ফরম সব মিথ্যে। আমাদের মূর্খ মনে করে একদল লোক আত্মা, পরম, ভগবান এসবের নামে ঠকিয়ে খায়। ভগবানকে কেউ দেখেছ? সত্যি করে বল, দেখেছ কেউ?"

"না - না - না" বলে শোর উঠল।

"আমি যাকে দেখিনি, আমি যাকে জানি না, তার কথা বলে আমি তোমাদের ঠকাতে চাই না। যা প্রত্যক্ষ দেখছি, যা আমাদের প্রতিদিন দরকার, সেই কথা আমি বলব। আমি বলতে চাই — আমাদের দরকার ভাত আর কাপড়। আমাদের খাদ্যে যে ধুলো দেবে, আমাদের কাপড় যে কেড়ে নেবে সে আমাদের শত্রু, বৈরী!"

হাততালি হল।

"এ গাঁয়ের জমি আমাদের। চাষী মজুরদের। বসে-খাওয়া লোকদের নয়।"

"বাবু আজ্ঞে, আপনি বসে-খাওয়া না খেটে-খাওয়া?"— বালুঙ্গা চেঁচাল। দাঁড়িয়ে পড়ল।

"চুপ কর। চেঁচিও না।" রামবাবু রেগে উঠলেন। জনতাও রেগে গেল। "বসে পড়, বসে পড়" বলে চেঁচাল। বালুঙ্গা বসল।

রামবাবু বলতে লাগলেন— "এরা পুঁজিপতিদের দালাল। আমাদের সভা পণ্ড করতে পুঁজিপতিরা পাঠিয়েছে। আমরা পুঁজিপতিদের বরদাস্ত করব না। তাদের দালালদের বরদাস্ত করব না। আমরা আমাদের জমিতে যা ইচ্ছে তাই করব। লাঙল দিয়ে কাজ করব।"

"লাঙল কখনো ধরেছ বাবু?" বালুঙ্গা বললে আবার উঠে পড়ে।

"বসে পড়, বসে পড়"— জনতা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রামবাবু উত্যক্ত হয়ে বললেন— "আমাদের জমি আমরা চষব। আমাদের জমিতে আমরা সোনার ফসল ফলাব। আমাদের জমিতে আমরা ধানের কল বসাব। আমাদের ধান আমরা মিলে চাল করব। তাতে কার বাপের কি? এ জমি আমাদের। লাঙল যার জমি তার।"

"বাহ, ছাপর যার বাড়ি তার বল না কেন? যে ছাপর করবে বাড়ি তার হয়ে যাবে।" বলে বালুঙ্গা সভা ছেড়ে উঠে চলে গেল।

"ওরে পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল"— চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা ছোকরা ।

রামবাবুর বক্তৃতা শেষ হতে চায় না—

"এরা সব প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের গোলাম। পুঁজিপতিদের দালাল। এরা আমাদের প্রগতিশীল বিপ্লবের বিরোধ করতে চায়। এদের মগজ ভেঙে দিতে হবে। এখানে মিল বসানোর জন্যে সরকার জমি দখল নিতে আসবেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল লোকগুলো— এই বালুঙ্গা, দুঃখী দাস আর তাদের মতো কতক ন্যস্তস্বার্থ দালাল বাধা দেওয়ার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। আমরা তাদের অভিসন্ধি ভেঙে দেব। আমাদের যে বাধা দেবে, যে আমাদের জমির ওপরে আসবে, আমাদের কাছে ঘেঁষলেই আমরা তাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।"

তালির বৃষ্টি হল। রামবাবু চিৎকার করে বললেন— "বল ভাই - ভারত মাতাকি—"

"জয়" — লোকেরা গলা মিলিয়ে তান ধরল।

"বল ভাই - লাল ঝাণ্ডা কি—"

"জয়" — লোকেরা জয়ধ্বনি দিল।

"আমাদের দাবি" — মানতে হবে।

"প্রতিক্রিয়া" —"ধ্বংস হোক"।

"দুঃখী দাস" — "মুর্দাবাদ"।

"কমরেড রামচন্দ্র" — "জিন্দাবাদ"।

" প্রতিক্রিয়া কা—" — "বদলা লেনা"।

"দুশমন কা—" —"বদলা লেন"।

গিন্নি ঠাকরুণ চলে যাওয়ার পর পরামর্শ চলল দুঃখী দাস, দীনবন্ধু, কাশীনাথ, ঘনশ্যাম

আর শুক্রসেনের মধ্যে। সত্যাগ্রহীদের সকলকে ডেকে কাল সকালে তালিম দেওয়া হবে। কেউ যেন পুলিশ কিম্বা চিরঞ্জীলালের দালালদের গায়ে হাত না দেয়। সাবধান।

কাশী বললে, "ও দুর্বুদ্ধি কোরো না। অহিংসা অহিংসা বলে বেশি হাঁকডাক করলে ভীরুতা এসে যাবে। সব পালাবে। অহিংসা করা হয়ে থাকলে আগস্ট বিপ্লব হত না। ভীরুতার চেয়ে হিংসা ভালো। একবার তো বলা হয়েছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে। আবার অহিংসা অহিংসা করে চেঁচালে অহিংসা ঢুকে যাবে সবার ভিতরে, এক রাতের মধ্যে এক ঘন্টার মধ্যে। কেউ কিছু না করলেও কাল গুলি চলবে। গিন্নিমা তোমার ওই কথাই বলে গেলেন। গিন্নিমা নন, রণচণ্ডী। শুকুরা ঠিক দেখেছে। তোমরা সব ভুল বুঝেছ। মানুষ মরবে। বিধানসভাতে শোরগোল হবে। সরকার জুডিসিয়াল এনকোয়ারি করবেন না— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিদ ধরবেন— অফিসিয়াল এনকোয়ারি হবে। ফল — হস্তীর বাতকর্ম। লোকেরা ঢেলা ছুঁড়ল, বন্দুক কেড়ে নিল, তাই গুলি চলল। ঢেলা ছোঁড়ার জন্যে পুলিশের তরফ থেকে 'এজেন্ট প্রভোকেটিয়ার' সাজিয়ে রাখা হয়ে গেছে। তোমরা এখানে নাকে তেল দিয়ে শুয়ে আছ। ব্রিটিশ শাসনে যা, কংগ্রেস শাসনেও তাই। এখনো ইংরেজ শাসন চলেছে। ইংরেজি শাসনে রাজা আসে রাজা যায়। তবু রাজা চিরন্তন। অমর। ইংরেজরা ভারতভূমিতে অমর। এক যুগের বেশি কাল কেটে গেছে। আমরা স্বাধীন হলাম কিন্তু পুলিশী জুলুম গেল না। স্বাধীনতার জন্যে যত লোক গুলি খেয়ে মরেছিল, তার দশগুণ লোক বারো-চোদ্দ বছরের ভিতরে স্বাধীনতার পর মারা গেছে। ব্রিটিশ সরকার যত গুলি করে মেরেছিল স্বাধীন গণতান্ত্রিক সার্বভৌম সরকার তার বিশগুণ গুলি করেছে। আমরা বিধানসভায় কত চেঁচামেচি করলাম পুলিশ কোড বদলাও বলে, কেউ শুনল না। আমাদের মনটা গোলাম হয়ে গেছে। মনটাকে স্বাধীন করবার জন্যে অনেক রক্ত দিতে হবে। ভয় করলে চলবে না। অহিংস আন্দোলন হবে। নিশ্চয়ই হবে, তবে হিংসাকে ভয় করে অহিংসা নয়।"

মিছিল দুঃখীর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শুকুরা লাঠিটা ধরে বললে, "দাদা, আমায় যেতে দাও। এই শালারা আমাদের নাকের ডগায় মুখ ফুলিয়ে বলবে 'দুঃখী দাস মুর্দাবাদ'— এ আমার অসহ্য। আমি ওদের মাথা না ফাটিয়ে দি তো আমার নাম শুকুরা নয়।"

দুঃখী গিয়ে ওর হাত থেকে লাঠিটা ছাড়িয়ে নিল।

ঘন হেসে হেসে বললে— "দেখলে তো অহিংসার স্বরূপ? আমার ছোট কথা মানো, চল আজ রাত থেকে জনে জনে আমরা ওদের যত লোক আমাদের মারতে আসবে তাদের দোরে ধরনা দিয়ে শুয়ে থাকব। তারা আমাদের আমল না দিয়ে বেরিয়ে এলে তারপরে আমরা জমির কাছে যাব। আমার বিশ্বাস তাদের ওপরে এর প্রভাব ভালোভাবে পড়বে।"

কাশী বললে — "হতে পারে। তবে গুলি ঠিক চলবে। এরা গণ্ডগোল না বাধালেও পুলিশ তার কাজ নিশ্চয় করবে — এজেন্ট প্রভোকেটিয়ারের, বুঝলে?"

দীনু বললে — "সে যা হবে আমরা তার জন্যে তৈরি। কিন্তু কাল কত লোক আমাদের বিরোধ করবে? কারা কারা করবে জানলে তো আজ রাত থেকে গিয়ে তাদের দোরে ধরনা দেব?"

দুঃখী বললে —"সেটা জানা কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। গিন্নিমা তো বলে গেলেন দশ-বারো জন ছিল। তাঁর মাইন্দার দুজনেও তাদের সঙ্গে। দৌড়ে যা তো শুকুরা, করুণা বা ভুবন যাকে পাবি ডেকে নিয়ে আসবি— বলবি দুখিয়ান্না ডাকছে। সব কথা জানা যাবে।"

"যদি না পাই?" শুকুরা বললে।

"পাগল হয়েছিস?" দুঃখী বললে। "সে ঘরে বসে টাকা গুনছে নয়ত কোথায় রাখবে জায়গা খুঁজছে।"

শুকুরা চলে গেল। সকলে হাসল। "সে কি সত্যিকথা বলবে?"

দুঃখী বললে "দেখ না। না বলে যাবে কোথায়? পাপ লুকোতে পারবে না।"

এই সময় এসে পৌঁছল বালুঙ্গা। বললে— "সর্বনাশ করল দুখিয়ান্না। সর্বনাশ করল! সংসারটা ভাসিয়ে দিল এই পাষণ্ডীগুলো। শুনেছ? সভা করছে। বলছে জমিগুলো সব দখল কর। লাঙল যার জমি তার। দেখছ কি গো দাঠাকুর? গাঁটা চুরমার হয়ে গেল। মাটি ফেটে হাঁ করে আছে। এ গাঁয়ে আর কিছু হবে না। ঘাসও গজাবে না। কলি, কলি, ঘোর কলি! 'গর্বে হইবে খলবল, নাশিবে ভুবন মণ্ডল'।

"পাপ ছেয়ে গেল। আগে সারা গাঁয়ে দুটো-চারটে লোক ছিল যারা বসে খেত। পরের ধনে বড় হয়েছিল। হলেও তারা দান-খয়রাত মেলা মোচ্ছব করত। বিয়ে-থাতে লোকদের খাওয়াত। কাপড় দিত। শ্রাদ্ধকর্মে বৃষোৎসর্গ করত। নাম-যজ্ঞ নাম-সংকীর্তনে দশ-পঁচিশ খরচ করত। এখন ত সে-সব কিছু নেই। যে যা পেল কোমরে গুঁজে দিল। সকলে আপনার রোজগারের না চেয়ে পরের ধনে আশা রেখে জালজোচ্চুরি কালোবাজারিতে মেতেছে। বলে কিনা, লাঙল যার জমি তার। মানে, পরের জমি পরের ধন নিয়ে নেবে। দেখ, যে পরের ধন আশা করবে তার সর্বনাশ হবে। আমি ত খেটে খাওয়া লোক। আমি বলছি। এরা যেমনভাবে লোকদের মাতিয়ে দিচ্ছে, সবাই উচ্ছন্নে যাবে। গাঁয়ে গাঁয়ে মারপিট গণ্ডগোল বেধে যাবে। আর শান্তি নেই গাঁয়ে।"

দুঃখী বললে, "রামবাবু যা বলছেন, আমাদের বিনোবা ভাবেও তাই বলছেন— ভূমি হল মা, মায়ের যে সেবা করবে মা তার।"

বালুঙ্গা ফুঁসে উঠল— "রাখোতোমার বিনোবাকে। 'ভাবের ঘরে চুরি'। এসব অন্যায়ের সঙ্গে সালিস, বুঝলে? মার যে সেবা করে মা হল তার, নয়? আহা, ধর্মাবতার এলেন আমার। যে ছেলে অক্ষম, দুর্বল, রোগা মা তার, না যে ছেলে রোজগেরে তার হে? যে মা রোজগেরে ছেলেকে দেখে, অপারগ ছেলেকে অনাদর করে, সে মা নয় রাক্ষুসী।"

"সরকার তো সেইরকম আইন করেছেন, আমরা কি করব?"

"কি আইন করেছে সরকার? সরকার কি আমাদের? গাঁয়ের মানুষদের? সরকার শহুরের বাবুদের। তেলা মাথায় তেল দিচ্ছে। ফড়িং মেরে পাখি পোষা। আমাদের মেরে শহুরেদের উঁচুতে তুলছে। লাঙল যার জমি তার! ছাপর যে করবে বাড়ি তার কর না কেন? যত রাজমিস্ত্রি শহুরে কোঠাবাড়ি সব তৈরি করছে বাড়িগুলো তাদের হয়ে যাক। আইন করছ না কেন? হেঁ, হেঁ, তার বেলা 'কত না শাস্তোর পড়ে শুক, বেড়াল দেখলে বেবাক মুক!' শহুরের মানুষদের গায়ে হাত দেবে?"

শুকুরা বললে, "বালুঙ্গাদা, কংগ্রেস সরকার বলছেন, এই শহরের লোকেরা গাঁকে শোষণ করছে বলে লাঙল যার জমি তার করার জন্যে আইন হচ্ছে। শহরবাসীরা শহরে বসে নানা ধান্দা করে রোজগার করে বড়লোক হয়। এদিকে গাঁয়ের মানুষের জমিরও মালিকানা হাতে রেখে বিনা মেহনতে ফসল পাবে এটা অন্যায় নয়?"

"বাহ্, বারে ছেলে, কথা একটা বললি বটে। তাহলে আইন করে দাও কেউ একটার বেশি ধান্দা হাতে রাখতে পারবে না। যে চাকরি করবে, ব্যবসা করবে, সে চাষ করতে পারবে না। কেন করবে হে? তুমি দশ জায়গায় হাত দিয়ে খাবে আর আমরা বেকার হয়ে বসে থাকব? কি গো, দুখীননা, আমি ন্যায় বলছি না অন্যায় বলছি? তোমার বিনোবা কি বলেন? কারো মগজে এ বুদ্ধি ঢোকে না? বলে কিনা গাঁয়ে যে দশ একর আবাদ করে প্রতিপোষণ করছে তার কাছ থেকে কেড়ে নাও। আর যে শহরে কোঠাবাড়ি করে ঘোড়া মোটর রেখে ভুঁড়ি বার করে বসে আছে তাদের ভাতের হাঁড়ির জন্যে সাতপাঁচ যা রইল থাক। তাদের দশ একর থাকবে আর আমাদের দশ একরের বেশি থাকবে না! এটা কেমন ন্যায়? এটা ইংরিজি পড়ার ন্যায়। থাক বাবা, তোমাদের কি আমরা যুক্তিতে পারব? আমরা চললাম, পেন্নাম।"

চলে গেল বালুঙ্গা। হাওয়াটা যেন গরম করে দিয়ে গেল। ওদিকে রামবাবু গরম বক্তৃতা ঝাড়ছেন। সব মাইকে শোনা যাচ্ছে। সে আক্ষেপ, সে গালি দুঃখী দীনু ঘন কাশীদের যত না গরম করছে, বালুঙ্গার কথাগুলো ঠাস ঠাস চড় মারার মতো মাথা ঝিম ঝিম করে দিচ্ছে। সকলে চুপ। ভাবনার জন্যে বালুঙ্গা— মূর্খ বালুঙ্গা যে খোরাক দিয়ে গেল সেটা ফুরোচ্ছে না।

করুণাকে নিয়ে ফিরে এল শুকুরা। করুণা প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, "কেন ডেকেছিলে দাঠাকুর?" ওর জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল যেন। থেমে থেমে ঢোক গিলে কথা বলছিল।

"না তেমন কিছু নয়। তোর সব ভালো তো?" বলল দুঃখী।

"আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর। তোমার আশীর্বাদে একরকম ভালো আছি।" করুণার বুকে এবার সাহস এল।

"এবার কত আমদানি করলে?"

"ধান আশি মন খামারে আছে। আজ্ঞে, বাকি বছরের খরচের জন্যে মরাই ভরা।"

"তোর মাইনে ভাগু মহান্তি দিয়ে দেয় নিশ্চয়ই? আজকাল সে নাকি খুব ভালো হয়ে গেছে, নয় রে?"

"আজ্ঞে নিম কি মিষ্টি হয়েছে না হবে?"

সকলে হেসে উঠল।

"হ্যাঁরে, তুই আমার কাছে থাকবি?" জিজ্ঞেস করল দুঃখী।

"সে-কথা আর বলতে, ঠাকুর? কবে থেকে? এই মাঘ মাসটা কাটুক।" বললে করুণা।

"তোমার বাবু রাগ করবেন না?"

"রাগ করলে করুন গে?"

"ওরে, আমার বাস থাকবে তো?"

"আর সে দাপট নেই গো বাবুর। সে রোয়াব কই? মিছিমিছি সরপঞ্চ বলাচ্ছেন। এখন তো হাকিম থেকে পুলিশ পর্যন্ত সবাইকে হাতজোড় করতে করতে দিন ফুরোয়।"

"তা হলেও সরপঞ্চ তো বটেন।"

"হোন গে সরপঞ্চ। তিনি তোমার কি করবেন?"

"লোক লাগিয়ে পিটিয়ে দেবেন। ভাগু মহান্তি কম জানোয়ার নয়।"

"ইস? পিটিয়ে দেবে?"

"টাকা দিলে আজকাল পিটোবার লোকের কি অভাব হবে?"

"এমন চাঁড়াল কে আছে যে পয়সা নিয়ে মানুষ মানুষকে পিটবে?"

"এ যুগে কি না হচ্ছে? তুই তো চোখে দেখলি আজ সন্ধেবেলা কি ব্যাপার হল?"

করুণার গলা আবার শুকিয়ে গেল। কথা আটকে গেল। ভয়ে বুক কাঁপছে। দুঃখী দাস একজন সিদ্ধপুরুষ। অনেকে একথা বলে। আজ করুণা প্রত্যক্ষ দেখছে। দুঃখী দাস তবে সব দেখতে পায়? সন্ধ্যাবেলা ভাগু মহান্তির দরদালানে যা যা ঘটেছে সব দুখীদাসের জানা। সে তার কাছে লুকোবে কি? মিথ্যুক হয়ে যাবে সে। তবু মনে ভাবল, যদি অন্য কোথাকার কথা হয়ে থাকে। সাহস করে ঢোক গিলে বললে, "আজ সন্ধেবেলা?"

"হ্যাঁ," দুঃখী বললে, "আজ সন্ধেবেলা।"

"কোথায় কি হল?" আবার বলল করুণা। 'আমি ত কিছু জানি না' বলতে যাচ্ছিল, আটকে গেল গলায়। কথা গিলে ফেলল।

"কোথায় তুই জানিস না?" বললে দুঃখী। করুণার বুক কাঁপছে।

"কোথাকার কথা বলছ দাঠাকুর?"

"ওই ভাগু মহান্তির দালানে রে। জেনেশুনে সেয়ানা সাজছিস?"

"না ঠাকুর, চোখের দিব্যি, আমি নই। ওরা সব নিল। আমি কিছু নিইনি।"

"সকলে তো সমান সমান ভাগ করে নেবে বলে কথা হল। তোর ভাগটা কি হল?"

এবার শুধু বুক নয়, গোটা শরীরটা কাঁপছে করুণার। দুখীননা সিদ্ধপুরুষ। সব জানে। দিব্যজ্ঞানী। আর লুকিয়ে লাভ নেই। বললে, "আমি নিলাম না। সব সে নিল, ওই ভুবন। মিছিমিছি আমার নামে বলছে। আমি তো মানা করে দিলাম না, আমি পারব না, বলে।"

"তোর ভাগেরটা সব তো ভুবন নেয়নি বোধহয়। তোর বাদে বাকি সবাই সমান সমান। তোর টাকাটা সব সমান ভাগ করে নিল, না কেউ কম কেউ বেশি নিল?

আরো একবার ঢোক গিলে করুণা বলল— "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মানে? কম বেশি নিল?" দুঃখী জানতে চাইল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে কত নিল?"

"আমার মনে নেই দাঠাকুর।"

"কে কে সব নিল বল তো? তোমরা কজন ছিলে? দশ না বারো?"

"দশ।"

"কে কে?"

একটি একটি করে ন-জনের নাম বলে গেল করুণা। দুঃখী বললে, "আচ্ছা বেশ, তুই এখন বাড়ি যা। দেখ, সে টাকা যদি বাড়িতে ঢুকিয়েছিস তো মহা অনর্থ হবে জেনে রাখ। পুলিশ আসবে। ঘর তল্লাশী করবে। এত টাকা একসঙ্গে পেলে জেলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।"

করুণা লম্বা হয়ে পড়ে গেল দুঃখীর পায়ের নীচে। "দাঠাকুর, তুমি বাঁচাও। আমার ঘরে পুলিশ ঢুকবে— এঁ - এঁ - এঁ"— কাঁদল বাচ্চা ছেলের মতো।

"আচ্ছা, ওঠ ওঠ"— দুঃখী বললে, "তোর কিছু হবে না। সব কথা সত্যি সত্যি বলে যাবি।"

"আমি মিথ্যে বলছি না। চোখ ছুঁয়ে দিব্যি করছি, সত্যি কথা বলছি। 'মহাপ্রভু'র দিব্যি। আমি মানা করেছিলাম। শঙ্করদা— সে সকলের সর্দার হয়েছে— জবরদস্তি আমার কোমরে গুঁজে দিল। দশটাকার নোট দশখানা— এই যে। এখনো আমার কোমরে গোঁজা রয়েছে। ওই পাপের টাকা বাক্স-তোরঙ্গে ঢোকাব না বলে। তখন থেকে আমার মন খালি ছাঁৎ ছাঁৎ করছে। যত ডাকল— সভা হচ্ছে চল আমি গেলাম না। আমার মন করল না। দাঠাকুর, আমায় এ থেকে রেহাই দাও। এ টাকা তুমি নাও"— বলে নোটগুলো রেখে দিল দুঃখীর সামনে।

দুঃখী বললে, "দেখ করুণী, আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি। পুলিশ এখুনি আসবে। তুই বোস, পুলিশ এলে সব সত্যি কথা বলে যাবি। টাকাগুলো পুলিশকে দিয়ে দিবি। তোর কাছে রাখ।"

"না না, তুমি রেখে দাও দাঠাকুর। যা যা ঘটেছে আমি পুলিশের সামনে সব বলব।"

"কিছু লুকোবি না?"

"কিছু না, একটুও না।"

"তাহলে তোর কিছু হবে না।"

সভা ভাঙার পর একদল ছোকরা স্লোগান দিতে দিতে এল— 'দুঃখী দাস মুর্দাবাদ'..... 'কমরেড রামচন্দ্র জিন্দাবাদ' .... 'প্রতিক্রিয়া ধ্বংস হোক'— দুঃখীর বাড়ি পর্যন্ত। একজন বললে— "আবে দুখিয়া! কোথায় গেলি? বেরিয়ে আয় শ্‌শলা! এখানে আমাদের জমির ওপরে ফোঁপরদালালি দেখাচ্ছ! শ্‌শালা, কাল জমির কাছে যাবি তো দেখবি। তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব।"

আর একজন বললে— "ওটা কোথায় লুকিয়েছে বে— চল।" আর একজন বললে—

"প্রাণের এত ভয়? তবে আর নেতাগিরি ফলায় কেন বে?"

দুঃখী বারান্দায় বসেছিল। উঠে এসে বললে— "আপনারা আমায় কেন খুঁজছেন? কিছু বলবার আছে?" দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির ওপরে। সিঁড়ি নয়, পাথর। বারান্দায় ওঠার জন্যে রাখা নিচু পাথরখানার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলে নীরব। দুঃখী তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল কাশী, দীনবন্ধু, ঘনশ্যাম আর একটু আগ বাড়িয়ে দাঁড়াল শুকুরা।

একটা নির্ভীক ছাতি। ঘাড় সোজা। উঁচু মাথা। সে মাথা নুয়ে পড়তে জানে না। জ্বলন্ত চোখ। সে চোখের সামনে বাঘও বোধহয় রাস্তা ছেড়ে দেবে।

দুঃখী দাস দাঁড়িয়ে আছে। সামনে গণ্ডা-দুয়েক গোঁয়ার ছোঁড়া। দু-চারজনের হাতে লাঠি। "আপনারা কি চান?" আবার বলল দুঃখী।

"আমরা চাই মিল"

"কাকে বলছ? কে দেবে?"

"তুমি দেবে।" বলল এক ছোকরা। চোখ লাল।

"আমার সে শক্তি নেই। আমি দিতে পারব না।"

"তুমি আটকাচ্ছ। মিল বসাতে দিচ্ছ না।" আর একজন বললে।

"আমি বসাতে দেব না। এ গাঁয়ে মিল বসবে না।" দুঃখী এবার খুব জোর গলায় বলল। যেন বাজ পড়ল। গম্ভীর জোরাল শব্দ কয়টা — তীরের মতো ধারালো।

"আলবাত বসবে। সে জমি আমাদের। আমাদের জমিতে আমরা মিল বসাব। যা ইচ্ছে তা করব। তোর বাপের কি গেল?" বলল সেই ছোকরা, যেন নেশা করেছে।

দৌড়ে গিয়ে একটা পাঁচহাতি লাঠি নিয়ে এল শুকুরা। লাঠিটা পেকে লাল হয়েছে তেল খেয়ে। শুকুরার সখের ঠ্যাঙ্গা। জায়গায় জায়গায় পিতলের গোঁজ বসানো। নিরেট বাঁশের তৈরি। কঠিন, মজবুত।

দুঃখী দেখল অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে। শুকুরার হাত থেকে লাঠিটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দার ভিতরে।

"আমার বাপের কি গেল?" বললে দুঃখী। "লজ্জা করে না তোদের? নিজের ভিটেকে পরের হাতে তুলে দেবার জন্যে এখানে এসেছ ঝগড়া করতে? যাও, যাও, বাড়ি যাও। তোমাদের বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে এস।"

"না, আমরা যাব না"— বলল সেই লাঠিধর ছোঁড়া। "আমরা তোমার কাছ থেকে জবাব নেব তবে ফিরব" বলে লাঠিটাকে ঠুকে দিল মাটিতে।

"কিসের জবাব নেবে?" বললে দুঃখী।

"আমাদের মিলের জমির ওপরে তুমি কাল গণ্ডগোল করবে না।"

"গণ্ডগোল তো আমরা সেখানে করতে যাচ্ছি না।"

"সত্যাগ্রহ করবে না আমাদের জমির ওপরে।"

"ওরে পাগল, জমি তো চিরঞ্জীলাল মারোয়াড়ির। তোমাদের কি করে হল?"

শুকুরা রাগের চোটে তেতে উঠছিল। আর সামলাতে পারল না। বলে ফেলল— "তোমরা কি চিরঞ্জীলালের দালাল?"

আর কে সামলায়! "কি বললি বে শালা— আমরা পুঁজিপতির দালাল?" বলে লাঠিটা তুলতেই, কাশী দড়াম করে গিয়ে ওর পিছন দিক থেকে লাঠিটা খিঁচে টেনে আনল।

তারপরে লেগে গেল মহাভারত। সে কি দৃশ্য! চার-পাঁচটা ষণ্ডা ছেলে লাঠি ধরে খেপে ধেয়ে এল কাশীর দিকে। সেদিকে পাঁচ-পাঁচটা লাঠিধরা জোয়ান। এদিকে একা কাশীনাথ লাঠি ঘোরাচ্ছে। এমন লাঠি ঘোরাচ্ছে যে ঢেলা ছুঁড়লেও একটা ওর গায়ে লাগবে না। কে কোথায় ছিটকে পড়ল।

এমন সময়ে তাদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে দিলেন রামবাবু। কোথাও আড়ালে দাঁড়িয়ে এদের মাতিয়ে দিয়ে মজা দেখছিলেন বোধহয়। অকস্মাৎ এসে বললেন— "আরে এসব কি হচ্ছে এসব কি হচ্ছে? থাম!"— তাঁর দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে। কাশীনাথ লাঠি ঘোরানো বন্ধ করে দিল। ছেলেগুলোর ধড়ে প্রাণ এল রামবাবুকে দেখে।

"তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে গণ্ডগোল করছ? এই সব শিখছ? যাও, বাড়ি চলে যাও। তোমাদের ভিতরে যে স্পিরিট আছে, 'জোশ' আছে, তাকে এমনভাবে অপব্যয় করছ! ছিঃ। তাকে বাঁচিয়ে রাখ— দেশের জন্যে, জাতির জন্যে, নীতির জন্যে, প্রগতির জন্যে। দলিতের জন্যে শোষিতের জন্যে তাকে জমিয়ে রাখ। সময় আসছে। লাল ঝাণ্ডার জন্যে তোমাদের এই যে প্রেম তারই জোরে সব লাল হয়ে যাবে। লাল সেলাম কমরেড, চল বাড়ি ফিরে চল।

"দুখীবাবু, এদের হঠকারিতার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত আর ব্যতিব্যস্ত, মানে — মানে — অস্তব্যস্ত। আমায় ক্ষমা কর। আসছি। বল ভাই — লাল ঝাণ্ডাকি—"

ছেলেগুলো 'জয়' বলার সময় ওদিক থেকে মণিয়া দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে— "সেদিকে লাল ঝাণ্ডা এসে ভারতের উত্তর সীমান্ত হিমালয় অধিকার করে ফেলেছে।"

"কে? চায়না না রাশিয়া?" জিজ্ঞেস করল ঘন।

"চায়না। চায়না ভারত আক্রমণ করেছে। রেডিও, রেডিও।"

"কখন শুনলে?"

"এই মাত্রই তো শুনে দৌড়ে দৌড়ে আসছি। বললাম— দুখিয়াম্লাকে আগে খবরটা দিই।"

"অসম্ভব! মিথ্যে!" রামবাবু ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন। "এগুলো সব বুর্জোয়াদের প্রচার। আমাদের আন্দোলনের গরম ভেঙে দেওয়ার জন্যে এসব মিথ্যে গুজবের সৃষ্টি। কোনো কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র অন্য এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করতে পারে না। অসম্ভব। অসম্ভব!"